বাংলার বিধানসভার একশো বছর
রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র

সত্যব্রত দত্ত

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট ঃঃ কলকাতা-৭৩

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাভাজনেষু

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অনেকের কাছেই এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমি ঋণী। কোনও ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য না নিয়ে এই গ্রন্থ রচনা সম্ভব হতো না যদি এঁদের সহযোগিতা না পেতাম। কয়েকজনের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। কাউন্সিল ফর পোলিটিক্যাল স্টাডিজের আমার সহকর্মীবৃন্দ, বিশেষ করে ড. অমল কুমার মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ না পেলে এই বই লেখার কাজে আমি এগোতে পারতাম না। বিশিষ্ট গবেষক-প্রাবন্ধিক মুরারি ঘোষ নানাভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে আমায় সাহায্য করেছেন। ক্ষুব্ধ হতে পারেন ভেবেও আত্মপ্রচারে বিমুখ আমার প্রাক্তন সহকর্মী ড. রামরাম চট্টোপাধ্যায়ের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করলাম। ত্রুটিমুক্ত মুদ্রণ ও গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করতে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও ভুলভ্রান্তি রয়েই গেল, এর দায়িত্ব আমার। শ্রদ্ধেয় কানাই পাকড়াশি, অধ্যাপিকা দীপিকা বসু, বন্ধুবর প্রশান্ত সান্যাল, শ্রীমতী সোমা দত্তগুপ্ত এবং আমার পরম সুহৃদ ও আত্মীয় ড. সোমেন্দ্রলাল রায়ের সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছি নানা পর্বে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নাম করতে হয় ড. প্রভাত মণ্ডল, স্মরণী অধিকারী ও সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সংসদচর্চায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা গ্রন্থাগারের সম্পদভাণ্ডার তুলনাহীন, কিন্তু যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিকল্পনার অভাবে বহু মূল্যবান গ্রন্থ শতচ্ছিন্ন, ধুলোজমাট এবং প্রায় বিলুপ্তির পথে। সহযোগিতার জন্য এই গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকেও নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি।

যেসব বই ও লেখকের সাহায্য নিয়েছি যথাস্থানে তার স্বীকৃতি জানিয়েছি।

এই বই রচনার কাজে আমাকে অনবরত প্রেরণা দিয়েছিল আমার প্রয়াত ভাই সুধাংশু। আমার স্ত্রীর সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছি সব সময়।

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্সের শ্রী কমল মিত্রকে ধন্যবাদ জানাই এই বই প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। এই সংস্থার কর্মীরাও সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন।

কলকাতা, — সত্যব্রত দত্ত

সেপ্টেম্বর, ২০০১

সূচিপত্র

কথাসার

১.১ ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার আইনসভা। স্বাধীনতার সাড়ে চার বৎসর পরে ১৯৫২ সালে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর ঔপনিবেশিক কাঠামোয় গঠিত আইনসভার বিলুপ্তি ঘটে। বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে বহুবিধ বিশিষ্টতার জন্য বিভাগপূর্ব বাংলার আইনসভা সারা ভারতের স্বীকৃতি পায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী অন্তত দেড় দশক পশ্চিমবাংলার বিধানসভাও স্বমহিমায় সক্রিয় ছিল। দীর্ঘ কালক্রমে বাংলার রাজনীতিতে শক্তি বিন্যাস ঘটেছে, সাংবিধানিক কাঠামোয় গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, আর তা প্রতিফলিত হয়েছে বিধানসভায়।

একশো বছরের বিধানসভার ইতিহাস শুধু আইন প্রণয়ন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, রাজা-উজির বদল, মন্ত্রী-সান্ত্রীর দিকে লক্ষ্যভেদই নয়, শতাব্দী-তামামির মধ্যে নিহিত রয়েছে বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। বিধানসভার দলিলপত্র, প্রশ্নোত্তর, প্রস্তাব ও বিতর্কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শাসক ইংরেজের সঙ্গে দেশজ রাজনীতির সহযোগিতা, সংঘাত ও প্রতিরোধ, জমিদার-প্রজা দ্বন্দ্ব, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের চাপান-উতোর, বিদেশী শাসকদের বিভেদনীতি ও কূটকৌশল ইত্যাদির উপাদান। বিধানসভার দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটলে সন্ধান পাওয়া যায় বাংলার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে ক্লাইভ স্ট্রীটের সওদাগর ইংরেজদের স্বার্থসিদ্ধির খেলা, বঙ্গকেন্দ্রিক তথা কলকাতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, রাজনীতিতে মহিলাদের অভ্যাগম এবং আরও অনেক কিছু। অত্যুক্তি হবে না যদি বলা যায় বিধানসভার পর্যালোচনা ব্যতিরেকে উনিশ ও বিশ শতকের বাংলার ইতিহাস আলোচনা বহুলাংশে অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

১.২ দুঃখের বিষয়, বিগত তিন দশকে ভারতের কেন্দ্রীয় সংসদ ও বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভার অধঃপাত এক মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। রাষ্ট্রপরিচালনায় আইনসভার মতো প্রতিষ্ঠানের অবমূল্যায়নে অনেকেই শঙ্কিত, কারণ আইনসভার সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বৃহত্তর রাজনৈতিক সংকট। জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বাকচাতুর্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিদগ্ধতা, যুক্তি ও শব্দবাণে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার মতো সংসদীয় অস্ত্রের প্রয়োগ আজ বিলুপ্তপ্রায়। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, একশো বছর আগে ১৮৯৯ সালে ইউরোপীয় প্রাধান্যে গঠিত ২০ আসন বিশিষ্ট বাংলার আইনসভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যাত্রামোহন সেন (দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পিতা), বৈকুণ্ঠনাথ সেন (লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী) এই কজন মাত্র বাঙালী বিধায়ক কলকাতা পৌরসভার সরকারিকরণ সংক্রান্ত কুখ্যাত ম্যাকেঞ্জি বিলের আলোচনার স্তরে বিদেশী শাসকদের কী নাস্তানাবুদই না করেছিলেন। ৫৬৫টি

সংশোধনী দেন সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগীরা। বিভিন্ন সংসদীয় অস্ত্র প্রয়োগ করে প্রায় এক বছর বিল পাস আটকে রাখেন। অনেক উজ্জ্বল মনীষার সমাবেশ ঘটেছিল বিধানসভায়। সুভাষচন্দ্র বসু-সহ জাতীয় কংগ্রেসের তেরোজন সভাপতি বিধানসভার আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। মুসলিম লীগের বেশ কয়েকজন সর্বভারতীয় নেতা বিধানসভার সদস্য ছিলেন। ফজলুল হক একটানা ৩৪ বছর ছিলেন বিধায়ক। ইউরোপীয় বণিককুলের সঙ্গে দেশীয় পুঁজির প্রতিনিধিত্ব ছিল বিধানসভায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলার বিধানসভায় গান্ধীবাদী কর্মীর পাশাপাশি ছিলেন কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। ডাকসাইটে জমিদার যেমন ছিলেন, তেমনি দু'-এক জন ভূমিহীন চাষীও ছিলেন। কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, সুচিকিৎসক, প্রখ্যাত অধ্যাপক ও সমাজকর্মীর সমাবেশ হয়েছিল বিধানসভায়। বাংলার সংসদীয় পরম্পরায় গর্ব করার মতো আরও অনেক কিছুই আছে। আজকের দিনের জনপ্রতিনিধিরা পূর্বসূরীদের সমকক্ষ না হোন, অন্তত অনুকরণ করতে পারেন আইনসভাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি তো কত সুযোগ ও সম্ভাবনা এনে দিয়েছে বিধায়কদের কাছে।

১.৩ কখন স্থাপিত হয় বাংলার আইনসভা? কি ছিল তার পরিপ্রেক্ষিত?

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পক্ষ থেকে ১৯৩৭-১৯৮৭ পর্ব অন্তে বিধানসভার সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হয়েছে। স্মারকগ্রন্থ-ও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার বিধানসভা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬২ সালে। প্রথম দিনের সভা হয় ১লা ফেব্রুয়ারি শনিবার আলিপুরের বেলভেডিয়ার (অধুনা জাতীয় গ্রন্থাগার)। সভাপতিত্ব করেন ছোটলাট পিটার গ্রান্ট।[১] বেলভেডিয়ার—রাজভবন—টাউন হল হয়ে ১৯৩১ সাল থেকে বর্তমান ভবনে বিধানসভার স্থিতি। বিপুল অর্থব্যয়ে এই সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণে তখনকার বাঙালী বিধায়করা আপত্তি জানিয়েছিলেন। "কী প্রয়োজন আমাদের এই প্রাসাদের? ইডেন গার্ডেনের গাছতলায় বসে আমরা আলোচনা করতে পারি যদি আমাদের আলোচনা জনসাধারণের অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়ের সংস্থান করে দিতে সক্ষম হয়", বলেছিলেন স্বরাজ্য দলের সদস্য মহম্মদ সাদেক ১৯২৮ সালে।

প্রতিষ্ঠাকালে বাংলার আইনসভার অধিক্ষেত্র বিহার, ওড়িশা, ছোটনাগপুর, আসাম নিয়ে ৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত ছিল। লোকসংখ্যা ছিল আট কোটি। কিন্তু আইনসভা গঠনের দাবি ওঠে বাঙালী ভদ্র ও সুধীজনের পক্ষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে, শিবনাথ শাস্ত্রীর কথায় বঙ্গ সমাজের তখন "মাহেন্দ্রক্ষণ"। বিদেশী শাসকরা তখন নেটিভদের থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন, সামরিক শক্তির ওপরই তাদের নির্ভর করে চলতে হচ্ছিল। বড়লাট লর্ড ডাফরিনের মতে, "ইংরেজ রাজশক্তি উত্তাল সমুদ্রের চতুর্দিকের মধ্যবর্তী একটি বিচ্ছিন্ন শিলাখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ বঙ্গে আইনসভা স্থাপন করে ঔপনিবেশিক শাসকরা চেয়েছিলেন উচ্চবর্গের সমাজ-শিরোমণি কয়েকজন ভারতীয়কে আইনসভায় মনোনীত করে নেটিভদের থেকে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রশক্তিকে সংহত করে শাসিতের সম্মতি নিশ্চিত করা। বস্তুত ঔপনিবেশিক শাসকদের আরোপিত বিহিত নিয়ম এবং ১৮৬১, ১৮৯২, ১৯০৯, ১৯১৯ ও ১৯৩৫-এর কিস্তিবন্দী সংস্কারের মধ্য দিয়েই আইনসভার বিবর্তন হয়েছে। বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে আইনসভার কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আজকের দিনের বিধানসভার সঙ্গে অতীতের ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত আইনসভার এক গভীর সম্বন্ধ-বন্ধন রয়ে গিয়েছে। ১৯৩৭ সাল বিধানসভার প্রতিষ্ঠা বছর ধরে নেওয়া যে ইতিহাস-চর্চার মানসিকতা-প্রসূত নয়, নিশ্চিতভাবে তা বলা যায়।

১.৪ আইনসভার সদস্যদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান একদিকে যেমন সমাজে তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির নির্দেশ দেয়, অন্যদিকে তেমনি রাজনীতির গতি-প্রকৃতিও বহুলাংশে নির্ধারিত হয় সদস্যদের এই অবস্থান দ্বারা। স্বভাবতই আলোচনায় এসে যায় কী ছিল বিধানসভার প্রকৃতি? কারা ছিলেন এর চালক? ইংরেজ না হয় ছিল শাসক ও শোষক, কিন্তু কী ছিল ভারতীয় বিধায়কদের সামাজিক অবস্থান? স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে বিধায়কদের সামাজিক অবস্থানের বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে কি?

আইনসভা প্রতিষ্ঠায় শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল অল্পস্বল্প খোরাক দিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন উচ্চকোটি ভারতীয়দের আইনসভায় মনোনীত করে রাজানুগত্য আদায় করা। স্বভাবতই আইনসভায় প্রবেশ করে ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে একাসনে বসার প্রতিযোগিতা পড়ে যায় ভারতীয়দের মধ্যে। শুরু হয় 'ইংরাজস্তোত্র'। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "হে সর্ব্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও, আমার সর্ববাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।" (লোকরহস্য) প্রথম তিন দশক আইনসভায় যে ৪৯ জন ভারতীয় সদস্য মনোনীত হন তার অর্ধেকের বেশি ছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য—জমিদার, ব্যবসায়ী, রাজা-মহারাজা। ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল, যেমন মহেন্দ্রনাথ সরকারের মত বিজ্ঞানী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত শিক্ষাবিদ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমীর আলির মত প্রথিতযশা আইনজীবী। আই.সি.এস. রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের শিরোমণি আবদুল লতিফ সরকারি কর্মচারীরূপে বিধানসভায় মনোনীত হয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস পালের মত বিধায়কও ছিলেন উনিশ শতকের বিধানসভায়। পরবর্তী তিন দশকে যাঁরা নির্বাচিত হন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন উকিল, ব্যারিস্টার, চিকিৎসক ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রতিনিধি। এঁরা ছিলেন 'বাবু'—"বাক্যে অজেয়, পরভাষা-পারদর্শী, মাতৃভাষা-বিরোধী"। (লোকরহস্য) নিজ নিজ পেশায় এঁরা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত, ভূ-সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না। কেউ কেউ ছিলেন জাতীয় আন্দোলনের নায়ক, সংস্কারপন্থী। বিদেশী শাসনের বৈধতা নিয়ে এঁরা কোনও প্রশ্ন তোলেননি। নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যরা ছাড়া বিধানসভার অনেক সদস্যই ছিলেন মনোনীত। 'নাইট-নবাব-জমিদারদেরই' সেজন্য প্রাধান্য ছিল বিধানসভায়।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রসারিত হয়, কিন্তু সদস্যদের সামাজিক অবস্থানের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। বিধানসভার এই পর্বে ছিল মফস্বল বাংলার প্রাধান্য। নির্বাচিতদের মধ্যে ছিলেন উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, ডাক্তার, কবি, সাংবাদিক, হেকিম, মৌলানা মৌলবী। এঁরা নিজেদের "কৃষকের নিজের লোক" বলে দাবি করতেন। তবে মুখে যাই বলুন, সামান্য কয়েকজন ছাড়া এদের সবাই ছিলেন জোতদার, বেশ কয়েকজন জমিদার ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর লোক। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা—এই তিন দলের মধ্যে কৃষক প্রজাই ছিল সাধারণ মানুষের কাছাকাছি, কিন্তু তাদের মধ্যেও ছিল জমিদার ও জোতদারদের প্রাধান্য। এই দলের নেতা আবুল মনসুর আহমদের মতে "বর্গাদারদের দখলীস্বত্ব দেওয়ার ব্যাপারে অনেক প্রজা-নেতাই ছ্যাৎ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেন।" যে মন্ত্রিসভা '৩৭-এর নির্বাচনে গঠিত হয় তাকে "জমিদার-পুষ্ট" মন্ত্রিসভা বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট সদস্য বঙ্কিম মুখার্জি ও অন্য কয়েকজন শ্রমিকনেতা বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৪৬-এর বিধানসভায়ও জমিদার, জোতদার ও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ছিল। জ্যোতি বসু সহ তিনজন কমিউনিস্ট, কয়েকজন শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধি এবং বীণা দাশ (ভৌমিক) সহ কয়েকজন বিপ্লবী কংগ্রেস কর্মী বিধানসভায় নির্বাচিত হন। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য সংখ্যা হয়ে যায় ৮৩। যাঁরা ১৯৪৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরাই ১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত বিধায়ক থেকে যান।

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বিধানসভার শতকরা ৭০ জন বিধায়কই নির্বাচিত হন গ্রামাঞ্চল থেকে। ভূস্বামী, জোতদার ও সম্পন্ন চাষীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ে সমকালীন রাজনীতিতে। জমিদারি অধিগ্রহণ আইন ও ভূমি-সংস্কার আইন ও তার প্রচলনে এঁরাই প্রধানত বাধা দেন। আইনজীবী, চিকিৎসক, অধ্যাপক, রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সংখ্যাধিক্য ছিল বিধানসভায়। এঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল। অনেকের সঙ্গেই যুক্ত ছিল আত্মত্যাগের কাহিনী, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। দ্বিতীয় বিধানসভায় (১৯৫৭-১৯৬২) জমিদাররা নিজেদের "ভূতপূর্ব জমিদার" বলে পরিচিতি দেন। এই পর্বে জোতদার ও কৃষক "লবি" বেশ শক্তিশালী ছিল।

চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক, প্রশাসক, ইঞ্জিনিয়ার, কেরানীরা ছিলেন বিধানসভার সদস্য। ভূমিহীন চাষী ছিলেন দুজন। যথাস্থানে এঁদের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। বিধানসভায় রাজনৈতিক কর্মীরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতি আবর্তিত হয় দলীয় নীতি দ্বারা।

১.৫ বিধানসভা সদস্যদের সামাজিক অবস্থান আলোচনায় "বাবু-ভদ্রলোক, পুরোহিত-যজমান" এই শব্দ কয়টি বাববার উঠে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৌতুক রসাত্মক রচনা লোকরহস্যে বাবু সম্বন্ধে লিখেছেন, "বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদিগেরও দশ অবতার—যথা কেরানী, মাস্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সম্বাদপত্রসম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা"। "বাবু বৃত্তান্তে" কবি-প্রাবন্ধিক সমর সেনও বাবু—আখ্যায়িত অনেকের কথাই জানিয়েছেন। বিদেশী গবেষকরা এক বিশেষ অর্থে বাংলার বিধানসভায় বাবু ভদ্রলোকদের ভূমিকা আলোচনা করেছেন। জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড (এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুর্যাল সোসাইটি) বাংলার বিধানসভাকে ভদ্রলোকের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন। লিওনার্দ গর্ডনের (বেঙ্গল দ্য ন্যাশন্যালিস্ট মুভমেন্ট, ১৮৭৬-১৯৪০) দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা পৃথক হলেও ভদ্রলোক বা 'এস্টাব্লিশমেন্ট ম্যান' তাঁরও আলোচনার কেন্দ্র। কেমব্রিজ ঘরানার অনিল শীল, গ্যালাহার প্রমুখ ইতিহাসবিদের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রভাবিত ব্রুমফিল্ডের বক্তব্য : ইংরেজের অনুগ্রহ লাভের জন্য ভারতীয় ভদ্রলোক বিধায়কদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব কারমাইকেল, রোনাল্ডশে ও লিটনের মতো "ভারতপ্রেমী" বাংলার প্রদেশ-প্রধানদের শুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। রাজপুরুষরা ছিলেন "ম্যান উইথ মিশন," আর ভদ্রলোকরা ছিলেন শাসকপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার মধুভাণ্ডের অংশীদার হওয়ার প্রতিযোগিতায় মত্ত। আইনসভায় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের কাছে আদর্শনিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও দেশসেবা ছিল গৌণ, মুখ্য ছিল অর্থ, যশ ও প্রতিপত্তির লোভে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ ও সংঘাত এবং ইংরেজদের কৃপাভিক্ষা লাভের জন্য প্রতিযোগিতা। ঔপনিবেশিক বিধানসভায় এলিট বা ভদ্রলোক (হিন্দু ও মুসলমান) সদস্যদের ভূমিকা বিতর্কিত ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু জাতীয়তাবাদের অশুভ প্রভাব বিধানসভাকে পঙ্গু করে রেখেছিল বলে ব্রুমফিল্ড যে মূল্যায়ন করেন তা নেহাতই একপেশে। বিধানসভার ভদ্রলোক সদস্যদের অনেকেই ছিলেন জাতীয় সংগ্রামের নায়ক, চালক। আত্মত্যাগেও তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন উজ্জ্বল ; কিন্তু ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি ছিল তাঁদের অবিচল আস্থা, তাঁরা মনে করতেন বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। ভদ্রলোকদের সঙ্গে ইংরেজ রাজপুরুষদের একটা রাজনৈতিক সংযোগও ছিল, কিন্তু ভদ্রলোক ও শাসকের সম্পর্ক কখনও "পুরোহিত-যজমান" পর্যায়ের ঊর্ধ্বে ওঠেনি। বাবুরা রাজপুরুষদের কৃপাপ্রার্থীই রয়ে যান। সামাজিক অবস্থানই ভদ্রলোকদের

রাজনৈতিক ব্যর্থতা নিয়ে আসে এবং তা প্রকাশ পায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে। যে সুরেন্দ্রনাথ একসময় "ঢাকা থেকে মুলতান পর্যন্ত নবীন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন", বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং "সারেন্ডার নট ব্যানার্জী" আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন, সেই সুরেন্দ্রনাথই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে অর্থ, পদক ও মিথ্যা সম্মানের মোহে বিদেশী শাসকদের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন বলে তখনকার দিনের পত্র-পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়।[২] মন্ত্রীদের ৬৪ হাজার টাকা বার্ষিক বেতন নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক অনবদ্য কার্টুনে ("লে আও চৌষট হাজার") সুরেন্দ্রনাথকে কাবুলিওয়ালা বলে চিত্রিত করেন। সর্বত্র ধিক্কৃত হন সুরেন্দ্রনাথ এবং ১৯২৩-এর নির্বাচনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। পরবর্তী কয়েক দশকের বিধানসভার সদস্যদের সামাজিক অবস্থানের পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, শতাব্দী অন্তেও বঙ্কিম-বর্ণিত বাবুদের প্রাধান্য থেকে মুক্ত হতে পারেনি বাংলার বিধানসভা।

১.৬ এই গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয় বিধানসভাকেন্দ্রিক বাংলার রাজনীতি। এই রাজনীতির রূপান্তর ঘটে বিভিন্ন সময়ে বিদেশী শাসক ও দেশজ শক্তির টানাপড়েন— আদিতে সহযোগিতায়, মধ্যপাদে প্রতিবাদে এবং প্রায় তিন দশকের প্রতিরোধে। স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতেও গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর প্রভাব পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়, কংগ্রেস দল ক্ষমতাসীন হয়, প্রতিপক্ষ হয় সংহত বামপন্থী জোট।

প্রথম দিকে আইনসভা-কেন্দ্রিক রাজনীতি ছিল প্রধানত, এমনকি কেবলমাত্র উচ্চবর্গের প্রভু-বন্দনার রাজনীতি। এই প্রভু-বন্দনার নিদর্শন পাওয়া যায় বঙ্গীয় বিধানসভার প্রধান চারজন ভারতীয় সদস্যের অন্যতম প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বক্তব্যে : "আমরা একবাক্যে তারস্বরে জানিয়ে দিতে চাই হিন্দুশাসন নয়, অন্য কোনও শাসন নয়, একমাত্র ইংরেজ শাসনকেই আমরা স্বীকার করি, স্বাগত জানাই।" ১৮৯২-এর সংস্কার আইন প্রবর্তনের পর বিশেষ করে বিশ শতকের শুরু থেকে বিধানসভায় অনুপ্রবেশ ঘটে 'শিক্ষিত ভদ্রলোক' অভিধেয় ভারতীয়দের। ভদ্রলোকরা মাঝে মধ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, শাসকদের ভ্রূকুটিও সময় সময় উপেক্ষা করেছেন, কিন্তু বিদেশী শাসনের বৈধতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেননি। রবীন্দ্রনাথ ওই সময়কার রাজনীতি ব্যাখ্যা করে বলেন, "রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই *পলিটিক্স। ...তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় কখনও অনুনয়ের করুণ* কাকলি, কখনও বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা"। (রায়তের কথা) ভদ্রলোকের রাজনীতি অবশ্য প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধের রূপ নেয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন,

স্থানিক মাত্রা প্রাপ্ত পৌর আন্দোলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।

বিধানসভায় স্বরাজ্যদল প্রাধান্য লাভ করার আগে বাংলায় সংসদীয় রাজনীতির পুতুলখেলাই যে চলছিল তা অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজবাদীরাই (১৯২৩-১৯২৯) বিধানসভায় বিদেশী শাসনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, একে প্রতিরোধ করার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী নেন। বিধানসভায় তাঁরা সরকারকে অনেক সময়ই বিপাকে ফেলতে সক্ষম হন, বাজেট-বরাদ্দ ভোটের জোরে ছাঁটাই বা বাতিল করে দেন, মন্ত্রীদের পদত্যাগে বাধ্য করেন, অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাই একমাত্র প্রদেশ যেখানে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের অবিমৃষ্যকারিতা এবং ইংরেজদের ইন্ধনে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমশ প্রশ্রয় পেতে থাকে। ইতিমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ায় (১৯৩০) কংগ্রেস আইনসভা বয়কট করে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। বাংলার কংগ্রেস কর্মীরা এতে খুবই ক্ষুব্ধ হন, কারণ আইনসভাকে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের এক শক্তিশালী মঞ্চ হিসেবে তাঁরা ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। সুভাষচন্দ্র এইভাবে আইনসভা বর্জন "মারাত্মক ভুল" বলে মনে করেন। ফল হয়, বিধানসভা হয়ে ওঠে জমিদার, নাইট-নবাব, আমলা ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিচরণ ক্ষেত্র। শাসকরা এই সুযোগে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রশ্রয় দিতে থাকে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে বাংলায় যে ছয়টি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, তার সব কটিতে মুসলমানরা ছিলেন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ, হিন্দুরা ছিলেন দু'-একজন মাত্র।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বিধানসভার গঠন সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। মফস্বল বাংলার প্রাধান্য দেখা যায় বিধানসভায়। মফস্বল থেকে নির্বাচিত সদস্যদের অধিকাংশই স্বাভাবিকভাবেই ছিলেন মুসলমান কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রভাব থেকে মুক্ত কৃষক প্রজা দলের। এঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল বাঙালীমনস্কতা, এঁরা মনে করতেন হিন্দু বা মুসলমান নয়, চাষী বাঙালী, মজুর বাঙালী, উকিল-মোক্তার বাঙালীর জাগতিক স্বার্থ ও আত্মিক সত্তা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বস্তুত ১৯৩৭-১৯৪১ পর্বের সংসদীয় রাজনীতিতে সুবর্ণ সুযোগ ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের এবং ইংরেজ রাজশক্তিকে কোণঠাসা করে রাখার, কিন্তু কংগ্রেসের কয়েকটি ভুল পদক্ষেপ, যেমন ফজলুল হকের সঙ্গে মন্ত্রিত্ব গঠন না করা, বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচনে কৃষক প্রজার বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে সমর্থন না করা ; ১৯৩৮ সালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নৌশের আলির পদত্যাগের পর কংগ্রেস-কৃষক প্রজা কোয়ালিশন সরকার গঠনের সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব গান্ধীর হস্তক্ষেপে কার্যকর না করা। এর ফলে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিই তৃণমূলে পরিব্যাপ্ত হয়। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় পরবর্তী প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার

প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না।

দেশবিভাগের পূর্ববর্তী পাঁচ বছর বাংলার রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের পরস্পরবিরোধী নীতি এবং হতোদ্যম ব্রিটিশ রাজশক্তির বিভেদ ও কূটনৈতিক চাল দ্বারা। নাজিমুদ্দিন সরকারের ব্যর্থতা ও ১৩৫০-এর মন্বন্তর সত্ত্বেও মুসলিম লীগের সাংগঠনিক প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯৪৪ সালে লীগের সদস্য সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। যদিও লীগ ছিল তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ এবং লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা নিয়েও লীগের মধ্যে মতভেদ ছিল। সংসদীয় রাজনীতিতে লীগের পরিত্রাতার ভূমিকা নেন ইউরোপীয় আমলা ও ক্লাইভ স্ট্রীটের ইংরেজ সওদাগররা, যাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল বিধানসভায় অন্তত ২৭টি ভোট। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে বিধানসভার ১২১টি মুসলমান আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ১১৩টি আসন। জিন্না এই বিজয়কে পাকিস্তানের পক্ষে গণভোট বলে দাবী করেন। লীগ-কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার গঠন নিয়ে সুরাবর্দী ও কিরণশংকর রায়ের মধ্যে কথাবার্তাও হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাব তখন তুঙ্গে, কাজেই কোয়ালিশন সরকার গঠন আলোচনার স্তরেই থেকে যায়।

অস্বীকার করা যায় না, ঔপনিবেশিক আমলের শেষদিকেও বাংলার সংসদীয় রাজনীতি স্থূল ভিত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। ক্ষমতা, লোভ, মন্ত্রিত্বলাভের প্রতিযোগিতা, আয়ারাম-গয়ারামের সক্রিয়তাও ছিল প্রবল। "রাস্কেল" মুসলিম এম.এল.এদের ভোটের দাম এক হাজার টাকার উপর উঠে যাচ্ছে বলে লীগের অর্থের যোগানদার ইস্পাহানিকে জিন্নার কাছে অনুযোগ করতে দেখা যায়। আজ যিনি প্রজা পার্টিতে, কাল তিনি মুসলিম লীগে। তুলসী গোস্বামীর মতো নেতাও কংগ্রেস দল ত্যাগ করে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী হন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নেতারা সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রশ্রয় দেন। জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান নিহিত, এ বোধ হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের খুব অল্পের মধ্যেই ছিল। তাছাড়া কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, প্রজা পার্টি সব দলেই ছিল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকোন্দল। বাংলার রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে জওহরলাল ওই সময়ে বলেন, বাংলা কংগ্রেসের প্রভাবশালী অংশকে যদি নলিনীরঞ্জন সরকারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংস্থা বলা হয়, তবে অন্য অংশকেও কোনও নেতার উদ্দেশ্য সাধনের সংস্থা বলে ধরে নিতে হবে। নাজিমুদ্দিন-সুরাবর্দী-আবুল হাশিমের বিরোধে মহম্মদ আলি জিন্নাকে প্রায়শই হস্তক্ষেপ করতে হয়। তবে সংসদ বহির্ভূত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বাংলায় ঐ সময়ে খুবই সচল ছিল। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও মুসলিম লীগসহ সব রাজনৈতিক দলই আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। '৪২ সালের ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের ঢেউ সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। মেদিনীপুরে এই আন্দোলন বিদ্রোহের রূপ নেয়।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিক্ষোভ, সমাবেশ, সভা ও শোভাযাত্রায় কমিউনিস্টরা সক্রিয় বলে গভর্নর ব্রেবোর্ন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান।

স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতা ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই তাঁকে বিদায় নিতে হয়। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকটভাবে দেখা দেয়। কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়। কিন্তু পার্টির সক্রিয়তা বেড়ে যায়। পরবর্তী নির্বাচনে তা প্রকাশ পায়।

১৯৫২-১৯৬২-র নির্বাচনে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টসহ বামপন্থীদের সাফল্য এই পর্বের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এবং তা প্রতিফলিত হয় বিধানসভায়। এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি, খাদ্য আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট, বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি ইত্যাদি "ইস্যু" পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রাধান্য পায় এবং বিধানসভাকে তা নিয়ে উত্তাল হতে দেখা যায়। বিরোধের নিষ্পত্তি মাঝে মধ্যে সহমতের মাধ্যমেও হয়। জমিদারি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩ ও ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ গ্রাম বাংলার সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় সন্দেহ নেই, কিন্তু আইনের ফাঁক-ফোকরের সুযোগে গ্রামাঞ্চলে জমিদার-জোতদারদের প্রাধান্যই বজায় থাকে। কৃষির ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার সিংহভাগ—ভাগচাষী, ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেত-মুজরদের দুর্গতি বাড়তেই থাকে।

১৯৪৭-১৯৬২ পর্বে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সমীকরণে দ্বিমেরু প্রবণতা অর্থাৎ কংগ্রেস ও বামপন্থী এই দুই শক্তিকে কেন্দ্র করেই রাজনীতি আবর্তিত হতে দেখা যায়। তৃতীয় শক্তির কোন নির্ণায়ক ভূমিকা এই পর্বে অনুপস্থিত ছিল। ১৯৬৭-র নির্বাচনে প্রান্তিক জনসমর্থন নিয়ে বাংলা কংগ্রেসের মতো তৃতীয় শক্তিপশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে এক বিশেষ ভূমিকা নেয় স্বল্পকালীন কয়েক বছরের জন্য।

১.৭ বঙ্গকেন্দ্রিক বিকল্প রাজনীতির প্রকাশ লক্ষ করা যায় বিশ শতকের শুরুতে, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাতে। লর্ড কার্জনের বাংলাকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা ব্যর্থ করার জন্য বাঙালীর রাজনৈতিক নিপুণতা সারা ভারতে সম্ভ্রম অর্জন করে। সুরেন্দ্রনাথদের নরমপন্থা আর অরবিন্দদের বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ ভারতের অন্য প্রদেশে রাজনৈতিক জমায়েতে সাহায্য করে। তবে বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বকীয়তা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় বিশের দশকে চিত্তরঞ্জন দাশের অভ্যাগমনে। বস্তুত কংগ্রেসের মধ্যে যেমন চিত্তরঞ্জন-শরৎ-সুভাষ ছিলেন বিকল্প রাজনীতির প্রবক্তা, মুসলিম লীগের মধ্যেও তেমনি বিকল্পের সন্ধানী ছিলেন ফজলুল হক, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতা। অবশ্য বঙ্গীয় চেতনা ফজলুল হকের মধ্যে যেভাবে সজীব ছিল, অন্য

কোনও মুসলমান নেতার মধ্যে তা দেখা যায়নি।

বয়কট, বর্জন ইত্যাদি গান্ধী-নির্দেশিত অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-১৯২২) কর্মসূচী বাঙালী মানসে তেমন ভাবে সাড়া জাগাতে পারেনি। কারণ স্বদেশী আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় এইসব কর্মসূচী বঙ্গজনের কাছে নিস্তেজ মনে হয়েছে। চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল কেউই গান্ধীজীর আইনসভা বর্জনের কর্মসূচী মেনে নিতে পারেননি। বিপিনচন্দ্র এ.আই.সি.সি. থেকে পদত্যাগও করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আইনসভায় ঢুকে আইরিশ ধাঁচের অসহযোগের আশ্রয় নিয়ে আইনসভাকে অকেজো করে দেওয়ার প্রস্তাব নেয়। শেষ পর্যন্ত 'কাউন্সিল এন্ট্রিকে' কেন্দ্র করে চিত্তরঞ্জন-মতিলালরা স্বরাজ্য দল গঠন করেন। এই বিকল্প রাজনীতির ফলেই বাংলায় দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বানচাল হয়, স্বরাজের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রয়োজনে কু-শাসনের অবসান ঘটাতে "অন্য পদ্ধতি" গ্রহণ করা হবে বলে স্বরাজ্য দলের সদস্যরা হুমকি দেন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনে চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগে স্বাক্ষরিত বেঙ্গল প্যাক্ট বিকল্প রাজনীতিরই প্রয়াস। এই প্যাক্টকে সারা ভারতে এক নতুন এবং যুগান্তকারী চুক্তি বলে আবুল কালাম আজাদ অভিহিত করেছেন।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেস হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কৃষক প্রজা ও মুসলিম লিগ দ্বিতীয় ও তৃতীয়। এককভাবে কোনও দলের পক্ষেই মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব ছিল না। শরৎচন্দ্র বসু-সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতাদের প্রয়াস ছিল ফজলুল হকের নেতৃত্বে এবং কংগ্রেস সমর্থনে কৃষক প্রজা সরকার গঠনের, কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের ফরমানের ফলে তা সম্ভব হয় না। ফজলুল হক কিন্তু লীগের সঙ্গে স্বস্তিতে ছিলেন না। আবুল মনসুর আহমদকে তিনি বলেন, "মুসলিম লীগওয়ালাদের সাথে আমার সম্পর্ক খুব খারাপ। কখন কি হয় কওয়া যায় না। হৈতে পারে শিগগিরই আমাকে রিজাইন দিতে হৈব।" এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস-কৃষক প্রজা কোয়ালিশন সরকার গঠনের যে উদ্যোগ সুভাষচন্দ্র নেন, গান্ধীজী তা বাতিল করে দেন। ১৯৪১-১৯৪২ সালে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন সরকার গঠন বাংলার আরেক বিকল্প উদ্যোগ, কিন্তু তা হয় খুবই ক্ষণস্থায়ী। স্বাধীনতার প্রাক্কালে বাংলাকে অখণ্ড রাখার জন্য শরৎচন্দ্র বসু ও আবুল হাশিমের প্রয়াসও ব্যর্থ হয়।

মুসলিম লীগের মধ্যেও বাংলাভিত্তিক বিকল্প রাজনীতির প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। ফজলুল হক কোনও সময়ই কেন্দ্রীয় লীগ নেতৃত্বের খবরদারি মেনে নেননি। বাংলার সাড়ে তিনকোটি মুসলমানের স্বার্থ বাইরের কোনও কর্তৃত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেবেন না বলে কয়েকবারই তিনি ঘোষণা করেন। আবেগপ্রবণ এবং অস্থিরচিত্ত হলেও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ভিত্তিতে বাংলায় এক বিকল্প রাজনীতি তিনি প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সফল হয়নি। হলেও তা হয়েছে খুব অল্প সময়ের জন্য।

বাংলার মুসলিম লীগ রাজনৈতিক নেতৃত্বের একাংশ এবং বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায় ছিল এক ও অখণ্ড পাকিস্তানের বিকল্প হিসেবে দুই পাকিস্তান—পূর্ব ও পশ্চিম এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে পূর্বের অস্তিত্ব। কিন্তু মহম্মদ আলি জিন্না লাহোর প্রস্তাবে "স্টেটস" শব্দটির 'এস' যুক্ত হয়েছে ছাপার ভুলে এই যুক্তিতে বিকল্পের চিন্তা বাতিল করে দেন। স্বাধীনতার পরও বাংলার রাজনীতিতে এই বিকল্পের প্রয়াস অব্যাহত আছে। সংবিধানের সংসদীয় কাঠামোর মধ্যে পর পর ছয়বার বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়া এই বিকল্পেরই স্বীকৃতি দেয়।

১.৮ বাংলার রাজনীতিতে বঙ্গকেন্দ্রিকতার পাশাপাশি কলকাতাকেন্দ্রিক প্রবণতা প্রকট ছিল দীর্ঘদিন। যতই যোগ্যতাসম্পন্ন হোন না কেন, যে সব বিধায়কের স্থিতি কলকাতায় নয়, তাঁরা বাংলার রাজনীতিতে আমল পাননি স্বাধীনতা-পূর্ব পর্যায়ে। নেতৃত্ব রয়ে যায় কলকাতাকেন্দ্রিক রাজনীতিবিদ্‌দের নিয়ন্ত্রণে। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের (১৮৮১-১৯৩৪) মতো নেতাও বাংলার রাজনীতিতে আমল পাননি, কারণ তাঁর অবস্থান ও কর্মস্থান ছিল জেলায়, মেদিনীপুরে। ব্যারিস্টার হয়েও জেলা আদালতে তিনি ওকালতি করেন, জেলা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হন। পরে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিও হন। স্বরাজ্য দলের সংসদীয় সাফল্যের পিছনে বীরেন্দ্রনাথের বিপুল অবদান ছিল। তৎকালীন অধ্যক্ষ (সভাপতি) শিবশেখরেশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি সংসদীয় দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু কলকাতা করপোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে তাঁর প্রার্থীপদ সমর্থিত হয় না। "কোথাকার নামগোত্রহীন মেদিনীপুরী এক কেয়টের ('কৈবর্তের') বাচ্চা হবে সি-ই-ও। সে কলকাতার কী জানে?"[৩] এই ছিল বীরেন্দ্রনাথের দেশসেবার প্রাপ্তি। ১৯৩৭-এর বিধানসভায় মফস্বল বাংলার প্রতিনিধিরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ, পল্লীবাংলার ছিল দাপট কিন্তু মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন কলকাতা ও ঢাকা-ভিত্তিক। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলায় রাজধানী-ভিত্তিক রাজনীতির পরিবর্তন ঘটে। অধিকাংশ বিধায়কই নির্বাচিত হন নিজ নিজ বাসস্থান ও কর্মস্থান থেকে। জেলার প্রতিনিধিত্বও মন্ত্রিসভায় নিশ্চিত করা হয়।

১.৯ অর্থনৈতিকক্ষেত্রে সামাজিক জীবনে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ কীভাবে বাংলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রভাবিত করে, বিধানসভার-আলোচনা, বিতর্ক ও প্রস্তাবে তা প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। সামাজিক ক্ষেত্রে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অসমকক্ষতা, মুসলমানদের স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতি দিতে হিন্দুদের অনীহা, জমিদারদের কাছারিতে জাজিম-তোলা আসনে বসতে দেওয়া বা হুঁকোর জল ফেলে দিয়ে তামাক খেতে দেওয়া ইত্যাদি বিধানসভার বিতর্কে উল্লেখিত হয়। কংগ্রেস ও হিন্দুদের বেশ কিছু নীতি, বিশেষ করে ১৯২৮ সালে প্রজাস্বত্বের সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার

পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মনোভাবের প্রসার ঘটে, কারণ জমির সঙ্গে যুক্ত ছিল সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন। ফজলুল হক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলতেন, "পলিটিক্স অব বেঙ্গল ইজ দ্য ইকনমিক্স অব বেঙ্গল।" বস্তুত "বাংলার আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো এমনই ছিল যে প্রজা-খাতক নামের চুল ধরিয়া টান দিলে মুসলমান নামের মাথাটা আসিয়া পড়িত ; অপরপক্ষে জমিদার-মহাজনের নামের টানে হিন্দুরাও কাতারবন্দি হইয়া যাইত", লিখেছেন আবুল মনসুর আহমদ। প্রজাস্বত্ব বিল আলোচনার সময় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ স্বরাজ্য দলের নেতা এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেস নেতারাও যুক্তি দেখাতেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করার জন্য তাঁরা সমন্বয় চান, সংঘর্ষ নয়। এর জন্য ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁদের সতর্ক অবস্থান। বঙ্গীয় কৃষি ঋণ মকুব আইন, ঋণ সালিশী বোর্ড ইত্যাদির কল্যাণে প্রজারা কিছু পরিমাণে উপকৃত হন। এই আইন পাস হওয়ার আগে প্রজারা ঋণ নিলে জমিদার বন্ধকী তমসুক হিসেবে প্রজার জমির উপস্বত্ব তো ভোগ করতেনই, সঙ্গে ঋণের পরিমাণ চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যেত। (২ টাকা ধারে জমি বন্ধক দিয়ে সুদে আসলে ঋণ ৪ হাজার টাকা হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও ছিল।) হিন্দু জমিদাররা প্রজাহিতকর এইসব আইনের বাস্তব রূপায়ণে বাধা দেন। এর ফলে কংগ্রেসের প্রতি মুসলমান সমাজের, বিশেষ করে প্রজাসাধারণের সমর্থন ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার প্রসারেও হিন্দুদের ছিল প্রবল আপত্তি। ফ্রেনচাইজ কমিটি, লোথিয়ান কমিটি ও সাইমন কমিশনের কাছে হিন্দুরা যে সাক্ষ্য দেন তা থেকে তা প্রমাণিত হয়। রামজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করেন ১৯৩২ সালে। হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হন এবং মুসলমানদের আটকানোর জন্য এস এম বসু উচ্চকক্ষ স্থাপনের এক প্রস্তাব আনেন বিধানসভায়। প্রস্তাব অবশ্য পাশ হয় না, কারণ মুসলমান বিধায়ক ছাড়াও হিন্দুদের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডাঃ নীলরতন ধর প্রমুখ সদস্য প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। বিভিন্ন কারণে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ আরও প্রসারিত হতে থাকে।

মুসলমানরা জাতীয়তাবাদী নন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা নেই, এ অভিযোগ প্রায়ই বিধানসভায় মুসলিম নেতৃত্বকে শুনতে হতো। বহরমপুর থেকে নির্বাচিত মুসলিম লীগ সদস্য আবদুল বারি একবার অনুযোগ করে বিধাসভায় বলেন, "জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয়, কিন্তু বুঝানো হয় হিন্দুত্ব। মুসলমানদের কি জাতীয়তাবাদী হওয়ার অধিকার নেই মুসলিম বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে?" ফজলুল হকও হিন্দুদের এই ধরনের অভিযোগের উত্তরে বিধানসভায় বলেন, প্রত্যেক মুসলমানই জাতীয়তাবাদী, উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত প্রচেষ্টাই জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হবে। মনে রাখা দরকার, ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হলেও

বাংলায় লীগের শাখা স্থাপিত হয় ১৯১৫ সালে। এরপরও দীর্ঘদিন লীগ ছিল "কংগ্রেসী মুসলমানদের দখলে।" ফজলুল হক নিজে একই সঙ্গে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। বাঙালীমনস্কতা বাংলাভাষী মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম বহুলাংশে প্রভাবিত করত। কাবুলি মহাজনের সঙ্গে মুসলমান খাতকের কোনও দিন সুসম্পর্ক হতে পারে না, এই ছিল সাধারণ মুসলমানের ধারণা। বাংলার আম মুসলিম জনতা বা নেতা কেউই বাংলার রাজনীতিতে জিন্নার আশীর্বাদধন্য ইস্পাহানি, আদমজির কর্তৃত্ব, ঢাকার আহসান মঞ্জিলের নবাবদের খবরদারি বা সুবাবর্দীর অবাঙালী মুসলিম-তোষণ পছন্দ করতেন না। ফজলুল হক মালাবার হিলস বা ওয়ার্ধার গান্ধী আশ্রম থেকে বাংলার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করেছেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সহ-সভাপতির পদ থেকে ইস্পাহানি এবং আদমজিকে অপসারিতও করা হয়। লাহোর প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবীরা দেন তা ছিল অখণ্ড পাকিস্তান চিন্তা থেকে পৃথক। বাংলার মুসলিম রাজনীতির এই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি কংগ্রেস নেতাদের স্বীকৃতি পায়নি। মুসলমানদের কাছে কংগ্রেসের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য জওহরলাল যে গণসংযোগের পরিকল্পনা নেন তা-ও বাংলায় ফলপ্রসূ হয়নি। একমাত্র শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসুর মতো কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ ছাড়া মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে বাংলার জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতারা যে উদাসীন ছিলেন, বিধানসভার আলোচনা ও বিতর্কে তা প্রকাশ পায়। স্বাধীনতার পর অবশ্য সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে সরকার ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে মোটামুটিভাবে সহমত লক্ষ করা যায়।

১.১০ মহিলাদের ভোটাধিকার ও রাজনীতিতে মহিলাদের ভূমিকা বাংলার সংসদীয় রাজনীতির আরেক উল্লেখযোগ্য দিক। ১৯২১ সালে বিধানসভায় মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়ার জন্য এস এম বসু এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দীর্ঘ আলোচনা হয়। বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি, "সহধর্মিনী সহভোটিনি হতে পারেন না" ইত্যাদি। যাঁরা সমর্থন করেন তাঁরা রিজিয়া, চাঁদবিবি, রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি, সরোজিনী নাইডুর মতো মহিলাদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। ১৯২৩ সালে স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলে মহিলাদের ভোটাধিকারের সুপারিশ করেন। পক্ষে ৩৩, বিপক্ষে ৩৩ ভোট পড়ে। শেষ পর্যন্ত সভাপতি হেনরি কটনের নির্ণায়ক ভোটে বাংলার মহিলারা করপোরেশন নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার পান। বিধানসভা নির্বাচনে মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় ১৯২৬ সালে। প্রধান নির্বাচনী অফিসার ও. এম. মার্টিন তাঁর প্রতিবেদনে জানান, বিধানসভা নির্বাচনে বারবণিতারাই অধিক সংখ্যায় ভোট দিয়েছেন, সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের ভোটকেন্দ্রে অনুপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মহিলাদের

জন্য ৫টি আসন সংরক্ষিত ছিল, ভোটার ছিলেন ৭৪,৯৯০ জন মহিলা। যে পাঁচজন মহিলা নির্বাচিত হন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র বেগম ফারহাত বানু ছাড়া আর সবাই ছিলেন বিধানসভায় সক্রিয়। হেমপ্রভা মজুমদারকে (স্বামী বসন্তকুমার, যুগান্তর দলের নেতা, কনিষ্ঠপুত্র সুশীলকুমার প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক) মুসলিম লীগ সদস্যরা সমীহ করে চলতেন, মন্ত্রীরা সন্ত্রস্ত থাকতেন। "এই কক্ষে খোদা ও ভগবানের মধ্যে যে টানাটানি চলছিল, গড দূরে বসে তা উপভোগ করছিলেন", হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বে সাহেবরা ফায়দা ওঠাচ্ছেন, এটাই ছিল তাঁর মন্তব্যের বিষয়। মীরা দত্তগুপ্তা (অধ্যক্ষা) শিক্ষাবিষয়ক আলোচনায় বেশি উৎসাহী ছিলেন। হাসিনা মুরশেদ ছিলেন সংসদীয় সচিব। মিস বেলহার্ট অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রতিনিধি। বিভাগপূর্ব বাংলায় ১৯৪৬-এর নির্বাচনে মীরা দত্তগুপ্তা, নেলি সেনগুপ্তা (যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর স্ত্রী), বীণা দাশ (গভর্নর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার স্ট্যানলি জ্যাকসনকে সমাবর্তন উৎসবে গুলি করার অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কংগ্রেস নেত্রী, সুলেখিকা), আশালতা সেন (কংগ্রেস নেত্রী, কল্যাণকুটির আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে বাস ও নানা গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত) ও মিস বেলহার্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে বেশ কয়েকজন মহিলা নির্বাচিত হন। দুজন মন্ত্রীও হন—রেণুকা রায় ও পূরবী মুখোপাধ্যায়। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের। খুব সফল বিধায়ক ছিলেন তিনি। তৈরি হয়ে বক্তব্য রাখতেন বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিধানসভায় সমীহ পেতেন। নিজের সীমাবদ্ধতার কথাও বুঝতেন : "আইনসভার একটা মোহ আছে, একটা জাঁকজমকও আছে। নিজেকে মনে হয় বুঝি কত বড় হয়ে গেছি। এ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা খুব কঠিন।" কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বিধানসভায় তাঁকে গুটিয়ে নিতে হয় দ্বিতীয় বিধানসভার শেষ দিকে। ১৯৫২-১৯৬২ পর্বে বিধানসভায় ২৪০/২৫০ জনের সদস্যের মধ্যে মহিলাদের প্রতিনিধি শতকরা ৪ জনও ছিল না। প্রায় সকলেই ছিলেন কংগ্রেস দলের। সি পি আই-র একমাত্র মহিলা সদস্যা মণিকুন্তলা সেন অনুযোগ করে লিখেছেন, "আমার সঙ্গে পার্টি-নেতাদের একটা বিষয়ে বিরোধ হলো, ১০০টা সিটে আমিই মেয়েদের মধ্যে একমাত্র প্রতিনিধিরূপে কেন মনোনীত হব? কমিউনিস্ট পার্টি তাদের মহিলা সদস্যদের এতই অযোগ্য মনে করে?"[৪] কৃতী মহিলা বিধায়কদের মধ্যে ডাঃ মৈত্রেয়ী বসুর বিশেষ উল্লেখ করতে হয়। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শ্রমিকনেত্রী ডাঃ বসু কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েও অনেক সময়ই স্বাধীনভাবে সরকারের সমালোচনা করে বক্তব্য রাখতেন। ১৯৬৭-র নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী রূপে তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হন।

বিধানসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব এখনও দশ শতাংশে পৌঁছয়নি। সদ্য অনুষ্ঠিত

ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র ২৮ জন মহিলা বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন।

১.১১ আইনসভার শুরু থেকে দেশ-বিভাগ পর্যন্ত বাংলার সংসদীয় রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা ছিল মনোনীত ইংরেজ আমলা এবং নির্বাচিত ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের। শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কৃষক প্রজা দলের সদস্যদের প্রায়শই ক্লাইভ স্ট্রীটের সওদাগরদের অদৃশ্য হস্ত সরকারি কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ করতে দেখা যায়। ১৯১৮ সালেই কংগ্রেসের দিল্লি অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভায় ইউরোপীয়দের জন্য মাত্রাতিরিক্ত আসন নির্দিষ্ট করার প্রতিবাদ জানান। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ যাতে কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয় এবং ইউরোপীয় গোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, তার জন্য ইংরেজ সরকার সব সময়ই সচেষ্ট ছিলেন। ইংরেজ শাসকদের সুপারিশের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের স্যার এডওয়ার্ড বেনথলের যোগদান সম্ভব হয়। বেনথল বাংলার রাজনীতিতেও খুব সক্রিয় ছিলেন। ইউরোপীয় বিধায়করা তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। বাংলার বেশ কয়েকজন ইংরেজ সিভিলিয়ান সরকারি চাকুরি থেকে ইস্তফা দিয়ে ক্লাইভ স্ট্রীটের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে আসীন হয়ে আইনসভায় নির্বাচিত হন। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর বিধায়করা প্রায় সময়ই মুসলমান সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে ভোট দেন। "মুসলমানরা আমাদের সবচেয়ে নির্ভরশীল মিত্র"—এই ধরনের বক্তব্য ইংরেজ বিধায়কদের বিধানসভায় রাখতে দেখা যায়। অবশ্য এই সমর্থনের পিছনে ছিল নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখা, হিন্দু-মুসলমান বিরোধে ইন্ধন জোগানো। ১৯২৬ সালে আবদুল রহিমের প্রস্তাবে ইংরেজ বণিকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার আমলে কিছু কিছু কর থেকে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের রেহাই দেওয়া হয়। ১৯৩৭-১৯৪১ পর্বে ফজলুল হক-মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা টিকে থাকে মূলত ইউরোপীয়দের সমর্থনের ফলে। বিধানসভায় ২৫ থেকে ২৭টি ভোট এদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কৃষকসভার মুসলমান সদস্যরা প্রায়শই মুসলিম লীগওয়ালাদের কটাক্ষ করে বলতেন, সাহেবরাই তাদের ত্রাতা, কাজেই সাহেবদের নির্দেশে চলবেন—এটাই স্বাভাবিক। ফজলুল হকও একবার ১৯৩২ সালে বিধানসভায় বলেন, বিধানসভার ৩৯ জন মুসলমান প্রভাবশালী ইংরেজ আমলা মিঃ প্রেনটিসের বাইসাইকেল। তিনি যেভাবে, যে দিকে চালনা করেন, সেদিকেই সদস্যরা চলেন। বাংলার গভর্নররাও ক্লাইভ স্ট্রীটের সঙ্গে সলাপরামর্শ করতেন। ফজলুল হক মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিধানসভায় যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি তৎকালীন গভর্নর জন হারবার্ট সম্বন্ধে বলেন, "ক্লাইভ স্ট্রীটের সওদাগরি অফিসের বড়বাবু হওয়ার যোগ্যতা যার নেই তাকেই

বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলার গভর্নর পদে।" ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সংসদীয় রাজনীতিতে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর প্রভাব পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়।

১.১২ বিধানসভা চর্চা ও বাংলার সংসদীয় রাজনীতির পর্যালোচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে স্বাধীনতার এক দশক আগে, বিশেষ করে ১৯৩৭-১৯৪১ পর্বে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপনের এক সহায়ক পরিস্থিতি বাংলায় সক্রিয় ছিল। মুসলিম জনতার মধ্যে লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তখনও ব্যাপকতা লাভ করেনি। কৃষক প্রজা তো বটেই, মুসলিম লীগ বিধায়কদের একাংশের কাছে পাকিস্তান ছিল "গোরস্থান", দীর্ঘদিন লীগ ছিল কংগ্রেসী মুসলমানদের দখলে। ফজলুল হক মন্ত্রিসভা কর্তৃক বঙ্গীয় কৃষিঋণ লাঘব আইন প্রণয়ন ও ঋণ সালিশী বোর্ড গঠনের ফলে সাধারণ চাষী, মুসলমান ও হিন্দু অধমর্ণ নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এইসব প্রয়াসকে মৌখিক সমর্থন জানিয়েছেন বিধানসভায়, কিন্তু সাধারণ কৃষকের দুঃখভার লাঘবের কোনও উদ্যোগ নেননি নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের জন্য। কমিউনিস্ট পার্টিও সেদিন কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের কথাই বলেছে, কিন্তু কৃষক সমাজকে সংগঠিত করার বিশেষ প্রয়াস নেয়নি। ফ্লাউড কমিশন (১৯৪০) ভূমি সংস্কার সম্বন্ধে যে সুপারিশ করে, কমিউনিস্ট সদস্য বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় তা কার্যকর করার দাবিও জানান বিধানসভায়, কিন্তু ঐসময় শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার কোনও প্রচেষ্টা হয়নি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে তে-ভাগা আন্দোলন মারফত সে প্রয়াস হয়, কিন্তু ততদিনে লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তৃণমূলে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, অনেক পরীক্ষিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাকে মুসলিম লীগের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। যদি জাতীয়তাবাদী নেতারা রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন, মুসলিম মানসিকতার প্রতি সহানুভূতিশীল হতেন, তাহলে এই বাংলায় হয়তো দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা প্রমাণিত হতো, ১৯৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তর এমনভাবে হতো না।

প্রথম অধ্যায়

সংসদীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও আইনসভা

ভারতীয় সংবিধানে যে রাজনৈতিক কাঠামোর নির্দেশ দেওয়া আছে তা একান্তভাবে সংসদ-নির্ভর। রাজনৈতিক দল ও পৌরসমাজের অন্যান্য সংস্থা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রক্রিয়া মূলত চালিত হয় কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভাকে কেন্দ্র করে। ইতিমধ্যে ভারতীয় সংবিধানের অর্ধশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। এর প্রাপ্তি ও ঘাটতি, সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং নানা ফাঁকফোকর নিয়ে লেখাজোখা হয়েছে বিস্তর, ভারতীয় ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের লেখা বইপত্রও প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু।[১] কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংবিধান পর্যালোচনা কমিশন গঠিত (ফেব্রুয়ারি, ২০০০) হওয়ার পর সংবিধান নিয়ে বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে। সংসদীয় ব্যবস্থার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিকল্প হিসেবে রাষ্ট্রপতি-কেন্দ্রিক ব্যবস্থার পক্ষেও ওকালতি চলছে।

বলা যায়, ভারতীয় সংবিধান জন্মসূত্রেই "প্রতিবন্ধী"। কারণ, এই সংবিধান রচনার কাজ শুরু হয় স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাস আগে ঔপনিবেশিক শাসকদের আরোপিত বিধি-নিষেধের মধ্যে এবং অতি সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। সংবিধান রচনা পরিষদও ছিল একদলীয়, সদস্যদের শতকরা ৮২ জনই ছিলেন কংগ্রেস দলভুক্ত। সংবিধান যাঁরা রচনা করেন তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান ছিল ভিন্ন। সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন রক্ষণশীল মতবাদের প্রবক্তা ; অনেকে ছিলেন উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। আবার সংখ্যায় স্বল্প হলেও সোচ্চার কিছু সদস্য ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের পক্ষপাতী। সংবিধানের আর্থ-সামাজিক কাঠামো সেজন্য বহুলাংশে নির্ধারিত হয় সদস্যদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান দ্বারা। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারা নিয়ে বিতর্কের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্বলতা ও বহুবিধ সীমাবদ্ধতার জন্য সংবিধান থেকে না পাওয়ার ক্ষোভ কম নয়। সংবিধান রচয়িতাদের পুরোধা ড. বি. আর. আম্বেদকর সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগের দিন (২৫ নভেম্বর, ১৯৪৯) গণপরিষদে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন, "এই সংবিধান গ্রহণ করে আমরা পরস্পরবিরোধী জীবনের সূত্রপাত করছি।" রাজনীতিতে সাম্য অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক ভোট, আর অর্থনৈতিক জীবনে অসাম্য যে—সামাজিক দ্বন্দ্বের সূচনা করবে তার বিপদ সম্বন্ধে আম্বেদকরের ভাষণে উল্লেখ ছিল। বস্তুত বিগত পাঁচ দশকে সংবিধান সংশোধন হয়েছে ৮২ বার (সর্বশেষ ৯১ তম সংশোধনী বিল সংসদে পেশ

হয়ে আছে)। তা সত্ত্বেও ভারতীয় সংবিধান ব্যর্থতার বোঝায় ভারাক্রান্ত, তা সে ৩৫৬ ধারার অপপ্রয়োগে হোক, কিম্বা মাত্রাতিরিক্ত কেন্দ্রের প্রাধান্য অথবা কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার বা স্বাস্থ্যের অধিকার না দেওয়ার ক্ষেত্রেই হোক।

সংবিধানের প্রাপ্তি কিন্তু অকিঞ্চিৎকর নয়। জাতীয় জীবনের বহুত্ববাদী প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের সংশোধন পদ্ধতি কিছু কিছু বিষয় ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহজসাধ্য ও নমনীয়। এই সংশোধন পদ্ধতি অবলম্বন করেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের পর্যায় থেকে সাধারণ অধিকারের পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, ভূমিসংস্কার, জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা বিলোপ, পঞ্চায়েত ও পৌরশাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে সংবিধান সংশোধন করে। সংবিধান সমাজ জীবনের সব সমস্যার সমাধান করতে পারে না, সম্ভবও নয়। সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সংবিধানের সম্পর্ক জৈবিক। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের মৌলিক পরিবর্তনসাধন সম্ভব নয়। ভারতীয় সংবিধানের এই সীমাবদ্ধতার কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

সাংবিধানিক এবং আর্থ-রাজনৈতিক সব ব্যর্থতার দায় চাপিয়ে দেওয়া হয় সংসদ কাঠামোর ওপর। অবশ্য স্বাধীনতা-উত্তর পাঁচ দশকের বেশিরভাগ সময়, বিশেষ করে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর থেকে বহুবিধ ত্রুটি ও ব্যর্থতার দরুন সংসদীয় ব্যবস্থা আজ প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আচার-আচরণ, জীবনযাত্রার পদ্ধতি, সাংসদ হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালনে অনীহা, দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি ইত্যাদি সংসদ ব্যবস্থাকে বহুলাংশে অকেজো করে রেখেছে। রাষ্ট্রীয় সংকট নিরসনে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা থাকছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে এটা স্বীকার করতেই হয় যে, বিগত পাঁচ দশকে রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক অন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে সংসদীয় ব্যবস্থা। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বেশিরভাগ দেশেই (এক হিসেবে ৫২টির মধ্যে ২৭টি) হয় রাজনীতির সামরিকীকরণ হয়েছে, না হয় একদলীয়, স্বৈরতন্ত্রী বা আধা-স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। ভারতে কিন্তু সংসদীয় কাঠামোর নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রয়েছে, কাজেই সংসদ বা আইনসভাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রাপ্তি মোটেই অপরিমেয় নয়।

এই প্রসঙ্গেই সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভার ভূমিকা আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা পায়।

আইনসভার ইতিহাস ধারাবাহিক না হলেও সুপ্রাচীন। এথেনীয় রাষ্ট্রে অ্যাগোরা, ব্যুলে অভিহিত পরিষদ দ্বারা গোষ্ঠীজীবন বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হতো। অ্যারিস্টটল

আইনকে চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী বলে বর্ণনা করেছেন। সোলন প্রবর্তিত গণপরিষদে ভূসম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তিদের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু বিত্তহীন ও সম্পত্তিহীনদেরও বক্তব্য রাখার অধিকার ছিল। দাসরা অবশ্য সব অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। রোমে প্যাট্রিসিয়ানদের পরিষদ ছিল সেনেট, প্লেবিয়ানদের ট্রাইব্যুনাল। ভারতে ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার অভিব্যক্তিরূপে "সমিতি" বা জাতীয় সভাকে সার্বভৌম বলে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। "রাজন" বা রাজাকে নির্বাচিত করার ক্ষমতা ছিল সমিতির। সমগ্র জনগণকে নিয়েই গঠিত ছিল সমিতি। তবে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সমিতি পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন। পরবর্তী সময়ে আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী হয় জনপদ বা জাতীয় পরিষদ। প্রাচীন ভারতে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মীয় উপাখ্যানে, ভারত সংক্রান্ত গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ইত্যাদিতে। বৌদ্ধযুগের প্রজাতন্ত্রগুলিতে নির্বাচিত "সভা" আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক কাজকর্মের দায়িত্বে ছিল বলে কে পি জয়সওয়াল উল্লেখ করেছেন।[২] অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়বঙ্গে যখন চরম অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায় চলছে তখন বাংলার "প্রকৃতিপুঞ্জ" অজ্ঞাত পরিচয় গোপাল দেবকে রাজা নির্বাচিত করেন।[৩] মধ্যযুগ থেকে আইনসভার মতো প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয় শুরু হয় সর্বত্র—ইউরোপে, ভারতে। ইংল্যাণ্ডে রাজা প্রথম এডোয়ার্ড কর্তৃক আহূত "মডেল পার্লামেন্ট" বা আদর্শ আইনসভার সময় থেকে, বিশেষ করে ধনতন্ত্রের অভ্যুদয় ও সম্প্রসারণের পর থেকে আইনসভার নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগমন শুরু হয় এবং আজও তা অব্যাহত আছে। সমাজব্যবস্থার বিভিন্নতা সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া—আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ছাড়া প্রায় সব দেশেই আইনসভা আজ অপরিহার্য, রাজনৈতিক জীবনের সর্বস্তরে আইনসভার প্রভাব পরিব্যাপ্ত। যেমন পুঁজিবাদী তেমনি সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মীয় রাষ্ট্রেও আইনসভা এক অনন্য ভূমিকা নিয়ে বিদ্যমান। সোভিয়েত ছিল রুশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ। অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠান হিসেবে সোভিয়েতের ক্রমহ্রাসমান কার্যকর ভূমিকা ও অবক্ষয় কমিউনিস্ট রাশিয়ার বিপর্যয়ের কারণ বলে মনে করা হয়।

আইনসভা নিয়ে চর্চা, গবেষণাও খুব বেশিদিনের নয়। ১৮৬৭ সালে ওয়াল্টার বেজহটের 'দ্য ইংলিশ কনস্টিটিউশন' প্রকাশিত হয়। এরপর একই বছরে ১৮৮৫-তে প্রকাশিত হয় উড্রো উইলসনের 'কংগ্রেস্যোনেল গভর্নমেন্ট' এবং এ. ভি. ডাইসির 'লজ অব কনস্টিটিউশন'। লর্ড ব্রাইস 'দ্য আমেরিকান কমনওয়েলথ' (১৮৮৮)-এ আইনসভার তৎকালীন ভূমিকা পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেন, আইনসভা যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করে, তার গুণগত উৎকর্ষ অত্যন্ত নিম্নমানের এবং সংখ্যার দিক থেকে

তা অতি নগণ্য।[৪] 'ইংল্যান্ড ও আমেরিকার আইনসভায় রাজনৈতিক দলের প্রভাব' শীর্ষক লাওয়ালের প্রখ্যাত রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে।[৫] তবে আইনসভা সম্বন্ধে এইসব লেখকদের বিচার-বিশ্লেষণে কোনও সাধারণ তত্ত্ব বা প্রণালীর স্বীকৃতি ছিল না। ঐতিহাসিক ও আইনগত পদ্ধতিই ছিল এঁদের আলোচনার মূলসূত্র। এই গতানুগতিক আলোচনায় ছেদ পড়ে আর্থার বেন্টলি লিখিত 'দ্য প্রোসেস অব গভর্নমেন্ট' (১৯০৮) এবং চার্লস মেরিয়ামের 'নিউ অ্যাসপেক্ট অব পলিটিক্স' (১৯২৫) প্রকাশিত হওয়ার পর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় 'আচরণবাদ' নামক তাত্ত্বিক সূত্রায়নের প্রচলনের পর থেকে পশ্চিমী দেশে আইনসভার চর্চাও আচরণবাদী মডেল অনুসরণ করে এগোতে থাকে। এঁদের আলোচনায় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচার-আচরণের বিশ্লেষণ প্রাধান্য পায়। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করা, তার সম্ভাব্য প্রবণতা নির্দেশ করা সম্ভব বলে এঁরা মনে করেন। মূল্যবোধ, মতাদর্শ, সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইনসভার পর্যালোচনা এঁদের বিশ্লেষণে গুরুত্ব পায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডেভিড ইস্টন লিখিত 'দ্য পলিটিক্যাল সিস্টেম' (১৯৫৩)[৬] প্রকাশিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আইনসভার সংহত ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা শুরু হয়। ইস্টনের 'সিস্টেম থিয়োরি' বা ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব অনুসরণ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিমণ্ডলে আইনসভার পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা গুরুত্ব পায়। পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সামাজিক ব্যবস্থার পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের উপাদান বিশ্লেষণ করে আইনসভার প্রকৃতি ও গৃহীত সিদ্ধান্তের তাৎপর্য ব্যাখ্যার মধ্যে এর উপযোগিতা প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। তাছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাঠামো ও কার্যগত তত্ত্বের সূত্র ধরে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল বা নেতৃত্ব সম্বন্ধে তাত্ত্বিক অনুসন্ধান পদ্ধতি ইদানীংকালে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আইনসভা আলোচনায় যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অ্যালান করণবার্গ, লয়েড মুসলফ, অ্যালবার্ট এলড্রিগ, জে. ব্লন্ডেল, জোসেফ ল্যাপেলেম্বা, রবার্ট প্যাকেনহাম, ম্যালকম জুয়েল, স্যামুয়েল প্যাটারসন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রিটেনের আইভর জেনিংস, বার্নার্ড ক্রীক, হ্যারল্ড লাস্কি, কে. সি. হোয়ার, হারবার্ট মরিসন প্রভৃতির গ্রন্থে আইনসভার ভূমিকা আলোচনায় ঐতিহাসিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। এরস্কি মে লিখিত 'পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস' আইনসভার কার্য পরিচালনা বিষয়ে এক অপরিহার্য গ্রন্থ। ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকেও বিশ্বের প্রায় সব দেশের আইনসভা সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি-প্রসূত আইনসভার আলোচনায় মার্কসবাদী ঘরানার অবদানও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোয় গণতন্ত্রের প্রকৃতি নির্ণয় প্রসঙ্গে আইনসভার আলোচনা

করেছেন মার্কস, লেনিন থেকে শুরু করে ইদানীংকালের রালফ মিলিব্যান্ড, প্যারি এন্ডারসন্, রবিন ব্ল্যাকবার্নের মতো তাত্ত্বিকরা।

ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আইনসভার ভূমিকা আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সংসদ কাঠামো নিয়ে চর্চা ও গবেষণার অভাবের কথা। মরিস্ জোনস্[৭] এবং অন্য দু'একজন ছাড়া ভারতের সংসদ ব্যবস্থা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাঠ্যসূচীতেও সংসদ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত নয়। সংসদ ও বিধানসভায় প্রায়শ যে ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে এবং যেভাবে তা সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমে পরিবেশিত হয় তাতে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে আইনসভা সম্বন্ধে প্রবল অনীহা লক্ষ করা যায়। আর সাধারণভাবে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচনে এম. পি এবং এম. এল. এ.-দের ভোট দেওয়া ছাড়া জনসাধারণের মধ্যেও আইনসভা সম্বন্ধে কোনো উৎসাহ দেখা যায় না। পশ্চিমের আচরণবাদী মডেল অনুসরণ করে ইদানীং ভারতের সংসদ ব্যবস্থা নিয়ে কিছু চর্চা হচ্ছে কিন্তু তা সীমিত থেকে যাচ্ছে সাংসদ ও বিধায়কদের আচরণগত বিশ্লেষণের মধ্যে। ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রবণতাসম্পন্ন ভারতীয় সমাজে আচরণবাদী তত্ত্বনির্ভর গবেষণা স্বাভাবিকভাবে গভীরে যেতে পারে না। লোকসভার সঙ্গে যুক্ত গবেষণা পরিষদ (লারডিস)[৮] আইনসভা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন দলিল ও তথ্য প্রকাশ করে আইনসভা গবেষণাকে কিছুটা প্রাসঙ্গিক করে তোলার চেষ্টা করছে, কিন্তু রাজ্য বিধানসভাসমূহে এই ধরনের কোনো তৎপরতা দেখা যায় না। দীর্ঘদিন বিধানসভার কার্যবিবরণী প্রকাশিত হয়নি, এমন নজিরও আছে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার দরুন বিদগ্ধ মহলে সংসদ আলোচনা প্রায় অনুপস্থিত।

উন্নত পুঁজি ও বাজার অর্থনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত সামাজিক পরিবেশে আচরণবাদ ও ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব আইনসভার প্রকৃতি বিশ্লেষণে খানিকটা সফল হলেও ভারতের মতো দেশে এই ধরনের পশ্চিমী সূত্রায়নের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। সংসদ ও বিধায়কদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান, চিন্তা-চেতনা এবং আইনসভার ভিতরে ও বাইরে এদের আচার-আচরণের বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন ব্যতীত এইসব আলোচনা অনেকটা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের সংসদ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিত ও কার্যপ্রণালী ঐ সব দেশ থেকে ভিন্ন। এতদ্সত্ত্বেও আইনসভা সম্পর্কে আলোচনায় পশ্চিমী গবেষকদের চর্চা ও নির্দেশকে গুরুত্ব না দিয়ে পারা যায় না, কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান-নির্ভর বেশকিছু তাত্ত্বিক সূত্র তাঁরা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-নির্ভর রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনাকে কেন্দ্র করে আইনসভার প্রকৃতি নির্ণয়ে মার্কসবাদীদের বক্তব্য। মার্কস এবং

এঙ্গেলসের লেখায় "পার্লামেন্টারি ক্রেটিনিজম" বা সংসদীয় স্থূলতার উল্লেখ পাওয়া যায়। লেনিন তাঁর বিভিন্ন লেখায় বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের বক্তব্যের সমালোচনা করে ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় গণতন্ত্র তথা সংসদের অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করেছেন। জার্মান নেত্রী রোজা লুক্সেমবুর্গ মনে করেন, আইনসভা সংসদের উপর কর্তৃত্বকারী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি জানাবার জন্য এক স্বয়ংক্রিয় রাবার স্ট্যাম্প মাত্র।[৯] মার্কসবাদীদের মধ্যে যাঁরা অতি-বাম বলে পরিচিত তাঁরা সংসদকে 'শুয়োরের খোঁয়াড়' বলে আখ্যায়িত করেন। সাম্প্রতিককালে রালফ মিলিব্যান্ড, প্যারি এন্ডারসন এবং আরও বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক বুর্জোয়া সংসদ ব্যবস্থার প্রকৃতি ও কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

মার্কসবাদীরা মনে করেন, রাষ্ট্র শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার। শ্রেণীবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজে শোষক শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য আইনসভা এক বিশেষ ভূমিকা নেয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আইনসভা সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের সেজন্য কোনো মোহ নেই। স্বভাবতই রাষ্ট্রীয় সংকট নিরসনে সংসদের ভূমিকা সম্বন্ধে পশ্চিমী তাত্ত্বিকদের মূল্যায়নের সঙ্গে মার্কসবাদী বিশ্লেষণের মৌলিক পার্থক্যও স্পষ্ট। প্রখ্যাত জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাক্স ভেবার এবং লেনিনের বক্তব্যের মধ্যে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির তফাত সহজেই ধরা পড়ে। একই বছর, ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয় ভেবারের 'পলিটিক্স অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইন এ রিকনস্ট্রাকটেড জার্মানি' এবং ভি. আই. লেনিনের 'স্টেট অ্যান্ড রেভোলিউশন'। ভেবার যখন লেখেন, জার্মান রাজনীতি তখন চরম সংকটের আবর্তে। এর না ছিল কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য, না ছিল কোনো গতি। ভেবার লক্ষ্য করেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমলাদের ক্ষমতা প্রসারিত হচ্ছে এবং জার্মানিতে গণতান্ত্রিক অগ্রগমন ব্যাহত হচ্ছে। ভেবার জার্মান সংসদের নিস্তেজ ভূমিকাকে এই জন্য দায়ী করেন। তাঁর মনে হয়, একমাত্র সক্রিয় সংসদ রাষ্ট্রব্যবস্থার এই বিপর্যয় প্রতিহত করতে পারে। বাগাড়ম্বরে লিপ্ত না থেকে আইনসভা যদি শাসনবিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তবে রাজনৈতিক নেতৃত্বও দায়িত্বশীল হবে বলে তিনি মনে করেন। জার্মান রাজনীতির তৎকালীন অবস্থা বিশ্লেষণ করে ভেবার সিদ্ধান্তে আসেন, আধুনিক শিল্পসমাজে একমাত্র শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল সংসদই পারে উপযুক্ত নেতৃত্ব তৈরি করতে ও সমাজের কাছে দায়বদ্ধতার নিশ্চয়তা দিতে। ভেবার সংসদ ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কিছু কিছু পদ্ধতি প্রয়োগের সুপারিশ করেন।[১০]

পক্ষান্তরে লেনিন মনে করেন, পুঁজিবাদী সামাজিক কাঠামোয় শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ সাধন এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে

প্রকৃত সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব। লেনিনের বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উৎপাদন-উপকরণের উপর কর্তৃত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাই আইনসভার উদ্দেশ্য, জনগণের সামগ্রিক স্বার্থরক্ষার জন্য আইনসভা নয়। বরঞ্চ আইনসভার মাধ্যমেই পুলিশ, মিলিটারি ও আমলাদের দমনমূলক কাজকর্মকে বৈধতা দিয়ে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রতিহত করে। সংসদকে বাগাড়ম্বরের প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করে লেনিন বলেন, সাধারণলোকের মধ্যে আইনসভা সম্বন্ধে মোহ সৃষ্টি করাই পুঁজিবাদী সমাজের লক্ষ্য। আইনসভার এই মূল্যায়ন সত্ত্বেও মার্কস থেকে শুরু করে কোনো কমিউনিস্ট নেতাই বুর্জোয়া আইনসভার প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করেননি। লেনিন নিজেও বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদের সংসদ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অতি সরলীকরণের বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। আইনসভায় অংশগ্রহণ নিয়ে ১৯১৮ সালে জার্মান কমিউনিস্টদের মধ্যে যখন খুব বিতর্ক দেখা দেয়, লেনিন তখন স্পষ্ট ভাষায় বলেন, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থেই আইনসভায় অংশ নেওয়া কমিউনিস্টদের আবশ্যিক কর্তব্য। উল্লেখ করা প্রয়োজন, আইনসভার প্রকৃতি নিয়ে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন। মার্কস তাঁর বিখ্যাত রচনা 'দ্য এইটিনথ্ ব্রুমেয়ারে অব লুই বোনাপার্ট'-এ শাসকশ্রেণীর মধ্যে এক ধরনের আপেক্ষিক রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রবণতা গড়ে ওঠার সম্ভাবনার উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয় আরও গুরুত্ব পেয়েছে, ব্রিটেনের রালফ মিলিব্যান্ড এবং ফরাসী তাত্ত্বিক নিকোস পুলানৎজাসের মধ্যে বিতর্ককে কেন্দ্র করে। মিলিব্যান্ড মনে করেন, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান হাতিয়ার পুলিশ, আমলা ও মিলিটারি একান্তভাবে আধিপত্যকারী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভিন্ন প্রতীক হিসাবে প্রতিটি রাষ্ট্রীয় বিভাগ একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত। অন্যদিকে পুলানৎজাস বলেন, তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধিতার জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিভিন্ন অংশ অনেকটা স্বাধীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পুলানৎজাসের ব্যাখ্যা বহুলাংশে ইতালীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামশির ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। আইনসভার ক্ষেত্রে আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের তত্ত্ব প্রয়োগ করে মার্কসবাদীরা স্বীকার করেন, পুঁজিবাদী সমাজে আইনসভা মূলত বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীও সংসদ ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। বস্তুত পার্লামেন্টে অংশ নিয়ে শ্রমিকশ্রেণী অগণিত জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত আরও প্রকট করে তুলতে সক্ষম হয়। তবে মার্কসবাদীরা সংসদীয় সংগ্রামকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার বিরোধী, পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের নেতিবাচক দিকগুলো সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন। বুর্জোয়া সংসদ কাঠামো শ্রমিকশ্রেণীর মানসিকতা আবিষ্ট করে রাখে, বুর্জোয়া

পার্লামেন্ট সম্বন্ধে মোহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে শ্রমিক আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে নিয়ে যায় বলে তাঁরা সমালোচনা করেন। শ্রমিক আন্দোলনের পরীক্ষিত নেতারা সংসদ ব্যবস্থার মোহে সংস্কারবাদের শিকার হয়েছেন, এ নজিরের অভাব নেই।[১১] তত্ত্বগতভাবে মার্কসবাদীরা সেজন্য সংসদ-সর্বস্বতায় বিশ্বাসী নন, সংসদ-বহির্ভূত সংগ্রামকেই তাঁরা গুরুত্ব দেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায় ভারত, শ্রীলঙ্কা, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে কমিউনিস্টরা আইনসভায় অংশ নিয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন।

আইনসভাকে কী কী কাজ করতে হয়—এ আলোচনা না করলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় আইনসভার ভূমিকা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাবে না। সপ্তদশ শতাব্দীতে জন লক (সেকেন্ড ট্রিটিস অব সিভিল গভর্নমেন্ট) আইনসভার কাজকর্ম আইন প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা সঙ্গত বলে মনে করতেন। লকের মতে, দেশ শাসনের ভার থাকবে শাসনবিভাগের উপর, আর কোন্ নীতি অনুসরণ করে দেশ শাসিত হবে সে সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম বা আইন প্রণয়ন করবে আইনসভা। লকের পর মতেঁস্কু তাঁর 'দ্য স্পিরিট অব দ্য লজ' (১৭৪৮)-এ বলেন, আইন প্রণয়নই হবে আইনসভার একমাত্র কাজ। সময় ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেজেহট যে বক্তব্য রাখেন তাতে তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন ও শাসনবিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখাই আইনসভার প্রধান কাজ বলে মন্তব্য করেন। আইন প্রণয়ন আইনসভার সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বেজেহট উল্লেখ করেন।

আইন প্রণয়ন ছাড়া আইনসভার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মধ্যে আছে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ, সরকারি আয়ব্যয়ের মঞ্জুরি ও পর্যালোচনা, রাজনৈতিক বিরোধের নিষ্পত্তি, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার নিশ্চয়তা দান, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে পরিব্যাপ্ত স্বার্থের সমন্বয় ইত্যাদি। শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যেও আইনসভার কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে। সংসদীয় ব্যবস্থায় আইনসভা মন্ত্রিসভাকে তৈরি, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনবোধে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে অপসারিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তিচুক্তি সম্পাদন, উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে সেনেটের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। বাস্তবে অবশ্য শাসনবিভাগকেই অধিকাংশ সময় আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায়। অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে আইনসভার ক্ষমতা বিস্তৃত হলেও অনেকাংশে শাসনবিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে বিভিন্ন সংসদীয় পদ্ধতি, যেমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, অর্ধঘণ্টাব্যাপী আলোচনা, অনাস্থা প্রস্তাব ইত্যাদি

মারফত শাসনবিভাগের উপর আইনসভা তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত কমিটি 'হিয়ারিং' বা শুনানির মাধ্যমে শাসনবিভাগের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ইদানীং অধিকাংশ দেশেই আইনসভাকে নিজ ক্ষমতা প্রসারে তৎপর হতে দেখা যাচ্ছে।

আধুনিক সমাজে ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতা থেকে শুরু হয় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। আইনসভার পরিকাঠামোর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে রাজনৈতিক বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটানো এবং সামাজিক সংঘাতের ক্ষেত্র সংকুচিত করা আইনসভার অন্যতম দায়িত্ব। বিরোধ সত্ত্বেও বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা যাতে বিপন্ন না হয় তার নিশ্চয়তা দেয় আইনসভা। জনগণের বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে আইনসভার বিশেষ দায়িত্বের কথা বেজেহট গত শতাব্দীতে উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সেজন্য আইনসভার অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলতে সেইসব ক্রিয়াকলাপকে বোঝায় যার মাধ্যমে জনগণকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত রেখে রাষ্ট্রশক্তির স্থায়িত্ব বা স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হয়, জনগণের কাছে রাজনৈতিক কাঠামোর বৈধতা আনা যায়। তাছাড়া আইনসভার মাধ্যমেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে পরিব্যাপ্ত স্বার্থের একত্রীকরণ করে সমাজ ব্যবস্থার সংকট নিরসনের চেষ্টা করা হয়।[১২] অন্তত সংসদীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভাবমূর্তি তৈরিতে আইনসভা বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। সর্বোপরি জনগণের দাবি ও প্রত্যাশা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় আইনসভায়। উনবিংশ শতাব্দীতে জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'রিপ্রেজেনটেটিভ গভর্নমেন্ট'-এ (১৮৬১) আইনসভাকে জনগণের অভাব অভিযোগ প্রতিকারের কমিটি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আধুনিক আইনসভার ক্ষেত্রেও মিলের উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য।

বিভিন্ন দেশে আইনসভার ক্রমহ্রাসমান প্রভাব সম্বন্ধে অনেকেই উদ্বিগ্ন। একদিকে শাসনবিভাগের অহেতুক নিয়ন্ত্রণ আইনসভাকে রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত করেছে, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামোগত দুর্বলতার জন্য আইনসভা বেশ কিছু দেশে স্তিমিত হয়ে রয়েছে। শাসনবিভাগ একসময় ছিল একান্তভাবে আইনসভার নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে আইনসভাই শাসনবিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থা ও টাকার খেলা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনকে অনেকটা প্রহসনে পরিণত করেছে বলে যে অভিযোগ করা হয় তার যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। দু'হাজার সালের নভেম্বর মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে জটিলতা দেখা দেয় তাতে ঐ দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার ত্রুটি ও দুর্বলতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। আমেরিকার সেনেটর বা কংগ্রেসম্যানদের নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করতে হয়। মার্কিন সেনেটরদের মধ্যে বেশ কয়েকজন থাকেন যাঁরা কোটিপতি বা

তাদের প্রতিনিধি। বস্তুত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সংকট, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রাধান্য, সর্বোপরি রাজনৈতিক দলের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য আইনসভাকে অনেক ক্ষেত্রেই অকেজো করে রেখেছে।

আইনসভার অবক্ষয় সর্বজনীন রূপ নিয়েছে এ অভিযোগ মেনে নেওয়া যায় না। যে সব দেশে আইনসভা ছিল না, নতুন করে সেখানে আইনসভা গঠিত হয়েছে, বেশ কিছু রাষ্ট্রে নিষ্ক্রিয় আইনসভা সক্রিয় হয়েছে। প্রায় তিন হাজার সদস্য নিয়ে গঠিত চীনের জাতীয় গণকংগ্রেসকে "রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা" হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি ও অন্যান্য কমিটিগুলি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। পররাষ্ট্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি নীতি নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি দ্বারা প্রভাবিত হয়। ৫৮৯ জন সদস্য বিশিষ্ট কিউবার জাতীয় সভার আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঐ দেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। পাশাপাশি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র নাউরু রাষ্ট্র, যার আয়তন ২১ বর্গ কিলোমিটার ও জনসংখ্যা ১০ হাজার এবং পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা মাত্র ১৮ জন সেদেশেও ভোটাধিকার প্রয়োগ আবশ্যিক কর্তব্য বলে গণ্য হয়। নির্বাচনে ভোট না দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তিও পেতে হয়। সেখানেও আইনসভার গুরুত্ব রয়েছে।[১৩] শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সংসদ যেমন সুরক্ষিত, অনুন্নত ও কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেও তেমনি আইনসভার কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। আগামীদিনে আইনসভা সংসদীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

ভারতের সংসদ ও সাংসদদের কার্যকলাপ নানাভাবে সমালোচিত হলেও ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যে অনেকাংশে আইনসভা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার (১৯৭৫) আগে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় সংসদের ভূমিকা ছিল প্রশ্নাতীত। জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উৎস ছিল সংসদ। লোকসভার সিদ্ধান্তের ফলেই জীবন বীমা এবং স্টেট ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, হিন্দু বিবাহ, হিন্দু উত্তরাধিকার, দশমিক মুদ্রা, ম্যাট্রিক মাপ ও ওজন পদ্ধতির প্রবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন পাস হয়। সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যসম্পন্ন এইসব আইন বামপন্থী মহলেও "ছোটখাটো বিপ্লব" বলে স্বীকৃতি পায়।[১৪] পরবর্তীকালে ব্যাঙ্ক ও কয়লাশিল্প জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা বিলোপ ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত সংসদের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেয়। আর্থিক ক্ষেত্রে সম্পদ কর, ব্যয় কর ও দান কর সংক্রান্ত আইন পাস হয়। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানেও আইনসভা পথনির্দেশ করতে সক্ষম হয়। লোকসভার আলোচনাসূত্র ধরেই বোম্বাই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে মহারাষ্ট্র

ও গুজরাট দু'টি আলাদা রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায়। পাঞ্জাবী সুবা গঠনের পিছনে লোকসভার যথেষ্ট অবদান ছিল।[১৫] স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন ও বাধ্যতামূলক জমা প্রকল্প সংসদীয় হস্তক্ষেপের ফলেই সরকারকে বহুলাংশে শিথিল এবং পরে প্রত্যাহার করে নিতে হয়। ১৯৬৩ সালে সংসদের বিরোধিতার জন্য সরকারকে 'ভয়েস অব আমেরিকা' চুক্তি বাতিল করতে হয়।[১৬] সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজীর মর্যাদা নিয়ে দেশে দীর্ঘদিন ধরে যে বিতর্ক ও বিক্ষোভ চলছিল, তাও অনেকাংশে প্রশমিত হয় সরকারি ভাষা (সংশোধন) বিল ১৯৬৭ পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর।

আইনসভার কার্যকারিতার অনেক প্রমাণই পাওয়া যায় স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রায় দুই দশকে। সংসদে বিরুদ্ধ-সমালোচনা ও দাবিতে অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে হয়েছে। যেমন—১৯৪৮ সালে অর্থমন্ত্রী সম্মুখম চেট্টি, ১৯৫৮ ও ১৯৬৫ সালে দু'বার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারিকে। প্রথমবার মুন্দ্রা কেলেঙ্কারি ও দ্বিতীয়বার পুত্রদের ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে সুবিধাদানের জন্য। সিরাজুদ্দিন কোম্পানির লেনদেন বিষয়ে জড়িত থাকার জন্য খনি ও তৈল মন্ত্রী কে. ডি. মালব্য ১৯৬৯ সালে পদত্যাগ করেন। চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষে ভারতের বিপর্যয়ের জন্য সংসদ সদস্যরা তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি. কে. কৃষ্ণ মেননকে দায়ী করেন এবং এর ফলে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৃষ্ণ মেননকে পদত্যাগ পত্র দিতে হয় (১৯৬৩)। গো-হত্যা-বিরোধী আন্দোলনের (১৯৬৬) সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য সাংসদদের দাবিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দকে পদত্যাগ করতে হয়। সাংসদদের বিরূপ সমালোচনার জন্য এইচ. এম. প্যাটেল (অর্থসচিব), এম. ও. মাথাই (প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বিশেষ সহকারী) ও সেনাধ্যক্ষ বি. এম. কলের বিরুদ্ধে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হয়।

পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সংসদ বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান আয়ুব খানের মধ্যে সিন্ধু নদীর জল বণ্টন চুক্তি (১৯৬০) এবং তাসখন্দে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও আয়ুব খানের মধ্যে চুক্তি (১৯৬৬) নিয়ে সংসদে দীর্ঘ আলোচনা হয়। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি (১৯৭১) এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সিমলা চুক্তির (১৯৭২) বিভিন্ন দিক নিয়ে সংসদে কয়েকদিন ধরে বিতর্ক চলে। সিমলা চুক্তি উপমহাদেশে চিরস্থায়ী শান্তি নিয়ে আসবে বলে সংসদের প্রস্তাবে আশা করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে লোকসভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় (১১ মার্চ, ১৯৭১)। ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের সংবাদ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সংসদেই প্রথম ঘোষণা করেন। গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক নানা প্রশ্ন সংসদে বিভিন্ন সময় উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে। পার্লামেন্ট সদস্যদের দাবির

সূত্র ধরেই ভিয়েতনাম ও অন্যান্য দেশ ভারতের কূটনৈতিক স্বীকৃতি পায়। ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দানের বিষয় কয়েকবাবই সংসদেব সামনে এসেছে। লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে বছরে গড়ে প্রায় ৮০০ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রচনা ও রূপায়ণে সংসদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে পরবর্তী সবকটি পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ে সংসদকে বিশেষ ভূমিকা নিতে দেখা যায়। পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার জন্য সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটির ভূমিকাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। এই কমিটিগুলির মধ্যে পরিকল্পনা রচনার নীতি সংক্রান্ত কমিটি, শিল্প-বিজ্ঞান-কারিগরি গবেষণা সংক্রান্ত কমিটি, কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি কমিটি, মানব সম্পদ ও সামাজিক পরিষেবা কমিটি এবং পরিকল্পনা রূপায়ণ ও জনসংযোগ কমিটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। লোকসভা ও রাজ্যসভার প্রায় সব সদস্যই কোনো না কোনো কমিটির সদস্য। পরিকল্পনা কমিশন যাতে সংসদের কাছে পুরোপুরি দায়িত্বশীল থাকে তার জন্য সাংসদদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রস্তাবও লোকসভায় এসেছে।

১৯৫০-১৯৭০ পর্বেও ভারতীয় সংসদ কাঠামোতে নানা বিচ্যুতি ছিল, উত্তেজনা ছিল কিন্তু এর বৈধতা নিয়ে জোরালো প্রশ্ন ওঠেনি। পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের পর থেকেই রাজনৈতিক ও পরিকাঠামোগত দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার জন্য সংসদ কাঠামোর সংকট ঘনীভূত হতে থাকে, এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আইনসভার পরিকাঠামোগত বিচ্যুতি কীভাবে সংসদ কাঠামোর অধোগতি এনেছে তার আলোচনা করলে এই সংকটের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হবে।

রাজনৈতিক প্রয়োজনে আইনসভার আয়ুষ্কাল কমিয়ে বা বাড়িয়ে দেওয়া ভারতে প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়েছে। এ পর্যন্ত তেরোটি লোকসভা গঠিত হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম, অষ্টম ও দশম লোকসভা মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট পাঁচ বছর কার্যকাল শেষ করতে পেরেছিল। চতুর্থ লোকসভা এক বছর আগে বাতিল করে দেওয়া হয়। ষষ্ঠ লোকসভা আড়াই বছর আর নবম লোকসভা মাত্র পনেরো মাস স্থায়ী হয়। একাদশ ও দ্বাদশ লোকসভা উনিশ মাস ও তেরো মাসের মাথায় ভেঙে দেওয়া হয়। নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সংসদ প্রথা বহির্ভূতভাবে ভেঙে দেওয়া স্বাভাবিকভাবেই সংসদ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়।

লোকসভা কর্তৃক পরিবেশিত তথ্য থেকে দেখা যায়, সংসদের অধিবেশনের সময়ও ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। প্রথম লোকসভা বসেছিল ৩৭৪৮ ঘণ্টা, অষ্টম লোকসভা ৩৩২৪ ঘণ্টা। আর নবম লোকসভা ৭৫৪ ঘণ্টা।[১৭] সাম্প্রতিককালে এই অধিবেশনের সময় আরও কমে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন সংসদের অধিবেশন চলতে না দেওয়ার

(বোফর্স ও অতি সাম্প্রতিক তহলকা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে) আইনসভার ভূমিকা যে অনেকাংশে নিস্তেজ হয়ে আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রথম লোকসভা থেকে নবম লোকসভা (১৯৫২-১৯৯০) সর্বমোট ২৪৯৪টি আইন বিধিবদ্ধ করেছে। অর্থাৎ গড়ে বছরে ৬৪টি আইন পাস হয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সংবিধান সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন সংসদ অনুমোদন করেছে। কিন্তু দশম লোকসভা থেকেই সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের সংখ্যা কমে যায়। অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আইন বিশেষ কোনও আলোচনা না করেই লোকসভাকে দিয়ে পাস করিয়ে নেওয়া হয়েছে। অষ্টম লোকসভায় একই দিনে পেশ ও পাস করিয়ে নেওয়া বিলের সংখ্যা ছিল ১০৫। তাছাড়া অনেক ভালো ভালো আইন প্রণীত হয়েও কার্যকর হয়নি। আইনসভাকে পাস কাটিয়ে অর্ডিন্যান্স জারির এক মারাত্মক প্রবণতা লক্ষ করা যায় কেন্দ্রে এবং বিশেষ করে রাজ্যস্তরে। একজন প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৭১ ও ১৯৮১'র মধ্যে বিহারে আইন পাস হয়েছে ১৬৩টি, আর ঐ সময়ের মধ্যে অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে ১৯৫৮টি। এমন অর্ডিন্যান্সও আছে যা, ১৪ বছর ধরে বলবৎ রয়েছে। ১৯৭৬ সালের ১৮ জানুয়ারি একদিনেই বিহারে ৫৬টি অর্ডিন্যান্স জারি হয়।[১৮] ইদানীংকালে এই প্রবণতা অবশ্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

কেন্দ্রীয় সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকারও দীর্ঘদিন ধরে সংকুচিত হচ্ছে। আইনসভার প্রতিদিনের বৈঠকের প্রথম একঘণ্টা সদস্যদের উত্থাপিত প্রশ্ন ও সরকারের তরফ থেকে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট থাকে। উত্তরের জের ধরে সম্পূরক প্রশ্নও তুলতে পারেন সদস্যরা। প্রশ্নোত্তর পর্ব একসময় ভারতীয় আইনসভার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল, বহির্বিশ্বের সংসদ বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিবিদদের কাছে তা সমাদৃত হয়েছিল। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আইনসভায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, রাজনৈতিক ঝড় উঠেছে এবং জাতীয় জীবনে আইনসভার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম লোকসভায় মোট সময়ের ১৪·৬০ শতাংশ নির্দিষ্ট ছিল প্রশ্নোত্তরের জন্য, অষ্টম লোকসভায় তা হ্রাস পেয়ে হয় ১২·৮০ এবং নবম লোকসভায় ১০·১৪ শতাংশ। প্রশ্নোত্তরের গুরুত্ব কমে যাওয়া, সংসদের ক্রমহ্রাসমান ভূমিকারই সাক্ষ্য দেয়।

আইনসভার কার্য পরিচালনার দীর্ঘদিনের স্বীকৃত কয়েকটি পদ্ধতি, যেমন—দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, অর্ধঘণ্টাব্যাপী আলোচনা, বাজেট বিতর্ক, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের ভাষণ সংক্রান্ত আলোচনা, অনাস্থা প্রস্তাব, অধ্যক্ষের নিরপেক্ষতা ইত্যাদি ক্রমশ লঙ্ঘিত হতে দেখা যাচ্ছে। অর্ধঘণ্টাব্যাপী আলোচনা, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব ইত্যাদি

দায়সারা গোছের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজেট বিতর্কের আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকছে না। কোটি কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ পাস হয়ে যায় কোন আলোচনা না করেই। বিভাগীয় বাজেট বিনা আলোচনায় গিলোটিন প্রয়োগ করে পাস করানো প্রায় রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের ভাষণে অনুপস্থিত থাকা, ওয়াক-আউট করা বা বাধা দেওয়াও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ১৯৬৩ সালে পাঁচজন সদস্য রাষ্ট্রপতির ইংরেজী ভাষণের বিরুদ্ধে বাধা দিলে তাঁদের কাছ থেকে অধ্যক্ষ কৈফিয়ত তলব করেন। দু'জন সদস্য ক্ষমা চান। বাকি তিনজন সদস্য ক্ষমা না চাওয়ায় লোকসভার সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশে অধ্যক্ষ কর্তৃক তিরস্কৃত হন।

অধ্যক্ষের বিতর্কিত ভূমিকাও সংসদ কাঠামোর অধোগতির জন্য কম দায়ী নয়। নিরপেক্ষতা ও আইনসভার মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে অধ্যক্ষদের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। ১৬৪২ সালে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্যকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলে তাঁরা এসে কমন্সসভায় আশ্রয় নেন। রাজা নিজে সভাকক্ষে আসেন এবং অভিযুক্ত সদস্যদের শাস্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অধ্যক্ষকে নির্দেশ দেন। অধ্যক্ষ লেনথলের ঐতিহাসিক জবাব আজও উল্লেখ্য। বিনীতভাবে অধ্যক্ষ রাজাকে জানান, সভাপতি পদে আসীন থাকাকালীন সময়ে তিনি কমন্সসভার আজ্ঞাবাহী, তাঁর দৃষ্টি ও বাক্‌শক্তি সভার নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কমন্সসভার সম্মতি ব্যতিরেকে তিনি রাজাদেশ পালনে অক্ষম। ভারতেও স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ পরিচালনার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ঔপনিবেশিক আমলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিঠলভাই প্যাটেল, বাংলায় আজিজুল হক থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জি. ডি. মভবলংকর প্রমুখ অধ্যক্ষরা নিরপেক্ষতার বেশ কিছু নজির রেখে গিয়েছেন। কিন্তু বিগত তিন দশক অধ্যক্ষরা দলীয় রাজনীতির সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছেন যে তাঁদের পক্ষে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। কেরালা, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, মেঘালয় প্রভৃতি বিধানসভার অধ্যক্ষরা সংসদীয় নীতিবহির্ভূত আচরণের জন্য সমালোচিত হয়েছেন। কেরালা বিধানসভার অধ্যক্ষ এ. সি. যোশ করুণাকরণ মন্ত্রিসভাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ১৯৮২ সালের ৪ জানুয়ারি একদিনেই সাতবার নির্ণায়ক ভোট প্রয়োগ করে নজির সৃষ্টি করেন। মেঘালয় বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্ণায়ক ভোট দিয়ে ১৯৯০-এর অক্টোবর মাসে মন্ত্রিসভাকে বাঁচিয়ে দেন। অধ্যক্ষদের সিদ্ধান্ত দলীয় নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এই ধরনের অভিযোগের সংখ্যা বাড়ছে। মন্ত্রিত্বের টোপও অনেক সময় অধ্যক্ষদের নিজ ভূমিকা স্বাধীনভাবে পালনের অন্তরায় হয়ে দেখা দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে একাধিক অধ্যক্ষ মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। ব্রিটেনে বিরোধী শ্রমিক দলভুক্ত প্রার্থী মিস বেট্রি বুথয়েড রক্ষণশীল দলের অনেক সদস্যের সমর্থন পেয়ে ৩৭২-২৩৮ ভোটে কমন্সসভার প্রথম মহিলা অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতে

এই ধরনের নজির তো নেই-ই বরঞ্চ দলীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য অধ্যক্ষরা নগ্নভাবে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন। এই ধরনের দৃষ্টান্ত দিন দিনই বাড়ছে। একাধিকবার সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ সম্মেলনে অধ্যক্ষ পদকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে কিন্তু দলীয় নিয়ন্ত্রণ অধ্যক্ষদের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, ফলে সংসদব্যবস্থারও সংকট বাড়ছে।

রাজনৈতিক স্বার্থে সাংবিধানিক সংস্থান ও রীতিনীতি লঙ্ঘন করার দরুন সংসদ-কাঠামোর সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার দোহাই দিয়ে ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ ধারার লাগামহীন প্রয়োগই এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এ পর্যন্ত এই ধারা প্রয়োগ করে ১০৮ বার রাজ্য সরকারগুলিকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং অধিকাংশ সময়ই তা করা হয়েছে দলীয় স্বার্থে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৬-র মধ্যে ১০ বার, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪-র মধ্যে ২৬ বার বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হয়েছে। সবচেয়ে বেশি হয়েছে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৩-র মধ্যে, ৫৮ বার। ১৯৭৭ সালে জনতা দল কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেস শাসনাধীন কয়েকটি রাজ্য সরকারকে বাতিল করে দেয়, ১৯৮০ সালে কংগ্রেস আবার জনতা-দল শাসিত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়। রাজনৈতিক কারণে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের প্রবণতা দিন দিনই বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সংবিধান পর্যালোচনা কমিশনও ৩৫৬ ধারার বিলুপ্তি সমর্থন করেনি তবে যাতে এই ধারার অপব্যবহার না হয় সেজন্য রাজ্য সরকারকে বাতিল করার আগে রাষ্ট্রপতির যথাযথ কারণ নির্দেশ করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছে। সংবিধানে ৩৫৬ ধারার উপস্থিতির ফলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের যেমন অবনতি ঘটেছে তেমনি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। আইনসভাকে দীর্ঘদিন বাতিল করে রেখে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রবর্তন পুরো সংসদ কাঠামোকেই অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

জনসাধারণের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের দূরত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় যাঁরা নির্বাচিত হতেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলন, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের নেতা, সংগঠক ও কর্মী, স্বদেশপ্রেম ও জনসেবার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে এই ধারার বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। আইনসভার বেশিরভাগ সদস্যই আসেন নতুন প্রজন্ম থেকে। সম্প্রতিকালে সংসদ সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বাড়িয়ে দেওয়ার সুপারিশ করেছে সংসদ নিযুক্ত কমিটি এবং তা বাস্তবায়িত হলে শিল্পোন্নত পশ্চিমী দেশের এম পি বা সেনেটরদের প্রায় সমতুল্য হবে বলে মনে করা হচ্ছে। একটা বড় সংখ্যক সাংসদ ও বিধায়কদের জীবনযাত্রার মান পালটে গিয়েছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার সঙ্গতি থাকছে না। এম. পি, এম. এল. এ-দের মধ্যে সাংবিধানিক দায়িত্ব সম্বন্ধে

সচেতনতার অভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক সময়ই দেখা গিয়েছে, প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্নকর্তা নিজেই আইনসভায় উপস্থিত নেই। মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিস দিয়ে আলোচনার প্রাক্কালে সদস্যদের অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। মন্ত্রীরাও নিয়মিত আইনসভায় উপস্থিত থাকেন না, কোরামের অভাবে অনেক সময়ই অধিবেশন স্থগিত রাখতে হয়। অতি সম্প্রতি 'তহলকা' পরিস্থিতির জন্য লোকসভার পুরো গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনই অচল করে রাখা হয়, গুরুত্বপূর্ণ বাজেট বরাদ্দ ধ্বনিভোটে পাস করে দিতে হয়। সর্বোপরি দলত্যাগ এবং আয়ারাম-গয়ারামের সক্রিয়তা ভারতীয় রাজনীতি তথা সংসদ ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করেছে। দলত্যাগ-বিরোধী আইনের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সংসদব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান অধোগতি এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিরসনে এই কাঠামোর ব্যর্থতায় স্বভাবতই বিভিন্ন মহল উদ্বিগ্ন। তবে এই ব্যবস্থার বিকল্প নয়, বরঞ্চ এর প্রধান প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করে একে সংকটমুক্ত করার চিন্তাভাবনা ও প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে। বেশ কিছু সমস্যার কথা আমরা আলোচনা করেছি তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার। ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাপক ও জটিল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের নির্বাচন পরিচালনা এবং রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে নির্বাচন কমিশনের ওপর। তাছাড়া রাজ্যস্তরে পঞ্চায়েত ও পৌরসংস্থার নির্বাচন পরিচালনা করতে হয় রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়া ইউরোপ মহাদেশের সবকটি দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার সম্মিলিত প্রক্রিয়ার সমতুল্য। যেমন, ১৯৯৯ সালে ৫৪৫ আসন বিশিষ্ট ত্রয়োদশ লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পুরো একমাস ধরে। ৫০ লক্ষ কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিতে হয়, পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর ২০ লক্ষ নিরাপত্তা কর্মী নিয়োজিত হন নির্বাচন পরিচালনার জন্য। নির্বাচনী রাজনীতিতে পেশিশক্তির প্রাধান্য, টাকার খেলা ও মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের সমস্যা। লোকসভা সদস্যদের অন্তত ৪০ জন ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত। বিহারে ১৭৪টি খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ ইত্যাদি ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কোনও অসুবিধা হয়নি। অতি সম্প্রতি তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচনে শ্রীমতী জয়ললিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেননি কারণ একাধিক দুর্নীতির মামলায় তিনি অভিযুক্ত। এতদ্‌সত্ত্বেও তামিলনাড়ুর রাজ্যপালিকা তাকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেন এই শর্তে যে ছয়মাসের মধ্যে জয়ললিতাকে বিধায়ক নির্বাচিত হতে হবে। রাজনীতির সঙ্গে অপরাধ জগতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অবসানকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভোরা কমিটির রিপোর্ট এখনও বাক্সবন্দী হয়ে আছে। এছাড়া নির্বাচনী

সংস্কার সম্বন্ধে দীনেশ গোস্বামী কমিটি (১৯৯০), ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কমিটি (১৯৯৮), আইন কমিশন (১৯৯৯) ও খোদ নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশ রয়েছে। এই সুপারিশগুলি কার্যকর হলে ভারতের নির্বাচনব্যবস্থা বহুলাংশে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত হতে পারে বলে আশা করা হয়।

রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বৃদ্ধিও ভারতীয় সংসদ ব্যবস্থার সাফল্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫২ সালে ৭৪টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১৯৮৯ সালে তা বেড়ে হয়ে ১৭৭। বর্তমানে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৬১২। অবশ্য এর মধ্যে বৃহদাংশই রেজিস্ট্রিভুক্ত নয়। লোকসভায় এখন রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৪০। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত জাতীয় রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৬ এবং আঞ্চলিক দল ৩৮। প্রায় কোনও রাজনৈতিক দলই বিধিবদ্ধ আচরণবিধি মেনে চলে না। এ নিয়েও বিভিন্ন সুপারিশ আছে কিন্তু তা কার্যকর হচ্ছে না।

প্রান্তিক পর্যায়ে হলেও সংসদ ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত দুর্বলতা দূর করার যেসব প্রয়াস ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ করতে হয় আইনসভার কমিটি ব্যবস্থার। আধুনিক সমাজে রাষ্ট্রীয় কর্মপরিধি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ, সরকারি কাজকর্মের নজরদারি ও ব্যয়বরাদ্দ খতিয়ে দেখার দায়িত্ব সংসদের সীমিত সময়ের অধিবেশনের মধ্যে সম্ভব হয় না। ইদানীংকালে বিভিন্ন দেশে আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত কমিটিগুলিকে এইসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইনসভার প্রায় ৮০ ভাগ কাজ কমিটি মারফত সম্পাদিত হয়। সেনেট ও জনপ্রতিনিধিসভার বিভিন্ন কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও পদস্থ রাজপুরুষরা কমিটির সামনে বক্তব্য, কৈফিয়ত ইত্যাদি পেশ করতে বাধ্য থাকেন। সরকারি নীতির বিভিন্ন দিক এবং অনেক অপ্রকাশিত তথ্য কমিটির শুনানির সময় সাধারণের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় সেনেটের ফুলব্রাইটের নেতৃত্বে গঠিত সেনেট পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কমিটি পদস্থ কর্মচারীদের শুনানির ব্যবস্থা করে যুদ্ধাবসানের পক্ষে জনমত গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছিল। ব্রিটেনের ক্রসম্যান কমিটি (১৯৬৬) ও কমন্সসভার কার্যপরিচালন কমিটির (১৯৭৭-৭৮) সুপারিশ অনুযায়ী পার্লামেন্টের কমিটি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হয়েছে। ভারতবর্ষেও কেন্দ্র এবং রাজ্য আইনসভার কমিটিগুলিকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে ১৭টি কমিটি গঠিত হয়েছে। পার্লামেন্টের প্রতিটি সদস্যই কোনো-না-কোনো কমিটির সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে সংসদ-সদস্যদের পক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রকের কাজকর্মের পর্যালোচনা, বাজেট-বরাদ্দ খতিয়ে দেখা ও নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়ও এই ধরনের ১৭টি কমিটি গঠিত হয়েছে এবং

ইতিমধ্যে কমিটিগুলি সরকারি বিভাগের কাজকর্ম খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে।

সংসদ ব্যবস্থাকে কার্যকর ও গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব উঠছে, সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। প্রস্তাবের মধ্যে আছে (১) সংসদের মেয়াদ নির্দিষ্টকরণ, (২) পরোক্ষ নির্বাচন, (৩) গঠনমূলক অনাস্থা প্রস্তাব ইত্যাদি।[১৯]

লোকসভার আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর নির্দিষ্ট করে দেওয়ার সুপারিশে বলা হচ্ছে, এতে সরকার স্থিতিশীল হবে, উন্নয়ন কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে, নির্বাচনী ব্যয় এড়ানো যাবে, ঘন ঘন নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ হবে। লোকসভার মেয়াদ নির্দিষ্টকরণের মধ্যে বিপদও আছে কারণ এর সুযোগ নিয়ে সংসদের আস্থালাভে ব্যর্থ একটি সংখ্যালঘু সরকারও ক্ষমতায় থেকে যেতে পারে। গণপরিষদে সংবিধান রচনার সময় ড. বি. আর. আম্বেদকর স্থায়িত্বের চেয়ে দায়িত্বশীলতার ওপর গণতান্ত্রিক সরকার নির্ভরশীল বলে মন্তব্য করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণনও মনে করেন স্থায়িত্ব নয়, দায়িত্ববোধই সরকারের উৎকর্ষতার মাপকাঠি।

ভারতে পঞ্চায়েত স্তর থেকে লোকসভা পর্যন্ত প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে। প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রের ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়। যেহেতু আমাদের দেশে নির্বাচন ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে ব্যয়বহুল এবং সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, সেজন্য কেউ কেউ মনে করছেন শুধুমাত্র গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন হওয়া উচিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে। জেলা বোর্ড থেকে বিধানসভা ও লোকসভা পর্যন্ত পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাই ভারতের পক্ষে শ্রেয়। মনে রাখা দরকার সংবিধান প্রণেতারা সচেতনভাবেই পরোক্ষ নির্বাচন ও সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের নীতি খারিজ করে দিয়ে সার্বিক প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন। সঙ্গতভাবেই সমালোচকরা বলছেন, প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে সরে এলে দেশকে পিছনের দিকেই নিয়ে যাওয়া হবে।

একাদশ ও দ্বাদশ লোকসভার অন্তর্বর্তী সময়ে লোকসভার অনাস্থার মুখে বাজপেয়ী-দেবগৌড়া-গুজরাল-বাজপেয়ী চারটি মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। ঘন ঘন অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য স্বভাবতই শাসনকার্যে অচলাবস্থা ও শূন্যতার সৃষ্টি হয়। আমাদের সংবিধানে এখন যে সংস্থান আছে তাতে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাস হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়, কারণ মন্ত্রিসভা যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী। গঠনমূলক অনাস্থা প্রস্তাব অনুযায়ী অনাস্থা প্রস্তাব পাস হলেই যে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে এমন নয়। একজন বিকল্প প্রধানমন্ত্রীর নাম করতে হবে এবং যদি কোন *বিকল্প না পাওয়া যায় তবে যে মন্ত্রিসভার প্রতি লোকসভার আস্থা নেই সেই*

মন্ত্রিসভাই ক্ষমতায় থেকে যাবে। এই গঠনমূলক অনাস্থা প্রস্তাবের উৎস জার্মান সংবিধানের—গ্রুন্ডগেসেটেজ বা "মৌল আইন"—৬৭ ও ৬৮ ধারা।[২০] জার্মানিতে সরকারের প্রধান বা চ্যান্সেলার আইনসভার নিম্নকক্ষ বুনডেসতাগ কর্তৃক নির্বাচিত হন। আইনসভার এক-চতুর্থাংশ সদস্য চ্যান্সেলারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারেন তবে সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিকল্প চ্যান্সেলারের নাম অনুমোদিত হলেই অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়। মনে রাখা দরকার জার্মানির সরকার 'রাষ্ট্রপতি ধাঁচের সংসদীয় যুক্তরাষ্ট্র', কাজেই রাষ্ট্রপ্রধানের হস্তক্ষেপের ফলে অনেক সাংবিধানিক সংকট এড়ানো সম্ভব হয়। সংসদীয় কাঠামোর ভিন্নতার জন্য স্বভাবিকভাবেই জার্মানির নজির ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না।

সংসদ-ব্যবস্থাকে উন্নততর করার প্রচেষ্টা চলছে সন্দেহ নেই, তবে এটা অস্বীকার করা যায় না যে পঙ্কিলতার আবর্তে ভারতের সংসদীয় রাজনীতি নিমজ্জিত, ফলে এর সামাজিক সমর্থন ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। সমাজব্যবস্থার সঙ্গে, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সংসদীয় রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। যে আর্থ-সামাজিক ভিতের ওপর ভারতের সংসদ কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফাটল অথচ ভারতের মত জনবহুল এবং বহুত্ববাদী প্রবণতাসম্ভূত দেশে সংসদনির্ভর রাজনীতি এবং তার পরিপূরক হিসেবে সংসদবহির্ভূত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ভিন্ন অন্য কোনও ব্যবস্থা কাম্য নয়, সম্ভবও নয়। সেজন্যই প্রয়োজন আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন, এবং সংসদ-ব্যবস্থাকে ক্রটিমুক্ত ও শক্তিশালী করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিধানসভা স্থাপনের প্রেক্ষিত ও প্রথম তিন দশক (১৮৬২-১৮৯২)

তাঁবেদারি থেকে প্রতিবাদী

বাংলার বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৮৬২ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি শনিবার। প্রথম দিনের অধিবেশন শুরু হয় ইংল্যান্ডের সম্রাজ্ঞীর প্রতি আনুগত্য জানিয়ে। প্রথম অধিবেশনেই বিধানসভার কার্যপ্রণালী ও পরিচালন নিয়ামবলী গৃহীত হয়। বারোজন মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত বিধানসভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলার তৎকালীন ছোটলাট (লেফটেন্যান্ট গভর্নর) স্যার পিটার গ্রান্ট। সদস্যদের মধ্যে চারজন ভারতীয় ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন ইংরেজ। ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন রাজা বামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়, মুসলমান সমাজের শিরোমণি মৌলবী আবদুল লতিফ, রামমোহন-শিষ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ও জমিদার প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং পাইকপাড়ার জমিদার প্রতাপচাঁদ সিংহ। রমাপ্রসাদের অকালমৃত্যুর পর ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে সুপণ্ডিত রামগোপাল ঘোষ সদস্যপদ পান। প্রারম্ভিক যুগে বিধানসভাকে 'বেঙ্গল কাউন্সিল', 'লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাউন্সিল', 'বেঙ্গল এসেম্বলি' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হতো। ঐ সময় বিহার, ওড়িশা ও আসাম নিয়ে বাংলার বিস্তৃতি ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার ; জনসংখ্যা ছিল আট কোটি। এই বিস্তীর্ণ এলাকার জন্য আইন প্রণয়নের দায়িত্ব ছিল বাংলার বিধানসভার। বিধানসভার অধিবেশন তখন বসত ছোটলাটের সরকারি আবাস আলিপুরের বেলভেডিয়ারে। গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদের অধিবেশনও তখন হতো কলকাতায়, রাজভবনে, আড়ম্বর ও জাঁকজমকের মধ্যে। কিন্তু তখনকার কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রাদেশিক আইনসভার চেয়ে সচল ও প্রাণবন্ত ছিল বাংলার আইনসভা। বাংলার ছোটলাট স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল (১৮৭১-১৮৭৪) একসময় গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ক্যাম্পবেল তাঁর স্মৃতিকথায় দুই পরিষদের মধ্যে তুলনা করে বাংলার বিধানসভার সদস্যদের মেধা, বুদ্ধি, বাকচাতুর্য এবং সংসদীয় দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[১] ১৮৭১ সালে একবার সবকটি প্রাদেশিক আইনসভা উঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব হয়। ছোটলাট উইলিয়াম গ্রে তখন ভাইসরয়কে জানান, সারা ভারতে যদি একটি আইনসভাও রাখা হয় তবে তা রাখা উচিত বাংলায়। বস্তুত শুরু থেকেই বাংলার সামাজিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণে বিধানসভার ভূমিকা ছিল অনন্য।

সন্দেহ নেই, প্রতিষ্ঠার অন্তত প্রথম তিন দশক বিধানসভা ছিল আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সম্বলিত ছোটলাটের শাসন পরিষদ। প্রথম যুগের ভারতীয় সদস্যরা ছিলেন একান্তভাবে রাজশক্তির অনুগামী, সাম্রাজ্য রক্ষায় শাসকদের সহায়ক। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বিধানসভা হয়ে ওঠে বাংলার রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদেশী শাসকরা আইনসভাকে সম্প্রসারিত করতে বাধ্য হন এবং ভারতীয় সদস্যদের বেশ কিছু সংসদীয় অধিকার দেওয়া হয়। আইনসভার বাইরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনসভার ভিতরেও ভারতীয় সদস্যদের শাসকবিরোধী ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ; ভারতের স্বাধীনতার দাবিও ক্রমশ আইনসভায় সোচ্চার হতে থাকে। সর্বোপরি ঔপনিবেশিক আমলে বিধানসভাকে কেন্দ্র করে সংসদীয় রাজনীতি, সংসদ বহির্ভূত বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনকে ক্রমশ প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। তবে প্রথম তিরিশ বছর বিধানসভার রাজনৈতিক প্রভাব ছিল খুবই সীমিত। ১৮৬২-৯২ পর্বের বিধানসভাকে সঠিকভাবেই সেজন্য ‘ছোটলাটের দরবার সভা’ বলে অভিহিত করা হয়।

বিধানসভা স্থাপনের পটভূমি বিচারে স্বভাবতই ইংরেজ শাসকদের মনোভাব আলোচনা করতে হয়। ইংরেজ রাজপুরুষরা দাবি করতেন যে সদিচ্ছা, ঔদার্য ও গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই শাসকরা আইনসভা গঠনে উদ্যোগ নিয়েছেন। বলা হতো, সাংবিধানিক পরিবর্তনে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের প্রতিবাদমূলক রাজনীতি দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয়নি। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই ধরনের দাবি সমর্থন করে না। টমাস ব্যাবিংটন মেকলে, চার্লস উড প্রমুখ একাধিক রাজপুরুষ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছেন, ভারতীয়দের নিয়ে প্রাদেশিক আইনসভা গঠন সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। স্থানীয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বরঞ্চ ভারতীয়দের নিয়ে আইনসভা গঠনে আগ্রহী ছিলেন। ১৮৫২ সালের ১৩ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি এক ‘নোট’ পাঠিয়ে বলেন, দেশের সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ও ব্রিটিশ রাজের প্রতি অনুগত এমন শিক্ষিত ভারতীয় ভদ্রলোকদের নিয়ে প্রাদেশিক আইনসভা গঠন করা উচিত। ভারত সচিব চার্লস উড ডালহৌসির এই প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দেন। ইংল্যান্ড থেকে ভারত সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়, প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা গঠনের জন্য ভারতীয়দের দাবি যেন কোনমতেই প্রশ্রয় না পায়। এটা স্পষ্ট যে শাসকদের সদিচ্ছার ফলে বাংলার বিধানসভা গঠিত হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গণঅভ্যুত্থান, ভারতীয়দের থেকে শাসকদের বিচ্ছিন্নতা এবং সর্বোপরি ইংরেজী শিক্ষিত ও ভদ্রলোক অভিধেয় অভিজাত শ্রেণীর দাবি আইনসভার প্রতিষ্ঠাকে অনেকটা অনিবার্য করে তুলেছিল। রজনীপাম দত্ত মনে করেন, পরিকল্পিতভাবেই আইনসভা গঠন করে বশম্বদ ভারতীয়দের দ্বারা

সাধারণ জনগণকে দমন করার ব্যবস্থা করা হয়।[২] 'মন্ত্রী-অভিষেক'-এ রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেন, অল্পস্বল্প খোরাক দিয়ে ভারতীয়দের মুখ বন্ধ করাই ছিল শাসকদের উদ্দেশ্য।[৩]

আইনসভা গঠনের সিদ্ধান্ত বহুলাংশে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ বাংলা তথা সারা ভারতে চরম বিপর্যয় নিয়ে আসে। লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা বাংলার কৃষিঅর্থনীতির সংকট আরও ঘনীভূত করে। উৎপাদন হ্রাস পায়, দুর্ভিক্ষ হয়ে দাঁড়ায় প্রায় নিত্যসঙ্গী। বিদেশী পুঁজির প্রভাব এবং রেল ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে দেশের অভ্যন্তরে শাসকদের আরোপিত অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং গ্রামীণ সমাজের পুরনো কাঠামো ভেঙে পড়ে। নিজস্ব প্রয়োজনেই শাসকগোষ্ঠী ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অচলায়তনে ভাঙন ধরায় এবং দীর্ঘ স্থবিরতার অবসান ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ও তার ওপর নির্ভরশীল পুঁজিবাদী উন্নয়ন ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতকে যুক্ত করে। ফলে বিশাল বাজার ও মুদ্রানির্ভর অর্থনীতির বিপুল সম্ভাবনা ভারতের শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। কিন্তু নজিরবিহীন সম্পদ নিষ্কাশন, ব্রিটিশ পুঁজির সুবিধার্থে ভারতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে রাখার নীতি ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য দেশের অগ্রগতি ব্যাহত করে। ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়রাও শাসকদের নগ্ন শোষণ সম্বন্ধে সমালোচনামুখর ছিলেন। দাদাভাই নৌরজি, রমেশচন্দ্র দত্ত, মহাদেব গোবিন্দ রানাডের লেখা ও বক্তব্যই এর প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ নবায়নের পূর্বে ১৮৫৩ সালে নিউইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন পত্রিকায় কার্ল মার্কস যে ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করেন, ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য আজও তা সমাদৃত। শুধু ভারতীয়রা নন, ব্রিটিশ শাসনের বিষময় পরিণতি সম্বন্ধে ইংরেজরাও শঙ্কিত ছিলেন। পাটনার প্রাক্তন কমিশনার উইলিয়াম টেলর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে জানান, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, করভার, সেনাবাহিনীর বিক্ষোভ ও জনগণের চরম অসন্তোষ ইত্যাদি যে কোনও সময় ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে।[৪] এই পরিস্থিতিতে রাজশক্তিকে অন্তত কিছু পরিমাণে সমর্থনপুষ্ট করে তোলার প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সুযোগদান বিধেয় বলে সরকার মনে করেন। প্রাদেশিক বিধানসভা গঠনের যে প্রস্তাব ইতিপূর্বে অগ্রাহ্য হয়েছিল ১৮৫৭-র পরে তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয় এবং ভারতীয়দের নিয়ে আইনসভা গঠিত হয়।

ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম ও আইনসভা গঠনের সিদ্ধান্তকে ত্বরান্বিত করেছিল। এদেশে ইংরেজ আধিপত্য ভারতীয়রা কোনও

সময়ই মেনে নেননি। প্রথম থেকেই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রাধান্যকে প্রতিহত করেছেন ভারতের জনগণ। ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ২৯টি বিদ্রোহের উল্লেখ করেছেন ক্যাথনিন গাফ।[৫] কৃষক ও আদিবাসী শ্রেণীর লোকেরাই ছিলেন এইসব সশস্ত্র বিদ্রোহের নায়ক। জমিদার, জোতদার ও ধনী কৃষকের শোষণ এবং অত্যাচারে জর্জরিত গ্রামাঞ্চলের মানুষ কখনও স্বতঃস্ফূর্ত, কখনও সশস্ত্রভাবে কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। হিন্দু সন্ন্যাসী, মুসলমান ফকির, পাইক, চোয়াড় ইত্যাদি বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনকে বিপর্যস্ত করে দেয়। উনিশ শতকের মধ্যপাদে সিধু ও কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ বীরভূম, ভাগলপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অন্তত কয়েক মাসের জন্য কোম্পানির শাসনব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকে চরম আঘাত দেয়। এর অব্যবহিত পরেই আসে বাংলার নীল বিদ্রোহ যা ভাইসরয় লর্ড ক্যানিংকে ১৮৫৭-র দিল্লির দিনগুলির থেকেও বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছিল। ক্যানিং লেখেন, "ভয় বা ক্রোধের বশে কোনও নির্বোধ নীলকরের চালানো একটিমাত্র গুলিই সমগ্র নিম্নবঙ্গে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করে দিতে পারে।"[৬] এই বিদ্রোহগুলির মূল্যায়ন করতে গিয়ে শাসকদের কাছে এটা স্পষ্ট ধরা পড়ে যে ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতীয়দের কাছ থেকে বিপজ্জনকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। ভারতীয়দের নিয়ে আইনসভা গঠন করে এই বিচ্ছিন্নতা দূর করতে ইংরেজ শাসকরা প্রয়াসী হন।

সর্বোপরি উনিশ শতকের এলিট বা পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত বাঙালী ভদ্র ও সুধীজনের বিক্ষুব্ধ মনোভাব প্রশমিত করাই ছিল বিধানসভা গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের ফলে শিক্ষিতদের মধ্যে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও উদারনৈতিক চিন্তার প্রসার ঘটে। সংবাদ কৌমুদী (১৮২২), হিন্দু প্যাট্রিয়ট (১৮৫২) প্রভৃতি সংবাদপত্র বাংলায় যুক্তিবাদের প্রসার ও রাজনৈতিক জাগরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) ও তাঁর ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর কার্যকলাপ তৎকালীন বঙ্গসমাজে বিরাট আলোড়ন নিয়ে আসে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রগতিশীল এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু কিছু ছাত্র দেশপ্রেমিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়। একথা সত্য যে ডিরোজিওর শিষ্যবর্গ কোনও সংগঠিত আন্দোলন বা সুনির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদের প্রচলন করতে পারেননি। কিন্তু বাংলায় যুক্তিবাদের প্রসারে তাঁদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ডিরোজিওর শিষ্যরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, চাকরিক্ষেত্রে ভারতীয়দের উচ্চপদে নিয়োগ, মরিশাস দ্বীপে কুলী চালানপ্রথা বন্ধ, জুরি দ্বারা বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন, বর্ণপ্রথার বিলোপসাধন ইত্যাদি

প্রগতিপন্থী দাবি উত্থাপন করে জনমত গঠনে সচেষ্ট হন। এক কথায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিক্ষা ও সাহিত্যে, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে, বিতর্ক ও তর্কালোচনায় এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অভূতপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর কথায়, "বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিতে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরগুপ্তের তিরোভাব, মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ইত্যাদি ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল।"[৭]

এই প্রসঙ্গেই আইনসভা গঠনের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার ব্যাপারে বাংলার কয়েকটি সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক ও আধা-রাজনৈতিক সমিতির অবদান উল্লেখ করতে হয়। তৎকালীন বাংলার শিক্ষিত সমাজের একাংশের মধ্যে প্রগতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণার পশ্চাতে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (১৮২৮) এবং সোসাইটি ফর দ্য অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ (১৮৩৮) প্রভৃতি সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এই সমিতিগুলিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, দেশপ্রেমের প্রয়োজনীয়তা, নারীমুক্তি, সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত তর্ক ও আলোচনা হতো। প্রায় একই সময় প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত জমিদার সভা বা ল্যান্ড হোল্ডারস সোসাইটি ভূম্যধিকারীবর্গের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট ছিল। এদিক দিয়ে খানিকটা পৃথক ছিল ১৮৪৩ সালে উদারনৈতিক ইংরেজ জর্জ টমসনকে সভাপতি এবং প্যারীচাঁদ মিত্রকে সম্পাদক করে গঠিত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি। "ভারতীয়দের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রচার এবং সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণ" সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়। অবশ্য এইসব সমিতির কোনোটিই বাংলার শিক্ষিত সমাজের অবরুদ্ধ বিক্ষোভের নির্গমপথ ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ পুনর্নবীকরণের সময় বিক্ষুব্ধ ভারতীয়রা তাদের দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে আরও প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা সত্ত্বেও বাঙালী ভদ্রজন ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজা রাধাকান্ত দেবকে সভাপতি ও দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সম্পাদক করে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। মূলত গোঁড়া হিন্দু, ধনী জমিদার এবং ব্যবসায়ীরাই ছিলেন এই সমিতির পরিচালক ও সমর্থক। এই অ্যাসোসিয়েশনই ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম রাজনৈতিক সমিতি যা সর্বভারতীয় মনোভাব উন্মেষে সহায়তা করে। এই সমিতির উদ্যোগে

১৮৫৩ সালে ৪৯০০ জনের স্বাক্ষরিত যে "গ্রেট পিটিশন" ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে পেশ করা হয়, ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে একে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে গণ্য করা হয়। ৩৬টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই গণ-আবেদনে আইনসভা গঠনের দাবি সর্বাধিক গুরুত্ব পায়।[৮]

ইতিপূর্বেও ভারতীয়রা আইনসভা গঠন নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন কিন্তু সুসংহত কোনও পরিকল্পনা ছিল না। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বোর্ড অব কন্ট্রোলের কাছে যে স্মারকলিপি দেন তাতে তিনি আইন প্রণয়নের পূর্বে প্রভাবশালী ভারতীয়দের সঙ্গে পরামর্শের সুপারিশ করেন। তবে আইনসভা গঠনের কোন প্রস্তাব রাজা রাখেননি। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের হাতেই ভারতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত রাখা উচিত বলেই রামমোহন মনে করতেন। কারণ যদি "ভারতে কোনও আইন পরিষদ গঠিত হয় তবে সেখানে শাসন ও বিচারবিভাগীয় কর্মচারীরাই প্রাধান্য পাবে, একজন বা দু'জন মনোনীত ভারতীয় প্রতিনিধির অংশগ্রহণ আইন পরিষদের বৈধতা আনতে পারবে না।"[৯] বোম্বাইয়ের "প্রভাকর" পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক গোপালহরি দেশমুখ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগের অভাবই ভারতীয়দের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে বলে বর্ণনা করেন। মহারাণীর কাছে ভারতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুকরণে আইনসভা গঠনের আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, জেলাশাসকের মাধ্যমে জনগণকে প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া উচিত। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সমান সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি সদস্য নিয়ে আইনসভা গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদের ন্যূনতম সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে বলেও তিনি প্রস্তাব দেন।[১০] মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও সমসংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি সদস্য নিয়ে প্রাদেশিক আইনসভা গঠনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়।

আইন পরিষদ গঠনের সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা কিন্তু পাওয়া যায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আবেদনপত্রে। অ্যাসোসিয়েশন আইনসভা গঠনের একান্ত বৈধ দাবি সম্বন্ধে বিদেশী শাসকদের উদাসীনতার বিরুদ্ধে অনুযোগ করে। আবেদনপত্রে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের একত্রীকরণের বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হয় এবং আইনসভাকে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল থেকে পৃথক করার পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়। আবেদনকারীরা এমন এক আইনসভা গঠনের দাবি জানান যাতে ভারতীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত হয়। যেমন আইনসভার সদস্য সংখ্যা যদি ১৭ হয় তবে অন্তত ১২ জন ভারতীয় তাতে যাতে স্থান পান তার সংস্থান রাখার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। একথাও বলা হয় যে, যতদিন পর্যন্ত দেশীয়

জনগণ যথার্থভাবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রয়োগের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়ে না ওঠে ততদিন অবধি গভর্নর জেনারেল বিভিন্ন প্রেসিডেন্সির গভর্নরের পরামর্শানুযায়ী ভারতীয় প্রতিনিধিদের মনোনীত করবেন। এই একই আবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশন ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার দানের জন্য প্রচলিত সনদের সংশোধন দাবি করে।[১১]

কিন্তু ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ আইনে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব তো দূরের কথা, বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রাদেশিক আইনসভা গঠনেরও সংস্থান রাখা হয়নি। কলকাতার ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট সমাজপতিরা ২৯ জুলাই টাউন হলে এক প্রতিবাদসভা আহ্বান করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবে প্রাদেশিক আইনসভা গঠন না করা এবং ভারতীয় সদস্যদের কেন্দ্রীয় আইনসভা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য প্রতিবাদ জানানো হয়। বলা হয়, ভারতীয় মনোভাব যাচাই না করে আইন প্রণয়ন করলে তা এতদ্দেশীয় জনগণের রীতিনীতির বিরুদ্ধেই যাবে এবং সরকারি কাজকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। শেষপর্যন্ত ১৮৬১ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক বিধানসভার সংস্থান রাখা হয় কিন্তু কতজন ভারতীয় আইনসভায় থাকবেন তার কোনও উল্লেখ করা হয় না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লেয়ার্ড সাহেব এক সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করে বলেন, প্রাদেশিক আইনসভায় যেন অন্তত এক-চতুর্থাংশ ভারতীয় রাখা হয়। ভারত সচিব স্যার চার্লস উড এই মর্মে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু আইনে তা সংযোজিত করতে অস্বীকার করেন।[১২] এইভাবেই দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয়রা এক অনিচ্ছুক সরকারের কাছ থেকে প্রাদেশিক আইনসভা গঠনের দাবি আদায় করতে সক্ষম হন।

স্বাভাবিকভাবেই আইনসভার সদস্য মনোনয়নে সরকার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উপর অত্যধিক পরিমাণে নির্ভরশীল ছিলেন। অ্যাসোসিয়েশনের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণবণিক সমাজের গোঁড়া হিন্দু। সদস্যপদের বার্ষিক চাঁদা ছিল ৫০ টাকা। কর্মকর্তাদের শতকরা ৮৫ ভাগ ছিলেন ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের। পেশাগতভাবে এঁরা সরকারি ও বেসরকারি ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এক কথায় তৎকালীন বঙ্গসমাজের এঁরাই ছিলেন সমাজপতি। এঁদের অনেকের কাছেই পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনধারার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সুতরাং, শাসকবর্গের কাছে এই অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে থেকে আইনসভার সদস্য নির্বাচন সবচেয়ে নিরাপদ ছিল। ১৮৬২ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত বাংলার বিধানসভায় যে ৪৯ জন ভারতীয় সদস্য মনোনীত হন তার অর্ধেকের বেশি ছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য। সাধারণ ভারতীয়ের স্বার্থরক্ষায় এঁরা মোটেই সচেষ্ট ছিলেন

না, কিন্তু নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে ন্যূনতম হস্তক্ষেপ হলে এঁরা প্রতিবাদমুখর হতেন। বাংলার আইনসভা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন দলিল থেকে জানা যায়, জমিদারশ্রেণীর স্বার্থ ব্যাহত হয় এমন বিধিবিধানের বিরুদ্ধে কোনও কোনও সময় এঁরা স্পষ্টত শাসকবিরোধী ভূমিকাও নিয়েছেন। এমনকি কৃষ্ণদাস পালের মতো লোক যিনি বিধানসভার কাজকর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং যিনি ছিলেন সাধারণ লোকের অনেক কাছাকাছি তিনিও জমিদারদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন। পরবর্তীকালে বিধানসভা গঠনের অনেক পরিবর্তন হয় কিন্তু প্রথম তিন দশক মোটামুটিভাবে জমিদার, ব্যবসায়ী এবং বশংবদ রাজকর্মচারীরাই বিধানসভায় মনোনীত হতেন। এর ব্যতিক্রমও অবশ্য ছিল, যেমন—মহেন্দ্রলাল সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আমির আলি প্রমুখ বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও প্রথিতযশা আইনবিদরা বিধানসভায় মনোনীত হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ১৮৬২-১৮৯২ এই তিন দশকের মধ্যে প্রাদেশিক বিধানসভাগুলিতে সদস্য মনোনয়নের নীতি, সদস্যদের শ্রেণীগত ও সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা এসে পড়ে। সাধারণভাবে মনে করা হয়, মনোনয়নের ব্যাপারটি ছিল নিতান্ত আকস্মিক, ছোটলাটের খেয়ালখুশি মতো সদস্যরা মনোনীত হতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য ব্যঙ্গ রচনা "মুচিরামের গুড়ের জীবনচরিত" এই ধারণার সমর্থন করে। মুচিরাম গুড় ছিল অশিক্ষিত, ধূর্ত, চতুর, বিবেকবর্জিত ও নীতিজ্ঞানহীন এক বাঙালী অন্ত্যজ। ঊর্ধ্বতন ইউরোপীয় রাজপুরুষদের তোষামোদে তুষ্ট করে সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করে। সরকারি পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে অবৈধ উপায়ে যথেষ্ট অর্থোপার্জনের পর মুচিরাম চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় বসবাস শুরু করে। তারপর "ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে নাম লেখাইয়া বৎসর বৎসর টাকা দিতে লাগিলেন।" ক্রমে বেলভেডিয়ার ও রাজভবনে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, "বাঙ্গাল কৌন্সিলে' একটি পদ খালি হইলে ছোটলাট জমিদার সভার অধিনায়করূপে মুচিরামকে ঐ পদ দিতে স্থির করেন' এবং 'অচিরাৎ অনরেবল বাবু মুচিরাম রায় বাঙাল কৌন্সিলে আসন গ্রহণ করিলেন।"[১৩] বঙ্কিমের এই রচনা কল্পনাপ্রসূত সন্দেহ নেই, কারণ লেফটেন্যান্ট গভর্নররা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে নানাদিক বিবেচনা করেই মনোনয়ন দিতেন। মনোনীত সদস্য রাজশক্তিকে সমর্থন ও সংহত করার ব্যাপারে সহায়ক হবেন কিনা এটাই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হতো। দেশীয় সমাজে প্রার্থীর প্রভাব-প্রতিপত্তি, আর্থিক সঙ্গতি ও দান-দাক্ষিণ্য ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করা হতো। শিক্ষা, পাণ্ডিত্য ও শাসনকার্য এবং আইন বিষয়ে দক্ষতাও মনোনয়ন প্রভাবিত করত। ১৮৬২ সালে বিধানসভায় যে পাঁচজন বাঙালীকে মনোনীত করা হয়, তাঁদের পূর্ববৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

এঁদের মধ্যে রামমোহন পুত্র রমাপ্রসাদ রায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর আইনজ্ঞ হিসাবে খুবই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রমাপ্রসাদ ছিলেন সরকারের লিগ্যাল রিমেমব্রেন্সার। তিনি হাইকোর্টের ভারতীয় বিচারকও নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু অকালমৃত্যুর জন্য ঐ পদে যোগ দিতে পারেননি। প্রসন্নকুমার ঠাকুর আইনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর বার্ষিক আয় ছিল দেড় লক্ষ টাকা। মৌলবী আবদুল লতিফ ছিলেন একজন কৃতী রাজপুরুষ, মহামেডান লিটেরারি সোসাইটির পুরোধা। প্রতাপচাঁদ সিংহ ছিলেন পাইকপাড়ার বিখ্যাত জমিদার। বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন। তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল যথেষ্ট। রামগোপাল ঘোষ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন উদারপন্থী বাঙালী ও প্রখ্যাত বাগ্মী। পাঁচজন সদস্যের মধ্যে প্রসন্নকুমার, প্রতাপচাঁদ ও রামগোপাল ছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সারির নেতা। বাকি দু'জন, আবদুল লতিফ ও রমাপ্রসাদ রাজকর্মচারী। পরবর্তী সময়ে দ্বারভাঙার মহারাজা, উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখার্জী, খিদিরপুরের সত্যশরণ ঘোষাল ও তাঁর পুত্র সত্যানন্দ ঘোষাল, দিগম্বর মিত্র প্রমুখ বিত্তশালী লোকেরা সদস্য মনোনীত হন। খিদিরপুরের ঘোষালরা শুধুমাত্র ভূমিরাজস্ব হিসেবে সরকারকে বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা দিতেন। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন দিগম্বর মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দুর্গাচরণ লাহা, প্যারীচাঁদ মিত্র, অনুকূল চন্দ্র, প্রমথনাথ রায়, ফজল ইমাম, আমির হোসেন প্রমুখ তখনকার দিনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কৃষ্ণদাস পাল, চন্দ্রমাধব ঘোষ, মোহিনীমোহন রায়, মহেন্দ্রলাল সরকার, রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট বঙ্গসন্তানরা আইনসভায় মনোনীত হয়েছিলেন। মনোনীত মুসলমান সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মৌলবী আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮) হুগলী কলেজের কৃতী ছাত্র আমির আলি ইংল্যান্ডে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আসেন। পরে তিনি হাইকোর্টের বিচারক হন এবং কিছুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেন। ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরবর্তীকালে ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে আমির আলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। আবদুল লতিফ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ আমির আলিকে সাহেব-ঘেঁষা, ভারতের মুসলমান জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বঘোষিত মুসলমান নেতা বলে বিদ্রূপ করতেন।

প্রথম তিন দশক বিধানসভায় জমিদারদের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। ইংরেজ রাজপুরুষরা বিধানসভায় ভারতীয় সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেন এই যুক্তি দিয়ে যে এতে জমিদারশ্রেণী ও বাণিজ্যিক গোষ্ঠীই শক্তিশালী হবে। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে (১৮৮৯) এক উদারনৈতিক ইংরেজ অভিযোগ করেন, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস হওয়ার সময় প্রায় সব বেসরকারি

সদস্যই জমিদারশ্রেণীর পক্ষে ছিলেন। দু'একজন অভিজাত ভারতীয়কে পুতুলের মতো বসিয়ে রেখে আইনসভায় সাধারণ ভারতীয়ের স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে না বলে প্রবন্ধে মত প্রকাশ করা হয়।[১৪] তবে বিধানসভার জমিদার সদস্যরা এমনকি রাজা-মহারাজারাও দাবি করতেন তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি, সাধারণের স্বার্থ রক্ষা করাই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁদের বক্তৃতায় প্রায়শই জনগণের কথা, জনসাধারণের সমস্যার কথা উল্লেখ থাকত। কোনও কোনও সময় অবশ্য তাঁদের শ্রেণীস্বার্থ ব্যাহত করে না এমন বিষয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তাঁদের লক্ষ্য ছিল রায়তদের শোষণ করে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা। ইংরেজরা আবার দাবি করতেন সরকারি প্রতিনিধিরাই দেশীয় জনগণের যথার্থ প্রতিনিধি, বেসরকারি সদস্যরা নন। তাঁরা অভিযোগ করতেন, জমিদারশ্রেণী স্থানীয় ও আঞ্চলিক সব প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় এবং জনগণকে শোষণ করার উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করছেন। ছোটলাট জর্জ ক্যাম্পবেল বঙ্গীয় বিধানসভায় যথার্থভাবেই বলেন, "এই সভায় বেসরকারী প্রতিনিধি হিসেবে যাঁদের গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই দেশীয় সমাজেব উচ্চবর্গের প্রতিনিধি। এই ভদ্রজনের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি নিজেকে জনতার প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করতে পারেন।"[১৫]

১৮৯২ সালে ভারত শাসন আইন পাস হওয়ার পর বিধানসভার গঠনের মধ্যেই যথেষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিধানসভায় জমিদারদের প্রতিনিধিত্বও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। কয়েকবারই জমিদাররা সরকারের কাছে এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানান।

সংসদীয় রীতিনীতি ও শৃঙ্খলা মেনে চলার বিষয়েও বাংলার বিধানসভার সুনাম ছিল। ঐ সময়কার কেন্দ্রীয় আইনসভার চেয়ে উন্নতমানের ছিল বাংলার আইনসভা। কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশন তখন হতো কলকাতায়। কেন্দ্রীয় পরিষদে বেসরকারি সদস্যদের মধ্যে অনুপস্থিতির হার ছিল অত্যন্ত বেশি, বাংলায় তা প্রায় ছিলই না। বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্যদের গুণগত যোগ্যতাও ছিল অনেক বেশি। বিধানসভার বেসরকারি সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বনামধন্য ব্যক্তি। সকলেই ছিলেন শিক্ষিত, কয়েকজন ছিলেন অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী। কেন্দ্রীয় সংসদে এমন বেসরকারি সদস্যও ছিলেন যাঁরা শুধুমাত্র আসন অলংকৃত করেই থাকতেন, আইনসভার কাজকর্মে অংশ নিতেন না। মাদ্রাজের 'দি হিন্দু' পত্রিকার এক সংবাদে জানা যায় (জানুয়ারি ৯, ১৮৮৫), জনৈক ভারতীয় সদস্য অধিকাংশ সময় নজর রাখতেন বড়লাট ও ইউরোপীয় সদস্যদের দিকে। ভোটের সময় বড়লাটের দিকে লক্ষ্য রেখেই বড়লাটের অনুকরণে তিনি হাত তুলতেন এবং হাত নামাতেন।[১৬] কেন্দ্রীয় পরিষদের আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক ছিল নিম্নমানের। বাংলার বিধানসভার

অধিবেশন বসত নিয়মিতভাবে প্রতি শনিবার ১১টায়। প্রথম বছর (১৮৬২) অধিবেশন হয় ১৯টি, পরের বছর ১৬ এবং ১৯৬৪ সালে ১৭টি। ১৮৯৩ সাল থেকে অধিবেশনের সংখ্যা কমতে থাকে। সর্বনিম্ন অধিবেশন হয় ১৯০১ সালে, মাত্র ২টি। বিধানসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতেন ছোটলাট, তাঁর অনুপস্থিতিতে অ্যাডভোকেট জেনারেল (১৯২১ থেকে আলাদা সভাপতি)। সাধারণত আইন প্রণয়নের জন্য বিল উত্থাপন করতেন সরকারি সদস্যরা তবে বেসরকারি সদস্যরাও প্রস্তাব আনতে পারতেন। ১৮৮১ সালে ছোটলাট কলকাতা পৌরসংস্থা (সংশোধনী) বিলটির দায়িত্ব দেন কৃষ্ণদাস পালকে। কৃষ্ণদাস বিলটি বিধানসভায় পেশ করেন, সমালোচনার উত্তর দেন এবং তার জবাবী ভাষণের পর বিধানসভা বিলটি গ্রহণ করে। বেসরকারি সদস্যরা বক্তৃতায় অগ্রাধিকার পেতেন। সদস্যরা লিখিত বক্তব্য পাঠ করতেন না, তবে প্রয়োজনে 'নোট'-এর সাহায্য নিতেন।

লক্ষণীয়, ঐ সময় সরকারি সদস্যরা মতপ্রকাশ ও ভোটদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতেন। ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা ভোটদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব পেত। অনেক সময়ই সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিতেন। এশলি এডেন, যিনি পরবর্তীকালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর হয়েছিলেন, লবণ-কর বসানোর পক্ষপাতী ছিলেন। ছোটলাট উইলিয়াম গ্রে এই করের বিরোধী ছিলেন। এডেন কিন্তু নতিস্বীকার করেননি এবং শেষ পর্যন্ত বিলের বিরুদ্ধেই তিনি মত দিয়েছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা পৌরসংস্থা বিল নিয়ে আলোচনার সময় ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল পৌরসভায় তিন-চতুর্থাংশ নির্বাচিত সদস্য গ্রহণের প্রস্তাব করেন। বেসরকারি সদস্যরা স্যার টেম্পলকে সমর্থন করেন। কিন্তু সরকারি সদস্যরা প্রায় সকলেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সরকারি সদস্যদের বিরোধিতার জন্য শেষ পর্যন্ত ভোটে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। রমেশচন্দ্র দত্ত ও স্যার হেনরি কটন প্রমুখ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা অনেক সময় বিধানসভায় সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। সরকারি কর্মচারীরা ঐ সময় রাজনৈতিক দলের সভায় যোগ দিতে পারতেন, কোনও বাধা ছিল না। ১৮৯২-র পর সরকারি সদস্যদের এই স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্ব করা হয় এবং কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা প্রবর্তন করা হয়। এরপর থেকে সরকারি সদস্যরা সরাসরি সরকারের সমালোচনা থেকে বিরত থাকেন।

বিধানসভার কমিটি ব্যবস্থা এখনকার মতো এত সুবিন্যস্ত না হলেও সিলেক্ট কমিটি ঐ সময় খুবই গুরুত্ব পেত। প্রায় সব বিলই সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো হতো। সিলেক্ট কমিটির সুপারিশে বিল প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে এমন বেশ কিছু নজির আছে। ভারতীয় সদস্যরাও সিলেক্ট কমিটিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন। এইভাবেই প্রথম তিন দশকে বাংলার বিধানসভায় সংসদীয় রীতিনীতির একটি

প্রারম্ভিক কাঠামোর প্রচলন হয়।

আলোচ্য পর্বে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও বিধানসভা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। বর্তমানে আইনসভার কাজকর্ম নানাদিকে প্রসারিত। আইন প্রণয়নে আইনসভার এক-চতুর্থাংশ সময়ও এখন ব্যয় হয় না। কিন্তু প্রথম দিকে আইন প্রণয়নই ছিল বিধানসভার প্রধান কাজ। ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় অভিজাতদের একটা অভিযোগ ছিল যে দেশকে আইন এবং করভারে ইংরেজরা জর্জরিত করে তুলেছেন।[১৭] বঙ্গীয় বিধানসভার প্রায় প্রতি অধিবেশনে আইন প্রণয়নের নতুন নতুন প্রস্তাব আনতেন সরকারি এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভারতীয় সদস্যরা। ভারতে ইংরেজ রাজশক্তির সামাজিক ভিত্তি সংহত করাই ছিল আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পরিষদীয় বিতর্ক ও আলোচনায় তৎকালীন সামাজিক সমস্যা ও সংঘাত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এইসব আইন ভারতীয় সমাজজীবনে নানা পরিবর্তনের সূচনা করে এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতির গতি নির্দেশ করতে সক্ষম হয়।

প্রথম বছর আইন প্রণয়নের যে সমস্ত প্রস্তাব বিধানসভায় পেশ করা হয় তার মধ্যে কলকাতা ও শহরতলির যানবাহন সমস্যা, আসামের চা-বাগিচার কুলিদের দুরবস্থা, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন, কলকাতা কর্পোরেশন, গ্রামবাসীর উপর পাইকারি হারে জরিমানা ধার্য ইত্যাদি বিল উল্লেখ্য। কলকাতার যানবাহন ব্যবস্থা এখনকার মতো তখনও সমস্যাসংকুল ছিল। কলকাতা ও শহরতলির যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে মৌলবী আবদুল লতিফ ১২ এপ্রিল, ১৮৬২ পরিষদে এক বিল উত্থাপন করেন।[১৮] তদানীন্তন লন্ডন শহরের যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কিত ইংলিশ ক্যারেজ আইনের অনুকরণে বিলটি রচিত হয়। আইনসভায় বিলটি পেশ করে আবদুল লতিফ বলেন, কলকাতার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতির পাশাপাশি যানবাহন সমস্যা নাগরিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ঘোড়ার গাড়ি ও পালকি মালিকদের দুর্ব্যবহার ও যথেচ্ছহারে ভাড়া নেওয়ার বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে, তিনি তারও উল্লেখ করেন। কোনও কোনও সদস্য অবশ্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত যানবাহন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করার পক্ষে ওকালতি করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরাও বিলের যৌক্তিকতা মেনে নেন। বিলে এক মাইল পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ির আট আনা, তৃতীয় শ্রেণীর তিন আনা ও পালকির তিন আনা ভাড়া ধার্য করা হয়। নির্ধারিত ভাড়া নিয়ে প্রচুর বাগবিতণ্ডা হয়। বিলটি শেষ পর্যন্ত সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। দুই বছর বিলটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলে এবং বিল নিয়ে ভোটে অনেকবারই পরিষদে ডিভিসন বা বিভাজন হয়। বিলটি ৯ জানুয়ারি, ১৮৬৪ আইনে পরিণত হয় কিন্তু কলকাতার

যানবাহন সমস্যার তাতে কোন বিশেষ সুরাহা হয় না। ২৭ বছর পর কলকাতার যানবাহন ব্যবস্থা নিয়মিত করা এবং গাড়ির মালিকদের মর্জিমাফিক ভাড়ার দাবিকে নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে চিফ সেক্রেটারি (পরবর্তীকালে কংগ্রেস সভাপতি) হেনরি কটন একটি বিল আনেন। বিলটির প্রস্তাবনাকালে কটন বলেন, কলকাতার যানবাহন ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াতে জনসাধারণের ভোগান্তি চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। ১৮৯১ সালে এই আইনটি পাস হয় কিন্তু তাতেও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি হয় অতি সামান্য এবং সমস্যাও প্রায় পূর্বের মতো তীব্র থেকে যায়।

১৮৬৩ সালে চা-বাগানের কুলিদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপন করেন স্যার এশলি এডেন। ঐ সময় পূর্ব ভারতে চা-শিল্পের অত্যন্ত দ্রুত প্রসার ঘটেছিল। এই শিল্পে ইংরেজদের অধিকার ছিল একচেটিয়া। স্থানীয় শ্রমিকদের সরবরাহও ছিল অতি সামান্য, ফলে বাংলা ও বিহার থেকে শ্রমিক রপ্তানি করা হতো সিলেট ও কাছাড়ের বিভিন্ন চা বাগানে। কুলি সংগ্রহের ভার ছিল অর্থগৃধ্নু দালালদের হাতে। তারা কুলিদের প্রতি অমানবিক ও নিষ্ঠুর ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। বেশ কিছু কুলির যাত্রাপথেই মৃত্যু হতো। বিলটি উত্থাপন ক'রে এশলি এডেন বলেন, "কুলি সংগ্রহের পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ, চুক্তিব শর্তাবলী কুলিস্বার্থ-বিরোধী ও মারাত্মক এবং কুলিদের কর্মস্থলে প্রেরণের ব্যবস্থা ভয়াবহ। যাতায়াতের পথে কুলিদের মৃত্যুহার ছিল অস্বাভাবিক। এমনকি কোনও কোনও ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ।"[১৯] এডেন আরও বলেন, বহুসংখ্যক কুলিকে গাদাগাদি করে জাহাজে পাঠানো হয়, খাওয়ার জন্য দেওয়া হয় কাঁচা খাদ্য। অসুস্থ হলে চিকিৎসার দায়িত্ব ছিল চাপরাশিদের উপর, যারা ওষুধের ব্যবহার বিষয়ে তাদের রোগীদের মতোই ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। চা-কর এবং দালালদের কাছে এই কুলি সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল ব্যবসায়িক লেনদেন মাত্র। "জীবিত মানুষগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছনোর এবং মৃতদেহের মূল্য মিটিয়ে দেওয়া হলেই সকল পক্ষই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে বলে ধরে নিত।" সরকারপক্ষ থেকে এই বিলে চা-কর, দালাল ও কুলি, তিন পক্ষের স্বার্থই রক্ষিত হবে বলে দাবি করা হয়। বিলে দালাল ও নিয়োগকারীদের নিয়ন্ত্রণ ও লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন, ডাক্তারদের দ্বারা কুলিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং কুলি বহনকারী স্টিমার ও নৌকার লাইসেন্স দান ইত্যাদি ব্যবস্থার সংস্থান রাখা হয়। প্রত্যেকটি কুলিদলের সঙ্গে কিছু সংখ্যক মহিলা পাঠানোরও নির্দেশ দেওয়া হয় বিলে।

চা-কর গোষ্ঠী বিলটির তীব্র বিরোধিতা করে। এমনকি ভারতীয়দের সংগঠন জমিদার সমিতিও (ল্যান্ড হোল্ডারস্ অ্যাসোসিয়েশন) এই বিলের প্রতিবাদ করে। বিলটির প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়ে বড়লাটের কাছে প্রতিনিধিও প্রেরণ করা হয়।

এই প্রচেষ্টা বিফল হলে চা-কর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা বিলটির সাময়িক স্থগিতকরণ দাবি করে। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে দৃঢ় থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত চা-কর, দালাল ও জমিদারদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিলটি আইনে পরিণত হয়।

বিধানসভা ভূমি সমস্যা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। ভূমি সংক্রান্ত জটিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার প্রাদেশিক আইনসভার আছে কিনা এ নিয়েও পরিষদে আলোচনা হয়। ইতিপূর্বে ১৮৫৯ সালে কেন্দ্রীয় সংসদ থেকে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়। কিন্তু বাংলার ভূমি সমস্যার প্রতিকারকল্পে ঐ আইনের সংশোধন করে একটি বিল ১৮৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই আইনসভায় উত্থাপিত হয়। জমিদার ও চা-করদের স্বার্থরক্ষা করাই ছিল এই বিলের উদ্দেশ্য। পরবর্তী সময়ে ১৮৭৮ সালে ভূমি রাজস্ব বিষয়ে কিছু কিছু সংশোধনের সুপারিশ করে কৃষ্ণদাস পাল পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সরকার প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানান কারণ বিল উত্থাপিত হয়েছে "পরিষদের এমন একজন সম্মানিত সদস্যের কাছ থেকে যিনি জমিদার শ্রেণীর আস্থাভাজন, আবার রায়তদের অধিকার রক্ষায়ও যিনি সচেষ্ট।" বিলটি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি কারণ ভূস্বামী সম্প্রদায় আগাগোড়া বিলটির বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু কৃষক বিক্ষোভ এবং বিশেষ করে ১৮৭৩-এর পাবনার কৃষক বিদ্রোহ, ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকারকে সচেতন করে তোলে। ১৮৭১-১৮৭৬-এর বাংলা সরকারের শাসনসংক্রান্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, জমিদারদের বে-আইনী কর আদায় এবং তার বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কৃষক বিক্ষোভের বিস্ফোরণ যেকোনও সময় ঘটতে পারে বলে সরকারি মহলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। এই পরিস্থিতিতে সরকার বোর্ড অব রেভিনিউ-র সদস্য ড্যাম্পিয়ারের নেতৃত্বে ১৮৭৯ সালে বেঙ্গল অ্যান্ড বিহার রেন্ট কমিশন গঠন করেন। ড্যাম্পিয়ার কমিশন যথেষ্ট পরিশ্রম করেন এবং অজস্র তথ্য সংগ্রহ করে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই ১৮৮৫ সালে কেন্দ্রীয় সংসদে বেঙ্গল টেনান্সি বিল পাস হয়।

বিধানসভা প্রণীত বিভিন্ন আইনের মধ্যে বাংলার পৌরশাসন ব্যবস্থার বিবর্তন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। পৌর আইন প্রণয়নের বিভিন্ন স্তরে যে আলোচনা, বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত হয় তার মধ্যে ভারতবাসীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা ও ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত এই পৌর সংস্থাগুলি থেকেই পরবর্তীকালে অনেক প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতার আত্মপ্রকাশ ঘটে। পৌর বিলের আলোচনায় ভারতীয় সদস্যরা অংশ নিয়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাব এনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। ১৬ মে, ১৮৬৩ কলকাতার পৌরসভা সংক্রান্ত একটি

সুসংবদ্ধ আইন প্রণয়নের প্রস্তাব আনেন স্যার এশলি এডেন। বিলে সরকারি, বেসরকারি, ইউরোপীয় ও দেশীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটি পরিচালকমণ্ডলীর উপর পৌরসভার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এক অভিজ্ঞ উচ্চবেতন-ভোগী সরকারি কর্মচারী, যিনি তাঁর সম্পূর্ণ সময় ও শক্তি পৌরসভার কাজে নিয়োজিত করবেন, এই পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে কাজ করবেন বলে বিলে প্রস্তাব করা হয়। ১৮৬৫ সালে একটি সংশোধনী মারফত পরিচালকমণ্ডলীতে ইউরোপীয়দের সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৮৭১-এর সংশোধনে এই সংখ্যা আবার হ্রাস করা হয়। ১৮৭৬ সালে স্টুয়ার্ট হগ একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ ক'রে বলেন, সংশোধনটি খুবই নগণ্য এবং এতে মতদ্বৈধতার কোন সুযোগ হবে না বলে তাঁর বিশ্বাস। সংশোধনীতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল না করে বরং আরও জোরালো করা হয়। বিধানসভার বিতর্কে বিলটি নিয়ে অনেক তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং কয়েকবার ডিভিসন বা বিভাজন দাবি করা হয়। শেষ পর্যন্ত বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। সিলেক্ট কমিটিতে বেশ কিছু স্মারকলিপি ভারতীয়দের পক্ষ থেকে পেশ করা হয় মূলত দু'টি দাবি জানিয়ে। এই দাবি দু'টি ছিল (১) পৌরসভায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস এবং (২) নির্বাচন নীতির প্রচলন। কৃষ্ণদাস পাল এই দু'টি দাবির পক্ষে বিধানসভায় জোরালো বক্তব্য রাখেন। কলকাতায় পৌরসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্থার দায়িত্ব একজন বেতনভোগী সরকারি কর্মচারীর ওপর অর্পণ করে সরকার স্বায়ত্তশাসনের মূলনীতি লঙ্ঘন করেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দৈনিক জল সরবরাহের সময়সীমা সতেরো ঘণ্টা থেকে কমিয়ে তিন ঘণ্টায় আনার এবং ছয় শতাংশ জলকর বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। কৃষ্ণদাস পালের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা ইউরোপীয় সদস্যদের মনে রেখাপাত করে। ডব্লিউ ব্রুকস নামে একজন বেসরকারি ইউরোপীয় সদস্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, তিনি কৃষ্ণদাস পালের বাগ্মিতায় প্রভাবিত হয়েছেন। বিলের বিরুদ্ধে তিনি যে সব যুক্তি দিয়েছেন তার যথার্থ ভিত্তি আছে বলে ব্রুকস স্বীকার করেন। প্রস্তাবের পক্ষে ৮টি ও বিরুদ্ধে তিনটি ভোট পড়ে। বিপক্ষে যাঁরা ভোট দেন তাদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল, নবাব আসগর আলি ও ডব্লিউ ব্রুকস। ১৮৮১ সালে আবার আইনটি সংশোধিত হয়। এবার সংশোধনী প্রস্তাব আনেন স্বয়ং কৃষ্ণদাস পাল। বিলে কলকাতার বস্তি উন্নয়ন, ওষুধের দোকান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারা যুক্ত হয়। বিলটি বিনা বিরোধিতায় পাস হয়।

বাংলাদেশে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রসারের উদ্দেশ্যে পরিষদে আরও বেশ কয়েকটি আইন প্রণীত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলির মধ্যে ছিল মফস্বল পৌরসভা আইন (১৮৭২), বঙ্গীয় পৌরসভা আইন (১৮৮৪) বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন (১৮৮৫), মফস্বল পৌরসভা সংশোধনী আইন (১৮৮৬) ইত্যাদি। ১৮৮৮ সালে ছোটলাট স্যার

স্টুয়ার্ট ক্যালভিন ব্রেইলির উদ্যোগে আনীত একটি বিলে কলকাতা ও বিভিন্ন পৌরসভাকে একই আইনের অধীনে আনার প্রস্তাব করা হয়। এই বিল নিয়ে পুনরায় পরিষদে তীব্র বিতর্ক এবং শাসক ও ভারতীয়দের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের সূচনা হয়। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, কালীনাথ মিত্র প্রমুখ মনোনীত সদস্যরা বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন। ছোটলাট বিজিত পক্ষের বাগ্মিতা, শিষ্টতা ও ঐকান্তিকতার প্রশংসা করেও বিলটির সপক্ষে ওকালতি করেন এবং শেষ পর্যন্ত বিলটি আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে ম্যাকেঞ্জি বিলে (১৮৯৮) কলকাতা পৌরসভার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় করা হয়। ভারতীয়দের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিলটি পাস হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে হুমকি দিয়ে ঘোষণা করেন, ভারতীয়রা সামান্যতম সুযোগ পেলেই বিলটিকে বাতিল করবে। তিনি কথা রেখেছিলেন। ১৯২১ সালে স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের মন্ত্রিত্ব লাভের পর তাঁর উদ্যোগে কলকাতা পৌরসভা আইন পাস হয়। এর ফলে পৌরশাসন ব্যবস্থার আংশিক গণতন্ত্রীকরণ সম্ভব হয়।

১৮৬২ সালে গ্রামবাসীদের উপর পাইকারি হারে জরিমানা ধার্য করে একটি বিল পরিষদে উত্থাপন করেন স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ ফারগুসন।[২০] বিলটির উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মানুষকে যথোচিত শিক্ষা দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যে রাজপুরুষদের আদেশ মান্য করা এবং ম্যাজিস্ট্রেট এবং আইন শৃঙ্খলায় রত অফিসারদের সাহায্য করা তাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আইনসভার কার্যবিবরণীতে দেখা যায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায় দু'জনেই এই আইনকে সমর্থন করেন। লক্ষণীয়, অপর মনোনীত ভারতীয় সদস্য মৌলবী আবদুল লতিফ এই বিলটির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, নির্বিচারে এই শাস্তির ব্যবস্থা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা এবং জমিদার ও নীলকরদের নিষ্ঠুর অপকর্মকে ঢেকে রাখতেই সাহায্য করবে।

পুলিশ বিভাগ নিয়ে চিরকালই সরকারের সমস্যা। পুলিশি ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিতকরণের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর কলকাতা ও শহরতলির পুলিশ আইন পাস করা হয় ১৮৬৬ সালে। এরপর পুলিশ বিভাগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস হয় ১৮৯৫ সালে। প্রস্তাবটি আনেন স্যার জন ল্যামবার্ট। ঐ সময়ে শহরের উত্তরাঞ্চলে বারাঙ্গনাদের ব্যবসায়িক তৎপরতার দরুন ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছিল। প্রকাশ্য রাজপথে বারাঙ্গনা এবং তাদের দালালরা পথচারীদের বিব্রত করছে বলে অভিযোগ করা হয়। রমেশচন্দ্র মিত্র ও বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় সদস্যের নেতৃত্বে গঠিত সোস্যাল পিউরিটি কমিটি এ বিষয়ে সরকারকে যথোচিত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান। বিলটিতে অধস্তন পুলিশ কর্মচারীদের অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন

ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিরা বিলটির বিরোধিতা করেন। সামাজিক শুদ্ধতা ও নৈতিকতার যুক্তি মেনে নিয়েও তাঁদের মনে হয় পুলিশের হাতে এত অধিক ক্ষমতা দানের ফলে এর অপব্যবহার অনিবার্য এবং তার শিকার হবেন সাধারণ নাগরিক। রমেশচন্দ্র দত্ত বিলটি সমর্থন করেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ও লালমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ ওজস্বিনী বক্তৃতার ফলে বিলটির বেশকিছু সংশোধন করা হয়। অ্যাডভোকেট জেনারেল চার্লস পল ভারতীয় সদস্যদের বাগ্মিতার প্রশংসা করেও বিলের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে পরিষদে জোরালো বক্তব্য রাখেন। এই বিল নিয়ে পরিষদে অনেকবার ডিভিসন হয়। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সংশোধন সহ বিলটি পাস হয়। প্রস্তাবক ল্যামবার্ট দুঃখ করে বলেন, বিলটি কাম্য ফলাফল লাভে ব্যর্থ হবে এবং তা কার্যকরী হবে কিনা, এ বিষয়েও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিলটি পুলিশের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা অর্পণের প্রথম সফল ভারতীয় প্রতিবাদ বলে দাবি করা হয়।

সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে আইন প্রণয়ন প্রারম্ভিক যুগে বঙ্গীয় পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। ঊনবিংশ শতকে বাংলায় ব্যাপকহারে জুয়াখেলার প্রচলন ছিল। ছোট ও বড় শহরে, শহরতলি এলাকায়, রেলস্টেশনে, এমনকি গ্রামাঞ্চলে এবং মেলায়ও প্রকাশ্যে ও গোপনে জুয়াখেলা চলত। ১৮৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে স্যার এশলি এডেন জুয়াখেলা নিয়ন্ত্রণ ও এর প্ররোচকদের শাস্তিদানের জন্য একটি বিল পরিষদে উত্থাপন করেন।[২১] বিলটি সমর্থন করে সদস্যরা বলেন, শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করে জুয়াখেলা বন্ধ করা যাবে না, কলকাতায় বড়বাজার অঞ্চলে জুয়াখেলার পিছনে প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা আছে বলে সদস্যরা অভিযোগ করেন। বিলটি বিনা বাধায় পাস হয়।

রোগ প্রতিষেধক হিসাবে টিকা দেওয়া বাধ্যতামূলক করে কৃষ্ণদাস পাল একটি বিল পরিষদে আনেন ১৮৮০ সালে। সাধারণভাবে টিকা দেওয়ার ব্যাপারে তখনও জনসাধারণের মধ্যে প্রবল অনীহা ছিল। রাজা রাধাকান্ত দেব টিকা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে বিশেষ সচেষ্ট হন। কিন্তু কলকাতার জনসমাজের একটি বৃহদাংশ টিকা দেওয়ার বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। রোগপ্রতিষেধক বিলটি পরিষদে পেশ ক'রে কৃষ্ণদাস পাল বলেন, মহামারীর সময় কলকাতার কাঁসারী সম্প্রদায়ের লোককে সর্ববিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও টিকা দিতে রাজি করান যায়নি। বক্তৃতায় তিনি বলেন, "মহামারীর সময় প্রায় কোন পরিবারই শোকচ্ছায়ামুক্ত থাকেনি। একই পরিবারের একটি দু'টি তিনটি করে ছোট ছোট সুন্দর শিশুকে মায়ের কোল থেকে মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়েছে, তবুও সংস্কারের বাঁধ ভাঙেনি।" এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সরকারি প্রয়াসকে সদস্যরা সাধুবাদ জানান এবং বিলটি বিনা বিরোধিতায় পাস হয়। কিন্তু শহরের জোড়াসাঁকো এলাকায় বসবাসকারী মাড়োয়ারী ও ভিন প্রদেশ থেকে

আগত মানুষের মধ্যে টিকা গ্রহণের প্রবল আপত্তির জন্য ১৮৮৬ সালে আইনটিকে আবার সংশোধন করতে হয়, কিন্তু তাতেও টিকা দেওয়া সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সচেষ্ট করে তুলতে সরকারি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

তৎকালীন সমাজে প্রচলিত কিছু অমানবিক আচার অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম নিষিদ্ধ করার বিষয়েও আইনসভা তৎপর ছিল। চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক পূজায় কাঁটাবিদ্ধ হয়ে ঘোরার প্রথা বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল। কলকাতার মিশনারি কনফারেন্স থেকে এই প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভার কাছে আবেদন জানানো হয়। আবেদনটি ভারত সচিবের কাছে পাঠানো হয় কিন্তু অনুমোদিত হয়নি। এরপর ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে খিদিরপুরের জমিদার ও বিধানসভার সদস্য সত্যশরণ ঘোষাল চড়ক পূজায় কাঁটায় ঘোরা নিষিদ্ধ করে পরিষদের সামনে একটি বিল আনেন।"[২২] বিলটি পেশ ক'রে তিনি বলেন, হিন্দুশাস্ত্রের ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা থেকেই এই অমানবিক প্রথার উৎপত্তি। হিন্দুশাস্ত্রে যে কাঁটায় ঘোরা নিষিদ্ধ তার প্রমাণ হিসেবে তিনি সংস্কৃত শ্লোক থেকে উদ্ধৃতি দেন। কিন্তু কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত লাগতে পারে এমন কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়নে সরকার খুবই সতর্ক ছিলেন। ইউরোপীয় সদস্যরা এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেও হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগবে এমন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তাঁরা সঙ্গত মনে করেননি। রাজা দিগম্বর মিত্র এই প্রথাকে বর্বরোচিত আখ্যা দিলেও আইন দিয়ে তা নিষিদ্ধ করার বিরোধী ছিলেন। ছোটলাট স্যার সিসিল বিডন প্রস্তাবকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, যেহেতু বিষয়টি স্পর্শকাতর এবং এটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে, সেজন্য প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করার জন্য তিনি প্রস্তাবককে অনুরোধ করেন। শ্রী ঘোষাল অনন্যোপায় হয়ে এবং "জ্ঞাপিত অনুরোধ উপরোধ" মেনে নিয়ে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেন।

১৮৬২-৯২ পর্বে বিদেশী শাসকদের দ্বারা আরোপিত নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যেই বাংলার বিধানসভায় বিভিন্ন আইনকানুন রচিত হয়েছিল। সময় সময় এই গন্ডির সীমা ছাড়িয়ে জনজীবনের পক্ষে কল্যাণকর দুই একটি আইনও এই পর্বে বিধানসভায় পাস হয়েছে। অত্যুক্তি হলেও শাসকবর্গের আত্মতুষ্টির পরিচয় মেলে প্রথম ৩০ বছরের আইনসভার কাজকর্মের পর্যালোচনা করে ছোটলাট স্যার প্যাট্রিক ম্যাকডোনাল যখন বলেন, "বাংলার আইনসভার দীর্ঘ তালিকায় এমন একটি আইনও পাওয়া যাবে না যা জনগণের প্রয়োজন ব্যতিরেকে অথবা জনগণের প্রতি কর্তব্যসাধনের উদ্দেশ্য ভিন্ন প্রণীত হয়েছে।"[২৩] শাসকরা অবশ্য "কর্তব্যসাধনের উদ্দেশ্যে" পাইকারি হারে শাস্তিদান ও অন্যান্য দমনমূলক ব্যবস্থাকে বিধিসঙ্গত করার মতো অনেক আইন পাস করিয়েছেন। বিধানসভাকে রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করার যে নীতি শাসকরা নিয়েছিলেন তা সফল হয়।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় বিধানসভার রাজনীতি ছিল প্রধানত, এমনকি কেবলমাত্র উচ্চবর্গের প্রভুবন্দনার রাজনীতি। এই প্রভুবন্দনার নিদর্শন পাওয়া যায় বঙ্গীয় বিধানসভার প্রথম চারজন ভারতীয় সদস্যের অন্যতম প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বক্তব্যে, "আমরা একবাক্যে তারস্বরে জানিয়ে দিতে চাই হিন্দু শাসন নয়, অন্য কোনও শাসন নয়, একমাত্র ইংরেজ শাসনকেই আমরা স্বীকার করি, স্বাগত জানাই।" প্রথম কয়েক দশক আইনসভার ভারতীয় সদস্যদের রাজানুগত্যে কোনও ঘাটতি ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আনুগত্য তাঁবেদারিতে রূপ নেয়। কিন্তু বিদেশী শাসকদের আরোপিত বিধি-বিধান ও নিষেধ ক্রমশ ভারতীয়দের প্রতিবাদী করে তোলে, বিধানসভাও ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে সক্রিয় বিধানসভা (১৮৯২-১৯২০)

প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধ

১৮৯২ সালের ভারতশাসন আইন এবং পরবর্তী ১৯০৯-এর মর্লে-মিন্টো সংস্কার বঙ্গীয় বিধানসভার বিবর্তনে এক বিশেষ ভূমিকা নেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঔপনিবেশিক আমলে ভারতের সাংবিধানিক বিকাশ মূলত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রথমত, ভারত সম্বন্ধীয় নীতি ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, শিক্ষিত বৃত্তিজীবী ভারতীয়দের আন্দোলন, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সক্রিয়তা ও জাতীয় আন্দোলনের প্রসারিত ভিত্তি বিভিন্ন সময় অনিচ্ছুক শাসকদের সংস্কার ঘোষণায় বাধ্য করেছিল। তৃতীয়ত, স্বতঃস্ফূর্ত এবং সংগঠিত এই দুই ধরনের কৃষক ও নিম্নবর্গের মানুষের অভ্যুত্থান এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে সংগঠিত শ্রমিক বিক্ষোভ ইংরেজদের ভারতনীতি নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছিল। শাসকরা কখনও এই শেষোক্ত উপাদানের স্বীকৃতি দেননি ; দুঃখের বিষয় জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব, এমনকি ইতিহাসবিদদের বক্তব্যেও এর যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। সম্প্রতি অবশ্য মার্কসবাদী গবেষক এবং ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে নিম্নবর্গের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনারত সমাজবিজ্ঞানীদের বক্তব্যে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক শক্তির টানাপড়েন যে আইনসভার ক্রমবিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল প্রখ্যাত ইংরেজ গবেষক মরিস জেনস তা স্বীকার করেছেন।[১] ভারতীয়রাও এ বিষয়ে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। ১৮৮০ সালে ইংলন্ডে সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন লিবারেল দলকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে এক আবেদন প্রচার করে এবং ঐ দলকে সাহায্য করার জন্য তরুণ ব্যারিস্টার ও সুবক্তা লালমোহন ঘোষকে ইংল্যান্ডে পাঠায়।[২] এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হয় প্রথমদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক পুঁজিরই প্রাধান্য ছিল। বণিক স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে কোম্পানি ভারতে সর্বাধিক মুনাফা ও অবাধ লুণ্ঠনের নীতি গ্রহণ করে। লর্ড নর্থ ও লর্ড পিট্‌সের ভারতশাসন আইন (১৭৭৩ ও ১৭৮৪) ইংলন্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থের রাজনৈতিক ক্ষমতা বহুলাংশে খর্ব করে। এই আইনগুলির বিরুদ্ধে তেরজন পিয়ার্সের প্রতিবাদ ঐ সময় ইংলন্ডে তুমুল ঝড় তোলে। পরবর্তী স্তরে

শিল্পপুঁজি বিকাশের ফলে ১৮১৩ সালের সনদে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়িক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, অবাধ লুণ্ঠন ও বিভেদনীতি শুধু বজায়ই থাকেনি, বরঞ্চ আরও নগ্নরূপে প্রকাশ পায় রাণীর ঘোষণাপত্র থেকে (১৮৫৮)। মাঝে মধ্যে বিশ বা তিরিশ বছর অন্তর শাসন সংস্কার নীতি ঘোষণা করে "স্বাধীন ও পক্ষপাতহীনভাবে" ভারতীয়দের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার প্রতিশ্রুতি, প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা ও স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশ্বাস, এমনকি ক্ষমতা হস্তান্তরের কথাও বলা হয়। এইসব "শূন্যগর্ভ অত্যুক্তি" সম্বন্ধে শাসকরা নিজেরাই সমালোচনামুখর ছিলেন। এমনকি ভাইসরয় লর্ড লিটনকেও বলতে হয়েছে, এইসব প্রতিশ্রুতি শুনতে ভাল কিন্তু তা ভারতীয়দের হৃদয় স্পর্শ করে না।[৩]

লক্ষণীয়, আইনসভার ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৯২-১৯২০) বৃত্তিজীবী শিক্ষিত ভারতীয়দের আন্দোলন, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্মোদ্যোগ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। রামমোহন প্রদর্শিত নিয়মতান্ত্রিক ধারা অনুসরণ করে ভারতে সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ থেকেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে একই রাষ্ট্রীয় চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরজি, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রমুখ নরমপন্থীদের কার্যকলাপ ভারতীয় রাজনীতিকে বিশেষরূপে সচল করে তোলে। আধা-রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ঐ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করে। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলার জনগণের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অভিজাতসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ১৮৭৫ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ ইন্ডিয়ান লিগ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই লিগও হয় স্বল্পায়ু। ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে তৎকালীন ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতির প্রবল তরঙ্গ বলে অভিহিত করা হয়েছে। সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, পুনা সার্বজনিক সভা ও মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন সোচ্চার দাবি তোলে। এই পর্বে ১৮৮৫ সালের পরবর্তীকালের ভারতীয় রাজনীতির মুখ্য নিয়ন্ত্রক ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রিটিশ শাসকরা চেয়েছিলেন ক্রমবর্ধমান গণবিক্ষোভ ও ব্রিটিশবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করতে। কিন্তু শীঘ্রই কংগ্রেস হয়ে

দাঁড়ায় সমগ্র জাতির যথার্থ সংগঠিত মুখপাত্র। জাতীয় সংগ্রামের গণআন্দোলনমুখী ধারা কংগ্রেসকে এগিয়ে নিয়ে চলে।[৪]

বিধানসভার বিবর্তনের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। মাৎসিনির আদর্শে অনুপ্রাণিত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কর্মসূচীতে সমগ্র ভারতীয়দের এক সাধারণ মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস প্রাধান্য পায়। ভারতীয় জনগণকে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত করা ছাড়াও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল জনমত গঠন, একই রাজনৈতিক স্বার্থ ও আদর্শের ভিত্তিতে ভারতীয় জনগণের ঐক্যসাধন, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবের প্রসার ইত্যাদি।[৫] বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের আশীর্বাদধন্য ছিল এই সমিতি। সুরেন্দ্রনাথের সাংগঠনিক ক্ষমতার বলে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শাখার সংখ্যা ১৮৭৬-এ দশ থেকে ১৮৮৫-তে আশিতে দাঁড়ায়। বাংলার বাইরেও অনেক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত কোনও কোনও জনসভায় পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার লোকের সমাবেশ হতো। সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এইসব সভায় জুরি প্রথার প্রচলন, মুদ্রণের স্বাধীনতা, আইনের চোখে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের সমানাধিকারের স্বীকৃতি, লবণ-কর হ্রাস ইত্যাদি দাবি উত্থাপন করতেন। সবচেয়ে গুরুত্ব পেত বিধানসভাকে প্রতিনিধিমূলক করার দাবি। বিধানসভা পুনর্গঠনের দাবিতে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য চাঁদা সংগ্রহের এক ব্যাপক কর্মসূচী নেয় অ্যাসোসিয়েশন। ১৮৮০-৮১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে আনন্দমোহন বসু বলেন, প্রতিনিধিত্বমূলক ও প্রকৃত ক্ষমতা সম্পন্ন বিধানসভা গঠনের দাবি শুধু বর্তমানের নয়, ভবিষ্যতেরও সমস্যা। ১৮৮৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের কাছে প্রদত্ত এক স্মারকপত্রে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অভিযোগ করে, প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে ইংরেজ রাজপুরুষদের প্রাধান্য বেসরকারি ভারতীয় সদস্যদের প্রায় নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। যেভাবে বিধানসভা গঠিত হয়েছে তাতে জনমতের সার্থক প্রতিফলন কখনও ঘটতে পারে না। প্রতিবেশী ব্রিটিশ উপনিবেশ সিংহলের আইনসভা ও অপেক্ষাকৃত অধিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত বলে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন দাবি করে।

জাতীয় কংগ্রেস প্রথম থেকেই আইনসভার সম্প্রসারণ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠা অধিবেশনেই (১৮৮৫) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনপরিষদের সংস্কার দাবি করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন কে. টি তেলাঙ্গ, সমর্থন করেন মাদ্রাজ বিধানপরিষদের সদস্য এস. সুব্রহ্মনিয়ম আয়ার। দাদাভাই নৌরজি প্রস্তাবের সমর্থনে তাঁর বক্তৃতায় বলেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক স্তরে সবগুলি আইনসভাই

সাংবিধানিক ব্যবস্থার অতি নগ্ন ও নকল মুখোশ, স্বৈরাচারকে আইনসংগত করার হাতিয়ার মাত্র। বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ১৮৮৬-র কলকাতা কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতেও আহ্বান জানান। পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনগুলিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এন. দার, ই. নর্টন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আনীত বিভিন্ন প্রস্তাবে নির্বাচনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা গঠনের দাবি করা হয়। প্রাদেশিক আইনসভার সংস্কারের জন্য সুরেন্দ্রনাথ একটি খসড়া পরিকল্পনাও তৈরি করেন। কিন্তু সরকার প্রতিনিধিত্বমূলক বিধানসভা গঠনের দাবি নাকচ করে দেন। কলকাতায় সেন্ট অ্যান্ড্রুজ ভোজসভায় প্রদত্ত এক ভাষণে (৩০ নভেম্বর, ১৮৮৮) ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন জানান, সরকারের পক্ষে আইনসভা পুনর্গঠনের "অসাংবিধানিক দাবি" মেনে নেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, কারণ এই দাবি উত্থাপিত হয়েছে এক "আণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘু ভারতীয়দের" মধ্য থেকে।[৬]

ঔপনিবেশিক শাসকরা অবশ্য অনুমান করতে পারেন, ভারতবর্ষ এক মারাত্মক বিস্ফোরণের পূর্বমুহূর্তে উপনীত হয়েছে। ইতিপূর্বে ওয়াহাবি আন্দোলন, পাবনার কৃষক বিদ্রোহ এবং সুদূর দক্ষিণে মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ সরকারকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। জনগণের দুঃখ দুর্দশাও ঐ সময় সীমা ছাড়িয়ে যায়। আর্থিক দায় মেটাতে সরকারকে ভূমিরাজস্ব বাড়াতে হয়, ক্যানেল কর, শিক্ষা সেস ইত্যাদি বসাতে হয়। মুদ্রণের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়, কঠোরভাবে অস্ত্রআইন প্রয়োগ করা হয়। নাট্য পরিচালন আইনও ঐ সময় পাস হয়। লিটনের দমননীতি আটের দশকে ভারতবাসীর মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সঞ্চার করে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার অনেকটা বাধ্য হয়েই ভারতীয় শাসনব্যবস্থার সংস্কারে উদ্যোগ নেন। প্রাদেশিক আইনসভাগুলির পুনর্গঠনের প্রস্তাব তৈরি করতে ভাইসরয় স্বরাষ্ট্র সচিবকে নির্দেশ দেন। স্বরাষ্ট্র সচিব অ্যান্টনি ম্যাকডোয়েল প্রাদেশিক আইনসভায় শতকরা ষাটজন সরকারি ও চল্লিশজন বেসরকারি সদস্য মনোনয়নের সুপারিশ করেন। ম্যাকডোয়েলের প্রস্তাব পর্যালোচনার জন্য বড়লাটের শাসন পরিষদের তিনজন সদস্য জর্জ চেসনি, চার্লস অ্যাটকিনসন ও ওয়েস্টল্যান্ডকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। বস্তুত এই কমিটির সুপারিশই ১৮৯২-এর ভারতশাসন আইনের ভিত্তি রচনা করে। ১৮৯৩ সালের ১৬ মার্চ ভাইসরয়ের ৩৫৪ নং ঘোষণাপত্র দ্বারা আইনটি অনুমোদিত হয় এবং বঙ্গীয় বিধানপরিষদে কুড়িজন মনোনীত সদস্যের সংস্থান রাখা হয়। দশজন বেসরকারি সদস্য সম্বন্ধে বলা হয়, এদের মধ্যে সাতজন নিম্নলিখিত সংগঠনগুলির সুপারিশ বা অনুমোদনক্রমে বাংলার ছোটলাট কর্তৃক মনোনীত হবেন—

ক. কলকাতা পৌরসভা	১
খ. মিউনিসিপ্যালিটি	২
গ. জেলা বোর্ড	২
ঘ. বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স	১
ঙ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটসভা	১

কলকাতা পৌরসভা, চেম্বার অব কমার্স ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে একজন করে প্রার্থী মনোনয়নের অধিকার দেওয়া হয়। মিউনিসিপ্যালিটির ভোটসংখ্যা আয়ের উপর নির্দিষ্ট করা হয়। যেসব মিউনিসিপ্যালিটির আয় পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকার মধ্যে তারা একটি করে ভোট দেওয়ার অধিকার পায়, এক থেকে দেড় লক্ষ আয়ের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ভোটসংখ্যা হয় পাঁচটি করে। জেলা বোর্ডের ক্ষেত্রে অবশ্য সব জেলাকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাকি তিনজন বেসরকারি সদস্যকে ছোটলাট এমনভাবে মনোনয়ন করবেন যাতে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত হয়। এই তিনজনের মধ্যে একজনকে অবশ্যই "প্রদেশের বৃহৎ ভূস্বামীবর্গের প্রতিনিধি" হতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।[৭]

১৮৯২ সালের আইনে পুনর্গঠিত বিধানসভায় জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের নীতিকে আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও এক সংশোধনী প্রস্তাবে অভিযোগ করা হয় ১৮৯২-এর সংস্কার আইন ভারতে স্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে ও ভারতীয়দের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কুড়িজন সদস্য নিয়ে গঠিত বঙ্গীয় বিধানসভার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে ইংরেজ রাজপুরুষরা নিজেরাই সজাগ ছিলেন। লর্ড ল্যান্সডাউন প্রকাশ্যে এই ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তিনি প্রশ্ন করেন, কীভাবে সাত কোটি জনসংখ্যাসম্পন্ন বাংলার মতো একটি প্রদেশে মুষ্টিমেয় আসনসংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত একটি আইনসভা কার্যকরী হতে পারে।

পুনর্গঠিত বিধানসভা সদস্যদের অবশ্য প্রশ্ন করার অধিকার ও বাজেট আলোচনায় অংশ নেওয়ার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বঙ্গীয় বিধানসভার বেসরকারি সদস্যরা এই দু'টি অধিকারের সদ্ব্যবহার করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, মহেন্দ্রলাল সরকার, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, আবদুল জব্বার প্রমুখের ভূমিকা থেকেই তা প্রতীয়মান হয়। সীমিত ক্ষমতা ও পরিষদীয় বিধিনিষেধের চৌহদ্দির মধ্যেও বেসরকারি সদস্যরা ভারতীয়দের অভাব অভিযোগ, দাবিদাওয়ার প্রতিকার বিধানেও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতেন। কিন্তু উদারপন্থী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে আইনসভায় যোগদানের অসারতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুরেন্দ্রনাথ লেখেন, "আট বৎসর আমি বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য হওয়ার সম্মান লাভ করেছি। আমি ভালভাবেই জানি আমলাতন্ত্রের সুসজ্জিত ব্যূহের বিরুদ্ধে দেশ ও জনগণের জন্য সংগ্রাম করা এই পরিষদে কত কঠিন ও অর্থহীন।"

১৮৯২-এর সংস্কারের অসম্পূর্ণতা, বিধানসভার প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের শূন্যগর্ভতা এবং অগণতান্ত্রিক বিভিন্ন বিধিনিষেধ সম্বন্ধে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রথম থেকেই সোচ্চার ছিল। এলাহাবাদ কংগ্রেসে (১৮৯২) সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যদি আইনসভা প্রত্যাশানুযায়ী ভূমিকা পালন না করে তবে কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে অবিরত বিক্ষোভ চালিয়ে যাবে। কংগ্রেসের পুনা অধিবেশনে (১৮৯৫) সুরেন্দ্রনাথ বলেন, ইংলন্ডে ৬৭০ জন সদস্য চার কোটি জনতার প্রতিনিধিত্ব করেন, বাংলার সাত কোটি জনতার প্রতিনিধিত্ব করেন পরোক্ষভাবে নগণ্য নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত সাতজন বেসরকারি সদস্য। নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি না করলে এই বিধানসভার অসারতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে আইনসভার সদস্যদের প্রশ্ন করার অধিকার সম্প্রসারিত করা, সম্পূরক প্রশ্নের অধিকার প্রদান ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রস্তাব পাস করা হয়। বাজেট বিতর্কে ভারতীয়দের উপর আরোপিত বিভিন্ন বিধিনিষেধ দূর করে ডিভিসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানান কংগ্রেস সদস্যরা। তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব অবশ্য আপস পন্থায় পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভারতীয় সদস্যসংখ্যা সম্প্রসারণের মাধ্যমে আইনসভাকে জনপ্রিয় করে তোলাই ছিল কংগ্রেসের লক্ষ্য। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে (১৮৯৯) সভাপতির ভাষণে রমেশচন্দ্র দত্ত স্পষ্ট করে বলেন, আমরা দেশের সম্পূর্ণ শাসনযন্ত্রকে আয়ত্তাধীনে আনতে চাই না। তবে সরকারের কাছে আমাদের বক্তব্যকে উপস্থিত করার যথার্থ সুযোগ চাই। কিন্তু এই সুযোগও অনিচ্ছুক শাসকরা দিতে পরান্মুখ ছিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত আইনসভা চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় টিকতে পারে না বলে লর্ড কার্জন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বলেন। তারও পরে লর্ড মিন্টো ভারতবর্ষে শাসন সংস্কারের যৌক্তিকতা নাকচ করে দিয়ে বলেন, "এমন দেশে আবার শাসন সংস্কার কি? চিরকালই একে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি রক্ষা করেছে, ভবিষ্যতেও করবে।"[৮]

স্বভাবতই সাংবিধানিক রাজনীতির বেড়াজালের মধ্যে নিজেদের অধিকার অর্জন সম্বন্ধে ভারতীয়রা ক্রমশ আস্থাহীন হয়ে ওঠেন এবং তা বিশেষভাবে প্রকাশ পায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময়। বঙ্গভঙ্গ সাধারণ মানুষকেও রাজনৈতিক আন্দোলনের আবর্তে টেনে আনতে সক্ষম হয়, বাংলার সাংবিধানিক রাজনীতিতেও এর প্রভাব পড়ে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন থেকে ভারতীয় রাজনীতিও এক নতুন মোড় নেয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে, বঙ্গভঙ্গের আগের রাজনৈতিক কর্মপন্থা ছিল "দুর্বল, ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা।"[৯] কংগ্রেসের মধ্যে ঐ সময় লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ চরমপন্থীদের নেতৃত্ব প্রাধান্য পায়। তিলক ঘোষণা করেন, কংগ্রেসের পূর্বতন নেতৃত্বের মতো তাঁরা আবেদন নিবেদনে

বিশ্বাসী নন। বয়কট, স্বদেশী প্রচার ও স্বায়ত্তশাসন তাঁদের লক্ষ্য এবং এর জন্য তারা চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত। লর্ড কার্জন ভাইসরয় হিসেবে (১৮৯৮-১৯০৫) যোগদানের পর বুঝতে পারেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রধান বাধা বাংলার ক্রমপ্রসার্যমাণ জাতীয়তাবাদী চেতনা। এই সুসংহত শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এইচ. রিজলে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা রচনা করেন। ইন্ডিয়া গেজেটে (৩ ডিসেম্বর, ১৯০৩) রিজলের পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পর সারা দেশে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। প্রতিবাদ সত্ত্বেও কার্জন বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে অনড় থাকেন, কারণ তাঁর মনে হয় বঙ্গভঙ্গ না হলে "ভারতের পূর্বপ্রান্তে এমন এক শক্তি জোরদার হয়ে উঠবে যা এখনই প্রবল এবং ভবিষ্যতে বর্ধমান বিপদের উৎস হয়ে দাঁড়াবে।"[১০] ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবিভাগ ঘোষণার ফলে ভারতবাসীর ঘনীভূত বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত গণবিক্ষোভ ক্রমশ ব্যাপক রূপ নেয়, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কয়েক মাসের মধ্যে দু'হাজারের মতো জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় হিন্দু-মুসলমান ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের নিদর্শনস্বরূপ রাখীবন্ধনের সূত্রপাত হয়। কলকাতার টাউন হলের সভা নিকটবর্তী ময়দান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, লোকসমাবেশ হয় এক লক্ষের বেশি। এই আন্দোলন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষের মধ্যে যে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে সহায়ক হয়েছিল, তা বোঝা যায় ঐ সময়কার সংবাদপত্রের প্রচার বৃদ্ধির থেকে।[১১]

	১৯০৪ সাল	১৯০৫ সাল
অমৃতবাজার পত্রিকা	২০০০	৭৫০০০
বেঙ্গলি	৩০০০	১১০০০
হিতবাদী	১৬০০০	২০০০০
সন্ধ্যা	৫০০	৭০০০

প্রথমদিকে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের নেতৃত্বে পরিচালিত হলেও ক্রমশ বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ নেতারা আন্দোলন পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা নিতে শুরু করেন। আন্দোলনের গণভিত্তিও প্রসারিত হতে থাকে। সরকারও চরম দমননীতির আশ্রয় নেয়। সরকারি হিসেবে প্রকাশ, ১৯০৫-১৯০৯ এর মধ্যে বাংলার বিভিন্ন আদালতে ৫৫০টির বেশি রাজনৈতিক মামলা নথিভুক্ত ছিল। বঙ্গবিভাগ ঘোষণার পর থেকেই আইনসভার কংগ্রেস সদস্যরা আইনসভা বর্জন করেন এবং বঙ্গবিভাগ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আইনসভার অধিবেশনে যোগ দেবেন না বলে ঘোষণা করেন।

বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রসার ইংরেজদের

শঙ্কিত করে তোলে। ইতিমধ্যে ১৯০৫-এর নির্বাচনে ইংলন্ডের লিবারেল দল আবার ক্ষমতায় আসে এবং ভারতসচিব জন মর্লে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় সংস্কারের উদ্যোগ নেন। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার হ্যারল্ড স্টুয়ার্ট আইনসভাগুলির সংস্কারসাধনের পরিকল্পনা রচনা করে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের কাছে পাঠান জনমত সংগ্রহের জন্য।[১২] বঙ্গীয় পরিষদের সংস্কার সম্বন্ধে রাজা প্যারীমোহন মুখার্জি, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সীতানাথ রায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বর্ধমানের মহারাজা, মুর্শিদাবাদের নবাব প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মতামত চাওয়া হয়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, বিহার ল্যান্ড হোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশন, ইম্পিরিয়াল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি সংস্থাকে মতামত দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। লক্ষণীয়, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে যেসব রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি যুক্ত ছিলেন, সেইসব ব্যক্তি বা সংস্থাকে আইনসভার সংস্কার সম্বন্ধে মত প্রকাশের কোন সুযোগ দেওয়া হয় না। যাঁদের মত চাওয়া হয় তাঁদের অধিকাংশই আইনসভায় জমিদারদের প্রাধান্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[১৩] এইসব মতামতের ভিত্তিতে বাংলার ছোটলাট ৩৭ জন সদস্য নিয়ে বাংলার আইনসভার পুনর্গঠনের সুপারিশ করে একটি খসড়া ভাইসরয়ের কাছে পেশ করেন। খসড়া অনুযায়ী পরিষদের গঠন ছিল নিম্নরূপ :

ক. সভাপতি	লেফটেনান্ট গভর্নর
খ. মনোনীত সদস্য	২২ জন, এর মধ্যে ১৮ জনই হবেন সরকারি কর্মচারী
গ. নির্বাচিত সদস্য	১৪ জন, এর মধ্যে কলকাতা পৌরসংস্থা ১, অন্যান্য পৌরসভা ও জেলাবোর্ড-৭, জমিদার-২, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, চেম্বার অব কমার্স, কলকাতা ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশন, ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় প্রত্যেকে ১টি করে মোট-৪

বঙ্গীয় আইন পরিষদের এই ধরনের সংস্কার প্রস্তাবে ভারত সরকার আপত্তি করেন, কারণ তাঁদের মনে হয় পরিষদের সদস্যসংখ্যা আরও বেশি হওয়া উচিত। জমিদার ও শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির পক্ষেও তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

ভারতসচিবের কাছে ভারত সরকার যে সংশোধিত পরিকল্পনা পেশ করেন তাতে ৪৭ জন সদস্য নিয়ে বঙ্গীয় বিধানসভা গঠনের সুপারিশ করা হয়। যেমন

ক. সভাপতি	লেফটেনান্ট গভর্নর
খ. মনোনীত সদস্য	২৬ ; এর মধ্যে অন্তত ২৩ জন হবেন সরকারি কর্মচারী
গ. নির্বাচিত সদস্য	কলকাতা পৌরসংস্থা-২, মিউনিসিপ্যালিটি-৪, জেলাবোর্ড-৪, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১, জমিদার-৪,

চেম্বার অব কমার্স-১, মুসলমান প্রতিনিধি-২, কলকাতা ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশন-১, ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়-১, মোট-২০

সুপারিশে বলা হয়, যেভাবে আসন সংখ্যা ভাগ করা হয়েছে, তাতে অন্তত দশটি আসন পাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থাৎ কলকাতা করপোরেশন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ডের সবকয়টি আসনই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা দখল করবে বলে অনুমান করা হয়। মনোনীত একজন বেসরকারি সদস্যকে ধরে জমিদারদের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৫, ব্যবসায়ীশ্রেণী ৩ এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি করে আসন হবে বলে সরকার মনে করেন। আইনসভার সংস্কার নিয়ে ভারতসচিব লর্ড মর্লে ও ভাইসরয় মিন্টোর মধ্যে চার বছর ধরে পত্রালাপ ও আলোচনার পর ১৯০৯-এর ভারতশাসন আইন ঘোষিত হয়। ১৯০৯-এর আইনের ভিত্তিতে ভারত সরকার ১৫ নভেম্বর এক প্রস্তাব পাস করে নিম্নোক্ত ৫৩ জন সদস্য নিয়ে বাংলার বিধানসভা গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

পদাধিকারবলে সদস্য		৩
লেফটেনান্ট গভর্নর	১	
কর্মপরিষদের সদস্য	২	
মনোনীত সদস্য		২৪
সরকারি কর্মচারী (সর্বাধিক)	১৭	
ভারতীয় বাণিজ্যিক প্রতিনিধি	১	
চা কর	১	
বিশেষজ্ঞ	২	
অন্যান্য (সর্বনিম্ন)	৩	
নির্বাচিত সদস্য		২৬
কলকাতা পৌরসংস্থা	১	
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১	
মিউনিসিপ্যালিটি	৬	
জেলাবোর্ড	৬	
জমিদার	৫	
মুসলমান সম্প্রদায়	৪	
বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স	২	
কলকাতা ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন	১	

পরবর্তী স্তরে বিধানসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫৪ করা হয়, নির্বাচিত সদস্যদের

সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ২৮ এবং অন্যান্য সংখ্যা কমে ২৬-এ দাঁড়ায়। শাসকরা আশা করেন পুনর্গঠিত আইনসভা বাংলার বিভিন্ন অংশের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হবে, জনগণ সরকারি নীতিকে সমর্থন করবে। নবগঠিত বিধানসভার উদ্বোধনী অধিবেশনে ছোটলাট স্যার এডওয়ার্ড বেকার এই আশা ব্যক্ত করে বলেন, আইনসভার সাফল্য অসাফল্য সবই নির্ভর করছে ভারতীয় সদস্যদের ওপর। কারণ আইনসভায় ভারতীয়রাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং বঙ্গবিভাগ ব্যবস্থা রহিত না হওয়ার দরুন নরমপন্থীরাও আইনসভার সদস্যপদ গ্রহণে অস্বীকার করেন। সরকারের বশংবদ ও একান্ত অনুগত লোকদের দ্বারা আইনসভার আসনসংখ্যা পূর্ণ করা হয়। ইংলন্ডে এক বন্ধুর কাছে লিখিত পত্রে নরমপন্থী নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে সরকারের একগুঁয়েমির বিরুদ্ধে অনুযোগ করেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য ভারতীয়দের আন্দোলনের চাপে ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল বঙ্গভঙ্গ আদেশ রদ করা হয়। বিহার ওড়িশা আলাদা প্রদেশ হিসেবে গঠিত হয়। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি স্থানান্তরিত হয়। ইংলন্ডের উদারনৈতিক দলের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ লর্ড কারমাইকেল বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন। ভারতের সাংবিধানিক বিকাশে এক নতুন যুগের সূচনা হলো বলে ভারতসচিব ঘোষণা করেন।

বৃহত্তর বাংলার বিধানসভার শেষদিনের অধিবেশনে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হয়। বিহার-ওড়িশায় ইতিমধ্যে পৃথক বিধানসভা গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সমাপ্তি অধিবেশনে বিহার-ওড়িশার প্রতিনিধিরা বাংলার সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের উল্লেখ করে বাংলার বিধায়কদের সহযোগিতা ও আন্তরিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন, বাংলার কাছে তাঁদের ঋণ স্বীকার করেন। শিওনন্দন প্রসাদ সিং তাঁর বক্তৃতায় বলেন, এতদিন এই তিন প্রদেশের মিলিত পরিবারের কর্তা ছিল বাংলা। ভবিষ্যতেও অভিভাবক হিসেবে বাংলা তার দায়িত্ব পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ফকরুদ্দিন আলি সভায় উর্দু বয়েত পরিবেশন করে বলেন, "পৃথক হয়ে গেলেও ভুলব না, আমরা শুধু ভাই নই, আমাদের তনুমনপ্রাণ এক। এক বৃক্ষের ফল আমরা, অচ্ছেদ্য আমাদের বন্ধন।"[১৪] বাংলার ছোটলাট ফ্রেডারিক উইলিয়াম ডিউক মনে করেন, শোক প্রকাশ না করে বরঞ্চ ভাবা উচিত ফিনিক্স পাখির মতো চিতাভস্ম থেকে নবদেহ নিয়ে বাংলার পুনরুজ্জীবিত বিধানসভা আবার তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে এবং ভারতের অন্যান্য আইনসভাকে পথ দেখাবে।

বাংলার সংসদীয় রাজনীতিতে নরমপন্থীদের আবার কর্মতৎপরতা শুরু হয়, কিন্তু ১৯১২-১৯১৩ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি)-র নির্বাচন তাদের কাছে এক চরম বিপর্যয় নিয়ে আসে। বিধানসভার ২৮টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে ২৩টিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ছিল ভারতীয়দের। বাকি পাঁচজন প্রার্থী নির্বাচিত হতেন ইউরোপীয়দের

দ্বারা—বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, চা-কর ইত্যাদি কেন্দ্র থেকে। সর্বমোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৯২৮৯। বাংলার চরমপন্থীরা বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেন ; ফলে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামী নরমপন্থী নেতাদের প্রত্যাশা ছিল মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ড ইত্যাদির সব ক'টা আসনেই তাঁরা জয়ী হবেন। কিন্তু নির্বাচনে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর তিনজন অনুগামী সুরেন্দ্রনাথ রায়, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও আবুল কাশেম ছাড়া সকলেই পরাজিত হন। অধিকাংশ আসনই পান হিন্দু ও মুসলমান জমিদাররা। বস্তুত ২৩টির মধ্যে ১৭টি আসনেই ভূম্যধিকারীদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড সাংগঠনিক দুর্বলতা ও নির্বাচনী রাজনীতির নতুন বাগভঙ্গি আয়ত্ত করার অক্ষমতাই সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগীদের বিপর্যয়ের কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য ফেব্রুয়ারি মাসেই (১৯১৩) বাংলার বিধায়করা যে দু'জন সদস্য কেন্দ্রীয় সংসদে নির্বাচন করেন তাঁদের একজন ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এই নির্বাচনে তিনি জমিদারদের সাহায্যে জয়ী হন।

নবগঠিত বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৮ জানুয়ারি, ১৯১৩ কলকাতায় রাজভবনে। কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশন যে কক্ষে বসত রাজভবনের সেই কক্ষই বঙ্গীয় আইন পরিষদের অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত হয়। সংসদীয় ব্যবস্থার সাফল্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে সক্ষম হবে বলে নতুন রাজ্যপাল কারমাইকেল আশা প্রকাশ করেন। বিধানসভার চৌহদ্দির মধ্যেই তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রবণতাকে ঐক্যবদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। উদ্বোধনী অধিবেশনে কারমাইকেল সদস্যদের "সংসদ সহকর্মী" হিসেবে স্বাগত জানান এবং বলেন, বিধানসভার সভাপতি পদে আসীন হওয়ার জন্য তিনি "গর্বিত"। পরিষদ পরিচালন সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনেকাংশে শিথিল করা হয়। জনস্বার্থ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার দেওয়া হয় সদস্যদের। বিধানসভায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সুযোগও প্রসারিত করা হয়। বাজেট বিতর্কের অংশগ্রহণে ভারতীয় সদস্যদের উপর যেসব বিধিনিষেধ ছিল, সেগুলি অনেকাংশে বিলোপ করা হয়। প্রথম দিনের অধিবেশনে কারমাইকেল সদস্যদের নিশ্চয়তা দেন—বিধানসভায় উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের সদুত্তর ও সরকারি কার্যকলাপের সমালোচনা যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হবে। গভর্নর আরও আশা করেন, পুনর্গঠিত আইনসভার বিধায়করা বিভিন্ন সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন।[১৫] শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের বিক্ষুব্ধ মনোভাবও প্রশমিত হয় কারমাইকেল যখন নীলরতন সরকার, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিধানসভার সদস্য হিসেবে মনোনীত করেন।

প্রথম কয়েক মাস বিভিন্ন পক্ষের সহযোগিতার দরুন বিধানসভার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবেই পরিচালিত হয়। কিন্তু শীঘ্রই নরমপন্থীদের আশাহত হতে হয়। নির্বাচিত সদস্যরা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু তা নামে মাত্র। বেসরকারি সদস্যদের

মধ্যে চারজন ছিলেন ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। এঁরা কোনও সময়ই ভারতীয়দের পক্ষ নেননি, বরঞ্চ গভর্নর কারমাইকেল ভারসাম্য রক্ষায় বণিক প্রতিনিধিদের ব্যবহার করেছিলেন। স্বভাবতই শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনও ক্ষমতাই ভারতীয়দের ছিল না। মুসলমানরাও নানা কারণে সরকারের ওপর বিক্ষুব্ধ ছিলেন। মুসলমান সমাজের মনোভাব প্রকাশ পায় ফজলুল হক যখন বিধানসভায় অভিযোগ করে (এপ্রিল ৪, ১৯১৩) বলেন, মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোককে উপাধি ও খেতাব দিয়ে সরকার যদি মনে করেন দায়িত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে তবে ভুল করবেন। সাধারণ মুসলমানদের উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী গৃহীত না হলে মুসলমানদের সহযোগিতা সরকার পাবেন না।[১৬] ভারত সরকার এবং ইংরেজ রাজকর্মচারীরাও নরমনীতি-র বিরোধী ছিলেন। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় সরকার ভারতরক্ষা আইন ও অন্যান্য দমনমূলক বিধি প্রণয়ন করেন। বাংলার বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায় থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। "দায়িত্বজ্ঞানহীন বিরোধিতা" বলে বিভিন্ন সময়ই ভারতীয়রা সরকারি সদস্যদের দ্বারা তিরস্কৃত হন। এতদ্‌সত্ত্বেও ১৯১৬ সালের নির্বাচনে নরমপন্থীরা অংশগ্রহণ করেন। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাই নির্বাচনে বিজয়ী হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কিশোরীমোহন চৌধুরী, অম্বিকাচরণ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ রায় ও মহেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ প্রখ্যাত আইনজীবীরা। আইনসভার মাধ্যমে বিদেশী সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতা ভারতীয় সদস্যদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আইনসভার কার্যকলাপে অংশগ্রহণ তাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার রাজনীতিবিদদের এই সংশয় বিপিনচন্দ্র পালের কণ্ঠে ব্যক্ত হয়। তিনি বলেন, আইনসভায় জননেতাদের উদ্যোগে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাবের ব্যর্থতা, উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবের অগ্রাহ্যকরণ ইত্যাদি থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, জনগণের অধিকার ও ব্রিটিশ স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান অসম্ভব।[১৭] নরমপন্থীরাও বুঝতে পারেন জনমতের বিরুদ্ধে আইনসভায় প্রবেশ করে তাঁরা সঠিক কাজ করেননি। চরমপন্থীরা প্রথম থেকেই আইনসভায় প্রবেশের বিরোধী ছিলেন। মর্লে মিন্টো 'সংস্কার'কে সংস্কার না বলে 'সংহার' বলে অভিহিত করতেন চরমপন্থীরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারতরক্ষা আইন প্রণীত হলে পীড়নমূলক নীতি আরও চরমে ওঠে। বিধানসভার সদস্যদের প্রতিবাদের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই পটভূমিতে ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষ ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০ আগস্ট ভারতশাসন সম্বন্ধীয় 'মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার' ঘোষণা করেন।

মর্লে-মিন্টো সংস্কার অনুযায়ী গঠিত বিধানসভার সমাপ্তি অধিবেশন হয় ১ সেপ্টেম্বর, ১৯২০। গভর্নর জে. এল ড্যান্ডাস, আর্ল অব রোনাল্ডশে পরিষদের শেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে বলেন, "বঙ্গীয় পরিষদের স্থগিতকরণের

ফলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হলো। বহু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পরিষদ তার বিশিষ্ট ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে।" বিধানসভার বিরুদ্ধে নানা সমালোচনার জবাবে গভর্নর বলেন, "আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য কাজকর্ম সম্বন্ধে পরিষদের ভূমিকা বিভিন্ন তরফে সমাদৃত হয়েছে। বঙ্গীয় পরিষদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে লজ্জিত হওয়ার কারণ নেই। এই পরিষদ এমন অনেক আইন প্রণয়ন করেছে যা জনস্বার্থ রক্ষার পক্ষে সহায়ক হয়েছে।"[১৮] গভর্নরের এই দাবি নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জিত। বাংলার মানুষের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে এই পরিষদ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সারা দেশ যখন উত্তাল, আইনসভায় ভারতীয় সদস্যদের দু-চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ছাড়া আর কোন অধিকার দিতে সরকার রাজি হননি। আমলাতন্ত্রের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে আইনসভায় ভারতীয় সদস্যদের পক্ষে যথাযথ ভূমিকা পালনের পরিবেশও ছিল না, তাছাড়া তাঁদেব মধ্যে বেশিরভাগই রাজশক্তির অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি নেওয়ার জন্যও তৈরি ছিলেন না। এই পর্বের বিধানসভা খানিকটা সচল ও সক্রিয় হলেও বাংলার রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হয়। ব্রুমফিল্ড অবশ্য কারমাইকেল প্রমুখ "ভারতপ্রেমী' বাংলার প্রদেশ-প্রধানদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতার জন্য ভদ্রলোকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব ও চরমপন্থীদের অসহযোগিতা ইত্যাদিকেই দায়ী করেছেন। ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকদের সদিচ্ছা ও ঔদার্যের ওপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে ব্রুমফিল্ড 'অনুগৃহীত', 'যজমান' (ইংরেজ আই. সি. এস-দের ভাষায়) ভারতীয়রা শাসকদের সদিচ্ছার সুযোগ নিতে পারেনি বলে অনুযোগ করেছেন। কিন্তু শাসকদের সদিচ্ছার কোন প্রকাশ অন্তত ভারতীয়রা বুঝতে পারেননি ; আইনসভায় অংশগ্রহণের শূন্যগর্ভতা তাদের কাছে প্রকট হয়ে ওঠে।

১৮৯২-১৯২০-র মধ্যবর্তী সময়ে পদ্ধতি প্রকরণগত দিক দিয়ে বিধানসভার সদস্যপদের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। প্রথম তিন দশক (১৮৬২ থেকে) বিধানসভার সদস্যপদ পুরোপুরি মনোনয়নের উপর নির্ভরশীল ছিল। শাসকরা নিজেরাও এই মনোনয়ন পদ্ধতি মেনে নিতে পারছিলেন না। মুখে তাঁরা গণতন্ত্রের মহিমা প্রচার করতেন। স্বভাবতই গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে মনোনয়ন যে বেমানান, নিজেরাই তা স্বীকার করতেন। ১৮৯২-এর ভারতশাসন আইন নিয়ে বিতর্কের সময় গ্লাডস্টোন পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন, ভারতের জনগণকে শুধু মনোনয়নে নয়, যথার্থ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু গ্লাডস্টোনের যথার্থ প্রতিনিধির ধারণা পৌরসভা, মিউনিসিপ্যালিটির মধ্য থেকে নির্বাচনী উপাদান সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯২-র আইনে বাংলার বিধানসভার সাতজন (২০ জনের মধ্যে) সদস্যকে করপোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি সংস্থার

সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনয়ন করার ক্ষমতা দেওয়া হয় গভর্নরকে। প্রয়োজনে সুপারিশ বাতিল করার ক্ষমতা ছিল তাঁর। এই ধরনের সীমাবদ্ধ পরোক্ষ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ নিয়েই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, গুরুপ্রসাদ সেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অম্বিকাচরণ মজুমদার, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ফজল ইমাম ও অন্যান্যরা বঙ্গীয় পরিষদের সদস্যপদ লাভ করেন। সুপারিশ বিবেচনা করার সময় গভর্নর প্রার্থীদের পূর্ব ইতিহাস, যোগ্যতা ও গুণাবলীর বিচার করে সাধারণত নির্বাচক সংস্থাগুলির মতামতকে মর্যাদা দিতেন। গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন লাভের পরই সদস্যপদ প্রাপ্তি গেজেটে প্রকাশিত হতো এবং প্রার্থী বিধানসভার সদস্য হিসাবে যোগ দিতেন। কলকাতা পৌরসংস্থার নির্বাচনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিনাথ মিত্র ও জয়গোপাল লাহাকে পরাজিত করে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। গুরুপ্রসাদ সেন, অম্বিকাচরণ মজুমদার, যোগেশ চৌধুরী প্রমুখ নেতা মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড ইত্যাদির প্রতিনিধিত্ব করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন প্রথমে আনন্দমোহন বসু, পরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। নবগঠিত বিধানসভার প্রায় সব ভারতীয় সদস্যই ছিলেন শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। সরকার এই শ্রেণীর লোককে আরও কাছে টেনে আনতে আগ্রহী ছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই— চরমপন্থীদের দুর্বল করে দেওয়া। ভূস্বামী সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধি বিধানসভায় নির্বাচিত হতে পারেননি। তাঁদের বিক্ষুব্ধ মনোভাব প্রশমিত করার জন্য সরকার মিউনিসিপ্যালিটির একটি আসন ভূস্বামীদের জন্য সংরক্ষিত করে রাখতে সম্মত হন এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাবানুযায়ী মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে ১৯০২ সালে বিধানসভায় মনোনীত করা হয়। এই মনোনয়নের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন খুবই সোচ্চার হয় এবং যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রকাশ্যে এর প্রতিবাদও জানান।

১৯০৯ এর সংস্কার আইনে বঙ্গীয় বিধানসভা ৫৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়। গভর্নর ও শাসন পরিষদের দু'জন সদস্য পদাধিকার বলে পুনর্গঠিত বিধানসভার সদস্য ছিলেন। নতুন আইনে স্থির হয় ২৪ জন সদস্যকে গভর্নর সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী, চা-কর ইত্যাদির মধ্যে থেকে মনোনয়ন করবেন। বাকি ২৬ জন হবেন নির্বাচিত। ১৯০৯-এর সংস্কারে নরমপন্থীদের রাজশক্তির অনুকূলে টানার জন্য সরকার সব ধরনের উদ্যোগ নেন। কারণ, চরমপন্থীদের কার্যকলাপ ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের ঢেউ প্রশাসন-ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। নরমপন্থীদের আরও সুবিধা দেওয়ার জন্য ১৯১২ সালে সরকার মনোনীত সদস্য সংখ্যা কমিয়ে ২৪ থেকে ২২-এ আনা হয় এবং নির্বাচিতের সংখ্যা ২৬ থেকে বাড়িয়ে ২৮ করা হয়। এর ফলে একদিকে যেমন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর এবং আরও

কয়েকজন রাজা ও রাজাবাহাদুর বিধানসভায় আসেন, তেমনি পরিষদের সদস্যপদ পান সুরেন্দ্রনাথ রায়, আবুল কাশেম, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ নীলরতন সরকার, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (পরবর্তীকালে লর্ড), প্রভাসচন্দ্র মিত্র, অখিলচন্দ্র দত্ত, কিশোরীমোহন চৌধুরী, ফজলুল হক, অম্বিকাচরণ মজুমদার, শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, রায় রাধাচরণ পাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯১২-১৩-এর নির্বাচনে নরমপন্থীরা সাফল্য লাভ করতে পারেননি। সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে মাত্র চারজন নরমপন্থী প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন ; অধিকাংশ আসনেই তাঁরা পরাজিত হন। পুনর্গঠিত বিধানসভায় জমিদারদের প্রাধান্যই থেকে যায়। বস্তুত ২৬ জন বেসরকারি ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে ১৭ জনই ছিলেন জমিদার। ১৯০৯-এর আইনে জমিদারদের জন্য বিধানসভায় ৪টি আসন নির্দিষ্ট হয়, পরে তা বাড়িয়ে করা হয় ৫। নির্বাচনের নিয়মাবলীও এমনভাবে তৈরি করা হয়, যার ফলে পেশাদার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি নির্বাচনে বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এমনকি ক্ষুদ্র ভূস্বামীরাও প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পাননি কারণ ভূমিরাজস্ব অথবা জনস্বার্থ সংক্রান্ত কাজের জন্য কর হিসেবে যাঁরা প্রভূত অর্থ দান করেন কেবলমাত্র তাঁদেরই ভোটদানের অধিকার ছিল। জমিদার-সংরক্ষিত নির্বাচনী এলাকার মোট ভোটার ছিলেন ৬৩৫ এবং এঁদের বৃহদাংশই ছিলেন বড় বড় ভূস্বামী, তাছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড ইত্যাদি থেকে জমিদাররাই নির্বাচিত হয়ে আসেন। নবগঠিত বিধানসভার প্রথম অধিবেশনেই গভর্নর স্যার উইলিয়াম বেকার স্বীকার করেন যে নির্বাচনী নিয়মাবলী নিশ্চয়ই শিক্ষিত ও বৃত্তিজীবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে কিন্তু ঐ শ্রেণীর প্রতি সরকারের সদিচ্ছার কোন ঘাটতি নেই। প্রতিনিধিত্বমূলক আইন পরিষদ যে নেহাতই প্রচার তা প্রমাণিত হয় মোট ভোটারের সংখ্যা থেকে। ১৯১৩-র নির্বাচনে সর্বমোট ভোটার ছিলেন ৯২৮৯। এর মধ্যে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন ক্ষেত্রে ভোটার ছিলেন ১১৯৩, জেলাবোর্ডে ১১১৫, জমিদার ৬৩৫ এবং মুসলমান ভোটার ৬৩৪৬। বিধানসভার অপ্রতিনিধিত্বমূলক গঠন থেকেই যায়। ফজলুল হক সঠিকভাবেই অভিযোগ করেন, পরিষদের প্রত্যেক সদস্য একমাত্র নিজের ছাড়া অন্য কারও প্রতিনিধিত্ব করে না। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও এই ধরনের নির্বাচন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং এক সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী মারফত প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবি জানায়।

অস্বীকার করা যায় না, ১৮৯২-১৯২০ পর্বের বিধানসভা নিশ্চিতভাবে পূর্ববর্তী বিধানসভা থেকে অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। আইন প্রণয়ন, প্রশ্নোত্তর, প্রস্তাব পেশ এবং বাজেট বিতর্ক ইত্যাদি থেকে তা প্রমাণিত হয়। যে সমস্ত আইন এই পর্বে পাস

হয় তার মধ্যে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল ১৮৯৮, বেঙ্গল সেটেল্‌ড এস্টেটস্ বিল ১৯০৪, ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট বিল ১৯১১ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ম্যাকেঞ্জি বিল আখ্যালব্ধ কলকাতা পৌরসংস্থা বিল-এর (১৮৯৮) মূল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা করপোরেশনে ভারতীয় সদস্যদের প্রভাব হ্রাস করে সরকারি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা। বিলের উত্থাপক মিঃ এইচ. এইচ. রিজলের ৩৩ পৃষ্ঠাব্যাপী টাইপ করা ভাষণ থেকে তা প্রমাণিত হয়। পৌরসংস্থাগুলিতে ভারতীয় সদস্যদের যথোচিত হস্তক্ষেপের ফলে সরকারপক্ষকে অনেক সময়ই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো, তাদের প্রাধান্য ব্যাহত হতো। বিলে পৌরসংস্থায় ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের যে সামান্য সুযোগ ছিল, তাও কেড়ে নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। করপোরেশনকে সরকারিকরণের এক নগ্ন প্রচেষ্টা বলে সুরেন্দ্রনাথ বিলটিকে আখ্যায়িত করেন। করপোরেশনের ২৮ জন ভারতীয় কমিশনার এই বিলের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। হাজার হাজার মানুষ বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায়। ইংলন্ডে অবস্থানরত রমেশচন্দ্র দত্তকে বাংলার নেতৃবৃন্দ অনুরোধ জানান, তিনি যেন ইংলন্ডে এই বিলের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হন এবং কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। বিধানসভার অভ্যন্তরে সরকার ও ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয় এই বিল নিয়ে।[১৯] ভারতের অন্য কোন আইনসভায় ইতিপূর্বে কোন বিল নিয়ে এত দীর্ঘ, বিশদ আলোচনা হয়নি। বিলটির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সিলেক্ট কমিটির অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, সাহেবজাদা বখতিয়ার শাহ্ প্রমুখ ছিলেন সিলেক্ট কমিটির সদস্য। সুরেন্দ্রনাথ লেখেন, "তিন মাস ধরে সিলেক্ট কমিটির বৈঠক চলে, প্রতিদিনই বৈঠক হতো, এই তিন মাস আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি।" সিলেক্ট কমিটিতেও মতানৈক্য রয়ে যায়, পরে সমগ্র কক্ষ কমিটি হিসেবে ১১ দিন পরিষদের অধিবেশন বসে। এই বিলের আলোচনাকালে ৫৬৫টি সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়। অনেকের মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও বিলের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তীব্র ভাষায় বিলটির সমালোচনা করে তিনি বলেন, বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তে দায়িত্বজ্ঞানহীন শাসনবিভাগের উপর করপোরেশনের কাজকর্ম পরিচালনার যে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সরকারপক্ষের প্রধান যুক্তি ছিল, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৌরসভার গঠন কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু বিলটির বিভিন্ন ধারা কলকাতা পৌরসভার গণতান্ত্রিক কাঠামোর যে ন্যূনতম ভিত্তি বিদ্যমান ছিল, তারও বিলুপ্তির সূচনা করেছে বলে সরকার পক্ষও সচেতন ছিলেন। সরকারের প্রবীণতম সদস্য মিঃ বেকার আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বলেন, "চারপুরুষ ধরে ভারতীয় নুন খেয়ে আমরা প্রতিপালিত হয়েছি। রাজপুরুষ হিসেবে আমার কর্মজীবনও শেষ হতে চলেছে। এই মহান দেশের মানুষের অগ্রগতির

পক্ষে সর্বপ্রকার সাহায্য করা আমি কর্তব্য বলে মনে করে এসেছি। আমি এও জানি এই বিল ভারতীয়দের আহত ও বিক্ষুব্ধ করবে। এটা কি সম্ভব বা বিশ্বাসযোগ্য যে নিশ্চিত প্রয়োজন ছাড়া এই ধরনের একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ ও দায়িত্ব আমি নিতে পারি?" এই বিলের বিরোধিতায় সুরেন্দ্রনাথ যে ভূমিকা নেন, ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার ইতিহাসে আজও তা এক অনন্য সংযোজন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে আছে। অতিরিক্ত ব্যস্ততার মধ্যে বিলটি পাস করানোর সরকারি উদ্যোগের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ব্যস্ততার মধ্যে প্রণীত এই আইন কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এই বিল পাস জনমতের সাময়িক পরাজয় বা সাময়িক পশ্চাৎগমনের সূচনা করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু উদ্বেলিত প্রতিরোধ আন্দোলনের মুখে সরকারকে এক সময় না এক সময় পিছিয়ে আসতে হবে। বিতর্কের উপসংহারে এক আবেগময়ী বক্তৃতায় তিনি বলেন, "এই বিল প্রণয়নকে কেন্দ্র করে আজকের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান আমাকে সর্বাধিক বিষাদগ্রস্ত করে তুলেছে। আমি এই শহরের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার জন্মের সঙ্গে জড়িত। প্রাথমিক শৈশবস্থায় আমি একে পর্যবেক্ষণ করেছি ; এর তেজোদৃপ্ত পূর্ণতা প্রাপ্তিতে আমি আনন্দানুভব করছি, আর এখন আমাকে এই প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তির সঙ্গে যুক্ত থাকতে হচ্ছে। এর চেয়ে শোকাবহ আর কি হতে পারে? রাজনীতিবিদদের জীবনের এখানেই ট্র্যাজেডি। যাইহোক মাননীয় সদস্যগণ, আমি এই ব্যবস্থার সঙ্গে কোনোমতেই নিজেকে যুক্ত করতে চাই না। প্রতীক্ষা করে থাকব সেই সুদিনের জন্য যেদিন আমার দেশের অতীত প্রজ্ঞার আবার অভ্যুদয় ঘটবে। আমার জন্মস্থান, আমার পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত এই বাসভূমি, আমার সন্তান ও উত্তরসুরিগণের ভবিষ্যৎ বাসস্থান এবং আমার সর্বাধিক প্রিয়, কাঙ্ক্ষিত ও আদরণীয় সাহচর্য দ্বারা পরিবেষ্টিত নগরীতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটবে।" সুরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। ১৯২১ সালে মন্ত্রিত্বলাভের পর তাঁরই উদ্যোগে কলকাতা পৌরসভা আইন পাস হয় এবং পৌরশাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রীকরণের পদক্ষেপ সূচিত হয়।

এই পর্বে ১৮৮৫-র বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের কয়েকটি সংশোধনীও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯০২ সালের ১১ আগস্ট এই সম্বন্ধে একটি বিল আনেন ডব্লিউ. ই. ম্যাকফারসন। বলা হয়, সংশোধনীটি মামুলি। কিন্তু পর্যালোচনা করে দেখা যায় বিলটির সঙ্গে ভূমিসংক্রান্ত কিছু মৌলিক প্রশ্ন জড়িত আছে। বিলটি সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো হয়। কমিটির ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বি. এল. গুপ্ত (আই সি এস), আনন্দমোহন বসু, জয়গোবিন্দ লাহা প্রমুখ বিধায়করা। কিছু সংশোধনী সহ বিলটি ১৯০৩ সালে পাস হয়।

ভূস্বামীদের স্বার্থ যাতে কোনভাবেই ব্যাহত না হয় সেদিকে ব্রিটিশ সরকারের

নজর ছিল খুব বেশি। ১৯০৪ সালে বিধানসভায় সরকার বেঙ্গল সেটেল্ড এস্টেট বিল উত্থাপন করেন। ঐতিহ্যসম্পন্ন জমিদার পরিবারগুলোর অবক্ষয় ও অবলুপ্তির কবল থেকে রক্ষা করাই বিলের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে প্রস্তাবক সি. ই. বাকল্যান্ড মন্তব্য করেন। ইতিপূর্বে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সরকারের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে প্রতিপত্তিশালী জমিদার পরিবারের ক্রমশ বিলুপ্তি হয়ে যাওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সম্পত্তির বিভক্তিকরণ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলে। ভারত সরকার ও ভারতসচিবের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে জমিদারের স্থাবর সম্পত্তি পারিবারিক বন্দোবস্তের অধীনে রাখার জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে এবং ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন জমিদারি এলাকাগুলির বিভাজন রোধ করার চেষ্টা করা হবে। এটা স্পষ্ট যে আইনটি রচনার পিছনে শাসকশ্রেণীর নিজস্ব স্বার্থরক্ষার আগ্রহ যতটা প্রবল ছিল, প্রাচীন জমিদার পরিবারগুলিকে রক্ষা করার আগ্রহও ছিল তেমনি তীব্র। কারণ জমিদার শ্রেণীই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অতি অনুগত সমর্থক, সাম্রাজ্য রক্ষার মূল স্তম্ভ। শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ভূস্বামী সম্প্রদায় ছিল সরকারের রক্ষাকপাট। সুতরাং তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করে সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল সরকারের আসল উদ্দেশ্য। ড. আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতীয়রাও বিলটি সমর্থন করেন। বিলটি পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে জমিদার সদস্যরা সরকারকে অভিনন্দন জানান এবং তাদের আনুগত্যের নিশ্চয়তা দেন।

১৮৯২-১৯২০-র আইনসভাকে জমিদাররা সব সময়ই নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯১১ সালে সরকারের তরফ থেকে কলকাতার উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি বিল বিধানসভায় পেশ করা হয়। বিলটিতে বাধ্যতামূলক ভূমি অধিগ্রহণের ধারা থাকার ফলে ভূস্বামী সম্প্রদায় বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন। ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট গঠনের প্রস্তাবেও ভারতীয় সদস্যরা বাধা দেন। এই বিলে দু'শোর বেশি সংশোধন প্রস্তাবিত হয় এবং অসংখ্য বিভাজন (ডিভিসন) দাবি করা হয়। অনেক সময়ই ছোটলাটকে নির্ণায়ক ভোট দিতে হয়। ভারতীয়দের বিশেষ করে জমিদারদের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও বিলটি পাস হয়। ইংরেজরা অবশ্য বিলটিকে কলকাতার উন্নয়নে একটি যথোচিত পদক্ষেপ বলে মনে করেন এবং এটি পাস হলে ভবিষ্যতে কলকাতা অনুরূপ আকারের আধুনিক নগরগুলির মধ্যে অন্যতম হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। ছোটলাটও এই আশা ব্যক্ত করে বলেন, "শহরের কলঙ্কস্বরূপ আবর্জনাময় যেসব অঞ্চল এখনও রয়ে গিয়েছে, এই বিল পাস হওয়ার ফলে সেগুলি অচিরেই দূরীভূত হবে। একপুরুষ পরে আমাদের মধ্যে যাঁরা তখনও জীবিত থাকব তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হবে এখনকার কলকাতা।" ভারতীয় সদস্যরা

অবশ্য শাসকদের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হননি। সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ কিছুতেই তাঁরা বরদাস্ত করতে পারেননি।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই পর্বের বিধানসভার আরেকটি অভিনবত্ব হলো, দ্রুত আইন প্রণয়ন। এখনকার মতো তখনও একটি বিল আইনে রূপ নিতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হতো। স্বভাবতই এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইনই অভীষ্ট সাধনে সক্ষম হতো না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় ব্যাপকহারে খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করে ঘি, মাখন ইত্যাদিতে ভেজাল মেশানো শুরু হয়। কলকাতার নাগরিকদের এক প্রতিনিধিদল গভর্নর আর্ল অব রোনাল্ডশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জরুরী ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা পৌরসংস্থা সংশোধন বিল (১৯১৭) পরিষদ উত্থাপন করেন লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। তৎপরতার সঙ্গে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নে অগ্রসর হওয়ায় ভারতীয় সদস্যরা সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর অবশ্য এই ধরনের 'ত্রস্ত আইন প্রণয়নের" বিরোধিতা করেন এবং বিলটিকে সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানোর দাবি করেন।[২০] নীলরতন সরকার, এ. কে. ফজলুল হক ও অন্যান্যরা পালের বিরোধিতা করেন। বিলটি একদিনে পাস হয়ে যায়। তবে তড়িঘড়ি করে এই ধরনের আইন প্রণয়নে অনেকেই অসন্তুষ্ট হন। রোনাল্ডশে অভিযোগ করেন, যাঁরা সরকারকে জরুরী আইন প্রণয়নের জন্য উৎসাহিত করছিলেন, তাঁরাই এখন সরকারের কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যস্ততার জন্য দোষারোপ করছেন। এই বিল পাস হওয়ার ফলে খাদ্যে ভেজাল দেওয়া বন্ধ হয়। একই দিনে (৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭) একটি বিল প্রস্তাবিত, বিবেচিত, আলোচিত ও আইনে প্রণীত হওয়ার দৃষ্টান্ত ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে এই প্রথম বলে সরকার দাবি করেন।

আইন প্রণয়ন ছাড়াও এই পর্বে "সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রস্তাব বা সংকল্প" পেশ করে ভারতীয় সদস্যরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। "সাধারণত কোন কার্যের জন্য সুপারিশ, সনির্বন্ধ আবেদন বা অনুরোধ কিম্বা সরকারের বিবেচনার জন্য কোনও বিষয় বা অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ" করাই ছিল সংকল্পের উদ্দেশ্য। এই ধরনের সংকল্প বা প্রস্তাব গৃহীত হলে সরকার প্রস্তাবগুলি কার্যকর করার চেষ্টা করতেন। ১৯১৬-র পর এই ধরনের প্রস্তাবের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং এক হিসেবে দেখা যায় ১৯১৭-২০ এর মধ্যে ৬৫১টি প্রস্তাব বিধানসভায় উপস্থাপিত ও বিবেচিত হয়েছিল।[২১] ভারতীয় সদস্যরা এই সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। জল সরবরাহ, রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, বন্যাত্রাণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, হাসপাতাল, পৌরপ্রশাসন, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সংকলন উত্থাপন করে ভারতীয় সদস্যরা এর প্রতিবিধান

দাবি করতেন। রোনাল্ডশে খানিকটা আত্মতৃপ্তির ভঙ্গীতেই বঙ্গীয় পরিষদের সাফল্যের পিছনে এই প্রস্তাবপত্র বা সংকল্পের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। বিধানসভায় তিনি বলেন, এই সংকল্প মারফত শাসনযন্ত্রের এমন কোন বিষয় নেই যা অণুবীক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়নি। কোন বিষয় এই সভাকক্ষের পর্যালোচনা এড়িয়ে যায়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শিক্ষার বিভিন্ন দিক যেমন—প্রাথমিক শিক্ষা, অবৈতনিক শিক্ষা, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় প্রস্তাবের মাধ্যমে বিধানসভায় উপস্থাপিত হয়। প্রায়শই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা প্রস্তাবাকারে সদস্যরা বিধানসভায় উত্থাপন করতেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে সরকারি নীতিও আলোচনা হতো পরিষদে। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮, আরউইন নামে একজন বেসরকারি ইউরোপীয় সদস্য বিদ্যালয় স্তরে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পঠনপাঠনের দাবি করেন। অপর এক ইউরোপীয় সদস্য মিঃ আর্ডেন উড প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেন এবং বাঙালীকে "পৃথিবীর পরিচ্ছন্নতম জাত" হিসেবে উল্লেখ করে দূষিত জল, সংক্রামক ব্যাধি ইত্যাদির সম্বন্ধে জনমত গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন। ডাঃ নীলরতন সরকার প্রস্তাবটিকে উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করে একটি উদ্দীপ্ত ভাষণ দেন। ভারতীয় সদস্যরা ইংরেজদের এই আন্তরিকতায় মুগ্ধ হন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ অবশ্য মনে করেন এই ধরনের শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক নেই। সুতরাং প্রস্তাবটিকে অধিক গুরুত্ব না দেওয়াই শ্রেয়। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটির উপর ভোটগ্রহণ করা হলে বিভাজন দাবি করা হয়। পক্ষে ২৪টি ও বিপক্ষে ১৮টি ভোটে প্রস্তাব পাস হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সংকট আরও ঘনীভূত হয়। অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ১৯১৮-১৯-এ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিরাট ঘাটতি দেখা যায়। মহামারীও বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক আকার ধারণ করে। এক হিসেব মতে ১৯১৮-১৯ সালে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ভারতবর্ষে এক কোটি বিশ লক্ষের ওপর মানুষকে প্রাণ দিতে হয়। ১৯২১-এর আদমসুমারির তথ্য থেকে জানা যায় অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের ফলে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষণীয়ভাবে কমতে শুরু করে। বাংলার বিধানসভায় এই ভয়াবহ অর্থনৈতিক দুর্দশা সম্বন্ধে সরকারের সমালোচনায় ভারতীয় সদস্যরা খুবই সোচ্চার ছিলেন। জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার চিত্র শাসকদের কাছে প্রস্তাবপত্র বা সঙ্কল্পের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেন ফজলুল হক, অখিলচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, রাধাচরণ পাল প্রমুখ বিধায়ক। ফজলুল হক ১৯১৮ সালের ৩ জুলাই বঙ্গীয় পরিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন ধান ও পাটের দাম অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে কাপড়ের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের

বাইরে পৌঁছেছে। তিনি আরও বলেন, আগের বছর একজন চাষী এক মণ ধান বিক্রি করে দু'জোড়া কাপড় কিনতে পারত, এক মণ পাটের বদলে সে পেত তিন জোড়া কাপড়। কিন্তু এখন দু'মণ পাট বিক্রি করে একজোড়া কাপড়ও সে পায় না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত দুরবস্থা প্রতিকারের জন্য তিনি সরকারকে একটি কমিটি গঠনের অনুরোধ জানান।[২২] সরকারের পক্ষ থেকে স্যার হেনরি হুইলার প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে সম্মত হন এবং বলেন, কমিটি হয়তো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাতও করতে সক্ষম হবে। লবণের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধেও অখিলচন্দ্র দত্ত একটি প্রস্তাব আনেন। সরকার থেকে জানানো হয় যে, লবণের মূল্য হ্রাসের জন্য ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ; ফলে উত্থাপক প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন। বিধায়ক মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দরিদ্র ও স্বল্প আয় বিশিষ্ট মানুষের উপর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আরেকটি প্রস্তাব বিধানসভায় উত্থাপন করেন (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯)। একের পর এক ভারতীয় সদস্য এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন এবং গ্রামবাংলার মানুষের দুরবস্থার এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন। উত্তরে স্যার হেনরি হুইলার বলেন, "মূল্যবৃদ্ধি একটি প্রাদেশিক সমস্যা নয়, সারা ভারত এই সমস্যায় জর্জরিত, বস্তুত সারা বিশ্বের প্রতিটি দেশেই এই সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে।" তিনি এই বিষয়ে সরকারি নীতি ও কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন কিন্তু ভারতীয় সদস্যদের তা আশ্বস্ত করতে পারে না। ভারতীয় সদস্যদের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত ভোট নেওয়া হয় কিন্তু ভোটে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।[২৩]

বহির্বিশ্বের ঘটনাবলীও বিধায়কদের প্রস্তাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে অম্বিকাচরণ মজুমদার ১৪ নভেম্বর, ১৯১৮ অভিনন্দনসূচক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য সভাপতির অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিশ্বের পরিস্থিতি বিবেচনা করে সভাপতি প্রস্তাবটি উত্থাপনের অনুমতি দেন। ইংলন্ডের সম্রাট ও রাজসিংহাসনের প্রতি ভারতের ঐকান্তিক আনুগত্য জানিয়ে স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী আশা প্রকাশ করেন, "ভার্সাই-এ অনুষ্ঠিতব্য শান্তি বৈঠক" প্রগতি, সভ্যতা, মানবতা ও ন্যায়ধর্মের অগ্রগতির সহায়ক হবে।" লক্ষণীয়, বিধানসভার ভারতীয় সদস্যদের, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন নরমপন্থী এবং সাংবিধানিক কাঠামোয় সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের পক্ষপাতী, রাজানুগত্যে তাঁদের কোন ত্রুটি ছিল না।

১৮৯২-১৯২০ পর্বের আরেক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিধানসভার প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গ। সরকারি নীতি ও কর্মপদ্ধতির বিভিন্ন দিক প্রশ্নের মাধ্যমে বিধায়করা বিধানসভায় উত্থাপন করতেন। জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত নানা বিষয়, শাসকদের অত্যাচার অবিচারের নানা কাহিনী, দুর্নীতি ও বিভেদনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় প্রশ্ন

মারফত বিধানসভায় উত্থাপন করতেন ভারতীয় সদস্যরা। অসংখ্য উচ্চমানের প্রশ্ন বঙ্গীয় পরিষদে উত্থাপিত হয়। বাংলার বিধায়কদের প্রশ্ন করার নৈপুণ্য বিভিন্ন মহলে সমাদৃত হয়, লন্ডনের টাইমস্ পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য পর্বে বাজেট বিতর্কের মাধ্যমেও ভারতীয় সদস্যরা অনেক সময় সরকারকে নাজেহাল করে তুলতেন ; সরকারের আর্থিক নীতির দেউলিয়াপনা উদ্‌ঘাটিত হতো।

ভারতীয়দের কাছে আইনসভার বৈধতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঔপনিবেশিক শাসকরা নির্ভর করতেন সামাজিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন, রক্ষণশীল, ব্রিটিশরাজের আশ্রিত ও পৃষ্ঠপোষকতালাভে উদগ্রীব জমিদার শ্রেণীর উপর। পরবর্তীকালে পেশাদার, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠী শাসকদের অনুগ্রহ লাভ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, আইনজীবী, এমনকি কয়েকজন উদারমনা ভারতীয় সিভিলিয়ান। জমিদাররা নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থরক্ষা করতেই বেশি উদগ্রীব ছিলেন। যেসব বৃত্তিজীবী শিক্ষিত ভারতীয় ১৮৯২-১৯২০-র পর্বে বিধানসভায় সদস্য হয়ে আসেন, তাঁরা অনেক সময়ই জনজীবনের নানা সমস্যা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অব্যবস্থা সম্বন্ধে সোচ্চার ছিলেন। বিভিন্ন সংসদীয় পদ্ধতিকে আশ্রয় করে তাঁরা অনেক সময় সরকারকে কোণঠাসা করতেও সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু ভারতে ইংরেজ কর্তৃত্ব বা ঔপনিবেশিক শাসনের বৈধতা সম্বন্ধে এঁরা কোনদিনই কোন প্রশ্ন তোলেননি। বড়জোর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপস্থাপন করেছেন। স্বায়ত্তশাসনের প্রতীক পৌরপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালায়ের শিক্ষা ইত্যাদির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণে এঁরা বিরোধী ছিলেন। কলকাতায় মিউনিসিপ্যাল বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ২৮ জন ভারতীয় কমিশনার পদত্যাগ করেছিলেন। এই ধরনের আরও ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় বিধানসভার কার্যবিবরণীতে। বাংলার সদস্যদের প্রতিবাদী মনোভাব ভারতের অন্য আইনসভায় যাতে প্রতিফলিত না হয় সেজন্য ইংরেজ শাসকরা সবসময় সতর্ক ছিলেন। স্থানীয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ অনেক সময় আইনসভার সদস্যদের ভূমিকার স্বীকৃতি দিলেও দিল্লি বা লন্ডনের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের নরম মনোভাব দেখালে প্রাদেশিক সরকারের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করতেন। গভর্নর কারমাইকেল নরমপন্থীদের প্রতি "আদুরে বিড়াল" নীতি অবলম্বন করছেন বলে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে অনুযোগও করা হয়। মোট কথা, বিদেশী শাসকরা কোনভাবেই আইনসভার উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার পক্ষপাতী ছিলেন না। আইনসভাকে তাঁরা এমন এক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে চাইতেন যা শাসন এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তাঁদের সহায়ক হবে।[২৪] মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারে আইনসভার সংখ্যাগত পরিবর্তন

সূচিত হয় এবং বাংলার সাংবিধানিক রাজনীতিতেও এর প্রতিফলন ঘটে।

কংগ্রেসের নরমপন্থীদের দলে টেনে চরমপন্থীদের নির্মূল করা এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে ঔপনিবেশিক শাসনকে সংকটমুক্ত ও দীর্ঘায়িত করাই ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির লক্ষ্য। সংসদীয় রাজনীতিতে ১৮৯২-১৯২০ পর্বে শাসকরা অত্যন্ত নিপুণভাবে এই নীতি কার্যকর করতে সক্ষম হন। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক অনৈক্য আনতে শাসকগোষ্ঠীর কর্মসূচী অনেকাংশে সাফল্যলাভ করে। কিন্তু সবসময় যে বিদেশী শাসকরা তাঁদের গৃহীত নীতির বাস্তব রূপায়ণে সফল হয়েছিলেন একথা বলা যায় না। লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬)-র ফলে বাংলার মুসলিম স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় তাতে সন্দেহ নেই, কারণ মুসলমানরা জনসংখ্যার ৫২.৬ শতাংশ হয়েও আইনসভার আসনের ভাগ পান ৪০ শতাংশ (৩৪টি আসন)। মুসলমানরা এতে বিক্ষুব্ধ হন কিন্তু প্রধানত ফজলুল হকের চেষ্টায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতির যে বাতাবরণ তৈরি হয় বাংলার সংসদীয় রাজনীতিতেও তার প্রভাব পড়ে। ফজলুল হক ও অন্যান্য মুসলমান বিধায়কদের হিন্দু সদস্যদের সঙ্গে একযোগে ইংরেজ সরকারের সমালোচনা করতে দেখা যায়, তবে সংসদীয় রাজনীতি এই পর্বে একান্তভাবে উচ্চবর্গের নেতৃত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আলোচ্য পর্বে বিধানসভায় ভারতীয় সদস্যদের ভূমিকা প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাবোর্ড থেকে নির্বাচিত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একটি উক্তি উল্লেখ করতে হয়। অখিলচন্দ্রের মতে "পরিষদের ভারতীয় সদস্যরা গ্রীক ট্র্যাজেডি দোহারদের ভূমিকা পালন করেন মাত্র।"[২৫] ফজলুল হকও বলেন, "চার বছর আমি এই পরিষদের সদস্য আছি, তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি সরকারি মতের বিরোধিতা করা পাথরে মাথা ঠোকারই শামিল।"[২৬] কংগ্রেস সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেন, "আমাদের সহজ ও সরল এই কথাটা মেনে নেওয়া উচিত যে সরকার ও জনগণের মধ্যে কোনও সহযোগিতা চলতে পারে না। কারণ পরস্পরের প্রতি রয়েছে অবিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার অভাব।"[২৭] এতদ্‌সত্ত্বেও বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে ভারতীয় সদস্যরা শুধু প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, প্রতিরোধেরও পথ নিয়েছেন সময় সময়। বর্ধমান বিভাগের কমিশনার সি. ই. বাকল্যান্ড (বেঙ্গল আনডার লেফটেনান্ট গভর্নর-এর লেখক) কালনা মিউনিসিপ্যালিটি পরিদর্শন করতে গিয়ে চেয়ারম্যান সূর্যনারায়ণ সর্বাধিকারী সম্বন্ধে অপমানকর মন্তব্য করেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররা একযোগে এর প্রতিবাদ করেন। সূর্যনারায়ণও পদত্যাগ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন তুললে সরকার বাকল্যান্ডের বক্তব্য তলব করেন। জবাবে বাকল্যান্ড এই অভিযোগ

অস্বীকার করেন এবং বলেন, ব্যক্তিগতভাবে চেয়ারম্যানের প্রতি রূঢ় আচরণ করার কোন অভিপ্রায় তাঁর ছিল না, মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্মের তিনি সমালোচনা করেছেন মাত্র। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ঐ সময় এই ঘটনা নিয়ে প্রবল আলোড়ন ওঠে। ম্যাকেঞ্জি বিলের আলোচনায় অংশ নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর স্থির বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেন, "আমাদের দুর্বল হাত থেকে হয়ত সাময়িকভাবে প্রতিবাদের পতাকা স্খলিত হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু অন্যরা তাকে তুলে ধরে নিশ্চিত বিজয়ের পথে এগিয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত প্রগতি প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে"। এই ধরনের আরও ঘটনা থেকে ভারতীয়রা ক্রমশ যে প্রতিরোধের পথ বেছে নিচ্ছিলেন তার অনেক নজির পাওয়া যায় বিধানসভার বিভিন্ন দলিলে।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনে এই পর্বের আইনসভার যে বিশেষ ভূমিকা ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্তের আবর্ত থেকে পরবর্তী পর্যায়ে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের সঙ্গে সংসদীয় রাজনীতির সম্পৃক্তিকরণের পূর্বাভাস এই পর্বে নির্দিষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া (১৯২১-১৯২৩)

দ্বৈতশাসন ও নরমপন্থার অবসান

২০ আগস্ট, ১৯১৭ ভারতসচিব এডউইন মন্টেগুর ঘোষণায় বলা হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ভারতে "দায়িত্বশীল" শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা ও "স্বায়ত্তশাসিত" প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশ ঘটানোই প্রস্তাবিত সংস্কারের লক্ষ্য। মন্টেগু ১৯১৭-র নভেম্বর মাসে ভারতে আসেন এবং বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে পাঁচ মাস ভারত সফর করেন। ৮ জুলাই, ১৯১৮ মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ১৯১৯-এর ভারতশাসন আইন প্রণীত হয়। নতুন আইনে আইনসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রসারিত ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং প্রদেশে প্রদেশে দ্বি-আঙ্গিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়। প্রদেশগুলোতে গভর্নরের অধীনে শাসন পরিষদ গঠন করে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত—এই দুই ভাগে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাকে ভাগ কবা হয়। স্বরাষ্ট্র, পুলিশ, বিচার, অর্থ, ভূমিরাজস্ব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত বিষয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ইউরোপীয় আমলা ও অতি অনুগত দু'একজন ভারতীয়ের হাতে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, রেজিস্ট্রেশন, কৃষি ইত্যাদি হস্তান্তরিত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত হন ভারতীয় মন্ত্রীরা। সংরক্ষিত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের দায়িত্ব থাকে গভর্নর তথা ভাইসরয়ের হাতে। তত্ত্বগতভাবে হস্তান্তরিত বিষয়ের মন্ত্রীরা আইনসভার কাছে দায়ী থাকলেও বাস্তবে আইনসভা অপেক্ষা গভর্নর বা প্রদেশপালের সন্তুষ্টির উপরই তাঁদের কার্যকাল নির্ভরশীল ছিল। প্রদেশস্তরে পুরো কাঠামোর উপর ছিল গভর্নরের বল্গাহীন ক্ষমতা।

তৎকালীন ভারতীয় পরিস্থিতি ১৯১৯-এর শাসন সংস্কার অনেকটা অনিবার্য করে তুলেছিল। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে যে চুক্তি ও সমঝোতা হয় তার ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আরও প্রশস্ততর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কংগ্রেস ও লীগ যুক্তভাবে ইংরেজ সরকারের কাছে এক মিলিত দাবি পেশ করতেও সক্ষম হয়। লক্ষ্ণৌ চুক্তি শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলিমের মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু ইংবেজদের সাময়িক দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশন (১৯১৬) চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাতেও সক্ষম হয়। শাসকদের কাছে এটাও ছিল

উদ্বেগের কারণ। অ্যানি বেশান্তর হোমরুল লীগও এই সময় শাসন সংস্কারের দাবিতে ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করতে উদ্যোগ নেয়। সবকিছু মিলিয়ে ভারতীয়দের বিক্ষুব্ধ মনোভাব প্রশমনের জন্য শাসনব্যবস্থা সংস্কারের ঘোষণা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়।

দায়িত্বশীল সরকার ও স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদির উল্লেখ এবং ভারতীয়দের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের সংস্থান থাকায় মন্টেগুর ঘোষণাকে অনেকে ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে সমর্থন জানান। তাঁরা আরও উৎসাহিত হন কারণ ইতিপূর্বে কার্জন, মর্লে প্রমুখ ইংরেজ রাজনীতিবিদরা ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থার সম্ভাবনা পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছিলেন। কার্জন এমনও বলেছিলেন, ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা কয়েক ঘণ্টাও টিকে থাকতে পারবে না। স্বভাবতই মন্ট-ফোর্ড পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া ছিল পরস্পরবিরোধী। নরমপন্থীরা মন্টফোর্ড রিপোর্ট ও ভারতশাসন আইনকে স্বাগত জানান। এর কাঠামোর মধ্যেই ভারতে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং পরবর্তী স্তরে ডোমিনিয়ন মর্যাদার সম্ভাবনা দেখেন তাঁরা। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে মন্টেগুর ঘোষণা ও পরবর্তী সংস্কার আইন সম্বন্ধে প্রথম থেকেই মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা ও গোষ্ঠীকে প্রায়শই নিজ নিজ মত পরিবর্তন করতেও দেখা যায়। মুসলমান নেতৃত্বের বৃহদাংশ মন্ট-ফোর্ড সংস্কারের মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষিত হয়নি বলে অভিযোগ করেন এবং আইনসভা ও দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় মুসলমানদের আরও অধিক প্রতিনিধিত্ব চেয়ে সংস্কারের পরিবর্তন দাবি করেন। বাংলার চরমপন্থী নেতৃত্বের একাংশ এবং 'নায়ক', 'বসুমতী' ইত্যাদি সংবাদপত্র প্রথম থেকেই সংস্কারের বিরোধী ছিল। কারণ, এর মধ্যে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার কোনও গুণগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত ছিল না। বাংলার নেতৃবৃন্দের একাংশ সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন, মন্ট-ফোর্ড প্রস্তাবে কাঠামোগত কোনও পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি ; ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা সংহত করার জন্য কিছু সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে মাত্র।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তেজবাহাদুর সপ্রু প্রমুখ নরমপন্থী নেতারা ১৯১৯-এর আইনকে এই ভেবে স্বাগত জানান যে, এর যথাযথ রূপায়ণের মাধ্যমেই ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হবে। সুরেন্দ্রনাথের পত্রিকা 'বেঙ্গলি' মন্টেগুকে 'ভারতবন্ধু' বলে সম্বোধন করে তাঁকে স্বাধীনতার প্রেরণাদাতা ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের উদ্ভাবক বলে আখ্যায়িত করে। নরমপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের বিশ্লেষণ ছিল বহুলাংশে পৃথক, ফলে অচিরেই নরমপন্থী ও কংগ্রেসের মধ্যে মতপার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বোম্বাই কংগ্রেসের (১৯১৮) প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল মন্ট-ফোর্ড সংস্কার, নরমপন্থীরা ঐ অধিবেশনে যোগ দেননি[১] কারণ সংস্কারের বিরুদ্ধে কোন আলোচনায় অংশীদার তাঁরা হতে চাননি। পরিবর্তে ১ নভেম্বর, ১৯১৮ বোম্বাই

শহরেই আলাদা সভা করে নরমপন্থীরা মন্ট-ফোর্ড প্রস্তাবকে পুরোপুরি সমর্থন জানান। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে ঐ সময় ন্যাশনাল লিবারেল লীগ গঠিত হয়। এর ফলে নরমপন্থীরা যে পুরোপুরি শাসকদের কৃপাপ্রার্থী, এটা অন্তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নরমপন্থীরা দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন, ব্যক্তিগত উচ্চাশা পূরণের জন্য তাঁরা ইংরেজদের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহে ব্যস্ত, এই ধরনের নানা অভিযোগ উত্থাপিত হয় চরমপন্থীদের পক্ষ থেকে। ফ্র্যানচাইজ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন সুরেন্দ্রনাথ, প্রভাস মিত্রকে কুখ্যাত রাওলাট কমিটির সদস্য করা হয়। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ পান ভারত সচিবের সহকারীর পদ এবং সেই সুবাদে লর্ড সভার সদস্যপদ। ১৯২০-র নির্বাচনে নরমপন্থীরা অংশ নেন এবং দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় হস্তান্তরিত বিষয়ের দায়িত্ব নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রভাসচন্দ্র মিত্র যোগদান করেন। সুরেন্দ্রনাথকে বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করেন গভর্নর রোনাল্ডশে।

কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির টানাপড়েনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মন্ট-ফোর্ড পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়া মাত্র অ্যানি বেশান্ত একে ভারতবাসীর কাছে অমর্যাদাকর বলে অভিহিত করেন। তিলক এই পবিকল্পনাকে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। বিপিনচন্দ্র পাল মনে করেন সংস্কারে যা আছে তাতে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কোনোমতেই দায়িত্বশীল বলে গণ্য করা যায় না। গান্ধীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াও ছিল প্রস্তাব বর্জনের পক্ষে। কিন্তু ১৯১৮ সালে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে সংস্কারের মূলনীতি গ্রহণ করে অন্তত যাচাই করার পক্ষে মত দেন গান্ধী। তবে বোম্বাই কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত মন্টেগুর ঘোষণাকে হতাশাব্যঞ্জক বলে প্রস্তাব পাস করে। ঐ বছরই কংগ্রেসের দিল্লি অধিবেশনে কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলিতে পুরোপুরি 'দায়িত্বশীল' সরকার গঠনের দাবি করা হয়। অমৃতসরে কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় (১৯১৯) জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, রাওলাট আইন ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে। গান্ধী ঐ কংগ্রেসে মন্টেগু সংস্কার গ্রহণের পক্ষে রায় দেন এবং কাউন্সিল বর্জনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। ব্রিটিশের বাড়ানো হাত গ্রহণ না করলে ভারতবাসী মর্যাদার আসন হারাবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিলক ও চিত্তরঞ্জন কাউন্সিলে অংশগ্রহণ করার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। অমৃতসর কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত সংস্কারনীতিকে যথাযথ রূপদানের মাধ্যমে একে কার্যোপযোগী করা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করে। এর অব্যবহিত পরেই কলকাতা কংগ্রেসের (সেপ্টেম্বর, ১৯২০) আগে গান্ধী একক সিদ্ধান্তে সারা দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানান। প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা ও মতপার্থক্য সত্ত্বেও কলকাতা কংগ্রেসও ১৮৫৫-৮৭৩ ভোটে অসহযোগের প্রস্তাব সমর্থন করে।

অসহযোগের অঙ্গ হিসেবে কাউন্সিল বর্জনের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য গান্ধী প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু, চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল প্রমুখ বাংলার নেতারা কাউন্সিল বয়কটের বিরোধিতা করেন। মহারাষ্ট্রের খেপার্ডে, এন সি কেলকার, উত্তরপ্রদেশের মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতারাও কাউন্সিলে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন। গান্ধী তাঁর কর্মসূচীর কিছুটা আপাতত স্থগিত রাখতে সম্মত হলেও কাউন্সিল বর্জনের প্রস্তাব আঁকড়ে থাকেন। নাগপুর অধিবেশন পর্যন্ত এই সব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়। নাগপুর কংগ্রেস (ডিসেম্বর, ১৯২০) গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানায়, তবে চূড়ান্ত খসড়ায় কাউন্সিল বর্জনের কোনো উল্লেখ থাকে না।

মন্ট-ফোর্ড সংস্কার, বিশেষ করে আইনসভায় অংশগ্রহণ নিয়ে গান্ধী-নেতৃত্বের সঙ্গে বাংলার মতবিরোধ প্রথম থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্রুমফিল্ড যদিও একে বাঙালী 'ভদ্রলোক'-এর দোদুল্যমানতা ও সংস্কারপন্থার প্রতি দুর্বলতা বলে অভিহিত করেছেন কিন্তু আসলে স্বদেশী আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় বয়কট-বর্জন ইত্যাদি কর্মসূচীর সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে বাংলার নেতৃবৃন্দ সম্যকভাবেই ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং সেজন্যই আইনসভা বর্জনের যৌক্তিকতা তাঁরা কোন সময়ই সমর্থন করতে পারেননি। মতিলাল নেহরুও এ-ব্যাপারে বাংলার নেতৃত্ব মেনে নেন, কারণ তাঁর মনে হয় আইনসভার নির্বাচনে অংশ নিলে জাতীয়তাবাদেরই বিজয় সূচিত হবে। আইনসভায় অংশ না নেওয়া, অথবা অংশ নিয়ে একে বানচাল করা, কোন্‌টা সঙ্গত তৎকালীন পরিস্থিতি বিচার করে পরে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, কলকাতা কংগ্রেসের আগেই বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আইনসভায় ঢুকে অসহযোগের মাধ্যমে আইনসভাকে অকেজো করে দেওয়ার প্রস্তাব নেয়। কলকাতা কংগ্রেসে বিপিনচন্দ্র পাল এ বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাবও আনেন। পালের সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশ যে বক্তব্য রাখেন তাতে তিনি কাউন্সিলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে অসহযোগের কর্মসূচী সফল করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কাউন্সিলে ঢুকে আইরিশ ধাঁচের অসহযোগিতা চালিয়ে ইংরেজদের ব্যাপকতম শাসনসংস্কারে বাধ্য করা, আর তা না হলে সংস্কারকে পুরোপুরি বানচাল করা—এই ছিল চিত্তরঞ্জনের নীতি। আইনসভায় যোগদান আইন অমান্য কর্মসূচীর পরিপূরক বলে চিত্তরঞ্জন মনে করতেন। কলকাতায় যখন কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল, সরকারের পক্ষ থেকে সেই সময় বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়। চিত্তরঞ্জনের সমর্থক অনেকেই নির্বাচন প্রার্থী ছিলেন। কলকাতা কংগ্রেসে আইনসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা বর্জন নিয়ে কোনও ফয়সালা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনের সমর্থক ২৪ জন বাঙালী আসন্ন নির্বাচন থেকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন। চিত্তরঞ্জন কাউন্সিল বয়কটের প্রস্তাব

কোনও সময়ই মেনে নিতে পারেননি। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান বয়কটের জন্য গান্ধী যে নির্দেশ দেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আগেই তা প্রত্যাখ্যান করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এইসব সংস্থা থেকেই বিধানসভার অনেক সদস্য নির্বাচিত হতেন। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর (১৯২১) আবার আইনসভায় অংশগ্রহণের প্রশ্ন গুরুত্ব পায়। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, বিটলভাই প্যাটেল, আজমল খাঁ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আইনসভাকে স্বরাজ লাভের পক্ষে ব্যবহার করা, অথবা আইনসভার মাধ্যমেই ১৯১৯-এর সংস্কারকে সম্পূর্ণভাবে বানচাল করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কংগ্রেসের মধ্যে ঐ নিয়ে বাদানুবাদ চলতেই থাকে। রাজাগোপালাচারী প্রমুখ গান্ধী সমর্থকরা আইনসভা বর্জনের পক্ষে প্রচার করতে থাকেন। গয়া কংগ্রেসে ((১৯২২) নির্বাচনপন্থী ও নির্বাচনবিরোধী এই দুই দলে কংগ্রেস বিভক্ত হলে চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জানুয়ারি ১৯২৩-এ স্বরাজ পার্টি গঠন করে আইনসভা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

মন্ট-ফোর্ড সংস্কার সম্বন্ধে মুসলিম মনোভাব আলোচনায় লক্ষ্ণৌ চুক্তির উল্লেখ করতেই হয়। লক্ষ্ণৌ চুক্তির (১৯১৬) ইতিবাচক দিক হলো, এই চুক্তি ধর্মের প্রশ্নকে বাইরে রেখে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে সংহত করতে অনেকাংশে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, মহম্মদ আলি জিন্নাও ঐ সময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে ধর্মীয় চেতনার ভিত্তিতে দাঁড় করানোর বিরোধী ছিলেন। লক্ষ্ণৌ চুক্তির ফলে বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানরা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ হয়েও আইনসভায় মুসলমানদের জন্য শতকরা ৩০ ভাগ আসন নির্দিষ্ট হয় ; অথচ মুসলমানরা বাংলার জনসংখ্যার ৫২.৬ শতাংশ হলেও তাদের জন্য আসন বরাদ্দ করা হয় ৪০ ভাগ, আর পাঞ্জাবে (৫০ ভাগ জনসংখ্যার ৫৪.৮ ভাগ মুসলমান) ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাঙালী মুসলমানদের একটা বড় অংশ যেমন এই চুক্তিকে সমর্থন করেন, তেমনি ঘোরতর সাম্প্রদায়িকতাবাদী নবাব আলি চৌধুরীর নেতৃত্বে সেন্ট্রাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন এই চুক্তির বিরোধিতা করে। লক্ষ্ণৌ চুক্তি মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ভারতসচিব মন্টেগু আবার পৃথক নির্বাচনের বিরোধী ছিলেন। ফলে মন্ট-ফোর্ড সংস্কার সম্বন্ধে মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে সন্দিহান হন। মুসলিম লীগ, সেন্ট্রাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন এই তিনটি সংস্থাই মন্ট-ফোর্ড সুপারিশ সম্বন্ধে মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাই বহাল থাকে। মুসলমানরা নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারেই বেশি উৎসাহী ছিলেন। আইনসভায় প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি, মন্ত্রিত্বে সুযোগ লাভ ইত্যাদি বিষয়ের উপরেই তাঁরা গুরুত্ব দেন বেশি। ফ্র্যানচাইজ কমিটির কাছে তাঁরা যেসব স্মারকলিপি দেন তা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মন্টেগুর ঘোষণা সবচেয়ে বেশি বিব্রত করেছিল ইউরোপীয় আমলাদের। মন্টেগুর নির্দেশে নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে যেটুকু সীমিত ক্ষমতা দেওয়ার সংস্থান রাখা হয় আমলারা তাতেও বাদ সাধেন। তাঁরা সংসদ ধাঁচের কোন ব্যবস্থা ভারতে প্রচলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, এতে সমাজের উপরতলার কিছু লোক সুযোগ-সুবিধা পাবে, সাধারণ হিন্দু ও মুসলিম কোনভাবেই উপকৃত হবে না। মন্টেগুর 'ডায়েরি' থেকে বোঝা যায় তিনি কি পরিমাণ আমলাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কয়েকজন ইংরেজ আই সি এস এই সংস্কারের প্রতিবাদে পদত্যাগও করেন। ১৯১৯-এর ভারতশাসন আইন রূপায়ণের প্রথম পর্যায়ে বাংলার গভর্নর ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রাক্তন সদস্য ও কার্জনের সমর্থক রক্ষণশীল দলভুক্ত রোনাল্ডশে। বাংলার রাজপুরুষদের মধ্যে চীফ সেক্রেটারি হেনরি হুইলার, রাজস্ব সচিব জে. এইচ. কার প্রমুখ সকলেই ছিলেন রক্ষণশীল মতবাদের প্রবক্তা। স্বভাবতই নতুন শাসনবিধি রূপায়ণে এঁরা খুব উৎসাহী ছিলেন না।

বাংলার চরমপন্থীরা মনে করতেন ১৯১৯-এর তথাকথিত সংস্কার আইনে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন দূরে থাক, ব্রিটিশ আধিপত্যকে আরও সংহত ও শক্তিশালী করারই চেষ্টা করবে। মন্টেগুর সংস্কার বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে 'নায়ক' পত্রিকা মনে করে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতশাসন আইন রাজকীয় সম্মতি লাভ করে ২৩ ডিসেম্বর, ১৯১৯। আইনসভা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মবিধি প্রণয়নের কাজও শুরু হয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় বিধানসভার আসনসংখ্যা নিয়ে। মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আসনসংখ্যা বাংলার মুসলিম জনসংখ্যার আনুপাতিক নয় বলে মুসলমান নেতৃত্বের একাংশ অভিযোগ করেন। ইতিপূর্বে মন্ট-ফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার আইনসভার সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ এবং হিন্দু ও মুসলিম প্রতিনিধির মধ্যে আনুপাতিক হারে আসন বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য ফ্র্যানচাইজ কমিটি গঠন করেছিলেন। কমিটির তিনজন ভারতীয় সদস্যের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং ইন্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য আখতার আহ্‌মেদ। মুসলমানরা লক্ষ্ণৌ চুক্তির শর্তাবলী সম্বন্ধে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। সেপ্টেম্বর ১৯১৮ কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক দাঙ্গা বাঁধে। ফজলুল হক ঐ সময় কংগ্রেসের নীতিকে সমর্থন করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রচারে তাঁর প্রভাব ও ভাবমূর্তি অনেকটা ম্লান হয়ে পড়ে। অভিযোগ করা হয়, হিন্দুদের মধ্যে প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য তিনি মুসলমান স্বার্থ বিসর্জন দিচ্ছেন। স্বভাবতই গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা পরিস্থিতির পরিপূর্ণ সুযোগ নেয়। এই সময় কেন্দ্রীয় সংসদের প্রভাবশীল মুসলমান সদস্য জমিদার খান বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলি মুসলিমদের মধ্যে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেন। নবাব আলি ছিলেন সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। ফ্র্যানচাইজ কমিটির কাছে দেওয়া স্মারকপত্রে

নবাব আলি আইনসভায় মুসলমানদের ৪৪টি আসন দাবি করেন। বাংলা সরকার আসন বণ্টনের ব্যাপারে মোটামুটিভাবে লক্ষ্ণৌ চুক্তির পক্ষে ছিলেন। নবাব আলি দাবি করেন অন্ততপক্ষে আইনসভায় শতকরা ৫০টি আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। ফ্র্যানচাইজ কমিটির কাছে এই দাবি যুক্তিসঙ্গত মনে হয়নি। কমিটি বাংলা সরকারের সঙ্গে একমত হয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আইনসভায় শতকরা ৪৫টি আঞ্চলিক আসন সংরক্ষিত রাখার পক্ষে সুপারিশ করে। ফলে বঙ্গীয় বিধানসভার প্রস্তাবিত ১১২ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত ৩৪টি আসন মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। নবাব আলি ও মুসলিম সম্প্রদায় এই সুপারিশের বিরুদ্ধে সভা-সমিতি, সম্মেলন ইত্যাদি সংগঠিত করতে থাকেন। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব ভিনসেন্ট স্মিথকেও নবাব আলি মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবির যৌক্তিকতা বোঝাতে এবং ফ্র্যানচাইজ কমিটির রিপোর্টের ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে সক্ষম হন।[2] শেষ পর্যন্ত বঙ্গীয় বিধানসভার আসনসংখ্যা বাড়িয়ে ১৩৪ করা হয়। এর মধ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা করা হয় ৮৫ এবং মুসলমানদের জন্য শতকরা ৪৫টি আসন বরাদ্দ করা হয়। নবাব আলির প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়, লক্ষ্ণৌ চুক্তির চেয়ে মুসলিমরা শতকরা ৫ ভাগ বেশি আসন পান। ১৯১৯-এর ভারতশাসন আইনে বিধানসভার গঠন দাঁড়ায় নিম্নরূপ[3] :

ক. পদাধিকার বলে সদস্য			৪
খ. মনোনীত সদস্য			২২
ভারতীয় খ্রীস্টান ও অনুন্নত শ্রেণী		২	
শ্রমিক		২	
অন্যান্য		১৮	
গ. নির্বাচিত সদস্য			১১৩
অ-মুসলিম (শহরাঞ্চল)	১১		
অ-মুসলিম (গ্রামীণ এলাকা)	৩৫	৪৬	
মুসলিম (শহরাঞ্চল)	৬		
মুসলিম (গ্রামীণ এলাকা)	৩৩	৩৯	
ইউরোপীয়		৫	
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান		২	
ভূস্বামী		৫	
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়		১	
ইউরোপীয় ব্যবসা ও বাণিজ্য		১১	
ভারতীয় ব্যবসা ও বাণিজ্য		৪	
		সর্বমোট	১৩৯

ভোটাধিকার প্রসারিত করার বিষয়টিও এই সময় বিশেষ প্রাধান্য পায়। ফ্র্যানচাইজ কমিটির অন্যতম বিচার্য বিষয় ছিল ভোটাধিকার সম্বন্ধীয় যাবতীয় খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করা। সাধারণভাবে বাংলা সরকারের সুপারিশ ভোটাধিকার বিস্তৃত করার পক্ষেই ছিল। ইউরোপীয় আমলাদের ভয় ছিল প্রদেশে আংশিকভাবে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দু ভদ্রজনেরই ক্ষমতা বাড়বে, আমলাদের ক্ষমতা অনেকাংশে সংকুচিত হয়ে যেতে পারে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, ধনী ও সম্পত্তিবান বাঙালী যাদের বৃহদাংশই হবে হিন্দু সম্প্রদায়ের—তারাই রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে। আমলারা সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন, হিন্দু ভদ্রলোক, যাঁরা ছিলেন তৎকালীন রাজনীতির নিয়ন্ত্রক, তাদের কোন গণভিত্তি নেই। এই ভদ্রশ্রেণীর কর্তৃত্ব ও গুরুত্ব যাতে হ্রাস পায় সেজন্যই আমলারা সাধারণ লোককে ভোটাধিকার দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। গ্রামীণ এলাকায় যারা অন্তত এক টাকা বার্ষিক সেস দেয় তাদেরই ভোটাধিকার দেওয়া উচিত বলে বাংলা সরকার মত প্রকাশ করেন। আরও নানাভাবে শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভোটাধিকার সীমিত রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন ইউরোপীয় আমলারা। যেহেতু কলকাতায় ভদ্রলোকদের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, সেজন্য কলকাতার আসন সংখ্যা কমিয়ে মাত্র তিনটিতে নিয়ে আসা (যার একটি আবার মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত) এবং কলকাতা ও শহরতলিতে ভোটার হতে হলে ন্যূনতম বসবাসের একটি মাপকাঠি মেনে চলার নির্দেশ বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। বাংলায় বসবাসকারী বেসরকারি ইংরেজরা রাজনীতিতে ভারতীয়দের প্রাধান্যের বিরোধী ছিলেন। ইংরেজ ব্যবসায়ীরাও বিধানসভায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না ; বরঞ্চ ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত দায়িত্বশীল সরকার চরম বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে বলে তাঁরা মনে করতেন। বাঙালী হিন্দু ভদ্রজনেরা আবার ভোটাধিকার প্রসারিত করার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাদের মনে হয়েছিল এতে লাভবান হবেন মুসলমানরা। তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে ভোটার হওয়ার জন্য ন্যূনতম সম্পত্তির অধিকারী হওয়া ভোটাধিকারের আবশ্যিক শর্ত হিসেবে আরোপ করার তাঁরা পক্ষপাতী ছিলেন। শহরাঞ্চল, বিশেষ করে কলকাতায়, আসনসংখ্যা কমানোরও তারা বিরোধিতা করেন। কারণ, শহরে বসবাসকারী শিক্ষিত ব্যক্তিরাই রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন বলে তাঁদের মনে হয়। কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় প্রমুখ জমিদাররা সাধারণের মধ্যে ভোটাধিকার প্রসারিত করার বিরুদ্ধে ফ্র্যানচাইজ কমিটির কাছে সাক্ষ্যও দেন। জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির কাছে সাক্ষ্যদানকালে সুরেন্দ্রনাথও বলেন শিক্ষিত লোকেরাই সাধারণ মানুষের রক্ষক এবং স্বাভাবিক অভিভাবক।[৪] সুতরাং জনগণের মধ্যে ভোটাধিকার প্রসারিত করার কোনো অর্থ হয় না ; বরঞ্চ নানা অসুবিধা দেখা দেবে বলে সুরেন্দ্রনাথ মনে করেন। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী কৃষকদের শতকরা ৭৫ জনই ছিলেন

মুসলমান। ভোটাধিকার প্রসারিত হলে এরা ক্রমশ রাজনীতিতে উৎসাহী হয়ে উঠবে এবং হিন্দু স্বার্থ ব্যাহত হবে ; এ ধারণা তৎকালীন নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ফ্র্যানচাইজ কমিটি বাংলা সরকারের অধিকাংশ সুপারিশ মেনে নেয়। ভোটার সংখ্যা ৯ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১০ লক্ষ করা হয়। তবে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য যথাক্রমে ৮টি ও ৫টি আঞ্চলিক আসন সংরক্ষিত থাকবে বলে ফ্র্যানচাইজ কমিটি ঘোষণা করে। ১৯২০-এর নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ[৫]

	ভোটার সংখ্যা	*আসন সংখ্যা*
অ-মুসলিম (শহরাঞ্চল)	৬৭,২৯১	১১
অ-মুসলিম (গ্রামীণ এলাকা)	৪,৭৩,৮৯৮	৩৫
মুসলিম (শহরাঞ্চল)	১৫,৭৪৫	৬
মুসলিম (গ্রামীণ এলাকা)	৪,৪৯,৩৮২	৩৩
ইউরোপীয়	৪,০০৬	৫
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান	২,৯০১	২
ভূস্বামী	৭৩৭	৫
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	৬,১৪৪	১
ইউরোপীয় ব্যবসা ও বাণিজ্য	৮২৬	১১
ভারতীয় ব্যবসা ও বাণিজ্য	৪৮৮	৪
সর্বমোট	১০,২১,৪১৮	১১৩

১৯২০-র নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় বিধানসভার নির্বাচন হয় কিন্তু ইতিমধ্যে যুদ্ধপরবর্তী পরিস্থিতি ভারতীয় রাজনীতিতে এক গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে। কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে তাঁর ভাষণে লালা লাজপত রায় বলেন, "আমরা এক বৈপ্লবিক কালপর্বের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছি।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে প্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভি. আই. লেনিনও ভারতে বিপ্লবের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। বস্তুত, নানা ঘটনার অভিঘাতে বস্তুগত দিক থেকে যে এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ভারতে বিরাজ করছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ঘনীভূত সংকট, অন্তঃসারশূন্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব, ইংরেজদের প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে ভারতবাসীর মোহভঙ্গ, জনগণের দুর্বিষহ জীবনযাত্রা, সর্বোপরি রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীর আবির্ভাব ভারতীয় রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। বিশ্ব পরিস্থিতিও ভারতীয় জনগণের উন্নত চেতনা বিকাশে সহায়ক হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যুদয় ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার

সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তোলে। ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়। মন্ট-ফোর্ড পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার দিনকয়েক পরেই রাওলাট রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। একদিকে স্বায়ত্তশাসনের আশ্বাস, অন্যদিকে রাওলাট প্রতিবেদনে দমনপীড়নের হুমকি স্বভাবতই ভারতীয়দের প্রতিবাদমুখর করে তোলে। ভারতীয়দের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্কচ বিচারপতি সিডনি রাওলাটের সভাপতিত্বে গঠিত রাওলাট কমিটির সুপারিশ কেন্দ্রীয় সংসদে বিধিবদ্ধ হওয়ার পরেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিনা বিচারে আটক, জুরি ব্যতিরেকে বিচার ইত্যাদি দমনমূলক ব্যবস্থা থাকায় গান্ধী রাওলাট আইনকে "শয়তানি আইন" বলে অভিহিত করেন। ৬ এপ্রিল সারা ভারতে সাধারণ হরতালের ডাক দেওয়া হয় এবং অভূতপূর্ব সাড়াও পাওয়া যায়। এরপর ১৩ এপ্রিল ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগের বীভৎস হত্যাকাণ্ড। সরকারি মতে এই হত্যাকাণ্ডে নিহত হন ৩৭৯ জন মানুষ, বেসরকারি হিসেবে নিহতের সংখ্যা অনুমান করা হয় এক হাজারের বেশি, আহত হন কয়েক সহস্র। নাইট উপাধি ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ লর্ড চেমসফোর্ডকে জানান, "ব্যক্তিগতভাবে আমি চাই বিশেষ সম্মানের সবরকম ভার থেকে মুক্ত হয়ে আমার সেই স্বদেশবাসীর পাশে দাঁড়াতে, যে তার অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান ও অবমাননার ভারে নত।" বস্তুত জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর সরকারও বিশেষভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভকে সংগঠিত বিদ্রোহ বলে আখ্যা দেন ইংরেজ রাজকর্মচারীরা। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানত খিলাফত সমস্যাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া এককভাবে গান্ধী ১ আগস্ট, ১৯২০ থেকে সারা ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানান। এক কথায় ভারতীয় রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয় এই সময়। "যে রাজনীতি ছিল বৃহৎ জনতার সংস্পর্শ-রহিত, মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের সংকোচবিহ্বল আচরণে যা ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে সীমায়িত, সেই রাজনীতির অভূতপূর্ব রূপান্তর তখন ঘটেছিল।"[৬]

অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে শাসকরা চাইছিলেন ভারতীয় রাজনীতিকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করতে। আইনসভার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা এবং ভারতীয়দের কাছে আইনসভাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার বিষয়ে শাসকরা ছিলেন সক্রিয়। বস্তুত ঐ সময় থেকেই আইনসভার রাজনীতিকে সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিয়ামক হিসেবে দাঁড় করানোর সর্বৈব চেষ্টা নেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে। আইনসভার বৈধতা প্রতিষ্ঠায় শাসকরা বিশেষভাবে নির্ভব করেন নরমপন্থীদের উপর। নরমপন্থীদের দলে টেনে জাতীয়তাবাদী অসহযোগীদের দমন করার নীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯২০-র নির্বাচনের পর বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে ২৮ জানুয়ারি, ১৯২১ সালে কলকাতার টাউন হলে। সদস্যরা ঐ দিন শুধু শপথ নেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে আইনসভার অধিবেশন শুরু হয় ১ ফেব্রুয়ারি। ইংলন্ডের যুবরাজ ডিউক অব কনোট ছিলেন প্রধান অতিথি ; সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ শামসুল হুদা। উদ্বোধনী ভাষণে গভর্নর রোনাল্ডশে প্রসারিত ভোটারের উল্লেখ করে বলেন, ১২ হাজার থেকে নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা পৌঁছেছে ১০ লক্ষ ২০ হাজারে। গভর্নর বলেন,"পূর্ববর্তী মর্লে-মিন্টো সংস্কারে বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৩, এখন ১৩৯। আগে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ২৮ জন মাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন, এখন প্রসারিত ভোটাধিকারের জন্য নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৩। আগে সরকারি কর্মচারী ছিলেন মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ, এখন শতকরা ১৩ জন মাত্র। পূর্বেকার গভর্নরের শাসন পরিষদের চেয়ে এখনকার শাসন পরিষদ অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। এখন গভর্নর ও দু'জন রাজপুরুষ ছাড়া বাকি পাঁচজনই বেসরকারি সদস্য, এর মধ্যে আবার তিনজন নির্বাচিত।" গভর্নর মনে করেন ক্ষমতা যথার্থভাবেই জনগণের কাছে, হস্তান্তরিত হয়েছে, শাসনব্যবস্থায় এক যৌথ অংশীদারিত্ব গড়ে উঠেছে। গভর্নর আরও আশা করেন, বাঙালী ও ইংরেজদের সহযোগিতায় আগামী দিনের ভারতবর্ষ ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। যুবরাজ তাঁর ভাষণে ভারতীয় রাজনীতিতে বাঙালীর অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। যুবরাজ বলেন, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা ও রাজনীতিতে বাঙালী সারা ভারতের পথ-প্রদর্শক। দক্ষ সংসদবিদ হিসেবে, বাগ্মী হিসেবে বাঙালী তার বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতার জন্য সারা ভারতের আদর্শ হয়ে থাকবে। শিক্ষার প্রসার, শিল্পের বিকাশ ও স্বাস্থ্য সরকারি কর্মসূচীর মধ্যে অগ্রাধিকার পাবে বলে যুবরাজ ঘোষণা করেন।[৭]

শতকরা ৮১ জন নির্বাচিত হলেও আইনসভা সদস্যদের সামাজিক ভিত্তির বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি এই পর্বে। অসহযোগীরা নির্বাচনে অংশ নেননি। খিলাফত আন্দোলনের ফলে অধিকাংশ মুসলমানই আইনসভা নির্বাচন বয়কট করেন। মৌলনা আবুল কালাম আজাদের নির্দেশেও বেশ কিছু মুসলমান নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। ফলে যা দাঁড়ায় তাতে নরমপন্থী ও তাদের সমর্থকরাই আইনসভায় নির্বাচিত হন। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা নির্বাচিত হন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন জমিদার, কেউ কেউ আবার সাম্প্রদায়িকতাবাদী। যে ৪৬ জন হিন্দু আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলেই হয় মডারেট দল, না হয় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। অধিকাংশই ছিলেন উকিল ও জমিদার। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত এবং অনেকেরই ছিল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা। ভোটারদের কাছে প্রার্থীর সম্পত্তির পরিমাণ, বংশমর্যাদা, পারিবারিক সম্পর্ক, রাজপুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পেত।

মুসলমানদের মধ্যে প্রার্থী সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। ৩৯টি আসনের জন্য ১৩২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মুসলমান প্রতিনিধি মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন ধনী সম্প্রদায়ের শহরের শিক্ষিত লোক। একই পরিবার থেকে একাধিক ব্যক্তিকে নির্বাচিত হতে দেখা যায়। সুরাবর্দী পরিবারের তিনজন—আবদুল্লা আল মোমিন সুরাবর্দী, হাসান সুরাবর্দী এবং হোসেন সুরাবর্দী বিধানসভায় নির্বাচিত হন। পূর্ব ও উত্তর বাংলার গ্রামীণ নির্বাচনী এলাকা থেকে যে ১৯ জন মুসলমান প্রার্থী নির্বাচিত হন তাঁদের মধ্যে অন্তত ১০ জন নিজেদের কৃষকস্বার্থের প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করেন। স্বভাবতই এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মুখে জাতীয়তাবাদের কথা বললেও এঁদের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মে জাতীয়তাবাদী আদর্শের কোনো ছাপ ছিল না। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন একান্তভাবে ইংরেজ অনুগত।

শাসনপরিষদের সদস্য নির্বাচনে গভর্নর রোনাল্ডশে যে দৃষ্টিভঙ্গি নেন তা দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে মোটেই অনুকূল ছিল না। বরঞ্চ এ ব্যাপারে ভারতসচিব মন্টেগু অন্তত হস্তান্তরিত বিষয়ের মন্ত্রী নির্বাচনে জাতীয়তাবাদীদের কাছাকাছি সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। সাত জনকে নিয়ে গভর্নরের শাসনপরিষদ গঠিত হয়। তাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন সরকারি কর্মচারী—স্যার হেনরি হুইলার এবং জে এইচ কার। হুইলার ছিলেন ভারত সরকারের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব, রক্ষণশীল এবং গভর্নরের ডান হাত। কার ছিলেন পুরোপুরি আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখার পক্ষে এবং সংসদব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে। নির্বাচিত মন্ত্রীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে এঁদের ছিল প্রবল অনীহা। মনোনীত দু'জন ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব ও স্যার আবদুর রহিম। বিজয়চাঁদের মনোনয়নে মন্টেগুর বিশেষ সায় ছিল না কিন্তু রোনাল্ডশে বিজয়চাঁদকেই মনোনয়ন দেওয়া যথাযথ বলে মনে করেন। স্যার আবদুর রহিম হোসেন (হোসেন শহীদ সুরাবর্দীর শ্বশুর) ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং বাংলার অন্যতম প্রভাবশালী মুসলমান নেতা (রহিম পরে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দেন এবং কেন্দ্রীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হন)। হস্তান্তরিত বিষয়ের মন্ত্রী নির্বাচনে গভর্নরকে প্রধানত নরমপন্থীদের উপর নির্ভর করতে হয়। সুরেন্দ্রনাথকে তিনি "মুখ্যমন্ত্রী" পদে নিযুক্ত করেন। যদিও সরকারিভাবে মুখ্যমন্ত্রী বলে কোনও পদ তখন ছিল না। সুরেন্দ্রনাথের সুপারিশে প্রভাসচন্দ্র মিত্রকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হয়। প্রভাসচন্দ্রকে মন্ত্রী নিযুক্ত করতে রোনাল্ডশে খুব ইচ্ছুক ছিলেন না, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্বন্ধেও গভর্নর প্রশ্ন তোলেন। সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য বলেন, প্রভাস মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট এবং সেই সুবাদে তিনি যেকোন পদ, এমনকি শিক্ষামন্ত্রীর পদও অলঙ্কৃত করতে সক্ষম।[৮] দ্বিতীয় মন্ত্রী নিয়োগ নিয়ে মডারেটদের মধ্যেও

মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুরেন্দ্রনাথ রায়ও ছিলেন এই পদের অন্যতম দাবিদার। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা ও গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী, কেন্দ্রীয় সংসদের প্রাক্তন সদস্য নবাব আলি চৌধুরীকে তৃতীয় মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে ড. আবদুল্লা আল-মোমিন সুরাবর্দীর নামও বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু রোনাল্ডশে ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে নবাব আলিকেই মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। তাছাড়া অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করে নবাব আলি একখানি প্রচার পুস্তিকা লিখেছিলেন। এটাও তাঁর মন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির অন্যতম কারণ। মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টনও এমনভাবে করা হয় যার ফলে শাসনকার্যের চাবিকাঠি থেকে যায় গভর্নর ও ইউরোপীয় আমলাদের হাতে। হেনরি হুইলার হন পুলিশ, রাজনৈতিক বিষয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত, মুখ্যসচিব কার অর্থদপ্তরের দায়িত্ব পান, বিজয়চাঁদ ভূমিরাজস্ব, বনবিভাগ ইত্যাদি, আবদুর রহিম থাকেন বিচার ও জেল দপ্তরের দায়িত্বে। হস্তান্তরিত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত নির্বাচিত মন্ত্রীদের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সুরেন্দ্রনাথ হন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও স্বাস্থ্যদপ্তরের মন্ত্রী। প্রভাসচন্দ্র মিত্র শিক্ষা, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি দপ্তর এবং নবাব আলি পান কৃষি, শিল্প, পূর্ত এবং অন্যান্য দপ্তর। পত্রপত্রিকায় এই দপ্তর বণ্টন সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক নানা মন্তব্য করা হয়। সর্বত্র ধিকৃত হন সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ। 'বাবুদের' আসল রূপ নগ্নভাবে এতদিনে প্রকাশ পেয়েছে ; মুখে গণতন্ত্রের বুলি কিন্তু কার্যত ইংরেজদের পদলেহন এই ধরনের মন্তব্য প্রকাশিত হয় 'নায়ক' পত্রিকায়।

মন্ট-ফোর্ড সংস্কারের ফলে গঠিত প্রথম বিধানসভা স্থায়ী হয় প্রায় আড়াই বছর ১৯১৯-এর ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত। এই পর্বে বিধানসভা হয়ে ওঠে বাংলার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। প্রশ্ন উত্থাপন, আইন প্রণয়ন, জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রস্তাব ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলার রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বহুলাংশে বিধানসভায় প্রতিফলিত হয়। যে সমস্ত আইন বিধানসভায় পাস হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন, কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন এবং কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট আইন। কলকাতা কর্পোরেশনকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ১৮৯৮ সালে কুখ্যাত ম্যাকেঞ্জি বিলের বিরোধিতা করে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমি অপেক্ষা করে থাকব সেদিনের জন্য যেদিন আমার জন্মস্থান কলকাতা মহানগরীতে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।" স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার পরই সুরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেন এবং ২২ নভেম্বর, ১৯২১ বিধানসভায় একটি বিল উত্থাপন করেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ৭ মার্চ, ১৯২৩

বিলটি বিধানসভায় পাস হয়। ভারতের অন্য কোনও আইনসভায় এত দীর্ঘ সময় নিয়ে কোনও আইন প্রণীত হয়নি। ৫৪৪ অনুচ্ছেদ ও অসংখ্য ধারা উপধারা সমন্বিত এই বিলে ৮৪১টি সংশোধনী প্রস্তাব আলোচিত হয়। বিলটিতে কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। বিলে কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণ ছাড়াও যৌথ নির্বাচন ও মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদানের সংস্থান ছিল। সুরেন্দ্রনাথ নিজে আগাগোড়া সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের বিরোধী ছিলেন। মুসলমানদের স্বার্থ যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য কর্পোরেশনে ১৩টি আসন ঐ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। কিন্তু বিলের আলোচনার সময় মুসলমান সদস্যদের মধ্যে এ নিয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান লীগের নেতা সৈয়দ নাসিম আলি অভিযোগ করেন, সুপরিকল্পিতভাবে বিলে মুসলমানদের অবদমিত করে রাখা হয়েছে। ড. আবদুল্লা সুরাবর্দী ও অন্য কয়েকজন মুসলমান সদস্য মুসলিম লীগের এই অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন, সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকারকে ইস্যু করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।[৯] শেষ পর্যন্ত অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ আরও নয় বছর কর্পোরেশন নির্বাচনে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা মেনে নিতে সম্মত হন।[১০] মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদানও ছিল বিলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইতিপূর্বে ২৯-৪ ভোটে এক প্রস্তাব পাস করে কর্পোরেশন মহিলাদের ভোটদানের পক্ষে মত প্রকাশ করে। বিধানসভায় যখন মহিলাদের ভোটাধিকারের প্রশ্ন ওঠে তখন সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। রিষিন্দ্রনাথ সরকার, হেমচন্দ্র নস্কর, মহবুর আলি, হামিজুদ্দিন খাঁ, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং আরও অনেক সদস্য এর বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে অধ্যাপক এস. সি. মুখার্জি (মনোনীত খ্রীস্টান), এস. এম. বসু, আবদুল্লা সুরাবর্দী, মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, ফজলুল হক প্রমুখ সদস্যরা এই প্রস্তাবের সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন।[১১] বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন করে শ্রী এস. এম. বসু বলেন, মেয়েরা অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত, তাদের উপস্থিত বুদ্ধি প্রখর, বিচার-বিবেচনা করার শক্তিও যথেষ্ট। একজন সদস্য মন্তব্য করেন, নারীরা যে সমাজে সম্মানিত, ঈশ্বর তথায় বিরাজিত। সুন্দর, স্বচ্ছ ও ছন্দোময় ভাষায় আবদুল্লা সুরাবর্দী প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন, সরোজিনী নাইডুর চেয়ে কোন্ পুরুষ সার্থকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন? যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, রিজিয়া, চাঁদবিবি, গুলবদন, অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, রাণী রাসমণির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নারীদের ভোটাধিকার সমর্থন করেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর সংশোধনী প্রস্তাব এনে শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েট মহিলাদের ভোটদানে প্রস্তাব জানান। আনন্দচন্দ্র দত্ত প্রায় অনুরূপ প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাব সমর্থন না করে কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় মার্কস, রুশো, লেনিন এমনকি বলশেভিক বিপ্লবের প্রসঙ্গও টেনে আনেন। সরকারের তরফ থেকে হেনরি হুইলার বলেন,

মনোনীত সদস্যরাও প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন। প্রস্তাব পাস হলে সরকার যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তাবকে কার্যকর করবেন বলে তিনি আশ্বাস দেন। প্রস্তাবটি ভোটে দিলে প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ৩৩টি করে ভোট পড়ে। সভাপতির নির্ণায়ক ভোটে শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি পাস হয় এবং মহিলারা কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটাধিকার পান।[১২] বিতর্কের জবাব দিতে উঠে প্রস্তাবক সুরেন্দ্রনাথ বলেন, এই বিল সম্বন্ধে অনেক রূঢ় কথা বলা হয়েছে, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্রোক্তি করা হয়েছে, যৌথ নির্বাচনের বিরোধিতা করা হয়েছে, কিন্তু কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কাছে "মডেল আইন" হিসেবে দীর্ঘদিন সমাদৃত হয়ে থাকবে। বিল পাস হওয়ায় একের পর এক সদস্য সুরেন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানান।[১৩]

এই পর্বে কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিল নিয়েও বিধানসভায় যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। লর্ড রোনাল্ডশের আহ্বানে ১৯২১ সালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে যোগ দেন। এর আগেও প্রায় আট বছর তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। আশুতোষের নিয়োগে বিধনসভার বেশ কিছু সদস্য ক্ষুব্ধ হন। বিধানসভায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নানা অভিযোগ ওঠে। বলা হয় পালি ক্লাসে ছাত্র মাত্র আট জন আর অধ্যাপকের সংখ্যা ষোল জন। অনুরূপ অবস্থা অন্য বিভাগেও বিদ্যমান বলে সদস্যরা অনুযোগ করেন। বাঁকুড়া থেকে নির্বাচিত সদস্য রিষিন্দ্রনাথ সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখার জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। দু'দিন এই প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক চলে। শিক্ষামন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মিত্রও কমিটি গঠনের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচিত অধিকাংশ সদস্য এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। কারণ তাঁদের ভয় ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সরকারি আনুকূল্য কমাতে না পারলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে পাস হয়ে যায়। এই প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত হওয়ায় আশুতোষ ও বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট ভয়ানক ক্ষুব্ধ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সরকারি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা হয়। ১৯২২-এ শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ আলোচনার সময় কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ নিয়ে আবার বিধানসভায় ঝড় ওঠে। রিষিন্দ্রনাথ সরকার প্রস্তাব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান কমিয়ে ৫০ টাকা করা হোক। ফজলুল হকও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অনুদান ছাঁটাই করার প্রস্তাব সমর্থন করেন। তিনি বলেন, ঢাকা যেন কলকাতার চক্ষুশূল। ঢাকার প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহারে যাঁরা উসকানি দিচ্ছেন তাঁদের তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেন, তাঁরা এক বিপজ্জনক খেলা খেলছেন। এর বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে হিন্দু ও মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে তিনি সরকারকে জানান। খাজা নাজিমুদ্দিন কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের দায়ী করে

বলেন, কেন তাঁরা ঢাকার প্রতি ঈর্ষান্বিত তিনি বুঝতে পারেন না। কিশোরীমোহন চৌধুরী ও অন্য সদস্যরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরূপ সমালোচনা করে বলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থের অপচয় হচ্ছে, এ অপচয় আর বাড়ানো উচিত নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ সমর্থন করে বিধানসভায় বক্তব্য রাখেন অজয়চন্দ্র দত্ত, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, অধ্যাপক এস সি মুখার্জি প্রমুখ সদস্যরা। বিধায়ক যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি ন'লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে চার লক্ষ টাকায় নামিয়ে আনার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবের সূত্র ধরে একের পর এক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থক বিধায়করা ঢাকার মঞ্জুরি হ্রাসের বিষয়ে ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ঢাকার অনুদান তিনলক্ষ টাকা, অজয় চন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক দু'লক্ষ টাকা, রাধাচরণ পাল একলক্ষ টাকা ও অধ্যাপক এস সি মুখার্জি এক টাকায় কমিয়ে আনার প্রস্তাব দেন।[১৪] শিক্ষামন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মিত্র অনুযোগ করেন, স্নাতকোত্তর বিভাগ প্রসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট কোনো নীতি নেই। খামখেয়ালীপনা করে পাঁচলক্ষ টাকা নষ্ট করা হয়েছে। সরকার অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক অনুদান দিতে স্বীকৃত হন। এই শর্তে যে, স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রসারে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে না। আশুতোষ ও সেনেটসভা এই ধরনের অপমানজনক শর্ত মানতে অস্বীকার করেন। সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এক জঘন্যতম ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যোগাচ্ছেন বলে আশুতোষ অভিযোগ করেন এবং গভর্নর লিটনকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে, যতদিন তিনি উপাচার্য আছেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি দপ্তরে পরিণত করার সর্বপ্রচেষ্টাকে বাধা দেবেন।[১৫] আশুতোষকে ১৯২৩ সালে চলে যেতে হয় এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে অনেক প্রশ্ন, প্রস্তাব ইত্যাদি বিধানসভায় উত্থাপিত হয়। দুই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেই সরকারি নীতির সমালোচনা করেন সদস্যরা।

এই পর্বের বিধানসভা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা, সদস্যদের মধ্যে ২৫ থেকে ৩০ জন ছিলেন অসহযোগের সমর্থক যদিও জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ তাঁদের ছিল না। নরমপন্থী ও মুসলমান সদস্যরাও কেউ কেউ প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করতেন। একমাত্র সরকারি আমলা, বেসরকারি ইউরোপীয় সদস্য এবং ভারতীয় মন্ত্রীরাই ছিলেন সরকারের সমর্থক। সুরেন্দ্রনাথের সমর্থক তৎকালীন বিধায়ক অজয় দত্ত উল্লেখ করেছেন, বেসরকারি সদস্যরা কোনো সময়ই অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে সরকারি নীতি সমর্থন করেননি।[১৬] শাসকদেরও অনেক সময় মনে হয়েছে অসহযোগ আন্দোলন বিধানসভাকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। বিধানসভাতে প্রশ্নোত্তর, প্রস্তাব উত্থাপন, মুলতুবি প্রস্তাব এবং বাজেট আলোচনায় অসহযোগ আন্দোলনের কথাই বার বার প্রতিধ্বনিত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় অসহযোগ আন্দোলনের দাবি, কর্মসূচী ইত্যাদির ব্যাপারে সংহত চিন্তা ও পরিকল্পনার যথেষ্ট অভাব ছিল। নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধও ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। পাঞ্জাব, খিলাফত ও স্বরাজের দাবি সম্বন্ধেও নেতৃত্বের খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। স্বরাজের দাবি সম্বন্ধে জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভাবে স্বরাজের ব্যাখ্যা করতেন। গান্ধী এক বিশেষ তারিখের মধ্যে স্বরাজলাভ সম্ভব হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের প্রতিশ্রুতিকে সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস বলে সমালোচনা করেন।[১৭] অসহযোগের সময় কংগ্রেসের যে সামাজিক ভিত্তি ছিল তাতে নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আন্দোলনের কর্মসূচীও তৈরি হয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দিকে লক্ষ্য রেখে। গান্ধী-পন্থা সম্বন্ধে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথমদিকে যথেষ্ট সন্দিগ্ধ ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশী যুগের দাপট তখনও বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত শ্রেণীর মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বাংলার মানুষের রাজনৈতিক চেতনা অসহযোগের নিষ্ক্রিয় কর্মসূচীকে সমর্থন করতে পারেনি। "সত্যের আহ্বান" প্রবন্ধে গান্ধীর আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংঘাতের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সব বিতর্ক, সন্দেহ, সংশয় ও সমালোচনার অবসান ঘটিয়ে বাঙালী মধ্যবিত্ত উদ্দাম আবেগে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিত্তরঞ্জন এগিয়ে আসেন নেতৃত্ব দিতে। এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের জোয়ার আসে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন, "নগরীর পথে রোল ওঠে আজ গান্ধীজী গান্ধীজী।" খিলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুসলিম সম্প্রদায়ের যে বিরাট অংশ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। কংগ্রেসে ও খিলাফত কমিটির বিভিন্ন অধিবেশনে এঁরাই মুখ্য ভূমিকা নিতেন। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীরা আইনসভা নির্বাচনে অংশ নেননি ঠিকই, কিন্তু বাংলার রাজনীতি প্রভাবিত করার মতো ক্ষমতা তাঁদের অনেকেরই ছিল। বিধানসভাও এই রাজনৈতিক আবর্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য দাবি করে ভারতীয় সদস্যরা প্রায়ই সরকারকে বিব্রত করতেন। ফজলুল হক এক প্রশ্ন উত্থাপন করে ফরিদপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচারের প্রতিকার দাবি করেন। তিনি জানান, নির্বিচারে ও নির্মমভাবে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর বেত্রাঘাত চলছে, নিকৃষ্ট ধরনের যে খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছে তা একজন ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। জে. এন. মৈত্র, ডাঃ হাসান সুরাবর্দী প্রমুখ সদস্যরা এই প্রসঙ্গে সরকারের সমালোচনা করেন। মন্ত্রী আবদুর রহিম সরকারের সমর্থন করতে গিয়ে

ক্রুদ্ধ সদস্যদের দ্বারা নাজেহাল ও কোণঠাসা হন। অন্য এক প্রশ্ন থেকে জানা যায়, ১৯২১-এর জুন থেকে নভেম্বর এই ক'মাসে সরকারি নীতির প্রতিবাদে ৪২৬৫টি সভা (গড়ে দিনে প্রায় ৩০টি) বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। ললিতমোহন সিংহরায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার জানান, অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে একজন এ এস আই ও ৪৬ জন কনস্টেবল চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। অপর এক প্রশ্ন থেকে জানা যায়, হাওড়ায় পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালাতে বাধ্য হয়। নীলফামারিতে গোর্খা সৈন্যদের অত্যাচার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে স্বরাষ্ট্র সচিব হেনরি হুইলার জানান, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে অনেকেই ছিল শ্রমিক। শ্রমিকরা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলেই পুলিশকে বাধ্য হয়েই গুলি চালাতে হয়। ললিতমোহন সিংহরায়ের অন্য এক প্রশ্নের জবাবে সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, বাংলার প্রায় সব জেলাতেই অসহযোগ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। হুইলার বিধানসভাকে জানান, ইউনিয়ন বোর্ডের কর, চৌকিদারি কর অনেক জায়গা থেকেই আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। এই জেলাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, হুগলী, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, বীরভূম ইত্যাদি প্রধান। বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন সম্বন্ধে আরও নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয় বিধানসভায়। সাধারণভাবে উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে সরকারি গড়িমসি লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ছাড়াও প্রস্তাবের আকারে সদস্যরা অসহযোগ প্রসঙ্গ বিধানসভায় উত্থাপন করতেন। মনোনীত খ্রীস্টান সদস্য অধ্যাপক এস সি মুখার্জি ১৯২২ সালের ৩১ জানুয়ারি বিধানসভায় এক প্রস্তাব উত্থাপন করে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবি করেন। অধিকাংশ সদস্যই প্রস্তাবের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অজয় দত্ত, ইন্দুভূষণ দত্ত, হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ সদস্যরা প্রস্তাব সমর্থন করে সরকারকে সদিচ্ছার পরিচয় দিতে আহ্বান জানান, কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় বলেন, তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক নন, তবে সরকারি দমননীতি প্রত্যাহৃত হোক এবং রাজবন্দীরা মুক্তিলাভ করুক এটা তিনি চান। স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হেনরি হুইলার বন্দীমুক্তি প্রস্তাবে রাজি হন না, তবে এ বিষয়ে খতিয়ে দেখার জন্য সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করতে প্রস্তুত বলে তিনি জানান। প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত ভোটে দেওয়া হয় এবং ৫০-২৬ ভোটে গৃহীত হয়[১৮] কিন্তু আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মর্যাদা দিতে সরকার পরাঙ্মুখ হন। রাজবন্দীদের বিষয়ে রাধাচরণ পাল বাহাদুরও এক প্রস্তাব পেশ করে বলেন, রাজনৈতিক বন্দীদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিতে হবে। হোসেন শহীদ সুরাবর্দী, ইন্দুভূষণ দত্ত প্রমুখ বিধায়করা প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই প্রসঙ্গেই সুরাবর্দী বলেন, যেভাবে গাদাগাদি করে জেলে বন্দীদের রাখা হয় তাতে ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই প্রস্তাবও সংখ্যাগরিষ্ঠের

সমর্থনে গৃহীত হয়। অসহযোগ আন্দোলন যত প্রসারলাভ করতে থাকে, সরকার তত মরিয়া হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত সরকার ভারতীয় ফৌজদারি আইন প্রয়োগ করে পাইকারি হারে গ্রেপ্তার ও অন্যান্য দমনমূলক ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। নরমপন্থীরা পর্যন্ত এইসব আইনের বিরোধিতা করেন। নরমপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৯ ডিসেম্বর, ১৯২১ এক মুলতুবি প্রস্তাব পেশ করে এ বিষয়ে আলোচনার দাবি জানান। হেনরি হুইলার প্রস্তাবকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলে অভিহিত করেন। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ওয়াটসন স্মিথ ভারতীয় সদস্যদের, বিশেষ করে নরমপন্থীদের সাবধান করে এর ভয়াবহ পরিণতির কথা মনে করিয়ে দেন। মন্ত্রীরা উভয় সংকটে পড়েন। এই ধরনের দমনমূলক আইন সমর্থন করতে দেশবাসীর কাছে দেশদ্রোহিতার দোষে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা, অন্যদিকে সরকারি নীতির বিরুদ্ধাচরণও আচরণবিধির পরিপন্থী। বিতর্কে অংশ নিয়ে সরকারি নীতির সমালোচনাও তাঁরা করেন কিন্তু ভোটে সরকার পক্ষকেই সমর্থন করেন। বর্ধমানের মহারাজা অবশ্য বিতর্কে অংশ নিয়ে সরকারের গৃহীত নীতিকে পুরোপুরি সমর্থন করেন এবং বলেন, অরাজকতা ও নৈরাজ্য দূর করতে এটাই একমাত্র পথ। প্রায় সব নির্বাচিত সদস্যই দমনমূলক আইনের প্রত্যাহার দাবি করেন। মন্ত্রীরা ও সরকাবি সদস্যরা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ৫০-৩৬ ভোটের প্রস্তাব পাস হয়।[১৯]

অসহযোগ আন্দোলনের সময় পূর্ববঙ্গের কুলি-শ্রমিকদের উপর নির্যাতন নিয়েও বিধানসভায় তুমুল ঝড় ওঠে। অসহযোগের ঢেউ আসামের চা-বাগান শ্রমিকদের মধ্যেও আলোড়ন জাগায়। বিভিন্ন চা-বাগিচায় শ্রমিকদের বিদেশী মালিকদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য স্থানত্যাগের সংকল্প নেয়। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গান্ধীরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ গুজবও তাদের প্রেরণা দেয়। শ্রমিকরা চাঁদপুরে স্টিমার ঘাটে এসে পৌঁছলে তাদের আটকে দেওয়া হয়। কারণ নিয়ম ছিল দেশে ফেরার জন্য মালিকের অনুমতি না থাকলে তারা স্থান ত্যাগ করতে পারবে না। গোর্খা সৈন্যবাহিনী তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। বন্দুক ও সঙ্গিনের আঘাতে সাংঘাতিকভাবে আহত হয় অনেকে। ম্যাকফারসন নামে একজন চা-কর লাথি ও লাঠির আঘাতে অনেককে আহত করে। চার্লস এন্ড্রুজ এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। এই নির্মম পীড়নের খবর ছড়িয়ে পড়লে সারা ভারতে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। প্রতিবাদে আসাম-বেঙ্গল রেলপথ ও স্টিমার কোম্পানির কর্মচারীরা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ধর্মঘট শুরু করেন। ধর্মঘট চলে দীর্ঘদিন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, পদ্মার উত্তাল তরঙ্গ উপেক্ষা করে দেশী নৌকায় যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় কুলি, শ্রমিক ও ধর্মঘটী কর্মচারীদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ

করেন। ধর্মঘটীদের জন্য যতীন্দ্রমোহন শেষ কপর্দক ব্যয় করেন।[২০] ৭ জুলাই, ১৯২১ বিধানসভায় চাঁদপুর প্রসঙ্গ ওঠে। সরকারের পক্ষে স্যার হেনরি হুইলার পূর্ববঙ্গের একটি রেলস্টেশনের সামান্য ঘটনা বলে প্রসঙ্গটিকে বাতিল করে দিতে চান।[২১] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাস মিত্ররা তাঁকে সমর্থন করেন। পরদিন বিধায়ক কিশোরীমোহন চৌধুরী (রাজশাহী) এন্ড্রুজের বিবৃতি উদ্ধৃত করে বলেন, এন্ড্রুজ মানবতার নামে সরকারকে অভিযুক্ত করেছেন। এন্ড্রুজের মতে সরকার চা-করদের কথার উপরই নির্ভর করেছেন, শ্রমিকদের কথা মোটেই ভাবেননি। চাঁদপুর প্রসঙ্গ পরেও বিধানসভায় উত্থাপিত হয়। মন্ত্রীদের বেতনের মঞ্জুরি সংক্রান্ত আলোচনায় চাঁদপুর প্রসঙ্গ টেনে আনেন বিভিন্ন সদস্য। হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মন্ত্রীদের সমালোচনা করে বলেন, এর পরও মন্ত্রীরা কি করে অতিরিক্ত বেতন দাবি করতে পারেন। ইন্দুভূষণ দত্ত কুলি-শ্রমিকদের সরকার থেকে কোনও সাহায্য না দেওয়ার জন্য সুরেন্দ্রনাথের সমালোচনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য এই অভিযোগের উত্তরে বলেন, তিনি চিকিৎসকদের একটি দলকে চাঁদপুরে পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া সাহায্য হিসেবে ছয় হাজার টাকা দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু অসহযোগীদের বাধাদানের ফলে সরকার কিছু করতে পারেননি। চাঁদপুরের ঘটনা নিয়ে বিধানসভায় সরকারকে যথেষ্ট হেনস্থা হতে হয়।[২২]

শ্রমিকরাও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। সারা ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে যেমন ধর্মঘটের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় আবার অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। ৩০ অক্টোবর, ১৯২০ নিখিলভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে বোম্বাই শহরে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন লালা লাজপত রায়, উপস্থিত ছিলেন মতিলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, অ্যানি বেশান্ত প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও শেখ চোটানি সহ খিলাফত নেতারা। বাংলার বিধানসভায় শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন সংক্রান্ত প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন শ্রমিক নেতা কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী। তাঁর উত্থাপিত প্রশ্ন থেকে জানা যায় ১ জুলাই, ১৯২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১—১৩৯টি শ্রমিক ধর্মঘট হয় এবং ২ লক্ষ ৭০ হাজার শ্রমিক এতে অংশ নেন।[২৩]

বিধানসভায় ভারতীয় সদস্যরা যে সরকারের মর্জিমাফিক কাজ করতেন না তার অনেক নজির লিপিবদ্ধ হয়ে আছে কার্যবিবরণীতে। বাজেট মঞ্জুরির সময় মন্ত্রীদের বেতন সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন অধিকাংশ সদস্য। সরকার একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। কিশোরীমোহন চৌধুরী ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ এক প্রস্তাব উত্থাপন করে সংরক্ষিত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের সংখ্যা চার থেকে দুই-এ হ্রাস

করার দাবি জানান। এক আবেগময়ী বক্তৃতায় তিনি বলেন, ভারতে দরিদ্রপীড়িত জনগণের রুটি রোজগার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর না রেখে মোটা বেতন দিয়ে চারজন ইউরোপীয় সদস্য ও তিনজন মন্ত্রী রাখা নিরর্থক। ফজলুল হক, সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ তাঁকে সমর্থন করে বলেন, গভর্নরের মাথাভারী প্রশাসনের ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করার দায়িত্ব বিধায়কদের। সব ইউরোপীয় সদস্য ও মনোনীত সদস্যরা সংখ্যা হ্রাসের বিরোধিতা করেন এবং এর পরিণতি সম্বন্ধে সাবধান করে দেন। প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ৭৩ ভোট, বিপক্ষে ৩১ এবং প্রস্তাব পাস হয়। কিন্তু সরকার তা কার্যকর করতে বাধ্য নয় বলে জানান। কারণ দেখানো হয়, সংরক্ষিত বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ বিধানসভার এক্তিয়ারের বাইরে।[২৪]

গ্রীষ্মকালে গভর্নরের শৈলবাস দার্জিলিং শহরে প্রায় পুরো সরকারি দপ্তর স্থানান্তরিত হতো। ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখে (১৯২১) দার্জিলিং অভিনিষ্ক্রমণ নিয়ে এক প্রস্তাব বিধানসভায় উত্থাপন করেন সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং আগামী বছর থেকে এই ব্যয়বহুল বিলাসিতা বাতিলের দাবি করেন। এই প্রস্তাবও পাস হয়ে যায় ৫৩-৪১ ভোটে কিন্তু সরকার প্রস্তাবকে কার্যকর করার কোন উদ্যোগ নেন না।[২৫]

বাজেট বিতর্কে সরকারকে সবচেয়ে বেশি বিব্রত হতে হয়। ২০ এপ্রিল, ১৯২১ তারিখে একের পর এক ভারতীয় সদস্য পুলিশ বাজেটের বিভিন্ন খরচের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব এনে সরকারকে নাজেহাল করেন। নানা বিষয় উঠতে থাকে পুলিশ বাজেট প্রসঙ্গে। কিশোরীমোহন চৌধুরী, তড়িৎভূষণ রায় (বঙ্গীয় মহাজন সভা), সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রমুখ সাংসদরা এই বিতর্কে অংশ নেন। পুলিশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হেনরি হুইলার পুলিশের কর্মদক্ষতার সাফাই দিতে গিয়ে বলেন, সদস্যরা এই সুযোগে সবকিছুই বলেছেন, কিন্তু পুলিশ বাজেট কেন ছাঁটাই করা দরকার সে বিষয়ে কিছুই বলেননি। পুলিশ বাজেট নিয়ে বিধানসভায় চরম তিক্ততা সৃষ্টি হয়।[২৬] ১৭ মার্চ, ১৯২১ পাবনা থেকে নির্বাচিত মুসলমান সদস্য ওয়াসিমুদ্দিন আহমেদ এক প্রস্তাব এনে পুলিশ বাজেট হ্রাস করার দাবি জানান। সরকারকে তিনি আহ্বান জানান। এই প্রস্তাব গ্রহণ করে সরকার যেন বিধানসভা ও বিধায়কদের মতামতকে মর্যাদা দেন। পুলিশের উর্ধ্বতন কিছু পদের বিলুপ্তিও তিনি দাবি করেন। হেনরি হুইলার খুব চটে যান। তিনি বলেন, বিধানসভায় এই ধরনের প্রস্তাব এনে সংশ্লিষ্ট সদস্য চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সদস্যরা হুইলারের ভীতি প্রদর্শনকে অগ্রাহ্য করে ওয়াসিমুদ্দিনের প্রস্তাব পাস করে দেন (৫১-৪২ ভোটে)।[২৭] গভর্নর রোনাল্ডশে তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে পুলিশের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করে দেন। ভারতীয় সদস্যদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাংবিধানিক নিয়মকানুনকে সরকার কী নির্দ্বিধায় অবহেলা করে চলেছেন।

মন্ত্রীদের সম্বন্ধে বিধানসভা প্রথম থেকেই সমালোচনামুখর ছিল। মন্ত্রীরা কর্মভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ বিধানসভার সম্মুখীন হন। জনসাধারণ ও সংবাদপত্রও সাধারণভাবে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ছিল। মন্ত্রীরা 'নির্লজ্জ' ও দেশবাসীর কাছে 'অভিশাপ স্বরূপ'—এই ধরনের নানা সমালোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিপূর্বে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে (১৯১৮) মদনমোহন মালব্য এক প্রস্তাবে দাবি করেন, নতুন সংস্কারের ফলে যে সব ভারতীয়রা নিযুক্ত হবেন তাঁদের মর্যাদা ও বেতন কোনমতেই ইউরোপীয় রাজপুরুষদের চেয়ে কম হওয়া উচিত নয়। তিলক এবং মতিলাল এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সরকারও শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক মন্ত্রীদের বার্ষিক বেতন ৬৪ হাজার টাকা ধার্য করার সিদ্ধান্ত নেন। এই নিয়ে প্রথম থেকেই বিধানসভায় তুমুল বাদানুবাদ চলে। মন্ত্রীদের এত উচ্চ বেতন দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তাবও বিধানসভায় উত্থাপিত হয়। ২৬ জানুয়ারি, ১৯২২ হেনরি হুইলার তিনজন মন্ত্রীর বার্ষিক বেতন হিসেবে ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকার মঞ্জুরি দাবি করে এক প্রস্তাব বিধানসভায় উত্থাপন করেন। পরের দিনই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বেশ কয়েকটি ছাঁটাই প্রস্তাব বিধানসভায় উত্থাপিত হয়। হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (২৪ পরগনা উত্তর) বলেন, জনগণকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন রেখে মন্ত্রীরা এই বিরাট বেতন পাবেন, এটা কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। বিভিন্ন ছাঁটাই প্রস্তাবের মধ্যে ইন্দুভূষণ দত্ত (ত্রিপুরা), তড়িৎভূষণ রায় (মহাজন সভা) হামিদউদ্দিন খাঁ (রাজশাহী) প্রমুখের প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য। এঁরা ১ লক্ষ ৯২ হাজারের মঞ্জুরি ৬৪,০০০, ৪৮,০০০, ৮৪,০০০ ইত্যাদিতে হ্রাস করার জন্য সুপারিশ করেন। রফিউদ্দিন আহমেদ (যশোর) বলেন 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধেক ত্যজতি পণ্ডিতঃ' এই যুক্তি মেনে নিয়ে মন্ত্রীদের উচিত অর্ধেক বেতন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। হোসেন শহীদ সুরাবর্দীও মন্ত্রীদের বেতন ছাঁটাই অবশ্যই করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। ইন্দুভূষণ দত্ত মনে করেন আর্থিক সংকটের মুখে ব্যয়সংকোচ, নেতাদের নৈতিক দায়িত্ব ইত্যাদির কথা মনে রেখে কোনমতেই এই বেতন দেওয়া উচিত নয়। অজয় দত্ত, রায়বাহাদুর নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, ডি. সি. ঘোষ, এইচ বারটন, এ. ই. স্টার্ক (অ্যাংলো ইন্ডিয়ান) হুইলারের প্রস্তাব সমর্থন করেন। ফজলুল হক বিলটি সংশ্লিষ্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানান। সংবাদপত্রে ও জনসভায় মন্ত্রীদের বিরূপ সমালোচনা করা হয়। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা স্যার-সারেন্ডার নট ব্যানার্জি কয়েকটি টাকা, পদক ও মিথ্যা সম্মানের মোহে বিদেশী শাসকদের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন বলে মন্তব্য করা হয়।[২৮] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ এক অনবদ্য কার্টুনে ('লে আও চৌষট্‌ হাজার') সুরেন্দ্রনাথকে কাবুলিওয়ালা বলে চিত্রিত করেন। সর্বত্র ধিকৃত হন একসময়কার অবিসংবাদী নেতা সুরেন্দ্রনাথ। শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করা

হয়, মন্ত্রীরা ৪৮ হাজার টাকা করে বার্ষিক বেতন নেবেন। বাকি টাকা জনস্বার্থে দান করা হবে।

মন্ট-ফোর্ড আমলের আড়াই বছরের বিধানসভার কাজকর্মের সঙ্গে দু'জন গভর্নর, রোনাল্ডশে ও লিটন এবং দু'জন ভারতসচিব মন্টেগু ও পীল খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রোনাল্ডশে ছিলেন রক্ষণশীল, মন্টেগু উদারনৈতিক, আবার লিটন উদারনৈতিক, পীল রক্ষণশীল। ভারত সম্বন্ধে এঁদের নীতির মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য ছিল না। পীল ও রোনাল্ডশে ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার প্রসারিত করার ব্যাপারে মোটেই সহানুভূতিশীল ছিলেন না। মন্টেগু সংস্কারের পক্ষপাতি ছিলেন। লিটন অবশ্য ভারতীয়দের অধিকার খানিকটা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেন। সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়ের পার্থক্য দূর করতেও সচেষ্ট হন। আমলাদের বিরোধিতাকেও অনেক সময় তিনি আমল দেননি। কিন্তু গুণগত কোন পরিবর্তনের তিনিও বিরোধী ছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য সুরক্ষিত করতে এঁরা সবাই আইনসভার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এঁদের ধারণা ছিল এই প্রতিষ্ঠানকে সফল করতে পারলে সংস্কার সার্থক হবে এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করা যাবে। কিন্তু গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের অভিব্যক্তি ও কর্মসূচী ইংরেজ শাসকদের অভিসন্ধি অনেকাংশে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়। অসহযোগের নানা ত্রুটি ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এর প্রাপ্তিও কম নয়। ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও, চিত্তরঞ্জনের ভাষায়, অসহযোগ হয়ত অনেক কিছু করতে পারেনি, কিন্তু যা করতে পেরেছে তা তুলনাহীন—পরাধীন দেশে মূক, বধির জনগণকে ঔপনিবেশিক শাসন সম্বন্ধে ভয়শূন্য করতে পেরেছে। সাময়িকভাবে হলেও নিয়মতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক রাজনীতির মোহ থেকে ভারতীয়দের মুক্ত করতে এই আন্দোলন সক্ষম হয়েছে।

অবশ্য শীল, গ্যালাহার, ব্রুমফিল্ড ও দুই গর্ডন (রিচার্ড গর্ডন ও লিওনার্ড গর্ডন) প্রভৃতি দেশী-বিদেশী গবেষকরা মনে করেন ভদ্রলোক বা 'এস্টাব্লিশমেন্ট ম্যান'-দের কর্মতৎপরতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ১৯২১-১৯২৩-এর সাংবিধানিক রাজনীতি অনেকটাই স্তিমিত ছিল। আইনসভার সদস্যপদ লাভ, আইনসভার সরকার সম্বন্ধে 'পূর্ণ সহযোগিতা' ও 'সমালোচনা' ইত্যাদি নীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ভদ্রলোকদের লক্ষ্য। বাইরের গণআন্দোলন এঁদের তেমনভাবে প্রভাবিত করেনি। আর করে থাকলে তা অতি অল্প-স্বল্প। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, বাইরের রাজনীতির যদি বিশেষ কোন প্রভাব না থাকে তবে বিধানসভার সদস্যরাই-বা কিভাবে রাজশক্তির এমন সমালোচনামুখর হয়ে উঠতে পারেন। বস্তুত জাতীয় আন্দোলন এই পর্বে বিধানসভার রাজনীতিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছিল। ভারতীয় সদস্যদের অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন মন্ট-ফোর্ড সংস্কার প্রবর্তিত আইনসভার রাজনীতির কোন ভবিষ্যৎ

নেই। তাই লিটন যখন বলেন, আইনসভাকে যথাযথভাবে কার্যকর করতে পারলে তা সেতুবন্ধনের কাজ হবে, যার মাধ্যমেই ভারতীয়রা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে সক্ষম হবে ; তখন অমৃতবাজার পত্রিকা এর জবাবে মন্তব্য করে, "সংস্কার একটি ফাঁদ, সেতু একটা প্রহেলিকা মাত্র এবং ভারতীয়রা ভাল করে জানেন, এই সেতু অতিক্রম করতে গেলে তাঁরা জলে নিমজ্জিত হবেন। যাঁরা সেতুতে চড়েছেন, তাঁরা জলে ডুববেন এটা অবধারিত।"[২৯] ব্রুমফিল্ডকেও স্বীকার করতে হয়েছে বাংলার নির্বাচিত বিধায়কদের একটা বড় অংশ অসহযোগীদের নির্দেশে বিধানসভায় প্রশ্ন করতেন, প্রস্তাব উত্থাপন করতেন এবং সময় সময় অসহযোগীদের নির্দেশেই ভোটদান করতেন।[৩০] এঁরা কেউ অবশ্য কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না। অসহযোগীরাই তাঁদের ভবিষ্যৎ আশ্রয়স্থল, বিধানসভার বেসরকারি সদস্যদের মধ্যে ক্রমশ এ বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছিল। কাজেই অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা আইনসভা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল এ বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

তবে ভোটাধিকার প্রসারিত হলেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই পর্বের বিধানসভার কোন যোগ ছিল না। কোনও কোনও বিধায়ক জনগণের প্রতিনিধিত্বের দাবি করলে ফজলুল হক জবাব দেন, "আমাদের নির্বাচনে জনগণের সক্রিয় কোনও ভূমিকা নেই ; নৌকা বোঝাই করে গাড়ি ভাড়া করে আমরা তাঁদের নিয়ে আসি এবং তাঁরা আমাদের ভোট দেন। এর অতিরিক্ত তাদের কোনও ভূমিকা নেই।"[৩১] বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার জানান, সাতশো গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে বিনামূল্যে বিধানসভার কার্যবিবরণী পাঠানো হয় কিন্তু তারা যে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী তা মনে হয় না।[৩২]

এই পর্বে সংসদীয় রাজনীতিতে নরমপন্থী বা মডারেটদের ব্যর্থতা সূচিত হয়। সংস্কার-পরবর্তী বিধানসভায় এঁরা ছিলেন 'না ঘরকা, না ঘাটকা'। শাসকরা এঁদের উপর নির্ভর করেছিলেন, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল এঁরা ভারতীয় জনগণের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। জাতীয়তাবাদীরাও এঁদের বিশ্বাস করতেন না। নানা বিশেষণে এঁদের উপহাস করা হতো। সুরেন্দ্রনাথকে বলা হতো, 'স্যর হেনরি হুইলারের কালো সংস্করণ'। মন্ত্রীদের 'ইংরেজদের ভাড়া করা অনুগামী', 'নির্লজ্জ' ইত্যাদি কটূক্তিতে আখ্যায়িত করা হতো। নরমপন্থীরা ছিলেন পত্র-পত্রিকার উপহাসের পাত্র। এঁদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও বিরূপ মন্তব্য করা হতো। "বাবুরা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু গোপনে খেতাব আর রাজপদের ধান্দায় থাকে। আজ যিনি চরমপন্থী, সরকারি পদ পেয়ে কাল তিনি নরমপন্থী। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনই এঁদের নগ্ন মুখোশ খুলে দিতে পারে" বলে 'নায়ক' পত্রিকা মন্তব্য করে।[৩৩] নরমপন্থীরা কিন্তু আন্তরিকভাবেই আশা করেছিলেন, দ্বৈতশাসনের সুযোগ নিয়ে তাঁরা সত্যিকারের কিছু কাজ করতে

পারবেন। সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হবে ; দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা পরবর্তী স্তরে ডোমিনিয়নের মর্যাদা এনে দেবে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করা হবে অবিবেচনাপ্রসূত কাজ, স্বদেশের স্বার্থবিরোধী ও বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য। মন্ত্রীরাও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না, অন্যান্য প্রদেশে গভর্নররা হস্তান্তরিত বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব চালাতেন। বাংলার নরমপন্থী মন্ত্রীরা তা হতে দেননি। কেন্দ্রীয় আইনসভায় অনেক বিল বিনা আলোচনায় পাস হয়ে যেত, সীমিত আলোচনারও বিশেষ সুযোগ ছিল না। বাংলার বিধানসভায় বিল পাসের বিভিন্ন স্তরে বিতর্ক ও সমালোচনা হতো প্রচুর। মন্ত্রীদের কাজকেও একেবারে অকিঞ্চিৎকর বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সুরেন্দ্রনাথের অন্যতম কীর্তি, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করা, ইংরেজ সার্জেন জেনারেলের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইউ. এন. ব্রহ্মচারীকে সার্জেন হিসেবে নিযুক্তি ইত্যাদি ভারতীয় মন্ত্রীরা সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করতে পেরেছিলেন। আত্মজীবনীতে সুরেন্দ্রনাথ লিখছেন, "আমার বিভাগে আমি ছিলাম সর্বেসর্বা। অনেক সময় অর্থদপ্তরের বিরোধিতাও আমি তোয়াক্কা করিনি।"[৩৪] নরমপন্থীদের প্রধান দুর্বলতা ছিল, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বৈধতা নিয়ে তাঁরা কোন প্রশ্ন তোলেননি ; যা ঐ সময়কার ভারতীয় রাজনীতির প্রধান 'ইস্যু' ছিল। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থাকে সফল করতে গিয়ে তাঁরা নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনেন। মন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মিত্রের মতে, "দ্বৈতশাসনকে আমরা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দ্বৈতশাসন ব্যবস্থাই আমাদের নির্মূল করে দিতে সক্ষম হয়।[৩৫]

পঞ্চম অধ্যায়

স্বরাজী প্রাধান্যে বিধানসভা ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক (১৯২৪-১৯২৯)

গান্ধী-চিত্তরঞ্জন মতবিরোধ

আইনসভায় যোগদানের বিষয়ে জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে যে মতবিরোধ সুস্পষ্ট পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা তা উল্লেখ করেছি। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর এই মতপার্থক্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। কাউন্সিল এন্ট্রি বা আইনসভায় অংশগ্রহণ বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা ও গবেষণা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা এই বিষয়ে লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে রিচার্ড গর্ডন, লিওনার্ড গর্ডন, জুডিথ ব্রাউন, রজত রায়, ব্রুমফিল্ড প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

রিচার্ড গর্ডনের মতে[১] অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী হিসেবে কাউন্সিল বর্জনের প্রস্তাব আসে প্রথমে লালা লাজপত রায়ের কাছ থেকে। পাঞ্জাব সরকার নির্বাচন নিয়ে যেসব নিয়মবিধি করেছিলেন, তাতেও শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের কোনও সুযোগ থাকবে না এই ভেবে লাজপত রায় আইনসভার নির্বাচন বয়কট করার আহ্বান জানান। লাজপত রায়ের বক্তব্যের সূত্র ধরেই গান্ধীজী 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮ জুলাই, ১৯২০) এক প্রবন্ধে কাউন্সিল বয়কট অসহযোগের অন্যতম কর্মসূচী বলে ঘোষণা করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ অনেক কংগ্রেস নেতাই গান্ধীজীর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। চিত্তরঞ্জন আইনসভায় অংশগ্রহণের পক্ষে চারদফা এক প্রস্তাব পেশ করেন। কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের আগে পুত্র জওহরলালকে লিখিত এক পত্রে মতিলাল অসহযোগ নীতি ও কর্মসূচীর যথাযথ রূপায়ণের জন্য কাউন্সিলে অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলে যুক্তি দেখান।[২] বিপিনচন্দ্র পাল কংগ্রেসের নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত এ আই সি সি থেকে পদত্যাগ করেন এবং এক উপনির্বাচনে জয়লাভ করে কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য হন। আইনসভা বর্জন সম্বন্ধে তীব্র মতভেদের দরুন কলকাতা কংগ্রেস এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবেও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী হিসেবে আইনসভা বয়কটের কোনও উল্লেখ ছিল না। চিত্তরঞ্জন অবশ্য দাবি করেন যে, নাগপুর প্রস্তাব তিনিই রচনা করেন এবং আইনসভা বিষয়ে তাঁর অভিমতকে সম্মান জানাতে গান্ধীজী নাগপুর প্রস্তাবে আইনসভা বর্জন বিষয়ে কোনও উল্লেখ করেননি। আইনসভায় অংশগ্রহণে বিরোধী গান্ধী সমর্থকরা উত্তরে বলেন, নাগপুর কংগ্রেসের আগে নভেম্বর মাসে বিভিন্ন প্রাদেশিক বিধানসভা ও কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন

সম্পন্ন হয়ে যায়, ফলে আইনসভা বর্জনের প্রশ্নটি পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়, যার জন্য গান্ধী আইনসভা বয়কটের কর্মসূচী নাগপুর প্রস্তাবে যুক্ত করার বিষয়ে উৎসাহ দেখাননি। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, আইনসভায় অংশগ্রহণ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন ও গান্ধী নিজ নিজ অবস্থান থেকে সরে আসেননি ; সাময়িকভাবে এ মতবিরোধ স্থগিত থাকে মাত্র।

নাগপুর প্রস্তাব সম্বন্ধে লিওনার্ড গর্ডনের মন্তব্য[৩] : বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হিসেবে চিত্তরঞ্জন, গান্ধীর মন্তব্য মেনে নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী চলতে সম্মত হন। জুডিথ ব্রাউনের মতে[৪] নাগপুরে গান্ধীর কাছে চিত্তরঞ্জনের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। রজত রায় গান্ধীর গোঁড়া মত ও পথের সঙ্গে আধুনিক বাঙালী ভদ্রলোকের সাংস্কৃতিক সংঘাতই এই বিরোধের কারণ বলে বর্ণনা করেছেন।[৫] ব্রুমফিল্ড এ বিষয়ে অন্য ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে বাঙালী ভদ্রলোকের মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই আইনসভার মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে প্রত্যয়শীল ছিল।[৬] আইনসভা সম্বন্ধে ভদ্রলোকের দুর্বলতার প্রতিফলন আমরা পাই চিত্তরঞ্জনের মধ্যে। চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মী হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মন্তব্য এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য : 'কাউন্সিল প্রস্তাবে বরাবরই চিত্তরঞ্জনের অমত ছিল। তিনি সহি করিতে রাজী হন নাই। কলিকাতা ও নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাব পাঠ করিলে বাস্তবিকই মনে হয় দেশবন্ধু অসহযোগ সম্বন্ধীয় অন্যান্য ব্যাপারে মহাত্মার মতাবলম্বী হইলেও কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া বাধ্যতামূলক নীতির অবলম্বন বিষয়ে তাঁহার স্বীয় মত তিলমাত্র পরিহার করেন নাই। ....গান্ধী-দাশ সাহচর্যে একজন আর একজনকে গ্রাস করেন নাই। উভয়েই পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ, উভয়েই শক্তিমান, উভয়েই পুষ্ট।"[৭] অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেন, নাগপুরে গান্ধী বা দাশ কেউই জয়ী হননি। উভয়পক্ষ এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধে একমত হন।[৮]

অসহযোগ আন্দোলনের চাপে কাউন্সিল বর্জন বিষয়ে গান্ধী-চিত্তরঞ্জনের মতদ্বৈধতা সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর কাউন্সিল প্রসঙ্গ কংগ্রেসের মধ্যে আবার প্রধান বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ১৯২২-এর জুন মাসে রাজাগোপালাচারী, আনসারি ও কস্তুরী রঙ্গ আয়ারকে নিয়ে গঠিত অনুসন্ধান কমিটি কাউন্সিল বর্জনের সিদ্ধান্তের পক্ষে সুপারিশ করে। চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, আজমল খাঁ, বিঠলভাই প্যাটেল এই সুপারিশের বিরোধিতা করেন। জেলে থাকার সময়ই চিত্তরঞ্জন কাউন্সিল সম্বন্ধে তাঁর কৌশলের চূড়ান্ত রূপ দেন। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, "বহু তর্কের পর আমরা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করি। কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব লইয়া তখন খুব দলাদলি হইয়াছিল।"[৯] চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল মহারাষ্ট্রের মুঞ্জে ও জয়াকরকে সপক্ষে আনতে সক্ষম হন। কলকাতার এ আই সি সি-তে (নভেম্বর,

১৯২২) মতিলাল এ বিষয়ে প্রস্তাব আনলে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তাঁকে সমর্থন করেন। কিন্তু গয়া কংগ্রেসের (ডিসেম্বর, ১৯২২) সভাপতি হিসেবে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেস সংগঠনকে কাউন্সিলে যোগদানের পক্ষে আনতে ব্যর্থ হন ; গয়া কংগ্রেসে গান্ধীর সমর্থকদের জয় হয়। কংগ্রেস নির্বাচনপন্থী ও নির্বাচন-বিরোধী এই দুই উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। চিত্তরঞ্জন পদত্যাগ করেন এবং ১ জানুয়ারি, ১৯২৩ তিনি ও মতিলাল নেহরু কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। চিত্তরঞ্জন অবশ্য বলেন, স্বরাজ পার্টি আলাদা নয়, কংগ্রেসেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। গান্ধীপন্থীদের তখনও কাউন্সিল বর্জনের ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব বজায় থাকে। সরোজিনী নাইডু, আবুল কালাম আজাদ, আনসারি, জওহরলাল প্রমুখ নেতারা কিন্তু সমঝোতার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯২৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের দিল্লি অধিবেশনে একটা মীমাংসা হয়। স্থির হয়, উভয় দলই কংগ্রেসের মধ্যে থাকবে এবং কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই যে যার পথে চলতে পারবে। নির্বাচনে অংশ নেবার এবং ভেতর থেকে আইনসভার কাজকর্ম বানচাল করার অনুমতি পান চিত্তরঞ্জন। গান্ধীও স্বরাজীদের কাউন্সিলে কাজ করে যাবার নীতি মেনে নেন। কাঁকিনাড়া কংগ্রেসে দাশের জয় সম্পূর্ণ হয়।

গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে আইনসভায় অংশগ্রহণ বিষয়ে মতদ্বৈধতা নীতিগত না কৌশলগত, এ প্রশ্ন থেকেই যায়। গান্ধী নিজেই বলেছেন, তাঁর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের মতানৈক্য নিছক পদ্ধতিগত নয়। পশ্চিমী ধাঁচের সংসদীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে গান্ধীর কোনও দুর্বলতা ছিল না। কাউন্সিলের রাজনীতিতেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। অরবিন্দের মতো গান্ধীর কাছেও কাউন্সিল ছিল মায়ামাত্র। কাউন্সিলে প্রবেশ বর্তমান সরকারের অংশগ্রহণ বলেই তাঁর মনে হয়েছে। কাউন্সিল বর্জন ছিল খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচী। এই সময় কাউন্সিলে অংশগ্রহণ হতো খিলাফতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও গণ-আন্দোলনের প্রতি ঝোঁকের জন্য সংসদীয় কাঠামোর মধ্যে জাতীয় আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখতে গান্ধী চাননি। তাছাড়া সঙ্গত কারণেই তাঁর ভয় ছিল আইনসভায় চতুর ইংরেজ ভারতীয়দের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃদ্ধিতে আরও ইন্ধন যোগাবে। হয়েওছিল তাই। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন এবং নির্বাচনের পর আইনসভাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে শাসকরা বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। গান্ধী ঠিকই বুঝেছিলেন, আইনসভায় অংশগ্রহণ করে শাসকদের আমরা বাগে আনতে পারব না। বরঞ্চ তারাই আমাদের বে-কায়দায় ফেলতে সক্ষম হবে আইনসভার চৌহদ্দির মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে।

চিত্তরঞ্জন কিন্তু মনে করতেন, আইনসভায় অংশ নিয়ে সংস্কার নীতিকে অকেজো

করতে পারলে বিদেশী শাসকদের অনেকাংশে কোণঠাসা করা সম্ভব হবে। ১৯১৯-এর "সংস্কার নীতির পুরোপুরি পরিবর্তন, না হয় ধ্বংস" এই ছিল তাঁর নীতি। কাউন্সিলকে তিনি মায়াবলে উড়িয়ে না দিয়ে একে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কাউন্সিলে ঢুকে অসহযোগিতার মারফত আইন অমান্য আন্দোলনকেই শক্তিশালী করা যাবে, এ বিষয়ে তাঁর বিশ্বাসের মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, কাউন্সিলে ঢুকে কী লাভ? তাঁর জবাব : "আমাদের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙ্গে খেতে পারবে না।" তাঁর মত ঃ "জনশক্তি যাতে প্রবল ও সংঘবদ্ধ হয় তার জন্য কাউন্সিলের ভেতর থেকে চেষ্টা করতে হবে।" তিনি স্পষ্ট করে বলতেন, "আমি চাই না যে বর্তমান ব্যুরোক্রেসির স্থানে একটি স্বদেশী ব্যুরোক্রেসি বা 'অমাত্যতন্ত্র' গড়ে উঠুক।"[১০] "মায়ারূপী কাউন্সিলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া মায়াজাল ছিন্ন করাই সেই সময়কার প্রধান কাজ" বলে তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১] চিত্তরঞ্জনের চার দফা দাবি, যেমন স্বরাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কাউন্সিলের কাজকর্মে অংশগ্রহণ, নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মীদেরই আইনসভায় মনোনয়ন দেওয়া, সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে সরকারি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করা, অন্যথায় পদত্যাগ ইত্যাদি তৎকালীন পরিস্থিতিতে বাস্তবোচিত বলেই অনেকে মনে করেন। অসহযোগের ব্যর্থতার পর আইনসভাকেই রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে তিনি গুরুত্ব দেন। বাংলার বিভিন্ন সংবাদপত্রও সেই সময় আইনসভায় অংশ নেওয়ার ব্যাপারে সোচ্চার ছিল।[১২] চিত্তরঞ্জন ভালোভাবেই জানতেন, গভর্নরের বিপুল 'ভেটো' ক্ষমতার বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিবাদ দুর্বলই থেকে যাবে কিন্তু কাউন্সিলের ভেতরের সংগ্রাম আর বাইরের আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয় নিয়ে এসে পুরো শাসনব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলা সম্ভব হবে। স্বরাজ পার্টির নির্বাচনী প্রচারপত্রে এই বিষয়টির উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়।[১৩]

কাউন্সিল বয়কট নিয়ে বিতর্কে চিত্তরঞ্জনই শেষ পর্যন্ত নিজ নীতিতে অটল থাকতে সক্ষম হন। কাউন্সিলে স্বরাজীদের কাজ কংগ্রেসেরই কাজ বলে গান্ধীজী স্বীকার করে নেন। বেলগাঁও কংগ্রেসে স্বরাজীদের কাজের প্রশংসাও তিনি করেন। চিত্তরঞ্জন ও মতিলালের কাছে স্বীয় নীতি বিসর্জন দিয়ে গান্ধীর আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে বড়লাট রিডিং-এর বক্রোক্তি উদ্দেশ্যমূলক হলেও একেবারে অসত্য নয়। কাউন্সিলে যোগদান বিষয়ে চিত্তরঞ্জনের মনোভাব ছিল স্পষ্ট, আন্তরিক ও দৃঢ়। আইনসভায় প্রবেশ করে স্বরাজীরা হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর এক দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন। দ্বৈতশাসনব্যবস্থা অকেজো করে দিয়ে তাঁরা বিদেশী শাসকদের মুখোশ খুলে দিতে সক্ষম হন। মৌলানা আজাদ যথার্থভাবেই বলেছেন, [১৪] প্রতিটি বিষয়েই চিত্তরঞ্জনের ছিল প্রখর দূরদৃষ্টি ও কল্পনার প্রসারতা। তিনি চেয়েছিলেন, কাউন্সিলের ভিতর থেকে

সরকার চালানো অসম্ভব করে আর বাইরে থেকে অসহযোগ কর্মসূচী জোরদার করে ভিতর ও বাইরের সম্মিলিত সংগ্রামকে শক্তিশালী করে বিদেশী শাসকদের বিপর্যস্ত করা। এই বিষয়ে তিনি সফলও হয়েছিলেন। আজাদের মতে আইনসভা নির্বাচনের পরই চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগে স্বাক্ষরিত বেঙ্গল প্যাক্ট বাংলা ও বাংলার বাইরের মুসলমানদের মনে এক বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে, তাদের অনুপ্রাণিত করে।[১৫] বাংলার বিধানসভা ও কেন্দ্রীয় সংসদের তৎকালীন নথিপত্রে দেখতে পাওয়া যায় আইনসভায় অংশ নিয়ে স্বরাজীরা কিভাবে ঔপনিবেশিক শাসকদের নাস্তানাবুদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সব দিক থেকে বিচার করলে কাউন্সিলে যোগদানের বিষয়ে চিত্তরঞ্জনের স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

কংগ্রেস সংগঠনের পক্ষ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর চিত্তরঞ্জন ও স্বরাজ্যদল ১৯২৩-এর প্রাদেশিক বিধানসভা ও কেন্দ্রীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য পুরো সাংগঠনিক শক্তি নিয়োজিত করেন। নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করে স্পষ্ট ভাষায় দ্বৈতশাসন ব্যবস্থাকে বাতিল করার ব্যাপারে সর্বপ্রয়াস চালানো হবে বলে স্বরাজীরা প্রতিশ্রুতি দেন। নির্বাচনের প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় 'দ্বৈতশাসন না স্বরাজ।' একদিকে স্বরাজীরা স্বরাজের পক্ষে, অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথের উদারপন্থী দল দ্বৈতশাসনব্যবস্থার সাফল্যের মাধ্যমে ভারতের ডোমিনিয়ান শাসনলাভে বিশ্বাসী। আর নবাব আলি চৌধুরী, আবদুল রহিমের মতো নেতারা সাম্প্রদায়িক দাবির সোচ্চার প্রবক্তা। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাজীরাই জনসমর্থন পান বেশি পরিমাণে। মডারেটদের সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা, এরা সরকারের অনুগ্রহভাজন, দুর্বল, সংগঠনবিহীন ও আমলাতন্ত্রের তাঁবেদার। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হন। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে স্বরাজ্য দলেই ছিল উদ্যমী নেতা, মজবুত সংগঠন ও সুস্পষ্ট নীতি। অক্টোবর ও নভেম্বর এই দুই মাস বাংলায় চিত্তরঞ্জন ও স্বরাজ্য দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন নির্বাচনে জয়লাভের জন্য। এই প্রথম বাংলার নির্বাচনে একটি সংগঠিত রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখীন হয়। খাদি পরিহিত স্বরাজ্য দলের কর্মীরা গ্রামেগঞ্জে নির্বাচনী প্রচারে ছড়িয়ে পড়ে ; স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠিত হয়। সাধারণ নির্বাচনের আগেই লোকাল বোর্ড ইত্যাদির নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং স্বরাজীরা যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। সহকর্মী হিসেবে স্বরাজ্য দলে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র ও মুসলমান নেতৃত্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অংশ—সৎ বিবেচক ও সাম্প্রদায়িক প্রভাবমুক্ত ব্যক্তিরা। এঁদের অনেকেই ছিলেন বয়সে তরুণ (সুভাষচন্দ্র তখন ২৬)। প্রার্থী হিসেবে স্বরাজীরা দাঁড় করান বিধানচন্দ্র রায়, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এমদাদুল হক প্রভৃতি স্ব-স্ব

পেশায় খ্যাতিমান ব্যক্তিদের। প্রার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ ইংলন্ডে থাকার সময় লিবারেল দলের হয়েও নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। এই নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের নেতাদের সাংগঠনিক শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমদিকে স্বরাজীদের সভা সমিতিতে তেমন লোক সমাগম হতো না। "ক্রমে ক্রমে সভায় লোক হইতে লাগিল। আহার নাই, নিদ্রা নাই, কোনও কাজেই তাঁহার (চিত্তরঞ্জনের) শৈথিল্য নাই। এমন দিনও গিয়াছে যে প্রতিদিন ১০/১২ ঘণ্টা নানা সভায় তিনি দাঁড়াইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ও সাধনা সকলের নিকট বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপ সাধনায়ই এ্যাডভোকেট জেনারেল সতীশরঞ্জনকে এবং মডারেট স্তম্ভ ও নায়ক স্যার সুরেন্দ্রনাথকে বড়বাজার ও ব্যারাকপুর হইতে কাউন্সিল সদস্যপদ লাভে তিনি বঞ্চিত করেন। মফস্বলেও তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিই প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন।"[১৬] দ্বিগুণের বেশি ভোট পেয়ে (৫৬৮৯-২২৮৩) বিধান রায় পরাজিত করেন সুরেন্দ্রনাথকে। অনুন্নত সম্প্রদায় এবং হিন্দু ও মুসলিম সকলশ্রেণীর লোকের কাছেই এরা সমর্থন পান। একজন প্রাক্তন মুসলমান মন্ত্রীর পরাজয় সম্বন্ধে তৎকালীন মুসলমান জাতীয়তাবাদী নেতা লিখছেন,[১৭] "ময়মনসিংহে স্বরাজ্যপ্রার্থী ছিলেন মৌলবী তৈয়বুদ্দিন আহমেদ, প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ধনবাড়ীর বিখ্যাত জমিদার নবাব আলি চৌধুরী সাহেব। তাঁর প্রজাপীড়নের নিত্যনতুন কাহিনী আমাদের কাছে আসিত।....এইবার তাঁহাকে নির্বাচনে হারাইয়া শোধ নেবার জন্য কাজে লাগিয়া গেলাম।....নির্বাচনে সত্য সত্যই নবাব বাহাদুর হারিয়া গেলেন। বিপুল বিত্তশালী সরকার সমর্থিত বড়লোকের গরিব জনতার কাছে পরাজয় এই প্রথম।" এইভাবে সর্বত্রই স্বরাজী প্রার্থী জয়ী হলেন। স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় ১ ডিসেম্বর, ১৯২৩-এ লেখা হয় "বাংলা স্বরাজীদের দখলে।"[১৮]

বাংলার বিধানসভায় স্বরাজ্যদলের আসনসংখ্যা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় ৪৭। কেন্দ্রীয় সংসদে স্বরাজ্যদল পায় ৪৫, বোম্বাইতে ৩২, উত্তরপ্রদেশে ২৯, আসামে ১৩ এবং মধ্যপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি ৫৪টির মধ্যে ৪১টি আসন। সর্বত্রই স্বরাজ্যদলের জয় জয়কার। স্বরাজীরা কংগ্রেস রাজনীতিকে নতুন রূপ দেয়—পুরাতনকেও অস্বীকার করে না। স্বরাজীদের এই সাফল্যের পেছনে ব্রুমফিল্ড দেখেছেন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের রাজনীতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের নবজাগ্রত রাজনৈতিক চেতনার সেতুবন্ধন। একদিকে স্বরাজ্যদল ভদ্রশ্রেণীর আস্থা অর্জন করে। আবার জনসাধারণের মধ্যেও উৎসাহ সঞ্চারে সফল হয়। স্বরাজ ও স্বাধীনতার দাবিকে তারা অগ্রাধিকার দেয়। কিন্তু স্বরাজ্যদলের সাফল্য অন্তত বাংলায় সম্ভব হয়েছিল চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্ব ও মুসলমানদের সম্বন্ধে তাঁর উদার মনোভাবের জন্য।

১৯১৯-এর আইনানুযায়ী গঠিত দ্বিতীয় বিধানসভার আসন ছিল সর্বমোট ১৪০, এর মধ্যে সংরক্ষিত মুসলিম আসন ৪৬, আর সাধারণ আসন ৩৯। মুসলমানদের

জন্য নির্দিষ্ট ছিল শতকরা প্রায় ৩০টি আসন, ইউরোপীয়রা পান শতকরা ১৪টি ১৯২৩-এর বিধানসভায় দলগত আসন সংখ্যা নিয়ে গভর্নর লিটন[১৯] ও ব্রমফিল্ড[২০] যে হিসেব দিয়েছেন তা থেকে দেখা যায় স্বরাজ্যদলের সদস্যসংখ্যা ছিল মোট ৪৭, ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পরিচালিত স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী দল ১৯, মনোনীত ২৬, (আমলা ৪, শ্রমিক ২, খ্রীস্টান ও অনুন্নত ২ ও অন্যান্য ১৮), ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মিলে ১৮, বাকি ২৯ জনের মধ্যে ছিলেন মডারেট, আর ফজলুল হকের গোষ্ঠীর আটজন ও অন্যান্যরা। "অন্যান্য" যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই সরকারের সমর্থক। স্বরাজীরা প্রথম দিকে ব্যোমকেশ গোষ্ঠীর সদস্যদের সমর্থন পেতেন। সরকারপক্ষ ও স্বরাজীদের মধ্যে ভোটের ব্যবধান থাকত সাধারণত দুই বা তিন, তবে অনেক সময়ই নরমপন্থী ও ফজলুল হক গোষ্ঠীর সমর্থনের ফলে স্বরাজীদের ভোটসংখ্যা বেড়েও যেত। লিটন প্রায়শই স্বরাজীদের বিরুদ্ধে অবৈধ উপায় গ্রহণের অভিযোগ আনতেন। গভর্নরের অভিযোগ অমূলক ছিল না। কিভাবে সরকার সমর্থক বিধায়কদের আটকে রেখে স্বরাজীরা ভোটে সরকারকে হারিয়ে দেন তার এক বিবরণ দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা বিজয় সিংহ নাহার। নাহার তখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির নির্দেশে নাহার ও অন্য তিনজন খেতাবধারী এবং ইংরেজ সরকারের তোষামোদকারী শ্রীরামপুরের এক বিধায়ককে রিভলবার দেখিয়ে সারাদিন চন্দননগরে আটক রাখেন। ফলে ঐ বিধায়ক আর ভোট দিতে পারেন না।[২১] মাত্র কয়েক ভোটের ব্যবধানে স্বরাজীরা মন্ত্রীদের বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব নাকচ করে দেন। স্বরাজীরা লিটনের রাজনৈতিক দুর্নীতির কথাও বিধানসভায় তুলে ধরেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে বিধানসভা গঠনের বিজ্ঞপ্তি সরকারিভাবে ঘোষিত হওয়ার পর গভর্নরের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় হস্তান্তরিত বিষয়ের মন্ত্রীদের নিয়োগ নিয়ে। স্বরাজ্যদলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল দ্বৈতশাসনব্যবস্থা বানচাল করা। কুশলী লিটন প্রথমে চিত্তরঞ্জনকে দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়াস চালান। তিনি চেয়েছিলেন চিত্তরঞ্জনকে দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে স্বরাজ্যদলে ভাঙন আনতে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে জনসাধারণ থেকে স্বরাজীরা বিচ্ছিন্ন হবে, এ আশাও তাঁর ছিল। ১১ ডিসেম্বর, ১৯২৩ রাজভবনে চিত্তরঞ্জন ও লিটনের মধ্যে দেড় ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা হয়। মন্ত্রিত্ব গ্রহণে চিত্তরঞ্জন অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান, নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে স্বরাজ্য দল দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা ভাঙার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কাজেই স্বরাজীদের পক্ষে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ হবে অনৈতিক। ১৬ ডিসেম্বর, ১৪৮ নং রসা রোড থেকে লিখিত এক পত্রে চিত্তরঞ্জন গভর্নরকে জানান, তিনি গভর্নরের সঙ্গে তাঁর আলোচনার পূর্ণ বিবরণ দলের কাছে পেশ করেছিলেন, কিন্তু দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। দলের সদস্যরা সমস্ত বৈধপন্থা অবলম্বন করে দ্বৈতশাসনব্যবস্থাকে বানচাল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের

কাছ থেকে মন্ত্রিত্ব দান হিসেবে গ্রহণ করে সেই ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করা সঙ্গত হবে না বলে সদস্যরা মনে করেন। চিঠিতে চিত্তরঞ্জন আরও বলেন, এ দেশের জনগণের নবজাগ্রত চেতনা সরকারি ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়, কাজেই কোনও পরিবর্তন আনতে না পারলে জনগণের সহযোগিতার প্রশ্ন আসে না। গভর্নরকে লিখিত চিঠির মধ্যে সংসদবিদ হিসেবে চিত্তরঞ্জনের মুনশিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।[২২]

এরপর লিটন চেষ্টা করেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে দিয়ে হস্তান্তরিত বিষয়ের মন্ত্রিসভা গঠন করতে, কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়, কারণ চক্রবর্তী চান তিনজন মন্ত্রীই তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী নিযুক্ত হোন। শেষ পর্যন্ত লিটন সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্মী এবং কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান), ফজলুল হক (যাঁকে সমর্থন করতেন অন্তত আটজন মুসলিম বিধায়ক) এবং আবদুল করিম গজনভিকে (কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রাক্তন সদস্য ও ময়মনসিংহের জমিদার) মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করতে সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু প্রথমেই স্বরাজীরা আদালতে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং আদালত পুনর্নির্বাচনের আদেশ দেয়। স্বরাজীরা ব্যারিস্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদারকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করান এবং অতি সহজেই তিনি সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে পরাজিত করেন। আইনসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার আগেই সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক আইনসভার আসনটি হারান। মন্ত্রী হিসেবে তাঁর আর নিযুক্ত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। লিটন শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক ও গজনভিকেই মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন ; অন্য মন্ত্রী পদটি খালি থেকে যায়। গভর্নরের শাসন পরিষদে সদস্য (যাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত বিষয়গুলি) হিসেবে নিযুক্ত হন স্যার আবদুর রহিম, জেমস ডোনাল্ড, আই সি এস, মহারাজ ক্ষৌণিশচন্দ্র রায়বাহাদুর এবং স্যার স্টিফেনসন, আই সি এস।

বিধানসভার সভাপতি নিযুক্ত হন প্রখ্যাত সংসদবিদ হেনরি ই. এ. কটন এবং সহসভাপতি মেজর হাসান সুরাবর্দী। ২২ জানুয়ারি সদস্যরা শপথ নেন। স্বরাজীরা খদ্দর ধুতি ও গান্ধী টুপি পরে সভায় প্রবেশ করলে সভাপতি তাঁদের "রোমান সেনেটর" আখ্যা দিয়ে স্বাগত জানান। বিরোধী আসনে তাঁরা বসেন ; স্বরাজী সদস্যদের বিধানসভায় নিয়মবিধি, কায়দাকানুন, আচার অনুষ্ঠান যথাযথ তালিম দেওয়া হয়। বিধানসভায় তাঁদের দলীয় নেতা, মুখ্য সচেতক ইত্যাদি ছিলেন। আধুনিক সংসদীয় কায়দায় স্বরাজীদের সংগঠন ছিল বিধানসভায়। স্বরাজী সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সুবক্তা, দক্ষ সংসদবিদ। বস্তুত এই পর্বেই বিধানসভা ছিল পুরোপুরি স্বরাজীদের দখলে। প্রশ্ন উত্থাপন, প্রস্তাব পেশ, মোশন আনা ইত্যাদি সংসদীয় পদ্ধতি সম্বন্ধে স্বরাজীরা পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। অনেক সময়ই সভাপতি ও সরকারের আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে সভাকক্ষ থেকে তাঁরা 'ওয়াক-আউট' করতেন।

স্বরাজী প্রাধান্যে বিধানসভার পর্যালোচনা মোটামুটিভাবে চারটি পর্যায়ে করা যায়। প্রথমত, ডায়ার্কি বা দ্বৈতশাসনব্যবস্থা বানচালে স্বরাজীদের সাফল্য ; দ্বিতীয়ত, হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীতে স্বরাজীদের অবদান ; তৃতীয়ত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নে স্বরাজীদের রক্ষণশীল মনোভাব যা প্রকাশ পায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনী বিল নিয়ে ; চতুর্থত, ভারতে সংসদব্যবস্থার গোড়াপত্তনে অনন্য ভূমিকা।

বিধানসভার প্রথম অধিবেশনেই (২৩ জানুয়ারি, ১৯২৪) গভর্নর লিটন স্বরাজীদের প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন। স্বরাজীরাও বুঝিয়ে দেন তাঁরা সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের দিকে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। গভর্নর লিটনের উদ্বোধনী ভাষণের সময় স্বরাজীরা সভাকক্ষে অনুপস্থিত থাকেন। গভর্নর যে উদ্বোধনী ভাষণ দেন তাতে স্বরাজীদের প্রতি উষ্মা ও প্রচ্ছন্ন হুমকি প্রকাশ পায়। মন্ত্রী নিয়োগের সাফাই দিয়ে তিনি বলেন, তাঁদেরই মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে, যাঁরা দায়িত্বপালনে প্রস্তুত, কর্তব্যপালনে সচেতন, যাঁরা শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস নয়, শাসনতন্ত্রের রূপায়ণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিধায়কদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তাঁদের স্থির করতে হবে, তাঁরা গড়ার দলে থাকবেন, না ভাঙার দলে। বাংলার বিধানসভার দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে গভর্নর বলেন, সংসদীয় কাঠামোর ভিত্তিস্থাপন ও বিবর্তনে এই সভা যথাযথভাবেই গর্ববোধ করতে পারে।[২৩]

প্রথম থেকেই স্বরাজীরা দ্বৈতশাসনের ব্যর্থতা এবং শাসকদের রাজনৈতিক ভণ্ডামি ইত্যাদি বিষয় সভায় তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯২৩-২৪-এ বাংলার ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ইংরেজদের সন্ত্রস্ত করে তোলে। বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে ডে সাহেবকে গুলি করেন। এর পরেই পুলিশের তরফ থেকে শুরু হয় ব্যাপক দনমনীতি। প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিস খানাতল্লাসির নামে তছনছ করে দেওয়া হয়। চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী অনিলবরণ রায়, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সুভাষচন্দ্র বসু, কিশোরীলাল ঘোষ প্রমুখ নেতা গ্রেপ্তার হন। আইনসভায় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করে ২৪ জানুয়ারি স্বরাজীরা এক প্রস্তাব আনেন। হোসেন সুরাবর্দী প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন, ব্যক্তি স্বাধীনতায় অহেতুক হস্তক্ষেপ, বিনাবিচারে আটক ইত্যাদি সাধারণভাবে অত্যাচারী সরকারেরই নীতি হয়ে থাকে, শরৎচন্দ্র বসুও প্রস্তাব সমর্থন করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রস্তাবের সমর্থনে জোরালো বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, "বলশেভিক অভিযোগে ১৯১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁরা অনেকেই আমার সহকর্মী। পুলিশি অত্যাচারে ভারতবাসীর বিদ্রোহাত্মক মনোভাব সরকার দমন করবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন। আমি সরকারকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই, দমননীতি চালিয়ে ভারতবাসীকে ঠাণ্ডা করা যাবে না। সরকার আরও বলেছেন, নীতি পরিবর্তনে সরকারকে বাধ্য করা যাবে না। ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আমিও সরকারকে

বলতে চাই যে আমার দেশের লোককে ভয়-ভীতি দেখিয়ে, জোর করে কিছু মানিয়ে নিতে বাধ্য করা যাবে না।"[২৪] স্বরাষ্ট্র সচিব স্টিফেনসন তাঁর বক্তব্যে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে হিংসাত্মক কার্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দোষারোপ করেন এবং নেতৃবৃন্দকে আটক রাখার জন্য স্বরাজীদেরই দায়ী করেন। ভোটে স্বরাজীদের বিপুল জয় হয়—প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ৭৬টি ভোট। বিপক্ষে ৪৫। বিপক্ষে যাঁরা ভোট দেন তাঁদের মধ্যে ২৭ জন ছিলেন সরকারি কর্মচারী, ১৫ জন ইউরোপীয়, বাকি কয়েকজন নির্বাচিত হিন্দু-মুসলিম সদস্য। স্বরাজীদের ৬৩ জন ভোটারের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছিলেন নির্বাচিত মুসলিম বিধায়ক। এর কয়েকদিন পরই শিক্ষা বিভাগের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করে যতীন্দ্রনাথ বসু শিক্ষা অধিকর্তার পদ বিলুপ্তির জন্য এক প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাবও পাস হয়ে যায় ; পক্ষে ৭০, বিপক্ষে ৫০ ভোটে।[২৫]

দ্বৈতশাসনব্যবস্থা বানচাল করার প্রধান অস্ত্র হিসেবে স্বরাজীরা গভর্নরের মন্ত্রী নিয়োগের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেন। পাঁচ-পাঁচবার মন্ত্রীদের বেতন সংক্রান্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করে মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে তাঁরা বাধ্য করেন, ফলে গভর্নরকে হস্তান্তরিত বিষয়ের দায়িত্ব স্বহস্তে নিতে হয়। ১৯২৪-২৫-এর বাজেটে বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় মঞ্জুরির দাবি সরকার বিধানসভায় পেশ করলে অনেক ক্ষেত্রেই এই দাবি স্বরাজীদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য প্রত্যাখ্যাত হয়। এইভাবে বন, শিক্ষা, শিল্প, ভূমিরাজস্ব ইত্যাদি বিভিন্ন দপ্তরের ব্যয় অনুমোদন করতে বিধানসভা অস্বীকার করে। ১৮ মার্চ সেচ দপ্তরের ব্যয় মঞ্জুরির ভোটে স্বরাজী ও সরকারি দল সমান সমান ভোট পায়। সভাপতি কটন নির্ণায়ক ভোট দিয়ে সরকারকে জিতিয়ে দেন।[২৬] অবস্থা এমন দাঁড়ায় গভর্নর লিটনকে ৭২-ডি ধারা অনুযায়ী একদিনেই ২১টি বিভাগের ব্যয় বিশেষ ক্ষমতা বলে অনুমোদন করতে হয়।[২৭] কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় বিধানসভায় এক প্রস্তাব এনে বলেন, এই ব্যয় মঞ্জুরির অস্বীকৃতি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেই অনাস্থা প্রস্তাব বলে গণ্য করা হোক। কিন্তু প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ৬৩ ভোট, বিপক্ষে ৬৪ ; প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। মন্ত্রীদের বেতন সংক্রান্ত ব্যয় মঞ্জুরির দাবি সরকার বিধানসভায় আবার আনেন ২৪ মার্চ, বিধানসভা তা অনুমোদন করতে অস্বীকার করে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়। ক্ষুব্ধ লিটন বিনা নোটিসে বিধানসভায় এসে বিধায়কদের হুমকি দেন যে, ব্যয় মঞ্জুরির দাবি এইভাবে বাতিল হওয়ার দরুন তিনি কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান বন্ধ করে দেবেন, মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ড কোনও টাকা পাবে না। হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ বন্ধ হবে এবং সরকারি কর্মচারীদের ছাঁটাই করতে বাধ্য হবেন এবং এর জন্য দায়ী থাকবেন বিধায়করা।[২৮] সত্য-সত্যই লিটন ৭০০ কর্মচারীকে ছাঁটাইয়ের নোটিস দেন ও ফজলুল হক এবং গজনভিকে মন্ত্রী হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। এক শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি

হয়। ব্রিটেনের পার্লামেন্টেও লিটনের এই কাজের সমালোচনা হয়। ভারত সচিব অলিভার ও বড়লাট রিডিং, লিটনকে সংযত হতে বলেন এবং গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা বলে প্রত্যাহৃত বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় মঞ্জুরির অনুমোদনের পরামর্শ দেন। সংবাদপত্রে লিটনের কাজের সমালোচনা করে বলা হয়, বিধানসভা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করার পরও লিটন মন্ত্রীদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ; রাজবন্দীদের মুক্তি দেননি, অযাচিতভাবে আইনসভায় এসে হুমকি দিয়েছেন, ছাঁটাইয়ের নোটিস জারি করেছেন। স্বরাজীদের লক্ষ্য ছিল হস্তান্তরিত বিষয়ের মন্ত্রী নিয়োগের সব ধরনের বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করে দ্বৈতশাসনব্যবস্থা বানচাল করা। তাঁরা সুপরিকল্পিত ভাবে এগোন। স্বরাজীদের নিয়ন্ত্রণে তখন তিনখানি পত্রিকা—ফরওয়ার্ড, নায়ক ও মোহাম্মদি। কোনও সদস্য স্বরাজীদের বিপক্ষে ভোট দিলে পরের দিনই খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় কালো বর্ডারে তার নাম ছাপা হতো, তিনি চিহ্নিত হতেন সরকারের তাঁবেদার হিসেবে।

পাঁচ মাস স্থগিত থাকার পর আগস্ট মাসে বিধানসভার অধিবেশন আবার শুরু হলে মন্ত্রীদের বেতন বাবদ ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার মঞ্জুরি প্রস্তাব উত্থাপন করেন রাজনৈতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য জে. ডোনাল্ড, আই সি এস। এই ধরনের প্রস্তাব বিধানসভায় আসতে পারে অনুমান করে পূর্বেই যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত হাইকোর্ট থেকে এক আদেশ নিয়ে আসেন যার মর্মার্থ হলো : আইনসভা একবার ব্যয় মঞ্জুরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর দ্বিতীয়বার আর তা আইনসভায় উত্থাপন করা যায় না। হাইকোর্টের এই আদেশের বিরুদ্ধে লিটন আবেদন করার উদ্যোগ নেন, ভাইসরয় রিডিং তখন তাঁকে নিবৃত্ত করেন এবং বড়লাট নিজে বিধানসভার নিয়মাবলী সংশোধন করে প্রত্যাখ্যাত ব্যয় মঞ্জুরি দ্বিতীয়বার বিধানসভায় পেশ করার ক্ষমতা গভর্নরকে দেন। উত্তেজনার পরিবেশের মধ্যে ২৬ আগস্ট ডোনাল্ড সাহেব বেতন সংক্রান্ত ব্যয় মঞ্জুরির প্রস্তাব তুললে স্বরাজীরাই প্রথমে বৈধতার প্রশ্ন তুলে বলেন, বিদ্যমান আইন অনুযায়ী একবার প্রত্যাখ্যাত মঞ্জুরি আবার অনুমোদনের জন্য আনা যায় না। সভাপতি হেনরি কটন ভারত সরকারের সদ্য সংশোধিত ঘোষণার উল্লেখ করে এই প্রস্তাব যথাযথ বলে রুলিং দেন। অনাস্থা প্রস্তাব যেদিন বিধানসভায় পেশ করা হয় সেদিন সকালে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় রায়বাহাদুর পিয়ারীলাল দাসকে লিখিত ফজলুল হকের চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিতে ফজলুল হক ঐ রায়বাহাদুরকে বিধানসভায় স্বরাজীদের বিরুদ্ধে ভোটের বিনিময়ে উৎকোচ দানের প্রস্তাব করেন। বেইট, ব্লাফ, অ্যান্ড ব্রাইবারী"—টোপ, ধাপ্পা, ঘুষ—এই শিরোনামায় 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় সংবাদটি পরিবেশিত হয়। ফজলুল হক বলেন, চিঠি জাল ও প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। চিত্তরঞ্জন দাশ ফজলুল হককে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চিঠির স্বাক্ষর যে ফজলুল হকেরই,

তা প্রমাণ করেন।[২৯] প্রস্তাবক ডোনাল্ড সাহেব অনেক যুক্তি দেখান, মন্ত্রীদের কাজের সাফাই দেন। সরকারের সদিচ্ছার কথা বলেন এবং শেষে ভয় দেখান। যদি মঞ্জুরি এবারও প্রত্যাখ্যাত হয় তবে হস্তান্তরিত বিষয়গুলো সংরক্ষিত বিষয় বলে গণ্য হবে। বিধানসভায় এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় ; সদস্যরা অনেক সরস মন্তব্য, টীকা-টিপ্পনী ব্যঙ্গোক্তি করেন। অখিলচন্দ্র দত্ত এক পালটা প্রস্তাবে মঞ্জুরি প্রত্যাখ্যানের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখে বলেন, বাংলা সরকার কালবিলম্ব না করে মন্ত্রীদের পদচ্যুত করুন। জবাবে ডোনাল্ড যুক্তি দেখান, মন্ত্রীদের পদচ্যুত করার এক্তিয়ার বাংলা সরকারের নেই। উত্তরে অখিল দত্তের মন্তব্য, "এটা কি হনলুলু সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যে?"[৩০] স্বরাজীরা ছাড়া প্রাক্তন মন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মিত্র, অখিল দত্তের প্রস্তাব সমর্থন করেন। বিধানসভার অধিবেশন ঐ দিন ছিল খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। দর্শক গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। সভাপতি কটন দর্শকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ভোটের ফলাফলের পর যদি বিন্দুমাত্র বিক্ষোভ দেখানো হয়, তবে তিনি উপরের ও নিচের গ্যালারি পরিষ্কার করে দেওয়ার আদেশ দেবেন। শেষ পর্যন্ত ব্যয় মঞ্জুরি প্রত্যাখ্যান করে অখিল দত্তের প্রস্তাব ৬৮-৬৬ ভোটে গৃহীত হয় ; মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন।[৩১] দ্বৈতশাসনব্যবস্থার অবসান পর্বের সূচনা শুরু হলো বলে ফজলুল হক মন্তব্য করেন।[৩২] লিটন অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধানসভা স্থগিত করার নির্দেশ দেন । জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে স্বরাজীদের এই ভূমিকাকে স্বাগত জানানো হয়। হিন্দু-মুসলমান বিধায়করা অভিনন্দিত হন।

ইতিমধ্যে লিটন সুযোগ খুঁজছিলেন ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইন বিধানসভাকে দিয়ে যাতে পাস করিয়ে নেওয়া যায়। সুভাষচন্দ্র বসু, অনিলবরণ রায়, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রমুখ স্বরাজী বিধায়করা তখন কারারুদ্ধ। বেশ কয়েকজন বিধায়কের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গুরুতর অসুস্থ! এই সুযোগে সরকার বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করে ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইন সংশোধনের একটি বিল পেশ করে। লিটনের ধারণা ছিল এতজন বিধায়কের অনুপস্থিতিতে স্বরাজীদের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া কঠিন হবে। স্বরাজী নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আটক বন্দীদের অনুপস্থিতির জন্য বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবি রাখার প্রস্তাব দেন সরকারকে, কিন্তু সভাপতি এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তারদের নির্দেশ অমান্য করে অসুস্থ চিত্তরঞ্জন স্ট্রেচারে করে বিধানসভায় আসেন ও অধিবেশনে যোগ দেন। বিপুল ভোটাধিক্যে বিলটি পরিত্যক্ত হয় কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা বলে লিটন একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেন বিনা বিচারে আটক করে রাখার। দেশবন্ধুও ঘোষণা করেন যতক্ষণ তার দেহে প্রাণ আছে, তিনি এই দুরভিসন্ধিমূলক অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে লড়বেন, দেশের তরুণ নেতারা বিনা বিচারে

আটক থাকবেন, এ তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না।[৩৩]

এরপর লিটন ১৯২৫-এর মার্চ মাসে নবাব আলি চৌধুরী (সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও ডাকসাইটে জমিদার—যিনি নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন) ও সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরীকে মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। এবার ফজলুল হক ও তাঁর গোষ্ঠীর আট জন মুসলমান সদস্য স্বরাজীদের সমর্থন করেন। ২৩ মার্চ, ১৯২৫, ভোট হলে পর দেখা যায় ৬৯ জন সদস্য মন্ত্রীদের জন্য কোনও মঞ্জুরির বিরুদ্ধে এবং ৬৩ জন পক্ষে ভোট দেন। ফলে এবারও সরকার পরাস্ত হয়। লিটন শাসনতন্ত্র বাতিল করেন এবং বলেন ১৯২৬-এর নির্বাচনের আগে দ্বৈতশাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রয়োগের সম্ভাবনা নেই। শুধুমাত্র জরুরী প্রয়োজনেই বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হতে পারে।

১২ আগস্ট, ১৯২৫ চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিধানসভায় এক বিশেষ অধিবেশন বসে। সভাপতি হেনরি কটন দুই প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই দুই নেতার অবদান চিরকালের জন্য অম্লান হয়ে থাকবে। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা, সংসদীয় রীতিনীতি সম্বন্ধে দক্ষতা এবং চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, শান্ত ঋজু বাচন-ভঙ্গি ও রোমান সেনেটরদের মতো আচরণবিধি সর্বদেশের সাংসদদের অনুকরণযোগ্য বলে তিনি মন্তব্য করেন। অন্যান্য সদস্যরাও মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রয়াত দুই নেতার উদ্দেশে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।[৩৪]

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে সংস্কার পরবর্তী তৃতীয় বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। চিত্তরঞ্জনের অবর্তমানে স্বরাজ্য দল তখন নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত, অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন মিত্র, অনিলবরণ রায় প্রমুখ স্বরাজী নেতা এবং অগণিত কর্মী তখন জেলে। সর্বোপরি স্বরাজীদের নীতিও আগের মতো জনসাধারণকে আকর্ষণ করতে পারছিল না। মুসলমান সমাজের সমর্থন লাভে স্বরাজীরা বঞ্চিত হন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৬-এর নির্বাচনে বিভিন্ন কেন্দ্রে স্বরাজী প্রার্থীরা পরাজিত হন। নির্বাচিত ৩৯ জন মুসলমান সদস্যের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন স্বরাজী। ভোটে শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নলিনীরঞ্জন সরকার, নৌশের আলি, বিধানচন্দ্র রায়, কিরণশংকর রায়, নাজিমুদ্দিন, হোসেন সুরাবর্দী প্রমুখ নেতারা নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বর্মার মান্দালয় জেলে বন্দী হিসেবে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্রকে উত্তর কলকাতার আসনে স্বরাজ্য দলের প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হয়। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়ান বাংলার উদারপন্থী দলের নেতা যতীন্দ্রনাথ বসু। নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে সুভাষচন্দ্র বিজয়ী হন।[৩৫]

তৃতীয় বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে ১১ জানুয়ারি, ১৯২৭। স্বাগত ভাষণে লিটন সদস্যদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিত্যাগের আবেদন জানান এবং আশা

প্রকাশ করেন, সংসদীয় ব্যবস্থা বাংলার রাজনৈতিক প্রগতির সহায়ক হবে।[৩৬] এ দিনই বিধানসভার সভাপতি নির্বাচিত হন নরমপন্থী নেতা মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন এমদাদুদ্দিন আহ্‌মেদ। হস্তান্তরিত বিষয়ে মন্ত্রী নিয়োগে লিটন আগের মতোই সমস্যায় পড়েন। ১৯২৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নায়ক আবদুর রহিমকে লিটন প্রথমে মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন, কিন্তু রহিমের সঙ্গে মন্ত্রী হিসেবে কাজ করার জন্য অন্য কোনও হিন্দু সদস্য রাজি হন না। রহিম পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর লিটন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও গজনভিকে মন্ত্রী নিয়োগ করেন। স্বরাজীদের কাছে ব্যোমকেশ ছিলেন বিশ্বাসঘাতক, দলত্যাগী, মতত্যাগী ; গজনভি ছিলেন অত্যাচারী জমিদার, সুবিধাবাদী, ফলে নির্বাচিত মুসলমান সদস্যদের অধিকাংশেরই আস্থাভাজন ছিলেন না। সাত মাস মাত্র এই মন্ত্রিসভা স্থায়ী হয়। বিধানসভা ভবন নির্মাণ, রাজবন্দীদের মুক্তি, খড়গপুরে ধর্মঘটরত রেল পুলিশদের ওপর গুলিবর্ষণ, বরিশাল-এর কুলকাঠিতে মুসলমান ও নমঃশূদ্র জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ইত্যাদি নিয়ে সদস্যরা সরকার ও মন্ত্রীদের বিব্রত করে তোলেন। মন্ত্রীদের অপসারণের জন্য স্বরাজীদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও স্বরাজীরা এ ব্যাপারে তৎপর থাকেন। ১৭ জানুয়ারি, ১৯২৭ নলিনীরঞ্জন সরকার এক প্রস্তাবে বলেন, মন্ত্রীদের বেতন বরাদ্দ প্রত্যাখ্যান করা হোক। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ স্বরাজী নেতা নলিনীরঞ্জনকে সমর্থন করেন, এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়। শেষ পর্যন্ত স্বরাজীরা পরাস্ত হন। প্রস্তাব ৩৮-৯৪ ভোটে বাতিল হয়ে যায়।[৩৭] বিধানসভায় স্বরাজীদের প্রভাব যে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে তা প্রমাণিত হয়। স্বরাজীরা অবশ্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে লেগেই থাকেন। ২৫ আগস্ট, ১৯২৭ স্ববাজী নেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও গজনভির বিরুদ্ধে এক অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন। শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দোষত্রুটি দেখিয়ে, মন্ত্রীদের ব্যর্থতার ফিরিস্তি দিয়ে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় নিযুক্ত মন্ত্রীদের তিক্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে ডাঃ রায় দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। আবদুর রহিমও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে স্বরাজীদের সমর্থন করেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ডাঃ রায়ের সপক্ষে বলেন। শেষ পর্যন্ত গজনভির বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়ে যায় ; পক্ষে পড়ে ৬৬টি এবং বিপক্ষে ৬২টি ভোট। চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ৬৮-৫৭ ভোট।[৩৮] মন্ত্রীরা পদত্যাগে বাধ্য হন। টাউনহলের বাইরে সমবেত হিন্দু-মুসলমান জনতা মন্ত্রীদের পতনে উল্লাস প্রকাশ করে।[৩৯]

এবপর মুশারফ হোসেন এবং প্রভাসচন্দ্র মিত্র মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন নয়মাসের জন্য, কিন্তু তাঁদেরও শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়। ১৯২৯-এর ডিসেম্বর মাসে গভর্নর কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় ও খান বাহাদুর জি এম ফারুকিকে মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। শিবশেখরেশ্বর কিছুদিন পরেই পদত্যাগ করেন। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে

স্বরাজীদের এই জেহাদ ছিল দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বানচাল করার অন্যতম অস্ত্র এবং এতে তাঁরা অনেকাংশেই সফল হয়েছিলেন।

সংসদীয় রাজনীতিকে নির্ভর করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপনে স্বরাজীরা এই সময় এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। স্বরাজী আমলে বিধানসভায় সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে দুটি ভিন্ন অবস্থান লক্ষ করা যায়। একদিকে যেমন চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি হয়, অন্যদিকে আবার এই পর্বেই বিধানসভাকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক শিকড় আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অত্যন্ত নিপুণভাবে বিদেশী শাসকরা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হন। হিন্দু ও মুসলিম নেতারা তাঁদের আরোপিত ফাঁদে পা বাড়ান। আগেই উল্লেখ করেছি, ১৯২৩-এর নির্বাচনে জয়ী স্বরাজী সদস্যদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের বেশি ছিলেন মুসলমান। চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দরদী মনই মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বরাজীদের দিকে টেনেছিল এবং এটা সম্ভব হয়েছিল বেঙ্গল প্যাক্ট বা হিন্দু-মুসলিম চুক্তির মাধ্যমেই। চিত্তরঞ্জন যথার্থভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন মুসলমান ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমর্থন না পেলে স্বরাজীদের পক্ষে নির্বাচনে জয়লাভ অসম্ভব। যদিও বেঙ্গল প্যাক্ট বা হিন্দু-মুসলিম চুক্তি সই হয় নির্বাচনের পরে কিন্তু তার প্রচেষ্টা শুরু হয় নির্বাচনের আগেই। বাংলার হিন্দু ও মুসলিম নেতারা চিত্তরঞ্জনের গৃহে মিলিত হয়ে যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন তাতে বলা হয়—

(১) বাংলার আইনসভায় প্রত্যেক সম্প্রদায় লোকসংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধিত্ব পাবে। কিছুদিন পর্যন্ত পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা বজায় থাকবে।

(২) সরকারি চাকরির শতকরা ৫৫ ভাগ পাবে মুসলমানরা।

(৩) জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠরা পাবে শতকরা ৬০ভাগ, সংখ্যালঘিষ্ঠরা শতকরা ৪০ ভাগ।

(৪) আইনের দ্বারা কোনও সম্প্রদায়ের ধর্মসংক্রান্ত কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হবে না, মুসলমান সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তিন-চতুর্থাংশ সম্মতি ছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে আইন প্রণীত হবে না। নমাজের সময় মসজিদের সামনে গান বা শোভাযাত্রা বেআইনী বলে গণ্য হবে, বকরী ঈদের সময় গো-কোরবানিতে বাধা দেওয়া হবে না।

বেঙ্গল প্যাক্টের ফলে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে কিন্তু বিরোধিতা আসে কংগ্রেসের এক প্রভাবশালী অংশ থেকে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন, "কংগ্রেসের অনেক নেতা প্রবলভাবে তাঁর বিরোধিতা

শুরু করেন। তারা দাশের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে জোরালো প্রচার চালাতে থাকেন। তাঁকে তাঁরা সুবিধাবাদী ও মুসলমান তোষণকারী বলে অভিহিত করেন। কিন্তু বিরোধিতা সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জনকে টলাতে পারেন না। পর্বতের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি সমস্ত রকম বাধাবিঘ্নের মোকাবিলা করতে থাকেন। সারা বাংলা পরিভ্রমণ করে জনগণের সামনে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। বাংলা এবং বাংলার বাইরের মুসলমানদের মনে চিত্তরঞ্জনের বক্তব্য এক বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে।" আজাদ আরও বলেছেন "আমি বলতে চাই, অকালে যদি তাঁর মৃত্যু না হতো, তাহলে সারা দেশে তিনি এক নতুন প্রাণবন্যার সৃষ্টি করতে পারতেন। দুঃখের বিষয় তাঁর মৃত্যুর পর কয়েকজন সহকর্মী তাঁর সেই যুগান্তকারী ঘোষণাকে নস্যাৎ করে দেন। এর ফলে বাংলার মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যান এবং এইভাবেই দেশবিভাগের প্রথম বীজ রোপিত হয়।[৪০]

আজাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা অন্তত বাংলার বিধানসভায় স্বরাজীদের ভূমিকা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বরাজী বিধায়কদের মধ্যেও একটা মনোভাব ছিল, চিত্তরঞ্জন বড় বেশি উদারতা দেখিয়েছেন মুসলমানদের প্রতি ; দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বানচাল করার জন্য ২১ জন মুসলমান সদস্যকে স্বরাজী দলে আনতে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে। চিত্তরঞ্জন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন, হিন্দু-মুসলিম মিলিত প্রয়াস ছাড়া স্বরাজ লাভ সম্ভব নয়। তিনি বলতেন, "হিন্দু ও মুসলিম উভয়েরই ঘরবাড়ি যখন এই দেশেই, উভয়েরই যখন তুল্যস্বার্থ, তখন উভয় সম্প্রদায়কেই তুল্য সুবিধা দেওয়াই কর্তব্য।[৪১] সুভাষচন্দ্রও বলেছেন, "ভারতের হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মতো ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না।[৪২] যখন জেলে ছিলেন, হিন্দু-মুসলিম বন্দীরা ঈদের দিন যাতে একসঙ্গে আহারে বসতে পারেন তার ব্যবস্থা তিনি করেন। তাছাড়া "মুসলিম সম্বন্ধে হিন্দু ভদ্রলোকের যে ভীতি মিশ্রিত বিরাগ লক্ষ করা যায়, দাস তার উর্ধ্বে বিরাজ করতেন।"[৪৩] চিত্তরঞ্জনের বেঙ্গল প্যাক্টের মধ্যে রাজনীতি ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু চটক, চমক বা সাময়িকভাবে কাজ হাসিল করার প্রয়াস ছিল না। বাংলার জনসংখ্যার দিক দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা ছিলেন শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির ফলে চিত্তরঞ্জন বুঝেছিলেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা মূলত অর্থনৈতিক সমস্যা। আর সেভাবেই তিনি সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করেছিলেন, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রশ্নে চিত্তরঞ্জনের ভূমিকা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ (বাংলাদেশ) ও কৃষক প্রজা পার্টির সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ সাহেব লিখেছেন, "সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে দেশবন্ধুর মর্মস্পর্শী উদাত্ত আহ্বান আমার কানে এবং বোধহয় আমার মতো অনেক বাঙালীর কানে আজও রণিয়া রণিয়া ধ্বনিয়া উঠিতেছে।" ঐ সম্মেলনেই চিত্তরঞ্জন

বলেন, "হিন্দুরা যদি উদারতা দ্বারা মুসলমানের মনে আস্থা সৃষ্টি করিতে না পারে, তবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আসিবে না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ব্যতীত আমাদের স্বরাজের দাবি চিরকাল কল্পনার বস্তুই থাকিয়া যাইবে।"[৪৪] চিত্তরঞ্জনের ভূয়সী প্রশংসা করে আজাদও লিখেছেন, "চিত্তরঞ্জন সেদিন যেভাবে বাংলার সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান করেছিলেন, আজও তাঁর অনুসৃত সেই পথই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ বলে আমি মনে করি।"[৪৫]

ইংরেজ সরকার প্রথম থেকেই মুসলমান সদস্যদের স্বরাজীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করে আনতে গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উস্কানি দিচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা প্রধানত নির্ভর করেন আবদুর রহিম, গজনভি প্রমুখ ইংরেজদের একান্ত অনুগত মুসলমান নেতৃত্বের উপর। প্রধানত এদের প্ররোচনায় মালদা থেকে নির্বাচিত সদস্য মুশারফ হোসেন ১২ মার্চ, ১৯২৪ এক প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, বেঙ্গল প্যাক্টের বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রাদেশিক সরকারের চাকরিতে এখনই মুসলমানদের জন্য শতকরা ৮০ ভাগ পদ সংরক্ষিত করা হোক। তিনি আরও বলেন, মুসলমানদের কোটা পূরণ হয়ে গেলে পর তা শতকরা ৭৫-এ নামিয়ে আনা যেতে পারে। এই প্রস্তাব এনে সরকার এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা চাইছিলেন স্বরাজীদের সবচেয়ে দুর্বলতম জায়গায় আঘাত হানতে। বেঙ্গল প্যাক্টে অবাস্তব, ছলনা এবং মুসলমানদের ভাঁওতা দেওয়ার জন্যই এর মূল পরিকল্পনা নির্মিত—এটা প্রমাণ করাই ছিল মুশারফ হোসেনের প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য। চিত্তরঞ্জন ও স্বরাজ্যদলকে বিপাকে ফেলার সব ধরনের প্রচেষ্টাই করা হয় এই প্রস্তাবে। সরকার সমর্থক সদস্যরা এবং ইউরোপীয় গোষ্ঠী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তাঁদের বক্তব্য, এ প্রস্তাব স্বরাজীদেরই আনা উচিত ছিল। চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্যদল কিন্তু এই ফাঁদে ধরা দেয়নি। এক সংশোধনী প্রস্তাব এনে আপাতত প্রস্তাব মুলতুবি রাখার পক্ষে যুক্তি দেন। চিত্তরঞ্জনের সংশোধনী প্রস্তাব ৬৬-৪৮ ভোটে পাস হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির প্রচেষ্টা তখনকার মতো ব্যর্থ হয়।[৪৬] এরপর ইংরেজ আমলারা বিধানসভায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী একটি স্থায়ী মুসলমান গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সক্রিয় হন। এ বিষয়ে শাসকদের প্রধান সহায় ছিলেন স্যার আবদুর রহিম। তিনি প্রথমে ছিলেন গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্য। পরে এক উপনির্বাচনে তিনি ১৯২৬ সালে, বঙ্গীয় বিধানসভায় নির্বাচিত হন। লিটন নিজেও স্বীকার করেছেন, গজনভি ও আবদুর রহিমকে দিয়ে সর্বপ্রকার সরকারি প্রচেষ্টা চালানো হয় স্বরাজীদের কোণঠাসা করার জন্য।[৪৭] রহিম দু'ভাবে মুসলমানদের প্রভাবিত করতে প্রয়াস চালান। সরকারি চাকরিতে যাতে বেশি সংখ্যায় মুসলমানদের নিয়োগ করা হয় সেজন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়। এক সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যেও প্রচার করা হয়। জেলা

শাসকদের আদেশ দেওয়া হয় জেলায় বিভিন্ন মুসলমান বেসরকারি সংস্থাকে তাঁরা যেন পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বিভিন্ন কমিটিতে মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।[৪৮] সরকারি আমলা এবং ইউরোপীয়দের চেষ্টায় রহিমের অনুগামী কয়েকজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান ১৯২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হন। নির্বাচনের পর রহিমের সমর্থক প্রাক্তন স্বরাজী সদস্য আবদুল গফুর বাংলার নির্বাচনবিধি সংশোধন করার জন্য বিধানসভায় এক প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবে জনসংখ্যা অনুসারে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের সংস্থান করার বিষয় উল্লিখিত হয়। গফুর বলেন, যেহেতু বেঙ্গল প্যাক্ট এখন তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে, সেজন্য মুসলমান, হিন্দু ও খ্রীস্টানদের জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধি দেওয়া হোক। স্বভাবতই ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা এই প্রস্তাবে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, কারণ জনসংখ্যার অনুপাতে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অনেক বেশি। চতুর রহিম তখন এক সংশোধনী প্রস্তাব এনে সংখ্যালঘু ও বাণিজ্যিক স্বার্থ ন্যায়সঙ্গত এবং যথাযথভাবে রক্ষার নিশ্চয়তা দেন। ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা আশ্বস্ত হন এবং প্রস্তাব সমর্থন করেন।[৪৯] ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও অন্যান্য স্বরাজীরা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুক্তি দেন। আবদুর রহিমের সংশোধনী প্রস্তাব সভাপতি গ্রহণ করায় স্বরাজীরা প্রতিবাদ জানান। শেষ পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে তাঁরা সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। প্রস্তাব গৃহীত হয়ে যায়। অবশ্য সব মুসলমান সদস্যই যে সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক ছিলেন তা বলা যায় না। অন্য এক প্রস্তাবের আলোচনাকালে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে সৈয়দ নৌশের আলি (পরবর্তীকালে অধ্যক্ষ) বলেন, 'সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ রচনা করে এবং তাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত আরও প্রসারিত হয়"। ত্রিপুরা থেকে নির্বাচিত সদস্য অসিমুদ্দিন আহমদ তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে মারামারি না করে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, দুর্ভিক্ষ, নিরক্ষরতা ইত্যাদি থেকে ঋণভারে জর্জরিত অগণিত কৃষকের দুর্গতি লাঘবের জন্য সচেষ্ট হতে বিধায়কদের কাছে আবেদন জানান।

হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পরিণতিতে ১৯২৬-এ কলকাতায় দাঙ্গা হয়। ২ এপ্রিল আর্যসমাজীদের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে যে ভয়াবহ দাঙ্গা কলকাতায় বাধে তা সুদূর মফস্বলেও ছড়িয়ে পড়ে। আবদুর রহিম ও তাঁর জামাতা হোসেন শহীদ সুরাবর্দী (যাঁর আশ্রিত পেশওয়ারি গুণ্ডা আল্লাবক্স দাঙ্গা বাধায় বলে প্রকাশ) ও অনেক হিন্দু নেতা নানাভাবে এই দাঙ্গার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এই বছর সারা ভারতে ২৫টি দাঙ্গা হয়। দিল্লিতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দাঙ্গার শিকার হন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ চরমে পৌঁছয়। বিদেশী শাসকরাও আত্মতুষ্টি লাভ করেন, কারণ এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ

এত বেশি বিদ্যমান যার জন্য ইংরেজদের শত্রুতা করার মতো সময় তাদের ছিল না। বাংলার বিধানসভায় এই দাঙ্গা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন হোসেন সুরাবর্দী। ৮ জুলাই বিধানসভায় একপ্রস্তাব পেশ করে তিনি পুলিশ ও বিচারবিভাগের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেন। পুলিশ বিভাগের কাজকর্ম তদন্ত করার জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করার কথাও তিনি বলেন। কমিটির সদস্য হিসেবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিজের নাম সুপারিশ করেন। দাঙ্গা সংক্রান্ত বিচারে হিন্দুরা কম ও মুসলমানরা বেশি শাস্তি পাচ্ছে বলে অনুযোগ করা হয়। দেবীপ্রসাদ খৈতান মনে করেন, হিন্দুরাই অত্যাচরিত হচ্ছে। দাঙ্গা শুরু হয়েছে মুসলমানদের গোঁড়ামির জন্য, মুসলিম নেতৃত্বের পরিকল্পনা মতো এই ধরনের অভিযোগ আসে বিধানসভায়। ইউরোপীয় সদস্যরা এই বিতর্কে নীরব থাকেন। আলোচনা খুব বেশি এগোতে পারেনি, কেননা বিদেশী শাসকরা বিধানসভার অভ্যন্তরে এ বিষয় নিয়ে আলোচনায় উৎসাহ দেখায়নি। সুরাবর্দীর প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।[৫০] হিন্দু-মুসলিম বিরোধের সুযোগ নিয়ে ঔপনিবেশিক শাসকরা বিধানসভাকে দিয়ে সাইমন কমিশনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতার নিশ্চয়তা দিয়েও এক প্রস্তাব পাস করিয়ে নেন। বাইরে সারা ভারতে যখন 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনিতে কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করেছে, বিধানসভায় তখন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব উত্থাপিত এবং পাস হয়। স্বরাজীরা এর বিরুদ্ধাচরণ করেন কিন্তু তাঁরা সেই সময় বিধানসভায় ছিলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ। অসিমুদ্দিন ও অন্য কয়েকজন ছাড়া সব মুসলিম সদস্যই প্রস্তাব সমর্থন করেন।[৫১]

ভারতের সংসদ-ব্যবস্থার গোড়াপত্তনে স্বরাজী প্রাধান্যে বিধানসভার বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই পর্বের প্রশ্ন, প্রস্তাব, মোশন, বাজেট বরাদ্দ নিয়ে বিতর্কের সময় বিধায়করা বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন। সাধারণত পুলিশি অত্যাচার, রাজবন্দীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন, শ্রমিক ধর্মঘট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনগণের দুঃখ-দুর্দশা, সাম্প্রদায়িকতা প্রসারে সরকারের উস্কানি ইত্যাদি বিষয়ের মোকাবিলা করতে শাসন পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রীদের নাজেহাল হতে হতো। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের ধর্মঘটী শ্রমিকদের নিয়ে বিধানচন্দ্র রায় উত্থাপিত প্রস্তাবের বিতর্ক চলাকালে হিন্দু-মুসলিম প্রায় সব সদস্য (আবদুর রহিম সহ) সরকারের সমালোচনা করেন। সুভাষচন্দ্র বসুর বন্দীজীবন নিয়ে প্রায়শই প্রশ্ন উত্থাপন করতেন বিধায়করা। মুক্তি পাওয়ার পর সুভাষচন্দ্র বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দেন কিন্তু মাঝে মাঝে রাজবন্দীদের নিয়ে প্রশ্ন করা ছাড়া বিধানসভায় মোটামুটিভাবে তিনি নীরব থাকতেন।

বিধানসভার বর্তমান ভবন নির্মাণ নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়। বেলভেডিয়ার-রাজভবন-টাউনহল হয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত বর্তমান ভবনে

বিধানসভা ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১ স্থানান্তরিত হয়। মন্ত্রী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী নতুন ভবনের নির্মাণ খরচ বাবদ ৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দাবি করলে অধিকাংশ সদস্যই প্রথমে এর বিরুদ্ধাচরণ করেন। সৈয়দ আবদুর রউফ বলেন, "আমাদের অনেক সৌধ আছে গর্ব করার মতো। আছে দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস। কী লাভ আমাদের এই ধরনের সুরম্য অট্টালিকার যেখানে আমাদের পরামর্শ নেওয়ার মতো সামান্যতম সময়ও রাজপুরুষরা দিতে পারেন না।" মহঃ সাদেক বলেন, "ইডেন গার্ডেনের গাছের তলায় বসে আমরা আলোচনা চালাতে পারি যদি আমাদের আলোচনা জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের সংস্থান করে দিতে সক্ষম হয়।"[৫২] শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিধানসভা নতুন ভবন নির্মাণের অর্থ মঞ্জুর করে।

সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব বঙ্গীয় বিধানসভায় প্রথম উত্থাপিত হয় ১৯২৬ সালে স্বরাজী সদস্যদের দ্বারা। সভাপতি পদ থেকে কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়ের অপসারণ দাবি করে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার ইতিহাসে তা বিশেষ নজির হিসেবে আজও স্বীকৃত।[৫৩] স্বরাজী আমলে বিধানসভায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের প্রস্তাবও আসে। এর মধ্যে ছিল বঙ্গীয় মফস্বল স্বায়ত্তশাসন সংশোধন বিল, কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বিল, মৎস্য সংরক্ষণ বিল, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন বিল, বঙ্গীয় গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা বিল ইত্যাদি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শেষোক্ত দুটি বিলেরই বিরোধিতা করেন স্বরাজীরা। বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ মঞ্জুর নিয়ে বিধানসভায় ঐ সময় যে আলোচনা হতো, তাও ছিল নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রী এ কে গজনভি একবার অভিযোগ করে বলেন, "হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার সমস্ত বিষয় সদস্যরা বাজেট আলোচনায় তুলতে চান। মন্ত্রীরা সমস্ত বিষয়ের জবাব দেন কি করে?"

স্বরাজীরা এই পর্বের বিধানসভাকে খুবই সচল করে রেখেছিলেন, সন্দেহ নেই। চিত্তরঞ্জনের জীবদ্দশায় বিধানসভায় স্বরাজীদের ভূমিকা খুবই কার্যকর হয়েছিল। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবি, বিভিন্ন দমনমূলক আইনের প্রত্যাহার, বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাব নামঞ্জুর, মন্ত্রীদের বেতন নাকচ ইত্যাদি প্রশ্নে হিন্দু-মুসলিম সদস্যরা একযোগে বিদেশী শক্তির মোকাবিলা করতে সক্ষম হন। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাকে স্বরাজীরা সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। এর বৈধতা নিয়ে শুধু প্রশ্ন তোলেননি, একে বিলুপ্ত করার সংকল্প নিয়েছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে অসুস্থ চিত্তরঞ্জন বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় শাসকদের জানিয়ে দেন, স্বরাজীরা এই কাঠামো ভেঙে দিয়ে নতুন ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করতে চায়। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কাদের সঙ্গে সহযোগিতা? যেখানে গভর্নরের

স্বৈরাচারী শাসন চলে, সহযোগিতার সুযোগ সেখানে কোথায়?" হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ উদ্যোগের ফলে স্বরাজীরা দ্বৈতশাসন ব্যবস্থাকে অনেকাংশে বানচাল করে দিতে সক্ষম হন। স্বরাজী নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত স্বরাজীদের ভূমিকার মূল্যায়ন করে বিধানসভায় বলেন, "আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সরকার জনগণের ইচ্ছানুযায়ী শাসন চালাচ্ছেন—শাসকদের এই স্বরূপ উদঘাটিত করা আর সাংবিধানিক পরিমণ্ডলে শাসনব্যবস্থাকে জনগণের মঙ্গলের জন্য পরিচালিত করা। আমরা দ্বিতীয়টি পারিনি। কিন্তু প্রথম উদ্দেশ্যসাধনে সফল হয়েছি। দ্বৈতশাসনকে আমরা অকেজো করেছি। আমরা হয়তো পারিনি অনেক কিছু, কিন্তু আমাদের কাজকর্মের জন্য আমরা মোটেই অনুতপ্ত নই। বরঞ্চ আমরা গর্বিত যে স্বৈরতন্ত্রের নগ্ন মুখোশ, ভণ্ডামি আমরা উন্মোচন করতে পেরেছি। আজ আর এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী নয়, সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সরকারি আমলাদের অঙ্গুলিহেলনেই শাসনকার্য পরিচালিত হয়। আমাদের অনুরোধ ও প্রত্যাশা সত্ত্বেও সরকার তার দমননীতি থেকে বিন্দুমাত্র ক্ষান্ত হননি। আমাদের মনে হয়েছে, পুরো জাতটাকেই শাসকরা মরিয়া করে তুলেছে, আর তার ফলে নিজেদের অজান্তেই কবর খুঁড়ছেন।" সরকারকে সাবধান করে দিয়ে তিনি বলেন, জনসাধারণ আর বেশিদিন এটা সহ্য করবে না। দুর্বিষহ অবস্থার অবসান ঘটাতে "অন্য পদ্ধতি" গ্রহণ করবে।[৫৪]

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর বিধানসভায় স্বরাজীদের ভূমিকা অনেকটা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। রক্ষণশীল হিন্দুরা প্রথম থেকেই বেঙ্গল প্যাক্টের বিরোধী ছিলেন। করপোরেশনে মুসলমানদের বেশি সংখ্যায় চাকরি পাইয়ে দিচ্ছেন, মুসলমানদের তোষণ করছেন— এই ধরনের অভিযোগ জীবিত অবস্থাতেই চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়। স্বভাবতই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেঙ্গল প্যাক্টের সুফল মুসলমানরা বিশেষ অনুভব করতে পারেননি। তাছাড়া স্বরাজীদের রাজনৈতিক কর্মসূচীর পরিপূরক সংহত কোনও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল না। মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলীর এক বিরাট অংশ ছিলেন গ্রামীণ মানুষ ও কৃষক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই শ্রেণীর লোকেরাই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নির্যাতিত হন। ৭ আগস্ট, ১৯২৮ ভূমিরাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মিত্র ভূমিব্যবস্থা নিয়ে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনী প্রস্তাব যখন বিধানসভায় আনেন স্বরাজীরা তখন জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্যই তৎপর হন।[৫৫] অগণিত গ্রামীণ প্রজা, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম, সম্পূর্ণ উপেক্ষিত রয়ে যায়। তাছাড়া কৃষকদের ঋণমকুব ও ভাগচাষীদের স্বার্থরক্ষায় স্বরাজীরা বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাননি। স্বরাজীরা যদি ঐ সময় কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়াতেন তাহলে মুসলমান জনগণের সমর্থন তাঁরা অবশ্যই পেতেন এবং বাংলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পরবর্তীকালে এমন প্রশ্রয় পেত না। প্রকৃতপক্ষে স্বরাজীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক

ভিত্তি তাঁদের ঘোষিত নীতির বিরোধী ছিল। তাছাড়া বিধানসভার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রকে বিপর্যস্ত করা, স্বরাজীদের এই কৌশলের মধ্যেও স্ববিরোধিতা ছিল। অভিজ্ঞতার ফলে স্বরাজীরা ঔপনিবেশিক কাঠামোয় সংসদীয় রাজনীতির সীমাবদ্ধতা বুঝতে পেরেছিলেন। আইনসভায় ঢুকে দ্বৈতশাসনকে সাময়িকভাবে হয়ত অকেজো করে রাখতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানো তাতে সম্ভব হয়নি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পবিপ্রেক্ষিতে স্বরাজী আমলের বিধানসভার প্রাপ্তি নিশ্চয়ই অকিঞ্চিৎকর নয়, কিন্তু এর না-পাওয়ার দিকও কম নয়। বস্তুত প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন ও প্রাথমিক শিক্ষা বিলে স্বরাজীদের জনবিরোধী ভূমিকার সুযোগ নিয়ে বিদেশী শাসকরা হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়। পরবর্তী স্তরে বাংলার সংসদীয় রাজনীতিও এর দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংসদীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের প্রাধান্য (১৯২৯-১৯৩৬)

জাতীয়তাবাদ ও আহত মুসলিম চেতনা

বিধানসভায় মুসলমান সদস্যদের অগ্রণী ভূমিকা এই পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেশবিভাগের অব্যবহিত পূর্বে যে অভিব্যক্তি মুসলিম রাজনীততে প্রাধান্য পেয়েছিল তার সূত্রপাত হয় এই সময় থেকেই। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর স্বরাজীরা কিভাবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যসাধনের পথ থেকে ক্রমশ সরে আসছিলেন পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা করেছি। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন নিয়ে স্বরাজীদের প্রজাবিরোধী ভূমিকা প্রতিটি মুসলমানকেই ক্ষুব্ধ করে ; মুসলমান জনগণের মধ্যেও এর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কি ভোটাধিকারের প্রস্তাবে, কি প্রাথমিক শিক্ষাবিলের বিষয়ে, কি কৃষকের ঋণভার লাঘবের প্রশ্নে দু'চারজন ছাড়া প্রায় সব হিন্দু বিধায়কদের বিরোধিতা সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রশ্রয় দেয়। মুসলমান বিধায়করা অনেক সময় অনুযোগ করে বলেন, হিন্দু সহকর্মীরা তাঁদের সমস্ত বক্তব্যকেই সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন ; কিন্তু একটু তলিয়ে দেখেন না যে, একটা অবহেলিত পশ্চাৎপদ এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকারের প্রশ্ন, তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতির প্রশ্ন। ফজলুল হক, আজিজুল হক এবং আরও অনেককে বিধানসভায় বারবার এই ধরনের অভিযোগ করতে দেখা যায়।[১] ফল হয়, রক্ষণশীল মুসলমান ও বিদেশী শাসকরা এই পর্বের সংসদীয় রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক আদলে গড়ে তোলার সব ধরনের প্রচেষ্টা নেন। আবদুর রহিম ও তাঁর জামাতা শহীদ সুরাবর্দী এবং অন্যান্যরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইন্ধন যোগাতে থাকেন, আর এ ব্যাপারে তাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা সাহায্য পান ইংরেজ আমলাদের কাছ থেকে। তবে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমানদেরই বিধানসভায় নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল, এটা মনে করা সঙ্গত হবে না। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির জন্য সমান্তরাল কিন্তু ক্ষীণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন বেশ কয়েকজন মুসলমান বিধায়ক এঁদের অধিকাংশই ছিলেন ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রজাসমিতির সদস্য। এঁরাও মুসলমান-সংহতির কথা বলতেন, তবে এই সংহতি 'নবাব সুবাদের আহসান মনজিল বা রাজপ্রাসাদে নয়, কৃষক প্রজাদের কুটীরের আঙিনায়' গড়ে উঠবে বলে এঁরা বিশ্বাস করতেন।[২] এইসব সদস্যরা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করতেন এবং যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর সপক্ষে বিধানসভায় বিভিন্ন সময় বক্তব্য রাখতেন। আইন অমান্য আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচার, রাজবন্দীদের প্রতি নির্যাতন,

চট্টগ্রাম ও হিজলির ঘটনাবলী, এমনকি ভগৎ সিং ও রাজগুরুর ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে এঁদের সোচ্চার হতে দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দু বিধায়কদের কাছ থেকে আন্তরিক সমর্থন এঁরা পাননি, বরঞ্চ অবজ্ঞা ও অপমানসূচক উক্তিই শুনেছেন। এর ফলে ইংরেজদের অভিসন্ধিই সিদ্ধ হয় ; দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টিতে তারা সফল হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে বাংলায় ছয়টি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এর সবকটিতেই সরকারি আনুকূল্যে এবং জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক বিধানসভা বয়কটের ফলে মুসলমানদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেকটিতেই প্রধান বা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে থাকেন একজন মুসলিম।

এই পর্বের অপর লক্ষণীয় বিষয়, আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী হিসেবে জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক বিধানসভা বয়কট এবং পরবর্তী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতার পর ১৯২৯-এর মে মাসে বাংলার বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর প্রাদেশিক আইনসভার যে নির্বাচন হয় তাতে কংগ্রেসের কিছুটা শক্তি বৃদ্ধি হয় ; বেশ কয়েকটি মুসলিম আসনেও কংগ্রেস মনোনীত জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা নির্বাচিত হন। চিত্তরঞ্জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আইনসভাকে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে গুরুত্ব দিতে থাকেন। কিন্তু জুলাই মাসে এলাহাবাদে এ আই সি সি-এর সভায় আইনসভা বয়কট করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলার প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, অন্য কয়েকটি প্রদেশও বাংলাকে সমর্থন জানায়। এর ফলে কংগ্রেসের পরবর্তী লাহোর অধিবেশন পর্যন্ত আইনসভা বয়কট সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়। লাহোর কংগ্রেস আইনসভা সদস্যদের পদত্যাগের সিদ্ধান্তই অনুমোদন করে। সুভাষচন্দ্র "মহাত্মার কাউন্সিল বর্জনের সযত্নলালিত এই মতবাদ" গৃহীত হওয়ায় খুবই ক্ষুব্ধ হন। একে তিনি "মারাত্মক ভুল" বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে, "পরবর্তী কয়েক বছরে এই বর্জনের অনিষ্টকর ফল স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল।"[৩] সুভাষচন্দ্রের এই বক্তব্য যে অনেকাংশে যথার্থ অন্তত বাংলার বিধানসভার ভূমিকা পর্যালোচনা করলে তার সত্যতা অনুধাবন করা যায়। কংগ্রেস বিধানসভা বর্জন করায় বাংলায় যাঁরা সদস্য হিসেবে রয়ে যান তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন নাইট-নবাব, নবাববাহাদুর, নবাবজাদা, রায়সাহেব, রায়বাহাদুর ইত্যাদি উপাধিধারী ইংরেজ তল্পিবাহক ; আর ছিলেন বেশ কিছু সাম্প্রদায়িকতাবাদী। নবাব, রায়সাহেব, রায়-বাহাদুরদের সংখ্যা ছিল ৩০। জাতীয়তাবাদীদের সমর্থক হিন্দু ও মুসলমান সদস্য ছিলেন মাত্র কয়েকজন। বিধানসভায় জমিদার, আমলা, ইউরোপীয় গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী বিধানসভা বিভিন্ন দমনমূলক আইনের বিরুদ্ধে, বাজেট বরাদ্দ হ্রাসের পক্ষে সরকার-বিরোধী প্রস্তাব পাসে সক্ষম

হয়েছিল কিন্তু চতুর্থ বিধানসভায় সংস্কারের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের প্রতিবাদ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বাতিল হয়ে যায়। গভর্নর ও তাঁর শাসনপরিষদের মনোনীত সদস্য, আমলা ও ইংরেজদের অনুগত ভারতীয় এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিই বিধানসভা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। সর্বোপরি হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধিতে এই বিধানসভা অত্যন্ত ঘৃণ্য ভূমিকা নেয়। সবকিছু মিলিয়ে এই সময় বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্যদের অনুপস্থিতি বাংলার পরবর্তী রাজনীতিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই সরকার বঙ্গীয় ফৌজদারি (সংশোধন) বিল, বঙ্গীয় সন্ত্রাসবাদ দমন বিল ইত্যাদি অতি সহজেই বিধানসভাকে দিয়ে পাস করিয়ে নিতে পেরেছিল। আমলাদের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান, পাইকারি হারে জরিমানা ধার্য, ঘরবাড়ি ক্রোক ইত্যাদি নানা সংস্থান ছিল ঐসব আইনে। আইন অমান্য আন্দোলনের সার্বিক স্বার্থে আইনসভা বর্জন হয়ত অনেকটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল তবে অন্তত বিধানসভাকে আমলা ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিচরণক্ষেত্রে পরিণত করা থেকে নিবৃত্ত করতে কৌশলগত কারণে বিধানসভা পুরোপুরি বর্জন করা উচিত হয়নি বলে যে অভিযোগ ওঠে তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মন্ট-ফোর্ড সংস্কারে চতুর্থ বিধানসভার কার্যকাল ছিল সাত বছরের বেশি—২ জুলাই, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৬-এর ডিসেম্বর। এই পর্বের বিধানসভাকে অনেক বেশি সক্রিয় হতে দেখা যায়। বিধানসভার অধিবেশন হয় ১৮টি এবং অধিবেশন চলে ৬২৫ দিন ; অর্থাৎ, বছরে প্রায় ৯০ দিন, প্রশ্নোত্তর হয় রেকর্ড পরিমাণ, উত্থাপিত ৪০১৭ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। বিভিন্ন জরুরী বিষয়ে মোট ১৬৮৭টি সংকল্প ও ৫৫৬৬টি মোশনের নোটিস দেওয়া হয়। বিধানসভা ১০৪টি বিল পাস করে, সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয় ৬৪টি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকি নৈতিক বিষয় সম্বন্ধীয় বিভিন্ন আইন প্রণয়নের কৃতিত্ব দাবি করে এই পর্বের বিধানসভা। কাজকর্মের এই খতিয়ান নিশ্চয়ই আশাব্যঞ্জক এবং আজকের দিনের বিধানসভাও সেই তুলনায় নিষ্প্রভ মনে হতে পারে। বিভিন্ন বিষয় যেমন—সাইমন কমিশনের সুপারিশ, গোলটেবিল বৈঠক, গান্ধী-আরউইন চুক্তি, আইন অমান্য আন্দোলনে পুলিশি নির্যাতন, রাজবন্দীদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, শ্বেতপত্র, নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্দেশক কমিশন, উচ্চকক্ষের স্থাপনা, হিজলি ও চট্টগ্রামের ঘটনাবলী, ভগৎ সিং-এর ফাঁসি, ইত্যাদি হয় প্রস্তাব, সংকল্প, স্বল্পকালীন আলোচনা, না হয় দৃষ্টি আকর্ষণ মারফত বিধানসভায় উত্থাপিত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকদের প্রাইভেট টিউশন, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রসঙ্গ, টেগার্টের উপর আক্রমণ সুভাষ বসুর উপর পুলিশি নির্যাতন, রাজবন্দীদের ভাতা, জেলের নারকীয় পরিস্থিতি, জেলে মশার

উপদ্রব ও মশারির অভাব ইত্যাদি নানা বিষয় বিধানসভার সামনে আসে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ আইন বিধানসভায় প্রণীত হয় তার মধ্যে বঙ্গীয় গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা আইন, বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন, বঙ্গীয় মহাজন আইন, বঙ্গীয় কৃষিঋণ আইন, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন আইন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিধানসভায় ঐ সময় দল ও গোষ্ঠীগত অবস্থান যা ছিল, তাতে সরকারকে পূর্ববর্তী বিধানসভার মতো সংগঠিত, রাজনৈতিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নৌশের আলি, জালালুদ্দিন হাসেমি, নরেন্দ্রকুমার বসু প্রমুখ কয়েকজন বিধায়ককেই সরকারি নীতির সমালোচনা করতে দেখা যায়। মুসলমান সদস্যদের মধ্যে বেশিরভাগই নাইট-নবাব-জমিদার-সওদাগর এবং ইংরেজের বশংবদ। এঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন মুসলিম লীগের সমর্থক। ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন প্রজাসমিতির মুসলিম বিধায়করা ছিলেন কৃষক ও সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি তবে এঁদের বিধানসভায় কোন সংহত কর্মসূচী ছিল না। যতীন্দ্রনাথ বসুর উদারপন্থী দলে কয়েকজন বিশিষ্ট বিধায়ক ছিলেন। তাঁরাও গঠনমূলক সমালোচনার মধ্যে নিজেদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ রাখতেন। সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন ছিলেন জাতীয়তাবাদের সমর্থক। এঁরাই সরকারি নীতি ও কর্মসূচীর বিরোধী ছিলেন, সরকার পক্ষ বিধানসভায় এঁদের সমীহ করে চলতেন। ডব্লিউ এইচ থম্পসনের নেতৃত্বে পরিচালিত ইউরোপীয় গোষ্ঠীও বিধানসভায় যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল কিন্তু এঁরা ছিলেন সরকারের সমর্থক।[৪] স্বরাজ্য দলের আমলে কংগ্রেস সদস্যরা যেভাবে বিধানসভায় সরকার পক্ষকে নাজেহাল করতেন, তা এই পর্বে একান্তভাবে অনুপস্থিত ছিল।

১৯২৯-১৯৩৬-এর বিধানসভায় বিভিন্ন বিল প্রণয়ন নিয়ে যে বাক-বিতণ্ডা হয় তাতে তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবণতা এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের এক বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়। প্রথমেই বঙ্গীয় গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা বিলের উল্লেখ করতে হয়। গ্রামীণ মানুষের মধ্যে মুসলমানরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ, স্বভাবতই মুসলমান সদস্যরাই শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে উৎসাহ দেখান। ১৯২৮ সালে তৎকালীন মন্ত্রী নবাব মুশারফ হোসেন এই বিল বিধানসভায় পেশ করেন। দু'দিন আলোচনার পর বিলটি ৩২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। তিনমাস ধরে ১৯টি বিরোধী মত সহ বিলটি যখন বিধানসভায় উপস্থাপিত হয়, তখন সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়ে গেছে। স্বাভাবিক কারণেই বিলটি বাতিল হয়ে যায়। ৫ আগস্ট, ১৯২৯ আবার বিলটি বিধানসভায় পেশ করা হয়। নতুন বিলে প্রাথমিক শিক্ষার দায়-দায়িত্ব মেটানোর জন্য জমিদার এবং কৃষকদের উপর সেস্ ধার্যের প্রস্তাব করা হয়। বিলটি আবার সিলেক্ট কমিটিতে যায়। এবার কমিটির সদস্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫। শিক্ষামন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন কমিটির রিপোর্ট

বিধানসভায় পেশ করেন এবং বিলটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার সুপারিশ করেন। হিন্দু এবং বেশ কয়েকজন মুসলমান সদস্য এর বিরোধিতা করেন। সিলেক্ট কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য বেসরকারি সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড এবং জেলাস্তরে জেলা প্রাথমিক বোর্ড গঠনের সুপারিশ করে। ১০ বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার কথাও সুপারিশে বলা হয়। লক্ষণীয়, সিলেক্ট কমিটি প্রাথমিক শিক্ষাকে পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখার সুপারিশ করে। আর্থিক দায়দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে বলে কমিটি মত প্রকাশ করে। সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট নিয়ে বিধানসভায় তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বিধিবদ্ধ সংস্থার উপর প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। তমিজুদ্দিন খাঁ, বি সি চ্যাটার্জি ও অন্য কয়েকজন সদস্য তাঁকে সমর্থন করেন। সরকারপক্ষে নাজিমুদ্দিন এবং ইউরোপীয় গোষ্ঠী ও মুসলমান সদস্যদের বৃহদাংশ সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না এবং বিলটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার পক্ষে ওকালতি করেন। বিলটি প্রত্যাহারের পক্ষে ৫১ এবং বিপক্ষে ৪৮টি ভোট পড়ে। উল্লেখ্য যে, ৪৮ জন সদস্য বিলটি যেভাবে সিলেক্ট কমিটি থেকে এসেছে সেভাবেই আলোচনার পক্ষে ও প্রত্যাহারের বিপক্ষে ভোট দেন, তাঁদের মধ্যে ১৫ জন ছিলেন মুসলমান।[৫] বিলটি নতুন আকারে বিধানসভায় আবার পেশ করেন শিক্ষামন্ত্রী নাজিমুদ্দিন (১১ আগস্ট)। তিনি সরাসরি বিলটি বিধানসভায় আলোচনা ও গ্রহণের পক্ষে যুক্তি দেন। বিরোধী সদস্যরা, যাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু, জনমত যাচাই করার জন্য বিলটি প্রচারের দাবি জানান। তর্কাতর্কির পর বিধানসভায় ভোট হলে দেখা যায় নাজিমুদ্দিন প্রস্তাবের পক্ষে ৭৯ ও বিপক্ষে ৪০টি ভোট পড়ে। এই ৪০ জনের সবাই ছিলেন হিন্দু ; মুসলমান কোন সদস্যই নাজিমুদ্দিনের পেশ করা বিলের আলোচনার বিরুদ্ধে ভোট দেননি। ইতিমধ্যে শিক্ষাবিল নিয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে চরম তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। জমিদারদের ওপর সেস ধার্যের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হিন্দুরা ছিলেন সোচ্চার।[৬] তাছাড়া এই বিল পাস হলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মুসলমান জনগণ প্রাথমিক শিক্ষার অধিকতর সুযোগ পেয়ে যাবে— এটাও ছিল হিন্দু সদস্যদের ক্ষোভের অন্যতম কারণ। বিধানসভায় প্রস্তাবিত শিক্ষা সেস নিয়ে প্রশ্নোত্তরও হয়। বিলের প্রতিবাদে একমাত্র হিন্দুমন্ত্রী শিবশেখরেশ্বর রায় পদত্যাগ করেন। হিন্দুদের মনোভাবের প্রতি সম্মান জানিয়ে সরাসরি বিলটি আলোচনা না করে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় প্রতিবাদস্বরূপ তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে বিধানসভাকে জানান। মুসলিম ও ইউরোপীয় সদস্যদের কাছে তিনি আবেদন জানান, হিন্দু জনমতের বিরুদ্ধে এই বিল পাস করা ঠিক হবে না।[৭] ফজলুল হকও এই স্তরে বিলের বিরোধিতা করেন

তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে ; তিনি হিসেব করে দেখান, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রায় এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কর দিতে হবে। আবেগপূর্ণ এক ভাষণে তিনি বলেন, এদেশের হিন্দু-মুসলিমের স্বার্থ অভিন্ন। মুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে হিন্দুরাও সমভাবে জড়িত। হিন্দু ও মুসলিম দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করে আসছে এবং একসঙ্গে ই তাদের বাস করতে হবে।[৮] নাজিমুদ্দিন বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাবে সম্মত হননি। তিনি তাৎক্ষণিক আলোচনার দাবি জানান। প্রতিবাদে ৫০ জন হিন্দু সদস্য একযোগে ওয়াক-আউট করেন। ২৬ আগস্ট, ১৯৩০ ঐ বিলটি পাস হয়ে যায়। ফজলুল হকও বিলের সমর্থনেই ভোট দেন।

বিলটি পাস হওয়ার ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি হয়। শিবশেখরেশ্বর রায়ের পদত্যাগ হিন্দুদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। লক্ষণীয়, এত বিতর্ক ও বাদানুবাদের পর প্রণীত আইনটি কিন্তু কাগজপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। এই আইনের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয়নি। কারণ, সরকার জমিদারদের উপর বাধ্যতামূলক সেস বসাতে রাজি হননি। ১৭ মার্চ, ১৯৩২ আবদুল গণি চৌধুরী আইনটির বাস্তব রূপায়ণের অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সরকার থেকে জানানো হয়, প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না হওয়ার দরুন আইনটিকে কার্যকর করা যাচ্ছে না।[৯] এমনকি এই আইনের অন্যতম প্রবক্তা আজিজুল হক শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার পরও আইনটি ফাইলবন্দী হয়ে থাকে। ১৯৩৫-এ আজিজুল হক বিধানসভাকে জানান— প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জমিদারদের উপর বাধ্যতামূলক কর বসানো সঙ্গত বলে সরকার মনে করে না। অন্য কী উপায়ে অর্থের সংস্থান করা যায়, তা নিয়ে সরকার ভাবনা চিন্তা করছেন বলে সদস্যদের তিনি আশ্বস্ত করেন।[১০] পরবর্তীকালে ফজলুল হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার আমলে প্রাথমিক শিক্ষা আইন নিয়ে বিধানসভায় সদস্যদের মধ্যে আরও তিক্ততা সৃষ্টি করে।

বঙ্গীয় কুসীদজীবী বিল (১৯৩২), বঙ্গীয় কৃষিজীবী অধমর্ণ বিল (১৯৩৫), বঙ্গীয় উন্নয়ন বিল (১৯৩৬) ইত্যাদির আলোচনায়ও হিন্দু সদস্যদের রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার ঋণগ্রহীতা দরিদ্র কৃষককুলকে মহাজনদের শোষণ থেকে বাঁচানোর জন্য মহাজনদের বাধ্যতামূলক নিবন্ধীকরণ ও সুদের হার হ্রাস করাই ছিল আজিজুল হক কর্তৃক উত্থাপিত কুসীদজীবী বিলের মুখ্য উদ্দেশ্য। আনন্দমোহন পোদ্দার প্রমুখ হিন্দু বিধায়করা বিলটির প্রবল বিরোধিতা করেন এবং জনমত যাচাই করার জন্য বিলটি প্রচারের প্রস্তাব রাখেন।[১১] কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না পাওয়ায় আনন্দমোহনের প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায় এবং সিলেক্ট কমিটির নিকট বিলটি প্রেরিত হয়। পরে অবশ্য সরকারের পক্ষ থেকে নাজিমুদ্দিন এ বিষয়ে একটি বিল পেশ করলে আজিজুল বিলটি প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু বিলের

আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলিম বিধায়কদের বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িক বিভাজন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

সৈয়দ মজিদ বক্স কৃষকদের ঋণভার লাঘবে তেজারতি ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি বিলের প্রস্তাব বিধানসভায় পেশ করেন। দু'চারজন ছাড়া সব হিন্দু বিধায়কই প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন কিন্তু মুসলিম সদস্যরা একযোগে তা সমর্থন করেন। এই প্রস্তাব নিয়েও হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি হয়।[১২] বঙ্গীয় অধমর্ণ বিল বিধানসভায় পেশ করে গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্য খাজা নাজিমুদ্দিন বিভিন্ন তথ্য দিয়ে দেখান কী নির্মমভাবে চাষীরা মহাজনদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে।[১৩] তিনি বলেন, দু'শ টাকা ঋণ দিয়ে দেড় হাজার টাকা লেখানো হচ্ছে ; সাড়ে তিন হাজার টাকা ঋণের জন্য দিতে হয়েছে আশি হাজার টাকার স্বীকৃতি। বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট, জি ডি বিড়লার বক্তৃতা ইত্যাদি তিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। এই অধমর্ণ বিল পাস হলে বাংলার কৃষকের করুণ অবস্থার অবসান হবে, কৃষি উৎপাদন বাড়বে, বাংলার অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত হবে বলে নাজিমুদ্দিন আশা প্রকাশ করেন। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সৈয়দ নৌশের আলি ও অন্যান্য কয়েকজন নীতিগতভাবে বিলটি সমর্থনের যোগ্য বলে মনে করেন কিন্তু বাধা আসে হিন্দু বিধায়ক ও মুসলিম জমিদারের কাছ থেকে।[১৪] এই বিল পাস হলে রাশিয়া ও ফ্রান্সে যা হয়েছে ভারতেও তা হবে বলে বিধায়ক অমূল্যরতন রায় মন্তব্য করেন।[১৫] বিলটি অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে আইনে পরিণত হয়।

বিধানসভায় যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা সুপারিশ করে কয়েকটি বিল উত্থাপিত হয়। এই বিলগুলিতে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের সংস্থানও ছিল। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন (সংশোধনী) বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন (২য় সংশোধনী) বিল এবং বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন (সংশোধনী) বিলে মিউনিসিপ্যালিটি, লোকাল বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়। লক্ষণীয়, এই বিলগুলিতে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে যৌথ নির্বাচনের সংস্থান করা হয়। নীতিগতভাবে বিলগুলো সমর্থন করতে না পারলেও হিন্দু বিধায়করা বিলের বিরুদ্ধাচরণ করেন না ; কারণ, যৌথ নির্বাচনের ফলে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের সংস্থান বিলগুলিতে ছিল। এই বিলগুলো নিয়ে যে বিতর্ক হয় তাতে দেখা যায় নৌশের আলি, ফজলুল হক, আবদুস সামাদ প্রমুখ বিধায়করা যুক্ত নিবাচন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানান। সামাদ পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে মুসলমানদের স্বার্থ-বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেন।[১৬] নৌশের বলেন, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা মুসলমান সমাজের কোনও উন্নতিসাধন করতে পারবে না ; বরঞ্চ আরও দুর্বল করে দেবে। উল্লেখযোগ্য, এই যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমেই ফজলুল হক ১৯৩৫-এ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বঙ্গীয় পতিতাবৃত্তি বিল নিয়ে বিধানসভায় যে আলোচনা হয় তা থেকেও তৎকালীন বিধায়কদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা, গুণগত উৎকর্ষ ও দায়িত্ব সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ধমান থেকে নির্বাচিত মৌলবী আবুল কাশেম মনে করেন, সামাজিক অত্যাচার, অর্থনৈতিক দৈন্যই মেয়েদের পতিতাবৃত্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, আইন পাস করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে তিনি মনে করেন না। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে বিলটির বিভিন্ন অসংগতির উল্লেখ করেন।[১৭] কল্যাণমূলক এই ধরনের আরও কিছু আইন এই পর্বে বিধানসভায় পাস হয়।

সাংবিধানিক সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এই আমলের বিধানসভাকে যথেষ্ট উৎসাহী হতে দেখা যায়। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরই ১৮ আগস্ট ১৯৩০ বিধানসভায় বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী ২০টি প্রস্তাব পেশ করে। উদারপন্থী বিধায়ক জে. এন গুপ্ত অভিযোগ করেন, কমিশনের রিপোর্ট ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ তো করেইনি ; বরঞ্চ বিভেদ ও অনৈক্যের শক্তি প্রশ্রয় পেয়েছে। সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ শক্তির প্রভাব বৃদ্ধির সবরকমের সংস্থানও রাখা হয়েছে এই রিপোর্টে। জাতীয় ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার পক্ষে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করবে বলে সদস্যরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। আবদুস সামাদ সাইমন কমিশনের রিপোর্টে পৃথক নির্বাচনের সপক্ষে যে সব যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা খণ্ডন করে যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবতনের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, এই রিপোর্ট কার্যকর হলে হিন্দু-মুসলিম উভয়েই নিজ নিজ ধর্মীয় আবেগ দ্বারা চালিত হয়ে রাজনীতিতে অংশ নেবে ; ফলে রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তিরই প্রাধান্য থাকবে এবং হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাড়বে। সর্বোপরি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়বে। প্রায় সব হিন্দু-মুসলমান বিধায়কই কমিশনের রিপোর্টের বিরোধিতা করেন। মজিদ বক্স মনে করেন সাইমনের দেওয়ার মতো কিছু ছিল না এবং সেজন্যই তাঁর সুপারিশ অন্তঃসারশূন্য। তমিজুদ্দিন খাঁ পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করেন। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মন্তব্য করেন, ভারতের স্বাধীনতার দাবি খণ্ডন করার জন্যই যেন কমিশনের রিপোর্ট লিখিত হয়েছে। সাইমনের সুপারিশকে তিনি হতাশাব্যঞ্জক, প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাৎমুখী বলে অভিহিত করেন। হিন্দু-মুসলিমের সমবেত সমর্থনের ফলে জে. এন. গুপ্তের মোশন বিধানসভায় গৃহীত হয়।[১৮]

পরদিন ১৯ আগস্ট উদারপন্থী নেতা এস এম বসু গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পেশ করে বলেন, ভারতে পূর্ণ ডোমিনিয়ন মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বিতর্কে অংশ নিয়ে বলেন ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনার পরিবর্তে বৈঠকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করা হবে বলে তাঁর বিশ্বাস। মুসলমান সদস্যদের মধ্যে এই নিয়ে তীব্র

মতবিরোধ দেখা যায়। হোসেন সুরাবর্দী গোলটেবিল বৈঠকের সাফল্য সম্বন্ধে প্রত্যয় ব্যক্ত করে হিন্দুদের প্রতি দোষারোপ করে বলেন, হিন্দুরা যদি উদারমনা ও সহনশীল হন তবে অন্তত ডোমিনিয়নের জন্য হিন্দু-মুসলিমের যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলা অসম্ভব নয়। আবদুস সামাদ মূল প্রস্তাব সমর্থন করে সুরাবর্দীর বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মন্তব্য করেন, "সুরাবর্দীর মতো নেতাদের জন্যই সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এঁরা নিজেদের বাঙালী মনে করেন না, উর্দু ও ফারসী ভাষার এঁরা পৃষ্ঠপোষক।" প্রজাপার্টির সদস্যরাও এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ফলে ৩৫-৪৯ ভোটেও এস এম বসুর প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারও বিরুদ্ধে ভোট দেন।[১৯]

আইন অমান্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধী-আরউইন চুক্তি (১৯৩১) প্রসঙ্গ নিয়ে বিধানসভায় তর্ক-বিতর্ক হয়। উদারপন্থীরা এই চুক্তিকে স্বাগত জানান। বিধানসভায় জে. এন গুপ্ত এক প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, এই চুক্তি সংখ্যালঘু মুসলমানের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ততর করেছে। এস এম বসু গান্ধীজীকে অর্ধনগ্ন ফকির, শান্ত, ধীর-স্থির ও স্থিতপ্রাজ্ঞ মানব আখ্যা দিয়ে প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান সদস্যই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন ; কারণ, তাঁদের মনে হয় এই চুক্তির ফলে মুসলমান স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে।[২০]

১৬ আগস্ট, ১৯৩২ রামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণার ফলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ আরও তীব্র হয়। বিধানসভার মোট আসনের ৪৮.৪ ভাগ মুসলমান, ৩৯.২ ভাগ হিন্দু ও ১০ ভাগ ইউরোপীয়দের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। বাঁটোয়ারার ফলে বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে হরিজনদেরও স্থায়ী বিরোধের সূত্রপাত হয়। এর প্রতিবাদে গান্ধীজী আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। পুণা চুক্তির ফলে গান্ধীজী অনশন প্রত্যাহার করেন, অনুন্নত সম্প্রদায়ের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাংলার সাধারণ হিন্দু আসনের মধ্যে ৩০টি আসন সংরক্ষিত করে রাখা হয় অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য। বিজয় প্রসাদ সিংহরায়, জে. এন. বসু, বি. সি. চ্যাটার্জি প্রমুখ বিধায়করা বড়লাট উইলিংডনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই চুক্তির প্রতিবাদও জানান। বিধানসভায় নরেন্দ্রনাথ বসু অনুযোগ করে বলেন, এর ফলে আইনসভা থেকে কার্যত হিন্দু বিতাড়নের সুপরিকল্পিত ছক কার্যকর করা হলো। হিন্দু সদস্যদের পক্ষে অবশ্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুণা চুক্তিতে সম্মতি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অথচ সাংবিধানিক রাজনীতিতে তাঁদের প্রাধান্যের বিলুপ্তি তাঁরা মেনে নিতে পারছিলেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে এস এম বসু ২৫ নভেম্বর, ১৯৩২ বিধানসভায় বাংলার আইনসভার উচ্চকক্ষ স্থাপনের এক প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবে বলা হয়, এই সভা হবে অসাম্প্রদায়িক, প্রাজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ,

শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রগণ্য, বুদ্ধিতে অভিজাত, মতবাদে গণতান্ত্রিক এমন ব্যক্তিরাই উচ্চকক্ষের সদস্যপদের অধিকারী হবেন। প্রস্তাবক উচ্চকক্ষের সপক্ষে চিরাচরিত যুক্তিগুলিই দেন। ফ্রান্স, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত সদস্যদের দেওয়া হয়। প্রস্তাবের অবশ্য আসল উদ্দেশ্য ছিল বিধানপরিষদ গঠন করে বিধানসভায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও অপ্রতিহত ক্ষমতা খানিকটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা। ফজলুল হক তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আসল উদ্দেশ্য গোপন করে যেসব তথ্য ও যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা দিয়ে একটি শিশুকেও ভোলানো যাবে না। ইউরোপীয় গোষ্ঠী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন, সরকার পক্ষ অবশ্য নিরপেক্ষ থাকেন, প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হলে দেখা যায় ৪৪ জন সদস্য পক্ষে ও ৪৬ জন বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। লক্ষণীয়, সব মুসলমান সদস্যই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, হিন্দু সদস্যদের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডাঃ নীলরতন ধর ও অন্য কয়েকজন বিধায়ক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন।[১১]

পুণা চুক্তি বাতিল করার বিষয়ে জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রস্তাব আনেন, নিম্নবর্গের হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধভাবে তার বিরোধিতা করেন ইউরোপীয় গোষ্ঠী ও সরকারি সদস্যরা ভোট দানে বিরত থাকেন। প্রস্তাব ৩৬-২৭ ভোটে পাস হয়ে যায়। রাজবন্দী হিসেবে আটক সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৫ নভেম্বর এক মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। হিন্দু-মুসলমান সদস্যরা একযোগে এই দুই নেতার আশু মুক্তি দাবি করেন। সরকার থেকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এঁদের চিকিৎসার সব ধরনের সুবন্দোবস্ত করা হবে।[২২] আবার এই প্রসঙ্গ বিধানসভায় উত্থাপিত হলে সরকার পক্ষ থেকে জানানো হয় এঁদের মুক্তি দেওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়।

জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন নিয়েও বিধানসভায় এই সময় তুমুল আলোড়ন দেখা দেয়। ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশের রাজ-আনুগত্য সম্বন্ধে বিতর্কের কোন অবকাশ ছিল না। তবে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল সদস্যরা বিধানসভায় (কংগ্রেসের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও) ছিলেন। ইতিপূর্বে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯২৯) সভাপতি জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন, ব্রিটিশ আধিপত্যের কবল থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি, পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের স্থির লক্ষ্য)। কংগ্রেস ২৬ জানুয়ারি পূর্ণ স্বরাজ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৬ জানুয়ারি, ১৯৩১ কলকাতার মেয়র সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র এক বিরাট শোভাযাত্রা চৌরঙ্গি রোডে পৌঁছনোমাত্র পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জের ফলে অনেকে আহত হন। সুভাষচন্দ্রের মাথায় লাঠির আঘাত পড়ে। সারা শরীর রক্তে ভেসে যায়—এ বিষয়ে এক মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপনের

অনুমতি চান জাতীয়তাবাদী নেতা সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেমি। নরেন্দ্রনাথ বসু বিধানসভাকে জানান ২৭ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্রকে রক্তমাখা পোশাকেই তিনি লকআপে দেখতে পান। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রস্তাব সমর্থন করেন। স্বরাষ্ট্রবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মিঃ প্রেনটিস আপত্তি জানান। ভোটে হাশেমির প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায় (৩৭-১১)। যাঁরা বিপক্ষে ভোট দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন যদুনাথ সরকার, বিজয়প্রসাদ সিংহরায় প্রভৃতি।[২৩] এরপর ২৫ মার্চ ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসির আদেশ নিয়ে হাশেমি, অন্য এক মুলতুবি প্রস্তাব বিধানসভায় উত্থাপন করেন। কয়েকজন সদস্য আপত্তি করেন, হাসান আলি প্রমুখ সদস্যরা সমর্থন করেন। সভাপতি মন্মথনাথ রায়চৌধুরী প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি দেন, কিন্তু এই প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ২৬টি ভোট, বিপক্ষে ৫৪। মজিদ বক্‌স, হাসান আলি, এমদাদুল হক প্রমুখ ১১ জন মুসলমান সদস্য এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ ১৫ জন হিন্দু সদস্য পক্ষে ভোট দেন, বিপক্ষে দেন যদুনাথ সরকার, আজিজুল হক প্রমুখ বিধায়ক।[২৪]

আইন অমান্য আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবিলা করার জন্য সরকার ফৌজদারি আইন সংশোধন বিল আবার বিধানসভায় আনেন। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিলটির বিরোধিতা করা হয় কিন্তু সরকার পক্ষের অনুগত সদস্য ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সমর্থনে বিলটি পাস হয়ে যায়। বেসরকারি সদস্যরা বিধানসভা থেকে ওয়াক-আউট করেন। এরপরও ১৯৩০ সালে এ-সংক্রান্ত বিল বিধানসভায় উত্থাপিত হলে আড়াইশোর বেশি সংশোধনী প্রস্তাব সদস্যরা পেশ করেন। এই বিলও পাস হয়ে যায়।

বিভিন্ন দমনমূলক আইন প্রণয়নে বিধায়কদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় সন্দেহ নেই কিন্তু সদস্যরাও সুযোগ পেলেই পুলিশি নির্যাতন সম্বন্ধে সরকারকে নাজেহাল করে তুলতেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২ হিজলি জেলের নারকীয় ঘটনার বিস্তারিত তথ্য দাবি করেন বিধায়করা।[২৫] রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলিন্দ যুদ্ধ এবং বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রসঙ্গও বিধানসভায় উত্থাপিত হয়।[২৬] জালালুদ্দিন হাশেমি তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদার দাবি জানান। বাংলায় পুলিশরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে সদস্যদের অভিযোগ করতে দেখা যায়। তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে, স্বরাজী আমলের বিধানসভা যেভাবে পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল, এই পর্বে তা ছিল অনুপস্থিত।

এই পর্বে বিধানসভায় উত্থাপিত প্রশ্নের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি, চার হাজারেরও অধিক। দাঙ্গা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, রাজবন্দী, সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহনের স্বাস্থ্য, সন্ত্রাসবাদ, গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বিধায়করা উত্থাপন করতেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজেব অধ্যাপকদের প্রাইভেট টিউশন সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে সরকারকে বেশ বিব্রত হতে হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নের জবাবে সরকার জানান অধ্যাপক পি সি ঘোষ, এন সি ঘোষ, সি ভট্টাচার্য এবং এস এম ব্যানার্জি প্রমুখ অধ্যাপকরা সরকারের অনুমতি নিয়েই প্রাইভেট টিউশন করেন।[২৭] অনেক সময়ই সরকারের তরফে প্রশ্নের উত্তর দানে গড়িমসি ভাব লক্ষ করা যায়।

এই আমলেই বিধানসভায় দণ্ড বা 'মেস' প্রচলন হয়। 'মেস' আইনসভার কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। ৩১ জানুয়ারি, ১৯৩৪ অধ্যক্ষ মন্মথনাথ রায়চৌধুরী এক আবেগময়ী বক্তৃতায় বিধায়কদের তত্ত্বাবধানে এই 'মেস' সমর্থন করেন। বিধানসভায় আজও এই 'মেস' অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে আছে।

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্রমাবনতি এই পর্বে তীব্র হলেও সাংবিধানিক রাজনীতিতে হিন্দু ও মুসলমান বিধায়কদের ঐক্যবদ্ধভাবে বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করতেও দেখা যায়। সরকার কর্তৃক লবণের উপর শুল্ক ধার্যের বিরুদ্ধে এবং সরকারি চাকুরিয়াদের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর ও বেকার সমস্যা সমাধানের দাবিতে সমবেতভাবে হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের সরকারের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করতে দেখা যায়। তবে হিন্দু সদস্যরা যে অনেক সময়ই বিধানসভায় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হতেন, পূর্বে তা আমরা উল্লেখ করেছি। প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারে যুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করে ১ আগস্ট, ১৯৩২। বিধানসভায় আবদুস সামাদের প্রস্তাব এবং এই প্রস্তাবের ওপর তমিজুদ্দিনের সংশোধনী প্রস্তাব সম্বন্ধে হিন্দু বিধায়কদের মনোভাব থেকেই তা প্রকাশ পায়। সামাদ তাঁর প্রস্তাবে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী, সংখ্যালঘু স্বার্থ-বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করে এই ব্যবস্থার অবসান দাবি করেন। সামাদ বলেন, ১৯০৯-এর পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা আস্কারা পেয়েছে এবং শাসকরা তাঁদের কর্তৃত্ব আরও শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছেন। তমিজুদ্দিন সামাদের প্রস্তাবে এক সংশোধনী যোগ করে বলেন যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থার সঙ্গে সার্বিক প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতিও থাকা উচিত। তাছাড়া তমিজুদ্দিনের সংশোধনীতে জমিদার, ব্যবসায়ী ইত্যাদির বিশেষ প্রতিনিধিত্বের বিলুপ্তি দাবি করা হয়। সুরাবর্দী অসুস্থ শরীর নিয়ে বিধানসভায় আসেন এবং সামাদের প্রস্তাব ও তমিজুদ্দিনের সংশোধনী প্রত্যাখ্যান করে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। মুসলমান সদস্যদের অনেকেই সুরাবর্দীকে সমর্থন কবেন। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তনের জন্য তমিজুদ্দিন যে সংশোধনী দেন তা ২৫-৪২ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার সহ ৩৪ জন হিন্দু সদস্য, ৬ জন ইউরোপীয় এবং দু'জন মুসলমান সংশোধনীর বিরুদ্ধে ভোট দেন, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সহ

তিনজন মাত্র হিন্দু প্রস্তাবের পক্ষ নেন। সামাদের মূল প্রস্তাব অবশ্য ৪৭-৩২ ভোটে পাস হয়ে যায়। অধিকাংশ মুসলমান সদস্যরাই এর বিরোধিতা করেন।[২৮]

পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার ফলেই ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূত্রপাত হয়, হিন্দু বিধায়করা এর বিরুদ্ধে সবসময়ই বিধানসভায় সোচ্চার ছিলেন কিন্তু ভোটাধিকার প্রসারিত করার বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের প্রবল আপত্তি। কারণ, এর ফলে মুসলমান ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে বলে তাঁদের আশঙ্কা ছিল। স্বভাবতই হিন্দুদের এই মনোভাবের জন্য জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা ক্রমশ জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেন। ফজলুল হক যথার্থভাবেই বিধানসভায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মুসলমানদের গোঁড়া, ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িকতাবাদী বলে হিন্দুরা অভিযোগ করেন, স্বাদেশিকতা এঁদের উদ্বুদ্ধ করে না বলে হিন্দুরা অভিযোগ করেন। তাঁর বক্তব্য, "আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, আমরা পৃথক নির্বাচন ও সংরক্ষণ দাবি করি আত্মরক্ষার জন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, অন্যের স্বার্থে আমরা আঘাত হানতে চাই না, মুসলমান হিসেবে নয়, এদেশের মানুষ হিসেবে, ভারতীয় হিসেবে আমরা মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা চাই।"[২৯] তবে মুসলমান বিধায়কদের অনেকেই যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন না। কারণ এ বিষয়ে হিন্দুদের মনোভাব সম্বন্ধে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই সন্দিহান ছিলেন। উচ্চকক্ষ নিয়ে বিধানসভায় যখন বিতর্ক চলছিল, ফজলুল হক এবং অন্য কয়েকজন মুসলমান সদস্যকে যৌথ নির্বাচনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হতে দেখা যায়, পরে তাঁরা এর বিরোধিতাও করেন। তবে নৌশের আলি ও অন্য কয়েকজন মুসলমান নেতা আগাগোড়াই যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা সমর্থন করেছেন।

মুসলমান নেতৃবৃন্দ দাবি করতেন, এই আমলে মুসলিম জনগণের মঙ্গলসাধনে তাঁরা তৎপর ছিলেন এবং বেশ ক'টি জনহিতকর আইনও বিধানসভাকে দিয়ে পাস করিয়েছেন। কিন্তু তাদের শ্রেণীস্বার্থ ব্যাহত হয় এমন কোন আইনই "নবাব-জমিদার প্রাধান্যে পরিচালিত বিধানসভা পাস করেনি। অধমর্ণ বিলের সমালোচনায় মৌলবী হাসান আলি (দিনাজপুর) বলেন, "বিলের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে জমিদারদের মঙ্গলসাধন, বাংলার ঋণগ্রস্ত চাষীদের উপকারসাধন নয়।" "পুঁজিপতিদের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিলটি তৈরি হয়েছে" বলে তিনি অভিযোগ করেন। বিধানসভায় তিনি আরও বলেন, "গত দু'বছরে অনেকগুলো আইনের আস্তরণ দিয়ে গরিব মানুষের মঙ্গলসাধনের কথা বলা হয়েছে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পাস করা হলো ; উপকৃত হলো জমিদার, প্রজা নয়। এই আইনকে এখন বঙ্গীয় জমিদারি আইন বলেই অভিহিত করা উচিত। বঙ্গীয় গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হলো, আজও তা কার্যকর হলো না ; এখন মোটামুটিভাবে এটা মৃত বলে ঘোষণা

করা যেতে পারে। বঙ্গীয় ভূমি উন্নয়ন আইনেরও একই পরিণতি।"[৩০] এতদ্‌সত্ত্বেও মুসলিম লীগ বাংলার মুসলমান জনগণকে আকর্ষণ করতে অনেকাংশে সক্ষম হয়।

বিধানসভায় এতদিন হিন্দুদের যে প্রাধান্য ছিল এই পর্বে ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে এবং শুরু হয় মুসলমানদের অপ্রতিহত প্রভাব। ১৯২৯-১৯৩৬-এর চতুর্থ বিধানসভায় যেসব মন্ত্রীরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দু'জন হিন্দু—কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় ও স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়। শিবশেখরেশ্বর রায়ের মন্ত্রিত্ব ছিল মাত্র আট মাস। মুসলমান মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন নাজিমুদ্দিন, জি এম ফারুকি ও আজিজুল হক। স্বরাজী আমলের মন্ত্রীরা যেভাবে বিধায়কদের দ্বারা হেনস্তা হতেন, এই আমলে সেই ধরনের কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন মন্ত্রীদের হতে হয়নি ; কারণ বিধানসভায় জাতীয়তাবাদীদের প্রভাব এই পর্বে ছিল প্রায় অনুপস্থিত। তাছাড়া মন্ত্রিসভা পূর্ণ সমর্থন পায় তফসিলী বিধায়ক, বেসরকারি ইউরোপীয় বিধায়ক, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং অধিকাংশ মুসলমান সদস্যের। ভারতীয় মন্ত্রীরাও ছিলেন শাসকদের অনুগত। মন্ত্রিসভা ছিল প্রেনটিস, মোরাবলি প্রমুখ আমলা ও শাসন পরিষদের সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিধানসভাতেও ছিল এঁদের আধিপত্য। ফজলুল হকের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ "বিধানসভার অন্তত ৩৯জন মুসলিম সদস্য মিঃ প্রেনটিসের বাইসাইকেল। তিনি যেভাবে, যে দিকে চালনা করেন, সে দিকেই সদস্যরা চলেন।" স্পষ্টতই এই আমলের বিধানসভার সঙ্গে স্বরাজী প্রাধান্যে বিধানসভার ছিল গুণগত পার্থক্য।

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন—ফজলুল হক, তমিজুদ্দিন, আবদুস সামাদ, হাসান আলি প্রমুখ মুসলিম নেতারা বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রায়শই বলতেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তাঁদের কোন বিরোধ নেই, কিন্তু তাঁদের অভিযোগ হিন্দু সহকর্মীরা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখেন না যে মুসলমানদের সামাজিক অধিকার ও অর্থনৈতিক বিকাশের প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে জাতীয়তাবাদী ধারার সঙ্গে মুসলমানদের যুক্ত করা সম্ভব নয়। একমাত্র নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছাড়া কোন বিধায়ক মুসলমানদের এই আহত মানসিকতার প্রতি সহমর্মিতা দেখাতে পারেননি। বিভিন্ন বিল ও প্রস্তাবে এই পর্বে যে ভোটাভুটি হয় তা থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

সপ্তম অধ্যায়

ঔপনিবেশিক বিধানসভার স্বর্ণযুগ : অসাম্প্রদায়িক মফস্বল বাংলা (১৯৩৭-১৯৪১)

কংগ্রেস মুসলিম লীগ ও প্রজাপার্টির রাজনীতি

ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত এই পর্বের বিধানসভা নানা দিক দিয়ে অনন্যতা দাবি করতে পারে। ১৯৩৭-এর বিধানসভার গঠন ছিল শুধু সংখ্যার দিক থেকে নয়, গুণগতভাবেও ভিন্ন। পূর্ববর্তী নির্বাচনের চেয়ে ভোটাধিকার ছিল অনেক প্রসারিত। পল্লী ও মফস্বল বাংলার প্রতিনিধিরা ছিলেন বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ। মফস্বল বিধায়কদেরই বিধানসভায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে দেখা যেত। পল্লীবাংলার দিকে লক্ষ্য রেখেই ফজলুল হক আমলের বিধানসভা প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন, সালিসি বোর্ড স্থাপন, মহাজনি আইন প্রণয়ন ইত্যাদি ব্যবস্থা নিয়েছিল। প্রয়োজনের তুলনায় বিভিন্ন বিধি-বিধান অকিঞ্চিৎকর হলেও এটা অস্বীকার করা যায় না যে এর ফলে শুধু মুসলমানরা নয়, সাধারণভাবে কৃষকপ্রজা এবং গ্রামীণ মানুষেরা কিছুটা উপকৃত হয়েছিলেন। জমিদার ও মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের অন্তত খানিকটা নিষ্কৃতি দিতে পেরেছিল এই পর্বের বিধানসভা।

সদস্যপদ তালিকার দিকে নজর দিলে এই পর্বের বিধানসভার স্বকীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শহরাঞ্চলে বিধানসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার ছিল বাড়ির মালিক, গাড়ির মালিক, আয়কর দাতা, ব্যবসায়ের লাইসেন্সধারী এবং ষষ্ঠশ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত নরনারীর। গ্রামাঞ্চলে ছয় আনা চৌকিদারি ট্যাক্স যাঁরা দিয়েছেন তাঁরাই ভোটের অধিকারি হয়েছেন। মফস্বল অঞ্চল থেকে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশের বিধায়ক ছিলেন কৃষকপ্রজা দলের, বাকিরা স্বতন্ত্র, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস দলের। মৈমনসিং, বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও যশোহরের কিছু কিছু এলাকা ছিল প্রজাদলের শক্তিশালী ঘাঁটি। শহরাঞ্চলে তাঁরা ছিলেন নিষ্প্রভ, আর অনেক জায়গায় অস্তিত্বহীন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ছিল শহরাঞ্চলে প্রবল। মফস্বল অঞ্চলের নবীন ও প্রবীণ বিধায়কদের অনেকেরই ছিল ইউনিয়ন, লোকাল জেলা বোর্ড পরিচালনার অভিজ্ঞতা। পেশায় এঁরা ছিলেন উকিল, মোক্তার, হেকিম, শিক্ষক। জমিদার ছিলেন বেশ কয়েকজন, জোতদার ও তালুকদার ছিলেন অনেক। মৌলানা, মৌলবী ছিলেন প্রায় ৩৫ জন। সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ, ভাল ইংরেজি জেনেও, বিধানসভায় বক্তৃতা দিতেন বাংলায়। পোশাক, আচার-আচরণে মুসলমান সদস্যদের অনেকেই ছিলেন খাঁটি বাঙালী। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এঁরা বিধানসভায়

আসতেন। অনেক সময়ই রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও গ্রাম্য কথা-কাহিনী থেকে উপমা দিয়ে বিধানসভায় এঁদের বক্তৃতা দিতে দেখা যেত। এঁরা নিজেদের 'পল্লীবাসীর প্রতিনিধি', 'পাড়াগাঁয়ের কৃষক' বা 'কৃষকদের নিজের লোক' বলে আখ্যায়িত করতেন।

এত বেশি দক্ষ বিধায়কের সমাবেশ ইতিপূর্বে এমনকি 'স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও বাংলার বিধানসভায় দেখা যায়নি। এঁদের পুরোধা ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ফজলুল হক, শহীদ সুরাবর্দী, নাজিমুদ্দিন প্রমুখ বিধায়ক, অন্যদের মধ্যে ছিলেন নলিনাক্ষ সান্যাল, শশাঙ্কশেখর সান্যাল, নীহারেন্দু দত্তমজুমদার, আবু হোসেন সরকার, সামসুদ্দিন আহমদ ও মুসলিম লীগের আবদুল বারি, ফজলুর রহমান, আবদুর রহমান সিদ্দিকি, আবুল হাশিম প্রমুখ সদস্য। মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে সোচ্চার ছিলেন হেমপ্রভা মজুমদার, হাসিনা মুরশেদ, মীরা দত্তগুপ্তা ও মিস বেলহার্ট। হেমপ্রভার সমালোচনা অনেক সময়ই সরকার পক্ষের অস্বস্তির কারণ হতো ; হাসিনা মুরশেদ হয়েছিলেন প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিসন মন্ত্রিসভার সংসদসচিব। মীরা দত্তগুপ্তা ও হাসিনা মুরশেদকে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে যুক্তি ও তথ্যবহুল বক্তব্য বাখতে দেখা যেত। শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দশার কথাও এই আমলের বিধানসভায় যথাযথভাবে প্রতিফলিত হযেছিল। শ্রমজীবী মানুষের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আফতাব আলি, এম এ জামান প্রমুখ বিধায়করা। ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি (পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল) খ্রীস্টান সম্প্রদায়েব প্রতিনিধিত্ব করতেন। জর্জ ক্যাম্পবেল, ডব্লিউ এম ওয়াকার, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ ছিলেন ইউরোপীয় গোষ্ঠীর নেতা। স্বাভাবিকভাবে বাংলার রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতাকরণের যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল পূর্ববর্তী পর্যায়ে তা প্রসারিত হয় এই পর্বে। 'জমিদার-নাইট-নবাব' এবং অবাঙালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মুসলিম লীগ বিধায়কদের অনেক সময়ই ইসলাম বিপন্ন, মুসলিম স্বার্থ অবহেলিত ও মুসলমানদের স্বাধিকারে হিন্দুদের বাধা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখতে দেখা যায়। কলকাতা কর্পোরেশন আইন সংশোধন করে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন, মাধ্যমিক শিক্ষা আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা, সরকারি চাকরিতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি এই পর্বেই কার্যকর হয়। হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য, মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক—এই বোধ মুসলমান জনগণের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। সর্বভারতীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবে বাংলার রাজনীতিতেও দেখা যায় এবং মুসলিম লীগের গণভিত্তি এই সময় থেকে প্রসারিত হয়।

বাংলার সংসদীয় রাজনীতিতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এই পর্বে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। ১৯৩৬-এ

কংগ্রেসের লক্ষ্নৌ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জওহরলাল নেহরু ১৯৩৫-এর সংস্কারকে 'দাসত্বের সনদ' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু অনেক টানাপড়েন এবং বাক্‌বিতণ্ডার পর আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস। কারণ ব্যাখ্যা করে নেহরু বলেন, নির্বাচনে যোগ দিলে কংগ্রেসের বাণী লক্ষ লক্ষ ভোটারের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে ; শুধু তাই নয়, যাদের ভোটাধিকার নেই, সেই অগণিত, শোষিত মানুষের সঙ্গেও কংগ্রেস যোগসূত্র স্থাপনে সক্ষম হবে। তবে নির্বাচনে জেতার পর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ বিষয়ে কংগ্রেসের মধ্যে মতদ্বৈধতা থেকেই যায়। কৃষক প্রজা ও মুসলিম লীগের মধ্যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ নিয়ে অবশ্য কোন সংশয় ছিল না। প্রধান তিন রাজনৈতিক দলের প্রাক্‌নির্বাচনী পর্বের প্রচারের মধ্যেও তৎকালীন রাজনৈতিক উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। কংগ্রেস যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করে, তাতে কৃষিঋণ মকুব এবং কৃষি সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।[১] মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে কংগ্রেসের দায়বদ্ধতার কথাও ঘোষণা করা হয়। জমিদারি উচ্ছেদ বা প্রধান প্রধান শিল্পের জাতীয়করণের প্রসঙ্গ ইস্তাহারে অনুল্লেখ থেকে যায়। কংগ্রেস থেকে বাংলার নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় শরৎচন্দ্র বসুর উপর, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় হন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। প্রাদেশিক কমিটির পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্র বসু যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেন তাতে ১৯৩৫-এর শাসনসংস্কার প্রত্যাখ্যান করেও কংগ্রেস কেন নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়, আইনসভার বাইরের সংগ্রামের সঙ্গে বিধানসভার অভ্যন্তরে সংগ্রামের যোগসূত্র স্থাপন এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করাই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আসল উদ্দেশ্য। কংগ্রেস আরও জানায়, 'আত্মত্যাগ ও সেবা দ্বারা যাঁরা জনগণের আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন কেবলমাত্র তাঁদেরই যেন জনগণ বিধানসভায় নির্বাচিত করে।'[২] সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যৌথ নির্বাচন অথবা উভয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য অন্য কোন নীতির উপর ভিত্তি করে মুসলমান প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথাও ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেসের তুলনায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহার ছিল অনেক প্রগতিশীল। কৃষক প্রজাপার্টির চৌদ্দ দফা কর্মসূচীতে ছিল, 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ, খাজনার নিরিখ হ্রাস, নজর সেলামি রহিতকরণ, খাজনা-ঋণ মকুব, মহাজনী আইন প্রণয়ন, সালিসি বোর্ড গঠন, হাজামজা নদী সংস্কার, প্রতি থানায় হাসপাতাল স্থাপন, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক বাধ্যতামূলককরণ, বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, মন্ত্রীর বেতন এক হাজার টাকা নির্ধারণ, রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি ইত্যাদি।'[৩] মুসলিম লীগের চৌদ্দ দফা দাবি সম্বলিত নির্বাচনী ইস্তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর চেয়ে মুসলমান ঐক্য ও সংহতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়

বেশি। জমিদারি উচ্ছেদ সম্পর্কে মুসলিম লীগের ইস্তাহারে কোন উল্লেখ ছিল না। কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ছিল মুসলিম লীগের মূল নীতির বিরোধী। প্রাক-নির্বাচনী পর্বে নবাব হাবিবুল্লার নেতৃত্বে 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' এবং শিল্পপতি ইস্পাহানি ও আবদুর রহমান সিদ্দিকির পরিচালনায় 'নিউ মুসলিম মজলিস' নামে দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলার প্রভাবশালী নাইট-নবাব-জমিদার ও ব্যবসায়ীরা সংঘবদ্ধ হন। শেষ পর্যন্ত এই দুই সংস্থাই নির্বাচনের আগে মুসলিম লীগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে ১৯৩৭-এর 'নির্বাচন যুদ্ধ কৃষক প্রজা সমিতি ও মুসলিম লীগের সম্মুখ যুদ্ধে পরিণত হইল।'[৪] এটা অবধারিত ছিল, মুসলমানদের মধ্যে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে সেই দলের নেতাই হবে বাংলার ভাবী মুখ্যমন্ত্রী। স্বভাবতই নির্বাচনযুদ্ধ দুই দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল।

১৯৩৭-এর নির্বাচন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়, কারণ 'সাধারণভাবে কৃষক প্রজাগণের এবং বিশেষভাবে মুসলিম জনসাধারণের অর্থনৈতিক কল্যাণ-অকল্যাণের দিক থেকে এই নির্বাচন ছিল জীবন-মরণ প্রশ্ন।"[৫] নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারি ১৯৩৭। নির্বাচনী অঞ্চল, সদস্য ও ভোটার সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায় নিচের সারণিতে :[৬]

নির্বাচনী অঞ্চল	*সদস্য সংখ্যা*	*ভোটার সংখ্যা*
সাধারণ (শহরাঞ্চল)	১২	৩,৮৫,৩৪৭
সাধারণ (গ্রামাঞ্চল)	৬৬	২৪,২৬,২৮৮
মুসলমান (শহরাঞ্চল)	৬	৫৫,৫৩৮
মুসলমান (গ্রামাঞ্চল)	১১১	৩৪,০২,৮২৬
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৩	৮,৫২৫
ইউরোপীয়ান	১১	১৪,১৭৫
ভারতীয় খ্রীস্টান	২	১০,০৩৮
বাণিজ্য ও শিল্প	১৯	৯২৬
জমিদার	৫	১,৯৫১
বিশ্ববিদ্যালয়	২	১,৪৭৯
শ্রমিক	৮	৩,১৩,৪০০
মহিলা	৫	৭৪,৯৯০
মোট	২৫০	৬৬,৯৫,৪৮৩

এটা স্পষ্ট যে, ২৫০টি আসনের মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশের কাছাকাছি অর্থাৎ ১৭৭টি ছিল গ্রামীণ নির্বাচন কেন্দ্র। এর মধ্যে মুসলমান আসন ছিল ১১১ এবং হিন্দু ও তফসিলী জাতি নিয়ে গঠিত সাধারণ আসন ছিল ৬৬টি। ইউরোপীয় আসন ১১

হলেও বাণিজ্য ও শিল্প নির্বাচনী ক্ষেত্রেও ছিল সাহেবদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। মোট ২৫ জন ইউরোপীয় বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৬৭ লক্ষ ভোটারদের মধ্যে গ্রামীণ বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোট ছিল ৫৮ লক্ষের বেশি মানুষের। সাধারণ (হিন্দু ও তফসিলী) ৭৮টি আসনের মধ্যে ৩০টি ছিল তফসিলী সম্প্রদায়েব এবং এই সম্প্রদায়ের মোট ভোটদাতা ছিলেন ৮ লক্ষের বেশি, বর্ণহিন্দুদের জন্য ছিল ৪৮টি আসন। যদিও ভোটারের দিক থেকে এদের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষের মত। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় কোন রাজনৈতিক দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সক্ষম হয়নি। ৫৪টি আসন পেয়ে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। কৃষকপ্রজা দল পায় ৪০, মুসলিম লীগ ৩৯, ইউরোপীয় গোষ্ঠী ২৫, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ৪, ইন্ডিয়ান খ্রীস্টান ২, হিন্দু মহাসভা ৩, হিন্দু জাতীয়তাবাদী ২, হিন্দু স্বতন্ত্র ৩৭ ও মুসলিম স্বতন্ত্র ৪২। কংগ্রেস যে ৫৪টি আসন পায় তার মধ্যে সাধারণ আসন ছিল ৪২, তফসিলী ৭ ও শ্রমিক ৫টি আসন। যে ৩২ জন তফসিলী প্রার্থী নির্বাচিত হলেন, তাঁদের মধ্যে কংগ্রেস পায় ৭, হিন্দু মহাসভা ২ ও স্বতন্ত্র ২৩। সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেসের সাফল্য ছিল লক্ষণীয় (১১৬১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবে কংগ্রেস পায় ৭১৬টি আসন) ; কিন্তু এই নির্বাচনে মুসলমান জনগণ থেকে কংগ্রেস যে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তাবও পরিচয় পাওয়া যায়। কংগ্রেস মনোনীত মুসলিম প্রার্থীরা সারা ভারতে ২৬টি আসন জয়লাভ করেন। মুসলিম লীগ টিকিটে নির্বাচিত হন ১০৯ জন প্রার্থী।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে সম্প্রদায়গত অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধিসহ মুসলমান ছিলেন ১২২ জন, বর্ণহিন্দু ৬৪ জন, তফসিলী ৩৫ জন, ইউরোপীয় ২৫ জন, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ৪ এবং ইন্ডিয়ান খ্রীস্টান ২ জন। এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সদস্য মিলিয়ে স্বতন্ত্র ছিলেন প্রায় ৮০ জনের মত। নির্দলীয় সদস্যরা, স্বাভাবিকভাবে যাঁরা সরকার গঠন করবেন তাঁদের দলে ভিড় করেন। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ ৬০ জন ও কৃষকপ্রজা ৫৮ জন সদস্যের সমর্থন আদায় করে। ২০ জন জমিদার, রাজা-মহারাজা পনেরো-যোলো জন, তফসিলী ও ইউরোপীয় সদস্যদের সমর্থনে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনে তৎপর হতে পারত কিন্তু কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নীতির জন্য মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেস আগ্রহ দেখায়নি। এমনকি কংগ্রেসের সমর্থনে কৃষক প্রজাদলের মন্ত্রিসভা গঠনের যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল তাও বানচাল হয় তৎকালীন কংগ্রেসের নীতির জন্য। প্রশ্ন ওঠে মন্ত্রিসভা গঠন বা সমর্থনের বিষয়ে কেন কংগ্রেস আন্তরিক উদ্যোগ দেখায়নি? মন্ত্রিসভা গঠন সম্বন্ধে কংগ্রেসের মধ্যে প্রথম থেকেই মতদ্বৈধতা ছিল। নেহরু ও বামপন্থীরা মন্ত্রিসভা গঠনের বিরুদ্ধে ছিলেন, অন্যদিকে প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ ছিলেন মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষে।

নির্বাচনে জিতলে মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে বলে রাজাগোপালাচারী আগেই জানিয়ে দেন। শরৎ বসু প্রমুখ কংগ্রেস নেতারাও সর্বভারতীয় নির্বাচনের আগে মার্চ মাসে সংস্কার বর্জন ও গণপরিষদের দাবি তোলেন। গভর্নরের হাতে বিশেষ ক্ষমতা ও নিজ বিবেচনাপ্রসূত ক্ষমতা দেওয়ার ফলে প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হবে বলে কংগ্রেস মনে করে এবং সেজন্যই মন্ত্রিসভা গঠন বা সমর্থন যুক্তিসঙ্গত হবে না বলে অধিকাংশ কংগ্রেস নেতৃত্ব এর বিরোধিতা করেন।[৭] শেষ পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সাধারণভাবে কংগ্রেস কর্মীদের মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিষয় গুরুত্ব দিয়ে আবার পর্যালোচনা শুরু হয় এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় প্রাদেশিক সরকারে যোগদানের সপক্ষে রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে প্রস্তাব আনেন তা গৃহীত হয়। যোগদানের বিপক্ষে জয়প্রকাশেব প্রস্তাব ৭৮-১৩৫ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। মৌলানা আজাদের মতে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস কমিটির সভায় তাঁর প্রস্তাব মতো মন্ত্রিসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৮] জুলাই ১৯৩৭-এ বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও ওড়িশায় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সবশেষে অক্টোবর মাসে আসামে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় রাজনীতি দ্বারা বাংলার নেতৃত্ব যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। মনে রাখা প্রয়োজন, বাংলার মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের অনেক আগেই। বিধানসভার অধিবেশন শুরু হয়েছিল ৭ এপ্রিল। ঐ সময় কংগ্রেসের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল, নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলে সরকার গঠন বা সমর্থন থেকে কংগ্রেস বিরত থাকবে। স্বাভাবিকভাবেই সর্বভারতীয় সিদ্ধান্তের আগে বাংলার ক্ষেত্রে আলাদা নীতি অবলম্বনে বাংলার নেতাদের পক্ষে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেওয়াও সম্ভব ছিল না। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কংগ্রেস এবং কৃষকপ্রজা আঁতাত যদি ঐ সময় হতো তবে আগামী দিনের অনেক রাজনৈতিক সমস্যাই এড়ানো যেত।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৩৭-এর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর নির্বাচনের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কংগ্রেস ও কৃষকপ্রজার মধ্যে আপসের প্রচেষ্টা অনেক দূর অগ্রসর হয়। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করে কর্মসূচীর ভিত্তিতে কৃষক প্রজাকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয় কংগ্রেস। কিন্তু বিরোধ বাধে (আবুল মনসুরের মতে) কর্মসূচীর অগ্রাধিকার নিয়ে। কংগ্রেস রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিতে চায়। কৃষকপ্রজা দল চাইছিল প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন। খাতকদের রক্ষার জন্য মহাজনি আইন প্রণয়ন, কৃষিঋণ মকুব, সালিসি বোর্ড গঠন ইত্যাদি কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দিতে। শেষ পর্যন্ত এই অগ্রাধিকারের প্রশ্নে আলোচনা ভেঙে যায় এবং হক-মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দূরত্ব এভাবে প্রসারিত

হওয়ার জন্য হিন্দু নেতাদের অদূরদর্শিতাকেই দায়ী করেছেন আবুল মনসুর। তাঁর মতে, ঐ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস-কৃষকপ্রজা দলের আঁতাতের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। "হক সাহেবের মতো সবল ও জনপ্রিয় নেতা কংগ্রেসের পক্ষে থাকিতেন। মুসলিম লীগে যাইতে বাধ্য হইতেন না। বাংলার কৃষকপ্রজারা কংগ্রেসের প্রতি আস্থাশীল হইত।"[৯] জটিলতাও অবশ্য অন্যদিকে ছিল। ফজলুল হক, নলিনীরঞ্জন সরকারকে মন্ত্রিসভায় নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, অন্যদিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত নলিনীরঞ্জনকে মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত করতে কংগ্রেসের প্রবল আপত্তি ছিল। শুধুমাত্র কর্মসূচীর অগ্রাধিকারের প্রশ্নে কংগ্রেস কৃষকসভার সহমত হলো না মনে করাও ভুল হবে।[১০] অন্য মৌলিক প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত ছিল, সর্বভারতীয় রাজনীতি এবং মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান প্রভাব।

তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে, বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের মধ্যে তখন যে সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী প্রবণতা ছিল তা বাংলার এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝতে অসমর্থ হয়েছিলেন। মুসলমানদের কাছে ৩৭-এর নির্বাচনযুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কৃষকপ্রজা সমিতি ও মুসলিম লীগের 'সম্মুখ যুদ্ধে' পরিণত হয়েছিল। পটুয়াখালির নির্বাচনদ্বন্দ্বে হক-নাজিমুদ্দিন লড়াইয়ের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। আবুল মনসুর বলেন, "একদিকে ইংরেজ লাটের প্রিয়পাত্র স্যার নাজিমুদ্দিনের পক্ষে সরকারি প্রভাব ও ক্ষমতা এবং নাইট-নবাবদের দেদার টাকা, অপরদিকে খেতাব-বিত্তবিহীন বৃদ্ধ প্রজানেতা হক সাহেবের পক্ষে তাঁর মুখের বুলি 'ডাল-ভাত' ও সমান বিত্তহীন প্রজাকর্মীরা। "রোমান্টিক আদর্শবাদী ছাত্ররা স্কুল-কলেজের পড়া ফেলিয়া বাপ-মায়ের দেওয়া পকেটের টাকা খরচ করিয়া চারদিক হইতে পটুয়াখালিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল।"[১১] শীলা সেনও দেখিয়েছেন, কীভাবে বাংলার গভর্নর, ঢাকার নবাব, ফুরফুরার পীর, শত শত মৌলানা, মৌলবী নাজিমুদ্দিনের প্রচারে যুক্ত হয়েছিলেন।[১২] অন্যদিকে, কৃষকপ্রজার বাণী "গ্রামে-গ্রামে দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেবার জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ কর্মীর সমাবেশ ঘটেছিল। ফজলুল হক ও প্রজাপার্টির আবেদন ছিল মূলত অর্থনৈতিক—ডাল-ভাতের সংস্থান, জমিদারি উচ্ছেদ ইত্যাদি। নির্বাচনের আগে ঢাকার এক বিরাট জনসভায় ফজলুল হক ঘোষণা করেন, এখন থেকে শুরু হলো একদিকে জমিদার ও পুঁজিপতি এবং অন্যদিকে গরিব মানুষের মরণপণ সংগ্রাম। ডাল-ভাত ও মোটা কাপড়ের সমস্যাই প্রধান সমস্যা, প্রবলেম অব প্রবলেমস বলে তিনি অভিহিত করেন। এই নির্বাচনযুদ্ধে বাংলার মানুষের কাছে প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্থনৈতিক সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতা নয়। নির্বাচনে ফজলুল হক নাজিমুদ্দিনের প্রায় দ্বিগুণ ভোট পেয়ে জয়ী হন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, ত্রিপুরা জেলার ৭টি মুসলমান আসনের মধ্যে ৫টিই পায়

ত্রিপুরা কৃষক সমিতি। ত্রিপুরা কৃষক ও শ্রমিক সমিতির দুই নেতা ইয়াকুব আলি ও অছিমুদ্দিন আহ্‌মদকে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন বলে সরকারের গোপন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। নির্বাচনে অছিমুদ্দিন প্রাক্তন মন্ত্রী ও জমিদার জি এম ফারুকিকে পরাজিত ক'রে বিধানসভায় নির্বাচিত হন।

বিধায়কদের মধ্যে ছিলেন অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, নাইট-নবাব, শিল্পপতি ও জমিদার। বিধানসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কত উন্নতমানের ছিল ঐ সময়কার বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি। সর্বাগ্রে নাম করতে হয় বিরোধী দলনেতা শরৎচন্দ্র বসুর। সংসদীয় বিধিরীতি ছিল তাঁর নখদর্পণে, আচরণ ছিল ধীর, শান্ত ও সংযত। বিধানসভায় খুব কমই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখা যায়। একবার মাত্র আব্দুর রহমান সিদ্দিকির মিথ্যা অভিযোগের জন্য শরৎ বসু যথেষ্ট বিচলিত হন। সিদ্দিকির বহিষ্কার দাবি করা হয়। শরৎচন্দ্র অনেক সংসদীয় নজিরও দেখান। অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত অধ্যক্ষ সিদ্দিকির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। আরেকবার স্পিকার আজিজুল হক সিদ্দিকিকে বিধানসভা ভবন থেকে চলে যেতে বলেন, কারণ—সিদ্দিকি অধ্যক্ষের আদেশ অমান্য করেছিলেন। শরৎচন্দ্রেব অনুরোধে স্পিকার তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেন এবং আদেশ প্রত্যাহার করে নেন। তাছাড়া অধ্যক্ষ আজিজুল বিভিন্ন রুলিং-এর ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের পরামর্শ নিতেন। শরৎচন্দ্র বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে উঠে দাঁড়ালে তাঁর প্রতি সম্মান ও সমীহ দেখাতেন সরকারি দল। শরৎচন্দ্র বসুর পরেই ছিলেন নলিনাক্ষ সান্যাল। তবে তিনি ছিলেন ভিন্ন ধরনের। বিধানসভার রীতিনীতির ব্যাপারে তিনিও ছিলেন দক্ষ। অধ্যক্ষকে তিনি নাস্তানাবুদ করে তুলতেন। অনেকবার তা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যেত কিন্তু বিধানসভাকে সবসময় তিনি 'গরম' করে রাখতেন একের পর এক পয়েন্ট অব অর্ডার তুলে। তাঁকে 'ফাইটিং বুল' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, কারণ তিনি গোপন তথ্য ফাঁস করার ব্যাপারে ছিলেন অদ্বিতীয়। শ্যামাপ্রসাদের ওজস্বিনী বক্তৃতা পুরো বিধানসভাকে স্তব্ধ করে রাখত। একবার সুরাবর্দী শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতায় ফোড়ন কাটলে নলিনাক্ষ সান্যাল সুরাবর্দীকে লক্ষ্য করে বলেন, শেয়ার বাজারের দালালি করার যোগ্য সুরাবর্দী, বিধানসভায় তাঁর স্থান হওয়া উচিত নয়। মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন, পয়েন্ট অব অর্ডার, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, বৈধতার প্রশ্ন ইত্যাদি উত্থাপনে তাঁর দক্ষতা ছিল অনুকরণযোগ্য। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিষাক্ত করে তোলার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের নগ্ন ভূমিকা তিনি উদঘাটিত করেন। গভর্নর স্যার জন হারবার্টের বিরুদ্ধেও তাঁর নানা অভিযোগ ছিল। কংগ্রেস দলের মধ্যে ছিলেন আরও কয়েকজন অভিজ্ঞ সংসদবিদ—কিরণশংকর রায়, সন্তোষকুমার বসু, শশাঙ্কশেখর সান্যাল, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, চারুচন্দ্র রায়, কমলকৃষ্ণ রায়, তুলসি

গোস্বামী, সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরাট মণ্ডল, রসিকলাল বিশ্বাস প্রমুখ। মুসলিম লীগের আবদুল বারি (বহরমপুরের প্রখ্যাত আইনজীবী), ফজলুর রহমান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), আবুল হাশিম (লীগের সংসদীয় সচিব) ছিলেন বিধানসভায় কোয়ালিশন সরকারের মুখ্য প্রবক্তা। লীগের আব্দুর রহমান সিদ্দিকি (যিনি কলকাতার মেয়র হয়েছিলেন) উর্দু বয়েত মিশিয়ে বক্তৃতাকে আরও রসালো করে তুলতেন। মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ছিলেন অভিজ্ঞ সাংসদ। বিধানসভায় তিনি খোলামেলা বক্তব্য রাখতেন। সহজ সরল ছিল তাঁর বাচনভঙ্গি। শরৎচন্দ্র বসু ও বিরোধীরা মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের সমালোচনা করতেন। কিন্তু মানুষ হিসেবে জনদরদী ফজলুল হককে শ্রদ্ধা জানাতেন। বিধানসভায় অনেক সময় ফজলুল হককে হালকাভাবে বক্তব্য রাখতে দেখা যেত। একবার বিরোধীরা বিধানসভায় দেওয়া তাঁর আগের এক বক্তব্য উল্লেখ করে সমালোচনা করলে ফজলুল হক বলেন, "তখন আমি বিরোধী দলে ছিলাম। বিরোধীরা খুব কম সময়ই সত্যি কথা বলে।"[১৩] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন ছিলেন শান্ত, সংযত, সংসদীয় নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। শ্রম ও বাণিজ্যমন্ত্রী সুরাবর্দীও ছিলেন কৃতী সাংসদ। কিন্তু অতিমাত্রায় ছল-চাতুরী এবং পেশিশক্তির উপর নির্ভরশীল যার জন্য বিধানসভায় তিনি ছিলেন অপাংক্তেয় এবং বিরোধীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। শিল্পপতি এম. এ. ইস্পাহানি বিধানসভায় মুখ খুলতেন খুব কম। কিন্তু নেপথ্যে অনেক ঘটনারই তিনি ছিলেন নায়ক। কংগ্রেস ও কৃষকপ্রজা দলের শতকরা ৯০ জনেরই ছিল কারাজীবনের অভিজ্ঞতা, যা একান্তভাবে অনুপস্থিত ছিল মুসলিম লীগ সদস্যদের মধ্যে।

সংহত দল ব্যবস্থা এই পর্বে গড়ে উঠলেও বিধানসভায় সদস্যদের মধ্যে দলীয় আনুগত্য ও শৃঙ্খলা তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। তাছাড়া দলত্যাগ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আজকের দিনের মত এক দল থেকে অন্য দলে যোগদান ঐ সময়ও প্রচলিত ছিল। আয়ারাম-গয়ারামদের সংখ্যাও কম ছিল না। অন্য দলের বিধায়কদের ভোট ও সমর্থন লাভের জন্য ব্যাপক ঘুষেরও প্রচলন ছিল। চিত্তরঞ্জন, নলিনীরঞ্জন সরকার, সুরাবর্দী, আবদুল রহমান সিদ্দিকি, ইস্পাহানি ও আরও অনেক নেতার বিরুদ্ধে অন্য দলের সদস্য ভাঙানোর অভিযোগ বিধানসভায় আনতে দেখা যেত। ১৯৩৭-৪১ পর্বে বিধানসভায় অনেক সদস্যই রাজনৈতিক আনুগত্য বদল করেন। প্রথমে কৃষকপ্রজা দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৮। কিন্তু ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর কোয়ালিশনের দিকে চলে যান বেশ কিছু সদস্য। আবু হোসেন সরকার, শামসুদ্দিন আহমদ তখন স্বতন্ত্র কৃষক দল বলে একটি নতুন দল গঠন করেন। বিধানসভায় নবাবজাদা হাসান আলি ছিলেন ঐ দলের হুইপ। তমিজুদ্দিনের নেতৃত্বে অপর এক গোষ্ঠী স্বতন্ত্র প্রজাদল গঠন করেন। হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাওয়ার

পর (১৯৩৮) মাত্র ২৮ জন সদস্য কৃষকপ্রজা দলে রয়ে যান, অন্যরা কোয়ালিশনের সদস্য হন। দলব্যবস্থা তখন খুবই শিথিল ছিল। ফজলুল হককে একই সময় কৃষক প্রজা দলের সভাপতি ও মুসলিম লীগের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখা যায়। তাঁর যুক্তি ছিল, "মুসলিম লীগ করা যেমন ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দরকার, কৃষকপ্রজা দল করাও তেমনি বাঙালী মুসলমানদের জন্য দরকার"। তিনি বলতেন, সভাপতি পদ ছেড়ে দিয়ে কৃষকপ্রজাকে তিনি কংগ্রেসী নেতাদের হাতে তুলে দিতে পারেন না ; আবার মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব ত্যাগ করে ওটাকে খাজা-গজাদের (খাজা নাজিমুদ্দিন ও গজনভি প্রমুখ নেতাদের) হাতে ছেড়ে দিতে পারেন না।[১৪] মুসলিম লীগ দলও বিধানসভায় নাজিমুদ্দিন-সুরাবর্দী-ইস্পাহানি প্রমুখ নেতাদের উপদলে বিভক্ত ছিল। শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল ছিল অনেকটা সংহত। পরে সুভাষচন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করায় কংগ্রেস দল দ্বিধাবিভক্ত হয়। শরৎচন্দ্র বসু হন কংগ্রেসের ফরওয়ার্ড ব্লক অংশের নেতা। আর যেসব বিধায়ক কংগ্রেসেই থেকে যান তাঁদের নেতা নির্বাচিত হন কিরণশঙ্কর রায়। কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে কংগ্রেস বিধায়কদের সঙ্গেই বসতেন। নীহারেন্দু দত্তমজুমদার কয়েকজন বিধায়ককে নিয়ে কৃষক মজদুর দল গঠন করেন। ন্যাশনালিস্ট দলে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বসু ও প্রায় ১৪-১৫ জন বিধায়ক। শ্যামাপ্রসাদও বেশ কিছুদিন বিধানসভায় এই দলের সঙ্গেই বসতেন। উলেমা দল বলে মুসলমান সদস্যদের একটি গোষ্ঠী ছিল। চট্টগ্রামের ডাঃ সানাউল্লা ছিলেন ঐ দলের নেতা। ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি ছিলেন ভারতীয় খ্রীস্টানদের প্রতিনিধি। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল। এছাড়া জমিদার গোষ্ঠী বিধানসভায় আলাদাভাবে বসতেন। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্যদের নেতৃত্ব দিতেন চিপেনড্যাল। সংসদীয় কাঠামোয় শাসনব্যবস্থা এই পর্ব থেকেই কিছু মৌলনীতি নির্ভর করে গড়ে উঠতে থাকে। ফজলুল হকের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় মন্ত্রী শামসুদ্দিনকে কৃষকপ্রজা দল পদত্যাগের নির্দেশ দেয় এবং তিনি পদত্যাগও করেন। আবুল মনসুর দাবি করেছেন, "কোনও পার্লামেন্টারি দলের স্বীয় মন্ত্রীকে 'কলব্যাক' করা এবং কর্মসূচীর ভিত্তিতে কোনও মন্ত্রীর পদত্যাগ করা বাংলা ও ভারতীয় রাজনীতিতে ছিল উহাই প্রথম।"

বিধানসভার আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে ১৯৩৭-৪১-এর রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, ১৯৪০-এর মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের পাকিস্তান প্রস্তাব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভার কার্যকলাপ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিধানসভায় অনেক সময়ই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। রাজবন্দীদের অনশন, নির্যাতন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিধানসভার আলোচনায় অগ্রাধিকার পায়। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন

নিয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সোচ্চার হতে দেখা যায়। কয়েকজন বিধায়কের বক্তব্যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সশ্রদ্ধ উল্লেখও পাওয়া যায়। কৃষিব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ফলে কৃষকদের দুরবস্থা সম্বন্ধে প্রায় প্রতি অধিবেশনেই বিধানসভার অনেক সদস্যকে সরব হতে দেখা যায়। কৃষি সমস্যার জন্য জমিদারি ব্যবস্থাকেই দায়ী করেন কৃষকপ্রজা দলের মুসলমান সদস্যরা। বিধানসভায় ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। 'দুঃখী-প্রজা', 'গরিব চাষী' সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হতে দেখা যায় মফস্বল অঞ্চল থেকে নির্বাচিত বিধায়কদের। নোয়াখালি থেকে নির্বাচিত সদস্য সৈয়দ আহমেদ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীমণ্ডলী বিদেশ থেকে সাহেব আমদানি করে (ফ্লাউড কমিশনের উল্লেখ) কমিশন গঠন করে কৃষকদের ধাপ্পা দিচ্ছে। এ ধাপ্পা বেশি দিন চলবে না ; কৃষকরা তা ধরে ফেলেছে।"[১৫] শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া, বিশেষ করে ন্যূনতম মজুরি সম্বন্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায় বিধানসভার অনেক সদস্যকে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বাজেট বিতর্ক, মুলতুবি প্রস্তাব, ছাঁটাই প্রস্তাব, বেসরকারি বিল ইত্যাদির আলোচনা প্রসঙ্গে সদস্যরা জনসাধারণের দুর্বিষহ জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র বিধানসভায় তুলে ধরতেন এবং তার প্রতিকার দাবি করতেন। ফজলুল হক আমলের বিধানসভার প্রায় প্রতিটি অধিবেশনেই বাইরের আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হতো। এক কথায় বলা যায়, গণদাবিতে মুখরিত ছিল এই পর্বের বিধানসভা।

ফজলুল হক ও নাজিমুদ্দিনের যুক্ত মন্ত্রিসভাকে 'জমিদারপুষ্ট মন্ত্রিসভা' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। বস্তুত ফজলুল হক প্রথম যে মন্ত্রিসভা গড়েন তার এগারো জনের মধ্যে মোটামুটিভাবে নয়জনই ছিলেন জমিদারশ্রেণীর। এর মধ্যে আবার ছয়জন বিশেষ আসন থেকে নির্বাচিত। মন্ত্রিসভায় মুসলিম লীগের প্রতিনিধি ছিলেন নবাব হবিবুল্লা, স্যার নাজিমুদ্দিন, হোসেন সুরাবর্দী। হক ছাড়া কৃষকপ্রজা দলের ছিলেন সৈয়দ নৌশের আলি। দলের সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দিন আহমেদকে বাদ দিয়ে শেষ মুহূর্তে নেওয়া হয় নবাব মুশারফ হোসেনকে, যিনি মুসলিম লীগ ও কৃষকপ্রজা উভয় দলেরই সভ্য ছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে ছিলেন স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও নলিনীরঞ্জন সরকার। তফসিলী হিন্দুদের দু'জন মন্ত্রী মুকুন্দবিহারী মল্লিক ও প্রসন্নদেব রায়কতও ছিলেন যথেষ্ট ভূসম্পত্তির মালিক। প্রথম অধিবেশন থেকেই ফজলুল মন্ত্রিসভাকে বিধানসভায় প্রবল বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হয়। রাজবন্দীদের মুক্তি নিয়ে টালবাহানা, ইতিপূর্বে প্রণীত প্রাথমিক শিক্ষা আইন, কৃষিখাতক আইন ইত্যাদির বাস্তবায়নে উদ্যোগের অভাব এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে অক্ষমতার জন্য বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে মন্ত্রিসভাকে ক্রমবর্ধমান সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। এই অবস্থায় ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে কংগ্রেস

ও কৃষকপ্রজা দলের সদস্যরা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। যে অভিযোগ আনা হয় তার মূল বিষয় হলো : মন্ত্রিসভা কৃষক-শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের সামান্যতম উন্নতিও করতে পারেনি ; নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনের বিষয়ে সচেষ্ট নয় ; পাটের নিম্নতম দাম নির্দিষ্ট করতে মন্ত্রিসভার অক্ষমতা ; গ্রামীণ মানুষের ঋণভার হ্রাসে ব্যর্থতা, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি অভিযোগ আনা হয় সুরাবর্দীর বিরুদ্ধে, অভিযোগ আনেন আফতাব আলি (শ্রমিক প্রতিনিধি)। অনুরূপভাবে আবু হোসেন সরকার, নবাব হবিবুল্লা বাহাদুরদের বিরুদ্ধে, শামসুদ্দিন আহমেদ নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে, আবদুল হাকিম ফজলুল হকের বিরুদ্ধে তমিজুদ্দিন নবাব মুশারফ হোসেন-এর বিরুদ্ধে, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রসন্নদেব রায়কতের বিরুদ্ধে, ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি স্যার বিজয়প্রসাদের বিরুদ্ধে, শরৎচন্দ্র বসু শ্রীশচন্দ্র নন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। সুরাবর্দী পেশিশক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগান। তমিজুদ্দিন খাঁ, শামসুদ্দিন আহমদ, ডাঃ সানাউল্লার মতো নেতাদের জীবন বিপন্ন হয়। ঘর ছাড়া হয়ে তাঁরা হিন্দু এলাকায় আশ্রয় নেন। প্রয়োজনীয় ৮২ জন সদস্যের সমর্থনে ৮ আগস্ট অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। আগের দিন রাত্রে ৭৫ জনের বেশি বিরোধী সদস্যকে বিধানসভা ভবনে আশ্রয় নিতে হয়। আবদুর রহমান সিদ্দিকি বিরোধীদের বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে বিধায়ক ক্রয়ের অভিযোগ আনেন। শরৎচন্দ্র বসুকেও সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ আনতে দেখা যায়। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সিদ্দিকিকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে হয়।

বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে যে বিতর্ক হয় তাও ছিল যথেষ্ট উচ্চমানের। আবদুল হাকিম শান্ত ও সংযত ভাষায় ফজলুল হকের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনেন তার মধ্যে ছিল উচ্চকক্ষের জন্য ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়, ভূমি রাজস্ব কমিশনের সভাপতি হিসেবে একজন ইউরোপীয় নিয়োগ, প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত আইন প্রচলনে ব্যর্থতা, পাটের দামবৃদ্ধি ও শিল্পোন্নয়নে অক্ষমতা ইত্যাদি। তমিজুদ্দিন খাঁ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলেন, বাংলায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। "ইসলাম বিপন্ন—লীগ সদস্যদের এই জিগির সাম্প্রদায়িকতার শক্তিবৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে।" শরৎচন্দ্র বসু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উভয়েই ফজলুল হকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে অনাস্থা প্রস্তাবের যৌক্তিকতা দেখান, শ্যামাপ্রসাদ বলেন, "বাংলা অন্তত ফজলুল হকের কাছ থেকে এই ধরনের অপশাসন আশা করেনি। তিনি সম্মানিত, কিন্তু নির্ভরযোগ্য নন"। শরৎচন্দ্র বসু মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মানুষ ফজলুল হকের কাছ থেকে এর প্রতিকার বিধান চান। ফজলুল হকের বক্তব্য ও জবাবী ভাষণও ছিল অনবদ্য। বাংলার মন্ত্রিসভার কাজকর্মের সঙ্গে কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলির মন্ত্রিসভার কাজকর্মের তুলনা করে

ফজলুল দেখান, বাংলার মন্ত্রিসভার রেকর্ড কত অমলিন। বলেন, "এরপরও আমাদের বলা হচ্ছে, আমরা প্রতিক্রিয়াশীল। ওরা প্রগতির বাহক।" ফজলুল হক জানান, তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। মন্ত্রিসভা এমন কিছু করেনি যার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত, ১১১-১৩০ ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। মুসলিম লীগ, তফসিলী, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছাড়া ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ২৩টি ভোটেই সরকার পক্ষ পায়। বস্তুত ইউরোপীয়দের সমর্থনের ফলেই মন্ত্রিসভা ভোটে জয়লাভ করে। অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে যাঁরা ভোট দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেস দলের ৫৩ জন, কৃষকপ্রজা ও নৌশের গোষ্ঠীর ৩২ জন, তফসিলী ১৫ এবং অন্যান্য ১১ জন। লক্ষণীয় এই ১১ জনের মধ্যে ভারতীয় খ্রীস্টান, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা ছিলেন। তফসিলী ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের ভোটও ভাগাভাগি হয়। কোয়লিশনের পক্ষে ৯ জন তফসিলী ও ২ জন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভোট দিয়েছিলেন।[১৬] উল্লেখ্য, মন্ত্রিসভার সমর্থনে হাজার হাজার মুসলমান ছাত্র ও যুবজনতা সারা কলকাতায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং বিক্ষোভ সংগঠিত করেন মন্ত্রী হোসেন সুরাবর্দী।[১৭] এরপরও মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক, শরৎচন্দ্র বসু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ডিসেম্বর, ১৯৪১-এ প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। কিন্তু ততদিনে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচার তৃণমুল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ফলে এই সরকার ১৫ মাসের বেশি স্থায়ী হতে পারেনি।

এই পর্বে বিধানসভায় আলোচিত হয়নি এমন বিষয় খুব কম আছে। বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ের মধ্যে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ, ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট, ক্যানেল কর ও রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিতে ১৯৪০-এ সুভাষচন্দ্র বসু পরিচালিত আন্দোলন নিয়ে বিধানসভায় যে আলোচনা ও বিতর্ক হয়, নানা কারণেই তা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার নাম কলঙ্কিত করে ইংরেজরা হলওয়েল মনুমেন্ট কলকাতায় স্থাপন করে। এই মনুমেন্ট ভাঙার দাবিতে সুভাষচন্দ্র ৩ জুলাই দেশব্যাপী "সিরাজ স্মৃতি দিবস" পালনের আহ্বান জানান। ১ জুলাই কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে এ নিয়ে হিন্দু-মুসলিমের এক মিলিত জনসভায় সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করেন, নিজে তিনি হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙার সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব দেবেন। হিন্দু-মুসলিমের এই যৌথ আন্দোলনে সরকারও শঙ্কিত হন। ১ জুলাই বিধানসভার সান্ধ্য অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ঘোষণা করেন, বাংলা সরকার শীঘ্রই হলওযেল মনুমেন্ট অপসারণের ব্যবস্থা নেবে। হক-মন্ত্রিসভা ঐ সময়ে সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় দলের সদস্যদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল। ঐ দলের নেতা পি. জে. গ্রিফিথ হলওয়েল মনুমেন্ট

ভাঙা হলে ইউরোপীয় গোষ্ঠী মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে বলে সতর্ক করে দেন। স্বভাবতই ফজলুল হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙার ব্যাপারে কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়। ২ জুলাই রাত্রে সুভাষচন্দ্র ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙার দাবিতে হিন্দু-মুসলিম মিলিতভাবে মিছিল, মিটিং ও সত্যাগ্রহ করে। ইসলামিয়া কলেজের (অধুনা মৌলানা আজাদ) বহু ছাত্র ও অধ্যাপক জুবেরী সহ কয়েকজন শিক্ষক পুলিশি হামলায় আহত হন। সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার, পুলিশি হামলা ও হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙার বিষয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ব্যাপারে একের পর এক সদস্য বিধানসভায় মন্ত্রিসভাকে দায়ী করেন। প্রথমে সন্তোষকুমার বসু, পরে জালালুদ্দিন হাশেমি এ নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাবে নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং বলেন, স্বাধীনতার জন্য অতীতে হিন্দু-মুসলিম যৌথভাবে সংগ্রাম করেছে ; আগামী দিনেও দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বিদেশী শক্তিকে পরাভূত করতে সক্ষম হবে। কমিউনিস্ট সদস্য বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতির যথাযথ দিক নির্দেশে সক্ষম হবে বলে তাঁর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের ব্যাপারে ফজলুল হকের সহানুভূতি ছিল আন্দোলনকারীদের পক্ষে। নাজিমুদ্দিন ছিলেন এ ব্যাপারে অনড়। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় নাজিমুদ্দিন সম্বন্ধে বলেন, "নাজিমুদ্দিনের ধারণা দুই শতাব্দী পূর্বের, দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি দুই শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি যদি তাঁর নবাবী মেজাজে সপ্তদশ শতাব্দীতে জন্মাতেন তা হলে সে যুগে প্রশংসা লাভ করতেন। যেহেতু স্বাধীনতার স্পৃহা তাঁর জীবন উদ্ভাসিত করেনি, জাতীয়তার উচ্চ আদর্শ, জাতীয় জীবনের আবেগময় স্পন্দন প্রভৃতি যে সমস্তের মধ্যে দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটে ওঠে সে সব কিছুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই, সেজন্যই তিনি মনে করেন লৌহশাসন দিয়ে মানুষের বিশ্বাস, আদর্শ, জীবনকে শেষ করে দেবেন।" এম. এ. জামান বলেন, সিরাজউদ্দৌলার কবর স্থানে ফজলুল হক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কলকাতায় ফিরেই তিনি মনুমেন্ট ভাঙার ব্যবস্থা নেবেন। মুসলমানরা গোরস্থানকে অতি পবিত্র মনে করেন। জামান প্রশ্ন করেন, "কোথায় গেল গোরস্থানের সেই প্রতিজ্ঞা?" নাজিমুদ্দিন বিধানসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যখন মনুমেন্ট ভাঙা যাবে না তখন একে সিরাজউদ্দৌলার জয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দেখলে দোষ কি? জামানের মন্তব্য : "ঢাকায় স্যার নাজিমুদ্দিন রোডের নাম পাল্টে যদি পটুয়াখালি বিজয় রোড (পটুয়াখালি নির্বাচনে ফজলুল হক নাজিমুদ্দিনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিলেন) রাখা হয় তবে সেটা কি হবে নাজিমুদ্দিনের বিজয় চিহ্ন?" দীর্ঘ আলোচনা হয়। জবাবী ভাষণে ফজলুল হক সুভাষচন্দ্রের প্রতি

তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক সরকারের কিছু করার ছিল না। নৌশের আলি, মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ বিধায়করা মুলতুবি প্রস্তাব সমর্থন করেন। শেষ পর্যন্ত সরকার মনুমেন্ট অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। হিন্দু-মুসলিমের মুখপাত্র হিসেবে সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু আন্দোলন প্রত্যাহার ঘোষণা করেন।[১৮]

ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত ফ্লাউড কমিশনের নিয়োগ নিয়েও বিধানসভায় তুমুল বাদানুবাদ হয়। ফজলুল হক সরকার ১৯৩৮-এর নভেম্বরে বাংলার ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করে সুপারিশ করার জন্য স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে ভূমিরাজস্ব কমিশন নিয়োগ করায় বিধানসভায় হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিরোধীরা দায়িত্বহীনতার অভিযোগ আনেন। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় বলেন, "কমিশন নিয়োগ করে ভূমিব্যবস্থার আমূল সমস্যা ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে, বাংলার কৃষককে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে।" জমিদারি উচ্ছেদের মূল প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে এভাবে কমিশন নিয়োগ করায় মুসলিম লীগ বিধায়কদেরও কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হন। কৃষকপ্রজা দলের সদস্যরা একযোগে আপত্তি জানান। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরও বিধানসভায় এ নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ হয়। মন্ত্রী বিজয়প্রসাদ সিংহরায় কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা দেন। শরৎচন্দ্র বসু মন্ত্রীর ভাষণের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, যে-কোনো স্কুলের প্রধান শিক্ষক এর চেয়ে ভাল বিশ্লেষণ করতে পারতেন। জালালুদ্দিন হাশেমি ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ সংশোধন করে এবং জমিদারি প্রথার আশু বিলুপ্তি দাবি করে এক বেসরকারি প্রস্তাব আনেন। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় কমিশনের রিপোর্টের ইতিবাচক দিকগুলির বাস্তব রূপায়ণের উপর গুরুত্ব দেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, "প্রয়োজন—বাংলার সমাজের আমূল পরিবর্তন। আইন প্রণয়ন করে সে পরিবর্তন আসতে পারে না। সে পরিবর্তন আসতে পারে একমাত্র সমাজ-বিপ্লবের ভিতর দিয়ে। আর সেই বিপ্লবকে ঠেকোবার জন্য যত বড় ফ্লাউড কমিশনই আসুক না কেন তাকে ঠেকাতে পারবে না।" ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনার জন্য সরকার গার্নার সাহেবকে দায়িত্ব দেন। গার্নারের সুপারিশ বিধানসভায় পেশ করা হয় ২৮ জুলাই, ১৯৪১। সাধারণভাবে সদস্যরা ফ্লাউড কমিশনের প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানান।[১৯]

দামোদর ক্যানেল পরিকল্পনা কার্যকর করার ফলে বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলসরবরাহের ব্যবস্থা হয়। এরপর সরকার থেকে উচ্চহারে ক্যানেল কর ধার্য করা হয়। এই উদ্দেশ্যে নাজিমুদ্দিন 'বেঙ্গল ডেভলপমেন্ট বিল' নামে আইন প্রণয়নের এক প্রস্তাব বিধানসভায় আনেন। জনসাধারণ, কৃষক সমিতি ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ

থেকে উচ্চহারে কর আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয় এবং বিভিন্ন এলাকায় 'ক্যানেল কর প্রতিকার সমিতি' গঠিত হয়। প্রতিবাদ আন্দোলন দমনের জন্য সরকারি পুলিশ ও সেনাবাহিনী গ্রামবাসীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। ক্যানেল কর নিয়ে বিধানসভায় ঝড় ওঠে। বর্ধমান থেকে নির্বাচিত বিধায়ক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যানেল অঞ্চলে দমননীতি ও বঙ্গীয় ফৌজদারি আইন জারি করার সমালোচনা করে এক মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি চান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন এই প্রস্তাব উত্থাপনের বিরোধিতা করে বলেন, ক্যানেল এলাকায় এমন কিছু ঘটেনি যার জন্য বিধানসভায় আলোচনা করতে হবে। তিনি কৃষকদের উত্তেজিত করার জন্য কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দলকে দায়ী করেন। অধ্যক্ষ আজিজুল হক সরকার পক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিষয়টি জনস্বার্থের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বলে মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপনে অনুমতি দেন। ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ক্যানেল অঞ্চলে গাড়োয়ালে আর গোরা সৈন্য পাঠানোর সমালোচনা করে প্রমথনাথ জনসাধারণের ন্যায্য দাবি মেনে নিতে সরকারকে অনুরোধ জানান। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, হেমপ্রভা মজুমদার, অদ্বৈতকুমার মাঝি বিতর্কে অংশ নিয়ে সরকারকে নাস্তানাবুদ করে তোলেন। মুলতুবি প্রস্তাব ভোটে বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু সরকার একর প্রতি সাড়ে পাঁচ টাকা কর দু'টাকা ন'আনায় নামিয়ে আনতে বাধ্য হন।[২০]

রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি নিয়ে সরকার পক্ষের সঙ্গে বিরোধীদের বাদানুবাদে এক এক সময় বিধানসভায় অচলাবস্থা দেখা দিত। হক মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করার কিছুদিন পরেই ২৪ জুলাই, ১৯৩৭ আন্দামানের রাজবন্দীরা হয় মুক্তিদান, না হয় অন্তত সুদূর আন্দামান থেকে নিজ নিজ প্রদেশে স্থানান্তরের দাবিতে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে শক্তিশালী আন্দোলনও ঐ সময় সংগঠিত হয়। ৮ আগস্ট টাউন হলের মহতী সভায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আন্দামান বন্দীদের মুক্তির দাবি সমর্থন করেন। গান্ধীজীও কলকাতায় আসেন এবং বন্দীমুক্তি নিয়ে হক-নাজিমুদ্দিন-নলিনী সরকার প্রমুখদের সঙ্গে আলোচনা করেন। গান্ধীজীর অনুরোধে আন্দামান বন্দীরা অনশনও ভঙ্গ করেন। কংগ্রেস দল বিধানসভায় এক মোশন এনে রাজবন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দাবি করে। কিন্তু নাজিমুদ্দিন জননিরাপত্তার অছিলায় এই দাবি মানতে অস্বীকার করেন। তুমুল বাদানুবাদ হয়। ফজলুল হক বিধানসভাকে জানান, তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন রাজবন্দীদের ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু কংগ্রেস-আনীত প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত ৮৫-১৪১ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। ১৪ আগস্ট ছাত্ররা 'আন্দামান দিবস' পালনে ধর্মঘট করে এবং বিরাট মিছিল নিয়ে বিধানসভার দিকে অগ্রসর হয়। পুলিশের লাঠিচার্জে অনেক ছাত্র আহত হয়। বিধায়ক নীহারেন্দু দত্তমজুমদার ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় বিধানসভা

ভবন থেকে বেরিয়ে এসে ছাত্রদের সঙ্গে সহমর্মিতা জানান। ১৬ আগস্ট কংগ্রেস এম. এল. এ-রা জাতীয় পতাকা সম্বলিত ব্যাজ ধারণ করে বিধানসভায় আসেন। পুলিশি অত্যাচারকে ধিক্কার জানিয়ে এবং আন্দামান বন্দীদের মুক্তি দাবি করে বিধানসভায় শরৎ বসু তাঁর বক্তৃতায় বাংলাকে আয়ারল্যান্ডে পরিণত না করতে হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভাকে অনুরোধ জানান। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আন্দোলনের চাপে আন্দামান বন্দীদের ফিরিয়ে আনা হয় এবং বহু সংখ্যক রাজবন্দী মুক্তি পান। রাজবন্দীদের মুক্তি, অনশন, নির্যাতন ইত্যাদি নিয়ে এরপরও বিধানসভায় অনেক মুলতুবি প্রস্তাব উঠতে দেখা যায়। ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮ রাজবন্দী হরেন্দ্রনাথ মুন্সির অনশনজনিত মৃত্যু নিয়ে এক প্রস্তাব তুলসী গোস্বামী বিধানসভায় উত্থাপন করেন। কীভাবে জোর করে অনশন ভঙ্গ করাতে গিয়ে হরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় একের পর এক কংগ্রেস সদস্য তার মর্মান্তিক বর্ণনা দেন। শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা সরকারকে প্রায় কোণঠাসা করে দেয়। পক্ষে বলেন জালালুদ্দিন হাশেমি, নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী এবং আরও অনেক বিধায়ক। সরকার পক্ষের সমর্থনে বক্তৃতা দেন সুরাবর্দী ও আব্দুল বারি। মুলতুবি প্রস্তাব অবশ্য বাতিল হয়ে যায় পক্ষে ৭৪, বিপক্ষে ১১৯ ভোটে।[২১]

ভারতরক্ষা আইনে মুজফ্ফর আহ্মদ, সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেন, মহম্মদ ইসমাইল, রবি রায়, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, দেবেন সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে নিজে নিজ বাসস্থান থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বহিষ্কারের যে আদেশ জারি করা হয় তার বিরুদ্ধেও বিধানসভাকে সোচ্চার হতে দেখা যায়। এ নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শিবনাথ ব্যানার্জি বিধানসভায় এক মুলতুবি প্রস্তাব আনেন। কংগ্রেস কৃষকপ্রজা সহ অন্যান্য দলও মুলতুবি প্রস্তাব সমর্থন করেন। যেভাবে ১১ জন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে কর্মস্থল ও বাসগৃহ থেকে অপসারণের আদেশ দেওয়া হয়েছে তাকে নাৎসী জার্মানীর গেস্টাপোদের সঙ্গে তুলনা করে বিধায়ক নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী বলেন, "বহিষ্কারের এই নিষ্ঠুর আদেশ যাঁর কর্তৃত্বাধীনে দেওয়া হয়েছে সেই স্যার নাজিমুদ্দিনের নামের সঙ্গে 'নাজি' শব্দের সৌসাদৃশ্য আছে ; তাই বোধহয় এদের আচরিত কর্মধারাও অভিন্ন।" যেভাবে নাজিমুদ্দিন কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক মতামত জানানোর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন, তার তীব্র সমালোচনা করেন শরৎচন্দ্র বসু, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিধায়ক। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় বলেন, মুলতুবি প্রস্তাব হয়ত ভোটের জোরে বাতিল করে দেওয়া হবে কিন্তু কৃষক, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের উপর এই নিপীড়ন বাংলার বিদ্রোহী ও বিপ্লবী শক্তির সার্বিক অভ্যুত্থানের সহায়ক হবে। শেষ পর্যন্ত এই মুলতুবি প্রস্তাব ৭৬-১০২ ভোটে বাতিল হয়ে যায়।[২২]

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পূর্বে প্রণীত প্রাথমিক শিক্ষা আইন এবং ফজলুল হক-মন্ত্রিসভার উদ্যোগে আনীত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের আলোচনা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয় ১৯৩০ সালে। কিন্তু প্রায় একদশক পরেও এই বিল কার্যকর না হওয়ার জন্য বিধায়করা সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলেন। সৈয়দ আবদুল মজিদ বলেন, এই ব্যর্থতার জন্য মন্ত্রিসভার উচিত পদত্যাগ করা। কৃষকদের উপর শিক্ষা-কর ধার্যের প্রস্তাব উঠলে গিয়াসুদ্দিন আহমদ মন্তব্য করেন, "এর ফলে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা তো হবেই না, বরঞ্চ কৃষকদের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন হয়ে সেগুলো জমিদারদের ঘরে যাবে।"[২৩] প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার দাবি বিধানসভায় অনবরত তুলে ধরতেন বিধায়করা। জবাবে ফজলুল হক অভিযোগ করেন, প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সদস্যরা তথ্যের ওপর নির্ভর করেন না, আবেগের তাগিদেই বলেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশের পাঁচকোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ ছেলে-মেয়ে আছে যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে প্রায় এক লক্ষ শিক্ষক দরকার। ন্যূনপক্ষে চার কোটি টাকা প্রয়োজন। জমিদারদের উপর সেস্ এবং কৃষকদের উপর কর ধার্য না করলে কোনদিনই প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা যাবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই আইনকে তিনি দুর্ভাগ্যজনক বলে বর্ণনা করেন। ফজলুল হক জানান, বিধানসভায় যখন আইন পাস হয় তখন তিনি পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তার কারণ সব মুসলমান সদস্যই আইনটিকে সমর্থন করেছিলেন, একা তিনি বিরোধিতা করতে চাননি।[২৪] এরপর প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন, প্রস্তাব, মোশন ইত্যাদি উত্থাপিত হতে দেখা যায়।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়েও ঐ সময় বাংলাদেশে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শরৎচন্দ্র বসু, নলিনাক্ষ সান্যাল, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিধায়করা বিলটিকে ইসলামী অনুশাসন নির্ভর করে রচিত, সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট বলে অভিহিত করেন। তাঁরা মনে করেন এই বিল অন্ধ ইসলাম ভক্তদের দ্বারা রচিত। এতে শিক্ষার বিষয় ছাড়া অন্য সবকিছুই আছে। বিলটি নিয়ে প্রায় এক বছর তুমুল বাদ-বিতর্ক হয় বিধানসভায়। বিরোধীদের আনা বিভিন্ন সংশোধনীও ৫৬-১২৪ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে।[২৫] হিন্দু সদস্যরা বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধেও ইন্ধন যোগানোর অভিযোগ আনেন। বস্তুত এই বিল রচনায় তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা ড. জেনকিন্সের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

শোক প্রস্তাব নেওয়া বিধানসভার দীর্ঘদিনের রেওয়াজ। কিন্তু গতানুগতিকতা পরিহার করে মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এই পর্বের বিধানসভার অনন্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। জগদীশচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বিধানসভায় যেসব শোক প্রস্তাব নেওয়া হয় তা এক কথায় অনবদ্য। বাঙালী হিন্দু

ও মুসলমানের উদার ও মরমী মানসিকতার স্বীকৃতি মেলে এই প্রস্তাবগুলিতে। অধ্যক্ষ আজিজুল হক নিজে এইসব প্রস্তাব রচনার উদ্যোগ নিতেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১২ আগস্ট, ১৯৪১ সর্বাধিক সংখ্যক বিধায়কের উপস্থিতিতে সমগ্র বঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ফজলুল হক বলেন, রবীন্দ্রনাথ কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাঙালীর, ভারতবাসীর তথা সমগ্র মানবজাতির। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা স্বীকার করে একের পর এক সদস্য তাঁদের শ্রদ্ধা জানান। পরিশেষে, অধ্যক্ষ আজিজুল হক কবিগুরুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে বলেন, রবীন্দ্র প্রয়াণে আজ শুধু সাংস্কৃতিক জগৎই রিক্ত নয়, মানবতাও আজ নিঃস্ব। সর্বোপরি আমরা যারা কবির কাছ থেকে দেশকে ভালবাসতে শিখেছি, আমাদের উত্তরাধিকার ও পরিবেশ সম্বন্ধে গর্ববোধ করতে শিখেছি, তাঁরা আজ স্তব্ধ। কবির বাণী আমাদের প্রেরণা দেবে, "আগামী কয়েক শতাব্দী আমরা তাঁকে নিয়েই বেঁচে থাকবো" এ প্রত্যয় তিনি ব্যক্ত করেন।[২৬]

বাংলার বিধানসভাকে যে অনেকাংশে ভারতের সংসদ কাঠামোর পথিকৃৎ বলে গণ্য করা হয়, তার পিছনে ছিল এই পর্বের বিধানসভার অধ্যক্ষ ও বিধায়কদের বিশেষ ভূমিকা। বিভিন্ন সংসদীয় রীতিনীতি ও প্রথার প্রবর্তন হয়েছিল এই সময়ে। স্যার আজিজুল হক এবং জালালুদ্দিন হাশেমি (অস্থায়ীভাবে যিনি অধ্যক্ষের কাজ চালিয়েছিলেন প্রায় এক বছর) এই দুজনেরই ছিল সংসদ পরিচালনার অসাধারণ দক্ষতা। সরকারি ও বিরোধী দল দ্বারা এঁরা সম্মানিত ছিলেন। এঁদের বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, পাণ্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অশান্ত বিধানসভাকে এঁরা অনেকসময়ই সংযত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এঁদের বিভিন্ন রুলিং আজও নজির হিসেবে উল্লেখ করা হয়। হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পাঁচ বছরে প্রথমেই পদত্যাগ করেন নৌশের আলি। এরপর একে একে শামসুদ্দিন আহমদ ও নলিনীরঞ্জন সরকার। প্রায় প্রত্যেকেই পদত্যাগের পর বিধানসভায় বিবৃতি দেন। অনাস্থা প্রস্তাবও বিধানসভায় আলোচিত হয়। এইসব বিবৃতি ও আলোচনা সাংবিধানিক অনেক নজির সৃষ্টি করে ১৯৩৭-এর বিধানসভাকে বিশিষ্টতা দিতে সক্ষম হয়।

ফজলুল হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব শেষ হয় ১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে। পাঁচ বছর মন্ত্রিসভাকে ব্যবহার করে মুসলিম লীগ বাংলায় তার গণভিত্তি বিস্তারে সক্ষম হয়। মুসলিম লীগের এই প্রভাব বৃদ্ধি অনেকাংশে সম্ভব হয় ব্রিটিশ রাজশক্তি ও আমলাদের আনুকূল্যের জন্য। হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে স্তিমিত করে রাখাই ছিল বিদেশী শাসকদের উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর স্বার্থ ব্যাহত হয় এমন কোনও নীতি বা কর্মসূচী ফজলুল হক সরকারের পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃত্ব ও হিন্দু বিধায়কদেরও মুসলিম লীগের শক্তিবৃদ্ধিতে দায়িত্ব কম ছিল না। সংসদীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস দলের ভূমিকা সম্বন্ধে মুসলিম ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। ফ্লাউড কমিশনের অন্যতম সদস্য ও বিধান পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় কমিশনের কাছে তাঁর বিরোধী প্রতিবেদনে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, এ নিয়ে বিধানসভায় তুমুল বিতর্ক হয়। বিধায়ক রসিকলাল বিশ্বাস তাঁর বক্তৃতায় বলেন, কংগ্রেস যদি বড়লোকের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকত তবে বাংলার রাজনীতিও অন্যরূপ নিত।[২৭]

বিধানসভায় কিছু হিন্দু সদস্য প্রায়শই মুসলিম লীগ সদস্যদের সাম্প্রদায়িক, জাতীয়তাবাদবিরোধী বলে অভিহিত করতেন। বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোই যে অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান জননেতাকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এই বোধ হিন্দু বিধায়কদের মধ্যে খুব অল্পই লক্ষ করা যায়। বহরমপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত মুসলিম লীগ বিধায়ক আবদুল বারি অনুযোগ করেন যে, "জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয়, কিন্তু বোঝান হয় হিন্দুত্ব, মুসলিম বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে মুসলমানদের কি জাতীয়তাবাদী হওয়ার অধিকার নেই?"[২৮] বারির মতো বেশ কিছু মুসলিম লীগ সদস্য বিশ্বাস করতেন উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই জাতীয়তাবাদের লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হবে। কংগ্রেস নেতৃত্ব যদি ঐ সময় মুসলমানদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল হতেন, তবে হয়ত মুসলমান সমাজের তাঁরা সমর্থন পেতেন। কারণ "জমিদার-পুষ্ট" হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা আইন পাস করিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা লাভে যতটা উদগ্রীব ছিল সাধারণ মুসলমানের সামাজিক আর্থিক উন্নতিসাধনে ততটা উৎসুক ছিল না। মুসলিম বিধায়করা এর জন্য সঙ্গত কারণেই বিক্ষুব্ধ ছিলেন। মহাজনি আইনকে রায়ত শোষণ আইন বলে অভিহিত করে বিধায়ক অসিমুদ্দিন আহমদ বলেন, আইনের খসড়া কাট-ছাঁট করে এমন অবস্থায় দাঁড় করানো হয়েছে যে এর ফলে শতকরা দশজন খাতকও উপকৃত হবেন না।[২৯] সৈয়দ আহমদ অভিযোগ করেন, "বাংলার কৃষকের সবই গেছে, শুধু হাড়গুলি বাকি আছে। এই আইন সেই হাড়গুলিকেও কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।"[৩০] মুসলমান বিধায়কদের কেউ কেউ মনে করতেন ফজলুল হক সরকার "দরিদ্র প্রজার গভর্নমেন্ট নয়, বড়লোকের গভর্নমেন্ট।"[৩১] সন্দেহ নেই বাংলার কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু ও তাঁদের সমর্থকরা মুসলমানদের এই মনোভাব প্রশমনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

এই পর্বে বাংলার সংসদীয় রাজনীতি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত ছিল ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ২৩ জন বিধায়ক দ্বারা। ফজলুল হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা কার্যত টিকেছিল

এই গোষ্ঠীর সমর্থনের উপর। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হক-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব আলোচনাকালে যথার্থভাবেই অভিযোগ করেন, মূলত ক্লাইভ স্ট্রিটের ওপর নির্ভর করেই ফজলুল হককে সরকার চালাতে হচ্ছে।[৩২] পরবর্তী সময়ে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার উপর এই গোষ্ঠীর প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। ইউরোপীয় বাণিজ্যিক স্বার্থে কোনভাবেই যাতে আঘাত না আসে এই ব্যাপারে এঁরা সদা সচেতন ছিলেন। বাংলার অর্থনীতিতে পাটের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পাট ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল ব্রিটিশ পুঁজি, চটকল মালিক, সরকারি আমলা ও ইংরেজ বাণিজ্যিক স্বার্থ। পাটচাষের ন্যায্য দাম থেকে কৃষকরা যে বঞ্চিত হচ্ছিল সে ব্যাপারে হক মন্ত্রিসভা এবং নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা তাদের সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ও কৃষকপ্রজা দলের সদস্যদের বিধানসভায় ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের উপর নির্ভরশীল সরকারের প্রায়শই সমালোচনা করতে দেখা যায়।[৩৩]

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং ঔপনিবেশিক শাসনের নগ্ন মুখোশ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার বিষয়ে এই পর্বের বিধানসভা সমভাবে সক্রিয় ছিল। ফজলুল হক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষয়ে বিধানসভায় এক প্রস্তাব উত্থাপন করে ইংরেজ সরকারের নীতিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করার আহ্বান জানান। কিন্তু সরকারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র বসু, শামসুদ্দিন আহমদ প্রমুখরা যেসব সংশোধনী আনেন তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব তীব্রভাবে প্রকাশ পায়।[৩৪] এই প্রস্তাবের বিতর্কে অংশ নিয়ে শামসুদ্দিন আহমদ মুসলিম লীগের আহ্বানে "মুক্তি দিবস" পালনের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ের মুক্তি ভারতীয় রাজনীতির প্রধান ইস্যু নয়। জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি লাভের জন্য হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই মুক্তি আন্দোলন ত্বরান্বিত করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয়, শামসুদ্দিন আহমদের মতো নেতাদের পরবর্তীকালে মুসলিম লীগেই যোগদান করতে হয়।

অষ্টম অধ্যায়

প্রতিবাদী মুখ্যমন্ত্রী ও প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা (১৯৪২-১৯৪৩)

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মন্ত্রিসভার সহায়ক মনোভাব

ফজলুল হক-শ্যামাপ্রসাদের নিয়ন্ত্রণে এই পর্বের বিধানসভা ঔপনিবেশিক সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানায়, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায়ও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বস্তুত শরৎচন্দ্র বসু ও ফজলুল হক-এর উদ্যোগে স্বাধীনতার পাঁচ বছর আগে গঠিত প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা বাংলাব সাংবিধানিক রাজনীতিতে হয়তো গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হতো, যদি বিদেশী শাসক-শক্তি মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে এমন নগ্নভাবে প্রশ্রয় না দিত। মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের দিন প্রস্তাবিত উপমুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র বসুর গ্রেপ্তার ও দীর্ঘদিন তাঁর অনুপস্থিতি প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে অনেকটা নিস্তেজ করে রেখেছিল। তবু মনে রাখা প্রয়োজন, এই সময় 'ভাবত ছাড়ো' আন্দোলনে মেদিনীপুর ও অন্যান্য অঞ্চলে ইংরেজ আমলাদের অত্যাচার ও দমননীতির প্রতিবাদ জানিয়েছিল মন্ত্রিসভা। শুধু প্রতিবাদ নয়, গভর্নরের প্রত্যক্ষ হুমকি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ফজলুল হক বিধানসভায় ঘোষণা করেছিলেন। স্বল্পস্থায়ী এই মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করার সর্বৈব চেষ্টা নেন গভর্নর হাববার্ট, ইংরেজ রাজপুরুষ ও ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিনিধিরা। মুসলিম লীগও নানাভাবে মুসলিম সদস্যদের প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। টাকার খেলাও চলে পুরোদমে, ইস্পাহানিরা ছিলেন লীগের টাকার যোগানদার। মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত না হয়ে কিরণশঙ্কর রায়ের নেতৃত্ব সরকারি কংগ্রেস দল বাইরে থেকে মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানাচ্ছিল। বিধানসভায় সুরাবর্দী, নাজিমুদ্দিন, আবুল হাশিম, তমিজুদ্দিন প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বারবার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা, স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যে দুই সম্প্রদায়ের যৌথ প্রচেষ্টা ইত্যাদির কথা বলে ফজলুল হক-এর নেতৃত্ব অস্বীকার করার জন্য কংগ্রেস দলের কাছে আবেদন জানাচ্ছিলেন। এক বিশেষ ব্যক্তির (হক) মিতালি যদি কংগ্রেস ও হিন্দু সদস্যরা ত্যাগ করেন তবে মুসলিম লীগ ফজলুল হক ছাড়া অন্য সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে, একটা মীমাংসায় আসার জন্য উদগ্রীব, এমনকি সাময়িকভাবে হিন্দু নেতৃত্ব স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত, তারও প্রস্তাব দেয় লীগ। কিন্তু কংগ্রেস মুসলিম লীগের ফাঁদে পা দেয়নি, শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক-মন্ত্রিসভার প্রতি সমর্থন বজায় রেখেছিল। তমিজুদ্দিন খাঁ মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব (২২ মার্চ, ১৯৪৩) আনলে তা ৮৬-

১১৬ ভোটে বিধানসভায় অগ্রাহ্য হয়। এর ক'দিন পর ২৭ মার্চ ক্যালকাটা ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশনের ইউরোপীয় প্রতিনিধি হ্যামিল্টন আবার এক ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন, কিন্তু তাও অগ্রাহ্য হয়। প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ৯৯, বিপক্ষে ১০৯ ভোট। সাংবিধানিক সব প্রচেষ্টা বৃথা হলে গভর্নর হারবার্ট ২৮ মার্চ ফজলুল হককে ডেকে পাঠান এবং বাধ্য করেন পূর্বে টাইপ করা পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করতে। বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও একটি নির্বাচিত সরকারকে এমন অন্যায়ভাবে ক্ষমতাচ্যুত করার নজির এই প্রথম।

অবশ্য প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পূর্ববর্তী ফজলুল হক-মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বাংলার তৃণমূল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয় এবং এর পরিপূর্ণ সুযোগ নেয় ইংরেজ শাসকরা। ১৯৩৭-১৯৪১ পর্বে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রসারের জন্য ফজলুল হকের দায়িত্বও কম ছিল না। ১৯৩৭-এর মন্ত্রিসভা গঠনের পর অন্তত চার বছর ফজলুল হক পুরোপুরি মুসলিম লীগের কুক্ষিগত ছিলেন। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির একজন প্রধান প্রবক্তাও তিনি ছিলেন। বিধানসভায় কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা কয়েকবারই সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রসারে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কুমিল্লার জনসভায় ফজলুল হকের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার উল্লেখ করে সরকারি তহবিল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সফর খরচ না-মঞ্জুর করার দাবি জানান বিধানসভায়।[১] কলকাতা কর্পোরেশনে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক পরিবর্তনের দাবি, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ইত্যাদি প্রসঙ্গ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কলকাতায় মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে (১৯৩৮) ফজলুল হক উপস্থিত মুসলমান জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি পানিপথ ও থানেশ্বরের পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে মুসলমানরা তাদের পূর্বপুরুষের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবে। কয়েক মাস পরে লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে ফজলুল হক কুখ্যাত "শাতানা" বক্তৃতা দেন। তিনি হুমকি দেন, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হলে বাংলায় তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে।[২] বস্তুত ফজলুল হকের সেই সময়কার অবস্থান, তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বিভিন্ন কার্যকলাপ বাংলায় মুসলিম লীগের গণভিত্তি প্রসারে সাহায্য করে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বৈধতা ও উপযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে আবেগপ্রবণ ও অস্থিরচিত্ত ফজলুল হকের সঙ্গে মুসলিম লীগের মেলবন্ধন যে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের সঙ্গে ফজলুল হক ও তাঁর সহযোগীদের দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তর ফারাক ছিল। ইস্পাহানি, সিদ্দিকী তো বটেই ; এমনকি সুরাবর্দী, নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভেদ ছিল দুস্তর।

ফজলুল হকের বাঙালীমনস্কতা, ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব, সর্বোপরি 'মালাবার হিলের' (জিন্নার বাসস্থান) স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব ইত্যাদির জন্য ক্রমশ মুসলিম লীগ সম্বন্ধে তাঁর মোহভঙ্গ হতে থাকে। ১৯৪১-এর জুলাই মাসে বড়লাটের অনুরোধে ফজলুল হক ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এ নিয়ে জিন্নাব সঙ্গে তাঁর মতান্তর চরমে ওঠে। লীগের নির্দেশে অবশ্য তিনি ডিফেন্স কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেন কিন্তু লীগ সম্পাদক লিয়াকত আলি খাঁকে ফজলুল হক জানান, বাংলার সাড়ে তিন কোটি মুসলমানের স্বার্থ বাইরের কোন কর্তৃত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেবেন না, তা সে যত শক্তিশালী হোক না কেন। শেষ পর্যন্ত, ফজলুল হক মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত হন, তাঁর জায়গায় এম এ ইস্পাহানিকে জিন্না লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে মনোনীত করেন। ১ ডিসেম্বর, ১৯৪১ মুসলিম লীগের সব ক'জন মন্ত্রী হক-মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করায় ইংরেজ শাসকরা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভে তাঁরা অসমর্থ হন। ইতিমধ্যে ফজলুল হক বিভিন্ন দল ও মতের ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং হকের সমর্থনে বিধানসভার ১৩৭ জন সদস্য গভর্নরের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। গভর্নর হারবার্ট অনেকটা বাধ্য হয়েই ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানান। ফজলুল হক যখন মন্ত্রিসভা গঠন করেন, বিধানসভায় তখন মন্ত্রিসভার সমর্থনকারী বিভিন্ন দলের অবস্থান ছিল নিম্নরূপ :

প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি	৪২
কংগ্রেস (শরৎ বসু)	২৮
কৃষক প্রজা	১৯
জাতীয়তাবাদী (শ্যামাপ্রসাদ অনুগামী হিন্দু মহাসভা)	১৪
তফসিলী	১২
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৩
শ্রমিক	১
মোট	১১৯

তাছাড়া কিরণশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারি কংগ্রেস দলের ২৫ জন সদস্যের সমর্থন বরাবর মন্ত্রিসভার প্রতি ছিল। বিরোধী দলে ছিলেন মুসলিম লীগ ও ২ জন তফসিলী সদস্য নিয়ে ৭২ জন বিধায়ক। সরকারিভাবে না হলেও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মন্ত্রিসভা-বিরোধী অবস্থান ছিল।

যে মন্ত্রিসভা ফজলুল হক গঠন করেন তাকে তিনি "জাতীয়" ও "সর্বদলীয়" মন্ত্রিসভা বলে অভিহিত করেন। মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক

ছাড়া ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঢাকার নবাব হবিবুল্লাহ বাহাদুর, সন্তোষকুমার বসু, আবদুল করিম, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসেম আলি, শামসুদ্দিন আহমদ, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, হেমচন্দ্র নস্কর ও খান বাহাদুর জালালউদ্দিন। শরৎচন্দ্র বসুর উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল কিন্তু মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের পূর্বমুহূর্তে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফজলুলের নেতৃত্বে জাতীয় ও স্বদেশ প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই প্রথম বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গির মুসলমান ও হিন্দু, তফসিলী জাতি ও অন্যান্যরা এক প্রতিনিধিস্থানীয় মন্ত্রিসভা গঠন করে বাংলাকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিলেন। বিধানসভায় কৃষকসভার মনিরুজ্জমান ইসলামবাদী বলেন, "বাংলার বিভিন্ন মত ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে লইয়া ফজলুল হক যে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন, তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে এক আদর্শস্থানীয়। ইহাতে আছেন কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, কৃষক প্রজা, হিন্দু মহাসভা, হিন্দু জাতীয় দল ও অনগ্রসর জাতির প্রতিনিধিবর্গ। ইহার পিছনে সমর্থন আছে অফিসিয়াল কংগ্রেসের, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর, নাই কেবল দেশের একদল মুষ্টিমেয় লোক যাহাদের আর্থিক স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে ; যাহাদের আড়াই হাজারী ও ত্রিশ হাজারী স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে।"[৩] শ্যামাপ্রসাদও মনে করেন, এই প্রথম হিন্দু-মুসলিম ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেরা ফজলুল হকের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠন করতে পেরেছে।[৪] বিধানসভার মুসলমান সদস্যদের প্রায়শই হক মন্ত্রিসভার ভূমিকা সম্বন্ধে সপ্রশংস উল্লেখ করতে দেখা যায়। ১৯৪২-৪৩-এর বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে মহম্মদ হাসানুজ্জমান বলেন, "আজ দরিদ্র চাষীদের মরণপথ হইতে বাঁচাইবার জন্য সর্বদল সম্মিলিত এই বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা হইয়াছে। নয়জন মন্ত্রীর মধ্যে সাতজনই নতুন। ইহাদের সকলের অতীত কার্যাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায় ইহারা চিরকালই জনসাধারণের মঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিয়াছেন। এই মন্ত্রিমণ্ডলী দ্বারা দেশবাসীর প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"[৫] মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের নিন্দায় মন্ত্রিসভা সমর্থক মুসলিম সদস্যরাই মুখ্য ভূমিকা নেন। গোলাম সারওয়ার হোসেনি বিধানসভায় বলেন, "মিঃ সুরাবর্দী ও তাঁহার দল লীগের ধ্বজা উড়াইয়া মুসলমান সমাজকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের কথা ও কাজের মধ্যে এই বিরাট ফারাক মুসলমান জনগণ ধরিয়া ফেলিয়াছেন।"[৬]

বাংলায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্ন অবশ্য আগে এসেছিল এবং তখনকার পরিপ্রেক্ষিত ১৯৪২-এর পরিস্থিতির চেয়ে অনেক সম্ভাবনাময়ও ছিল। ১৯৩৭-এর বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী পরিস্থিতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। '৩৭-এর নির্বাচনের পর কৃষকসভা ও কংগ্রেস দলের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা অনেকটা অবধারিত ছিল। অন্তত কংগ্রেস দলের সমর্থনে কৃষক প্রজাদল মন্ত্রিসভা গঠন করবে অনেকেই

তা আশা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং এর জন্য দায়ী ছিলেন কংগ্রেস দল ও ফজলুল হক নিজে। শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু উভয়েই প্রথম থেকেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে মুক্ত হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিদের মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনে উৎসাহী ছিলেন কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এ বিষয়ে কোনও উৎসাহ দেখাননি, বরঞ্চ বিরোধিতাও করেছিলেন। ১৯৩৭-এ হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর এটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ২৩টি ভোট এই মন্ত্রিসভাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। স্বভাবতই ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থ ব্যাহত হতে পারে এমন কোনও কর্মসূচী হক-নাজিমুদ্দিন সরকারের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ফজলুল সমর্থক কৃষকপ্রজা নেতারাও তাঁর উপর নির্ভর করতে পারছিলেন না। ১৯৩৮ সালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নৌশের আলি পদত্যাগ করেন। জাতীয়তাবাদী শিবিরে মন্ত্রিসভাকে গদিচ্যুত করার কর্মতৎপরতা শুরু হয়। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সুভাষচন্দ্রের মনে হয়েছিল, ঐ সময় কংগ্রেস যদি মুসলিম লীগ সদস্যদের নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারে তবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য অনেকটা সংহত হয়, শাসকশক্তিকে কোণঠাসা করা যায়। ১৯৩৮এর ডিসেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে পবামর্শ করেন। নীরদ সি. চৌধুরীর বিখ্যাত 'দাই হ্যান্ড গ্রেট এনার্ক' গ্রন্থে এ বিষয়ে সবিশেষ উল্লেখ আছে।[৭] চৌধুরীর কাছে রক্ষিত গান্ধী-সুভাষ পত্রাবলী থেকে প্রকাশ, গান্ধীজী প্রথমে লীগ মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবে উৎসাহ দেখান, সম্মতিও দেন এবং নলিনীরঞ্জন সরকারকে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দিতেও রাজি হন। কিন্তু মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, নলিনীরঞ্জন সরকার ও ঘনশ্যাম দাস বিড়লার সঙ্গে আলোচনার পর তিনি মত পরিবর্তন করেন। ওয়ার্ধা থেকে বিড়লা নিজে "সুভাষবাবু"-কে লেখা গান্ধীজীর যে পত্র নিয়ে আসেন তাতে গান্ধীজী সার্বিক পরিস্থিতি বিচার করে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যুক্তিসঙ্গত হবে না বলে মত প্রকাশ করেন। সুভাষচন্দ্র এতে খুব ক্ষুব্ধ হন। ২১ ডিসেম্বর, ১৯৩৮ এ বিষয়ে গান্ধীকে লিখিত সুভাষচন্দ্রের চিঠি সুভাষ-গান্ধী সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটায়। এ সময় অবশ্য বাংলার পরিস্থিতি খুবই জটিল ছিল। লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাব (১৯৩৮) নিয়ে আলোচনার দিন সুরাবর্দীর দ্বারা সংগঠিত লক্ষাধিক মুসলিম লীগের সমর্থক বিধানসভার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৯৪১-এ ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে কোয়ালিশন সরকার যখন গঠিত হয়, মুসলিম লীগের শক্তি তখন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামেগঞ্জে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়েছে মুসলিম লীগ। ইংরেজ শাসকরাও মুসলিম লীগকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার জন্য সব ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল।

স্বভাবতই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে নিত্যব্যবহার্য জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনিও মানুষকে শংকিত করে। ৭ মার্চ, ১৯৪২ রেঙ্গুনের পতন হয়, দলে দলে লোক বার্মা পরিত্যাগ করে বাংলায় আসতে থাকে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং সর্বোপরি মুসলিম লীগের অপপ্রচার ক্রমশ ফজলুল হককে মুসলমান জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হয়। পূর্ববর্তী নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা যেভাবে দ্রুততালে সাধারণের মানুষের পক্ষে হিতকর বেশ কিছু কর্মসূচীর রূপায়ণ করতে পেরেছিল প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ১৬ মাসে সেই ধরনের কোন কর্মসূচী নিতে ব্যর্থ হয়। এমনকি ফ্লাউড কমিশনের যে সব সুপারিশ কার্যকরের সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভা নিয়েছিল তাও শিকেয় তুলে রাখা হয়। বিধানসভায় মুসলিম লীগ সদস্যরা এর সুযোগ নেন। শ্যামাপ্রসাদের বাগ্মিতা, নলিনাক্ষ সান্যাল, কিরণশংকর রায় প্রমুখের সংসদীয় কর্মতৎপরতা কিম্বা মফস্বল বাংলা থেকে নির্বাচিত হক-সমর্থক মুসলমান বিধায়কদের সর্বচেষ্টা সত্ত্বেও নাজিমুদ্দিন, তমিজুদ্দিন খাঁ ও অন্যান্য লীগ নেতারা বিধানসভার ভিতরে এবং বিধানসভার বাইরে সুরাবর্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতাদের সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য মুসলমান জনগণ থেকে ফজলুল হক ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন। ইংরেজরাও সুযোগ দেখে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও আঁতাত করে। হক-সমর্থক মুসলিম বিধায়ক, এমনকি কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্যদের কেউ কেউ গোপনে মুসলিম লীগের সঙ্গে সলাপরামর্শ শুরু করেন, তবে সাধারণভাবে মন্ত্রিসভা সমর্থক বিধায়কদের ফজলুল হকের প্রতি সমর্থন শেষ পর্যন্ত অটুট থাকে।

১৬ মাসের ফজলুল মন্ত্রিসভা অন্তত কয়েকটি কারণে অনন্যতা দাবি করতে পারে। এর মধ্যে প্রধান হলো ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। এই আন্দোলনের সময় সরকারের দমননীতির শুধু প্রতিবাদই মন্ত্রিসভা করেনি, পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু কার্যকর ব্যবস্থাও নিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের ব্যাপারে এই মন্ত্রিসভা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিল। মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ না করে, মন্ত্রিসভাকে না জানিয়ে গভর্নর হারবার্ট যেভাবে শুধুমাত্র আমলাদের উপর নির্ভর করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন তারও প্রতিবাদ জানিয়েছিল মন্ত্রিসভা। যুদ্ধকালীন 'ডিনায়েল পলিসি'র বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিল মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে শ্যামাপ্রসাদ বিধানসভায় যে বক্তৃতা দেন ঔপনিবেশিক আমলে তা অভূতপূর্ব। গভর্নর হারবার্টের ভূমিকা, আমলাদের স্বৈরাচার, মিলিটারি ও পুলিশের অত্যাচার সম্বন্ধে নানা তথ্য ও যুক্তি তিনি বিধায়কদের সামনে তুলে ধরেন। ভাইসরয়

পর্যন্ত হারবার্টের কাজের সমালোচনা করতে বাধ্য হন। "বেচারা হারবার্ট, নিজের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করে, কিন্তু বুঝতে পারে না এই ধরনের রাজনীতি কত বিপজ্জনক।" এত হালকাভাবে, একটু তলিয়ে না দেখে ফজলুল হককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা গভর্নরের নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেয়। গভর্নরের কাজের সমালোচনা করে ভারতসচিব আমেরি-কে লিখিত ২৩ এপ্রিল, ১৯৪৩-এর পত্রে এই মন্তব্য করেন ভাইসরয়।[৮]

প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরই উপাধ্যক্ষ নির্বাচন নিয়ে বিধানসভায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কোয়ালিশনের প্রার্থী ছিলেন জালালুদ্দিন হাসেমি (যিনি পরবর্তীকালে আজিজুল হকের অবর্তমানে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ রুলিং দেন), মুসলিম লীগের প্রার্থী ছিলেন মহম্মদ আবুল ফজল। দ্বিগুণের বেশি ভোট (১৩০-৬৩) পেয়ে হাসেমি নির্বাচিত হন।[৯]

প্রথম অধিবেশনেই প্রতীয়মান হয় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মন্ত্রিসভা ও বিধানসভার কোয়ালিশন সদস্যরা কত উদগ্রীব। অর্থমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪২-৪৩-এর যে বাজেট পেশ করেন। তাতে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় সাম্প্রদায়িক মৈত্রী সম্বন্ধীয় প্রচারের জন্য। কর্মসূচী নেওয়া হয় সাময়িক পত্র, সংবাদপুস্তিকা প্রকাশ, গ্রন্থাগারসমূহে সাম্প্রদায়িক মনোভাবমুক্ত পুস্তিকাদি সরবরাহের।[১০] বিধায়করা তাঁদের বক্তৃতায় ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার অধিবাসীদের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে, জাতীয়তাবাদের আদর্শ বিকাশে সকলকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানান। অতুল কৃষ্ণ ঘোষ (হিন্দু মহাসভা) ফজলুল হককে "হিন্দু-বাংলার গুরুদেব" ও শ্যামাপ্রসাদকে "মুসলিম বাংলার ইমাম বা আমির-এ-মিলাত" বলে অভিহিত করেন।[১১] ফজলুল হক ঘোষণা করেন, শ্যামাপ্রসাদের উপর থাকবে মুসলিম বাংলার স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব আর হিন্দু স্বার্থরক্ষা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভার অভ্যন্তরে ও বাইরে ফজলুল হক, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, নলিনাক্ষ সান্যাল, ঢাকার নবাব হবিবুল্লাহ, কিরণশংকর রায়, এন সি চ্যাটার্জি, নৌশের আলি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অতীতের ঐতিহ্য বহন করে বিভেদের যে প্রাচীর গড়ে উঠেছে তা ভেঙে ফেলার জন্য আবেদন জানান। ১৯৪২-এর জুন মাসে কলকাতায় 'টাউন হলে' হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস, কৃষক প্রজাদল, হিন্দু মহাসভা, লিবারেল ফেডারেশন প্রভৃতি রাজনৈতিক দল এই সম্মেলনে সক্রিয় ভূমিকা নেয়, ফজলুল হক মন্ত্রিসভার সকল সদস্যই এই সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, উদ্বোধন করেন ফজলুল হক। সাম্প্রদায়িক মৈত্রী বজায় রাখার জন্য হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সম্মেলনে। মুসলিম

লীগ অবশ্য এই সম্মেলনের বিরোধিতা করে। হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সামাজিক ক্ষেত্রে যে প্রীতির সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত আছে তা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন বক্তা সম্মেলনে আবেদন জানান। সম্মেলনের প্রস্তাবে বলা হয়, "বিভিন্ন দলের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রয়োজনে ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ ও বণ্টন করার জন্য এবং সমস্বার্থের কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি হিন্দু ও মুসলিমেরই ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার।" সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। শান্তিবাহিনী গঠন, স্থায়ী ট্রাস্ট ফান্ড তৈরি ইত্যাদি কর্মসূচী নেওয়া হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে এক বার্তা পাঠান।[১২] বিধানসভার অধিবেশনেও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ফজলুল হক, নলিনাক্ষ সান্যাল প্রমুখ বিধায়ক সুরাবর্দী, তমিজুদ্দিন, নাজিমুদ্দিন প্রমুখ লীগ সদস্যদের কাছে বাংলার স্বার্থেও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য জাতীয় সরকার গঠনের আবেদন জানান। বিধানসভায় ১২ মার্চ, ১৯৪২ ফজলুল হক হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে চরম ত্যাগ স্বীকারেও প্রস্তুত বলে নিশ্চয়তা দেন।[১৩] মুসলিম লীগ অবশ্য বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাতেই থাকে। ফজলুল হক বিধানসভাকে জানান, যুদ্ধকালীন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গত কয়েক মাসে লীগকে মফস্বল অঞ্চলে ৪২৭টি মিটিং করতে দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি মিটিং-এ লীগ সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি দিয়েছে। লীগ নেতৃত্ব এই সময় মুসলমানদের চোখে ফজলুল হককে হেয় প্রতিপন্ন করার সব ধরনের চেষ্টা নেন। হককে তাঁরা মুসলমানের শত্রু, বিশ্বাসঘাতক, মীরজাফর ইত্যাদি বলে প্রচার করেন। মৌলবী আবুল হাশিম বিধানসভায় অভিযোগ করেন, কোনদিনই ফজলুলের মানসিক ভারসাম্য ছিল না। রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি মোটেই নির্ভরশীল নন, তাঁর সততার অভাব আছে। "আমরা তাঁর একটি বাক্য, এমনকি শব্দও বিশ্বাস করি না।"[১৪] কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও হক মন্ত্রিসভার সমর্থক হিন্দু ও মুসলিম বিধায়করা সমবেতভাবে ফজলুল হকের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে হক মন্ত্রিসভা দায়িত্ব পালন করছে তাতে হয়ত অসাফল্যের বোঝা তাঁকে বহন করতে হবে কিন্তু বাংলায় ফজলুল হক বিদেশী শাসনের বিরোধিতায় আইনসভার ভিতরে ও বাইরে হিন্দু-মুসলিমের যৌথ প্রয়াসের যে পথ দেখিয়েছেন। সারা ভারতের পক্ষে তাই একমাত্র কাম্য পথ।[১৫]

১৯৪২-এ শ্যামাপ্রসাদ বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করেন তার মধ্যেও অভিনবত্ব দেখা যায়। যুদ্ধপরিস্থিতির দরুন তীব্র আর্থিক সংকটের মধ্যেও সাধারণ মানুষের

দুর্গতি লাঘবের বিশেষ চেষ্টা নেওয়া হয় বাজেটে। শ্যামাপ্রসাদ বাজেটকে জাতিগঠনের বাজেট না বলে "জাতি বাঁচানোর বাজেট" বলে আখ্যায়িত করেন। বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে সরকার সমর্থক সদস্যরা মন্ত্রিসভার কাজকর্ম পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইংরেজ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। জনগণের দুঃখদুর্দশার জন্য বিদেশী শাসকদেরই দায়ী করেন। সুরাবর্দী, ইস্পাহানি প্রমুখ লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ আনেন। পাবনার নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, "ইস্পাহানি ব্যবসাদার, সে ব্যবসা ছাড়া আর কিছু বোঝে না, সে চায় টাকা, সেখানে হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, ধর্ম নেই, জাতি নেই, সে চায় আত্মস্বার্থ এবং সেই স্বার্থের পুষ্টিসাধন।"[১৬] অন্যদিকে মন্ত্রিসভার সমালোচনায় সুরাবর্দী, মহম্মদ আলি (বগুড়া) ও লীগ নেতাদের সোচ্চার হতে দেখা যায়। যুক্তি, তর্ক ও তথ্য দিয়ে যেভাবে সুরাবর্দী শ্যামাপ্রসাদের বাজেটের সমালোচনা করেন তাতে তাঁর বাগ্মিতা ও যুক্তিবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিম মুখার্জি অভিযোগ করেন, শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট দলের বিরুদ্ধে সরকার দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে দমনপীড়নের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের সমর্থন পাবেন না বলে তিনি মন্তব্য করেন।[১৭] আবদুল মতলেব মালিক, শ্রমিকদের বিড়ম্বিত জীবনের এক মর্মস্পর্শী চিত্র বিধানসভায় তুলে ধরেন।[১৮] জবাবী ভাষণে শ্যামাপ্রসাদ বিধানসভায় যে বক্তব্য রাখেন, সংসদীয় ইতিহাসে তার নজির খুব কম দেখা যায়।[১৯] ফজলুল হকও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্প্রসারিত করেই ভারতকে অভীষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলে তাঁর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। নাজিমুদ্দিন দাবি করেন, হক মন্ত্রিসভা দেশদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং এই সরকার ক্ষমতাসীন থাকার দরুন দেশের নিরাপত্তা ব্যাহত হচ্ছে। সুভাষচন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র বসু "দেশদ্রোহমূলক কাজে" লিপ্ত বলে ২০ মার্চ, ১৯৪২ নাজিমুদ্দিন বিধানসভায় অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ যে কত ভিত্তিহীন, ফজলুল হক বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তা প্রমাণ করেন। বস্তুত, ইংরেজ শাসকদের ও রাজপুরুষদের সুনজরে পড়ার জন্যই নাজিমুদ্দিন যে প্রস্তাব এনেছিলেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২০] বাজেট অধিবেশনে এই ধরনের নানা ঘটনা ঘটে যার থেকে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ইংরেজ-মুসলিম লীগ ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বিভিন্ন সরকারি নীতির প্রতিবাদেও এই আমলের বিধানসভা সোচ্চার ছিল। এর মধ্যে ডিনায়েল পলিসি ও ভিটেমাটি থেকে জনসাধারণকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। যুদ্ধের জন্য বাংলা ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি ও সেনাবাহিনীর ছাউনি ইত্যাদি স্থাপনের ফলে বহু মানুষকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে নোয়াখালির ৩৫টি গ্রাম নিশ্চিহ্ন করা হয়। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে এভাবে উৎখাত করায় সদস্যরা বিধানসভায় ইংরেজ সরকারের সমালোচনা করেন। ডিনায়েল

পলিসির মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্ভাব্য জাপানী অগ্রগমনের পথে বাধা দেওয়ার জন্য সব কিছু থেকে তাদের বঞ্চিত করা। প্রায় ৩০ হাজারের বেশি নৌকা ক্রোক করা হয়, অনেকগুলি ভেঙে ফেলা হয়। বাখরগঞ্জ থেকে নির্বাচিত বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত অভিযোগ করেন "ডিনায়েল পলিসির ফলে আমরা বাঙালীরা সব কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, আহার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, বিহার থেকে হচ্ছি এবং সব ধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। জেলেরা মাছ ধরতে পারছে না, কারণ সমুদ্র ও নদীতে তাদের যাওয়া বারণ। তাদের নৌকা ক্রোক করে দূরে চালান দেওয়া হচ্ছে, সর্বত্র দামও দেওয়া হয়নি। জেলেদের জীবিকা নষ্ট হয়েছে। তারা অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। নৌকার অভাবে নদীপথে চলাচল করা যাচ্ছে না।"[২১] ডিনায়েল পলিসির ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে মন্ত্রিসভা একটি 'নোট' তৈরি করে গভর্নরকে দেয় এবং এর প্রত্যাহারে দাবি করে। কিন্তু হারবার্ট কোনও গুরুত্বই দেন না।

১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ঢেউ এই পর্বের বিধানসভা ও মন্ত্রিসভাকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পর সারা দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব বিস্ফোরণের পর্যায়ে পৌঁছয়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মধ্যে এই মনোভাবেরই অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪২-এর আন্দোলন সংগ্রামী চেতনা ও জঙ্গীপনায় জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত পূর্বতন সবক'টি আন্দোলনকে ম্লান করে দেয়। নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ '৪২-এর আন্দোলনকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। নমনীয় ও অহিংস কর্মসূচী, এমনকি প্রতিরোধ ও সংঘর্ষের মধ্যে এই আন্দোলন থেমে থাকেনি। অতি শীঘ্র এই আন্দোলন এক ব্যাপক বিদ্রোহের রূপ নেয়। ১৯৪২-এর আন্দোলন ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের চেয়েও অনেক গভীর ও ব্যাপক বলে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ইংলন্ডের সরকারকে জানান। বালিয়া, তালচের, সাঁতারা, ও তমলুক প্রভৃতি স্থানে বিকল্প জাতীয় সরকার গঠন করে সাময়িকভাবে ইংরেজশাসনকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ করে দিতে সক্ষম হয় '৪২-এর আন্দোলন। বিশেষ করে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের ভূমিকা আত্মত্যাগের নানা কাহিনীতে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিধানসভার বিতর্কে মেদিনীপুরের ঘটনাবলী যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বিধানসভায় ফজলুল হক স্বীকার করেন বিকল্প সরকারের পুলিশ, মিলিটারি, এমনকি নিজস্ব জেলখানাও আছে। এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বলে বিধানসভাকে জানানো হয়। বেশ ক'টি সরকারি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অন্তত ১০টি থানা আক্রান্ত হয়। গভর্নর হারবার্ট মনে করেন, "এটা একটা বড় ধরনের বিদ্রোহ"। জেলাশাসক এন এম খাঁ স্বরাষ্ট্রসচিবের নিকট রিপোর্ট পাঠিয়ে জানান, "গ্রামবাংলার সর্বত্র বিরাট কৃষক জনতা সরকারি প্রতিষ্ঠান ও পুলিশের লোকজনকে আক্রমণ করছে। বেশ ক'টি থানা মহকুমা সদর

দপ্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। মহকুমাকেও জেলা সদর দপ্তর থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে আন্দোলনকারীরা। অনেক জায়গায় সেনাবাহিনীকেও আন্দোলনকারীরা নিষ্ক্রিয় করে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ইতিমধ্যে বিধ্বংসী সাইক্লোনে প্রায় পনেরো হাজারের মতো নরনারী ও শিশু প্রাণ হারান কিন্তু আন্দোলনে কোন ভাঁটা পড়েনি। গোপন আন্দোলনের কাঠামো আগের মতোই কাজ করছে বলে জেলাশাসক বিভাগীয় কমিশনারকে রিপোর্ট দেন। এইসব কিছুরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় বিধানসভার প্রশ্নোত্তর, প্রস্তাব ও বিতর্কে। পুলিশ ও মিলিটারির নির্যাতন, নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার, জেলে আটক রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে বারবারই সদস্যদের বিধানসভায় প্রশ্ন উত্থাপন করতে দেখা যায়।[২২] বিধানসভায় সদস্যদের জানানো হয়, রাজবন্দীদের মুক্তিদানের বিষয়ে মন্ত্রিসভায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও সরকারি আমলারা তা কার্যকর করতে দেননি। শেষ পর্যন্ত রাজবন্দীদের মুক্তিদানে মন্ত্রিসভার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভারতরক্ষা আইনে ধৃত শরৎচন্দ্র বসু, সত্যরঞ্জন বক্সি, শশাংকশেখর সান্যাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবি করে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় বিধানসভায় একটি বেসরকারি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই আন্দোলন দমনে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতির সমর্থন করে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ডেভিড হেনড্রি আনীত এক বিশেষ মোশান নিয়ে বিধানসভায় তুমুল উত্তেজনা হয়। মুসলিম লীগ প্রস্তাবকে পুরোপুরি সমর্থন জানায়, সৈয়দ বদরুদ্দোজা প্রমুখ মুসলমান নেতারা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।[২৩]

'৪২-এর আন্দোলন কিভাবে দমন করা হবে এ বিষয়ে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারকে সারকুলার দেন। মুখ্যমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার সদস্যরা মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সারকুলার আলোচনার দাবি জানান কিন্তু গভর্নর হারবার্ট তাতে আপত্তি তোলেন। তাঁর মতে এই বিষয়গুলি গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্বের আওতায় পড়ে ; সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই।[২৪]

ইংরেজ শাসকদের প্ররোচনা সত্ত্বেও '৪২-এর আন্দোলনে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা বাংলায় সংযত ও সহায়ক মনোভাবই দেখিয়েছিল। বড়লাট লর্ড লিনলিথগো 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করে বিবৃতি দেওয়ার জন্য ফজলুল হক, আম্বেদকর এবং শিখ, তফসিলী ও অকংগ্রেসী, নেতৃবৃন্দের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। লিনলিথগো গভর্নর হারবার্টকে লেখেন, তিনি যেন অতি সাবধানে ও সুকৌশলে ফজলুল হককে দিয়ে গান্ধীবিরোধী ও আন্দোলনবিরোধী বিবৃতি দেওয়ানোর চেষ্টা করেন। হারবার্ট যথাসাধ্য চেষ্টাও করেন কিন্তু ফজলুল হক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন-বিরোধী কোনও বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেন।[২৫] মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যেরই এই আন্দোলনের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। মেদিনীপুরে পুলিশি অত্যাচারের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন সরকারি কর্মচারীর বদলির আদেশ মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত হয়,

কিন্তু গভর্নর হারবার্ট তা নাকচ করে দেন। নৃশংস দমননীতির বিরুদ্ধে অনেক সময়ই মন্ত্রিসভা প্রতিবাদ জানায় কিন্তু কোনো ফল হয় না। পাইকারিহারে জরিমানা ধার্যের বিরুদ্ধেও মন্ত্রিসভা আপত্তি জানায়। সাইক্লোনের সময় সরেজমিনে তদন্ত করে মন্ত্রীরা বেশ কিছু ব্যবস্থা নেন। কিন্তু গভর্নরের নির্দেশে আমলারা তা রদ করে দেন। এই সবই বিধানসভার সামনে আসে। অবস্থা চরমে ওঠে যখন ফজলুল হক বিধানসভার দাবি মেনে নিয়ে মেদিনীপুরের পুলিশি অত্যাচার বিষয়ে পূর্ণ তদন্তের জন্য এক কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ গভর্নর হারবার্ট এর জন্য ফজলুল হকের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করেন।[২৬]

মহাত্মা গান্ধীর অনশন নিয়েও বিধানসভায় এক প্রস্তাব পাস হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আনীত এই প্রস্তাবে বলা হয়, অনশনের ফলে মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। সুতরাং কাল-বিলম্ব না করে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হোক। এ এফ স্টার্ক এই প্রস্তাব উত্থাপনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু উপাধ্যক্ষ আইনসভার নিয়মবিধির ৯৫ (১) ধারার উল্লেখ করে স্টার্কের প্রস্তাব বাতিল করে দেন। উল্লেখ্য, নাজিমুদ্দিন প্রমুখ বিধায়করা শ্যামাপ্রসাদের প্রস্তাব সমর্থন করেন। ডেভিড হেনড্রি বিরোধিতা করেন। কিরণশঙ্কর রায়, সন্তোষকুমার বসু প্রমুখ বিধায়করা প্রস্তাবের পক্ষে জোরালো বক্তৃতা দেন। প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত হয়।[২৭]

প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা থেকে প্রথমে পদত্যাগ করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এর চার মাস পর মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। মন্ত্রিসভাও বাতিল হয়ে যায়। পদত্যাগের পর শ্যামাপ্রসাদ, ফজলুল হক, সন্তোষকুমার বসু, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শামসুদ্দিন আহম্মদ বিধানসভায় দীর্ঘ বিবৃতি দেন। জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে কিভাবে সমস্ত রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে ইংরেজ সরকার '৪২-এর আন্দোলন দমনের জন্য ঘৃণ্যতম পন্থা অবলম্বন করেছেন মন্ত্রীরা তার বিবরণ দেন। যেভাবে গভর্নর হারবার্ট একের পর এক মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাতিল করে আমলাদের পরামর্শে চালিত হচ্ছেন তারও উল্লেখ থাকে মন্ত্রীদের বিবৃতিতে। এই বিবৃতি দেওয়ার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিরোধীরা। বিরোধীদের বক্তব্য, ভারতে এর নজির নেই, এমনকি ইংলন্ডের সাংবিধানিক নথিপত্রে এর কোনও দৃষ্টান্ত নেই। অধ্যক্ষ নৌশের আলি এ বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ রুলিং দেন। তিনি বলেন, অন্ধভাবে ব্রিটিশ সংসদীয় প্রথা অনুসরণে তিনি বিরোধী, আর তাছাড়া বাংলার বিধানসভা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নয়, এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কাজেই দেশজ পরিস্থিতি বিবেচনা করেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অধ্যক্ষ জানান, যে পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বতন মন্ত্রীরা বিবৃতি দিতে চাইছেন, তার সাংবিধানিক যথেষ্ট তাৎপর্য আছে এবং সেজন্যই বিধানসভার নিয়মাবলীর ১০৩ নং ধারা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের বিবৃতি দেওয়ার

অনুমতি তিনি দিচ্ছেন।[২৮]

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩-এ দেওয়া তাঁর বিবৃতিতে জানান মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রিসভার সঙ্গে মতপার্থক্যের দরুন অথবা নীতিগত প্রশ্নে মতভেদের জন্য তিনি পদত্যাগ করেননি। ফজলুল হকের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, হিন্দু-মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত জাতীয় সরকার ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে মুসলিম লীগকেও মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত করাব পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আমলা ও গভর্নর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপনের সব ধরনের প্রচেষ্টার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন, মুসলিম লীগের অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা যৌথ মন্ত্রিসভা গঠনের অন্তরায় ছিল। প্রায় এক বছর সরকারি কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে বিধানসভায় তা বিবৃত করে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, ইংরেজ শাসকরা ভারতীয়দের হাতে ন্যূনতম রাজনৈতিক ক্ষমতা দিতেও প্রস্তুত নন। ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত কোনও সরকার যদি জনগণের মঙ্গলসাধনের কোন কর্মসূচী নেয়, তাতেও শাসকরা প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ান। সর্বোপরি বিদেশী শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুরক্ষিত করতে শাসকরা আন্তরিক নয়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন দমনের জন্য যে পুলিশি সন্ত্রাস শুরু হয়েছে তা হিটলারের অত্যাচারকে ম্লান করে দিয়েছে বলে তিনি মনে করেন। গভর্নরের বিশেষ দায়িত্ব সম্বলিত ৫২ নং ধারা প্রচলিত থাকাব ফলে ভারতীয় মন্ত্রীদের ক্ষমতা প্রহসনে পরিণত হয়েছে বলে শ্যামাপ্রসাদ বিধানসভাকে জানান।[২৯] পরোক্ষভাবে গভর্নরের যোগ্যতা সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করলে ('ক্লাইভ স্ট্রিটের সওদাগরী অফিসের বড়বাবু হওয়ার যোগ্যতাও যার নেই') বিধায়ক মিঃ স্টার্ক নিয়মাবলীর ১২ নং ধারা উল্লেখ করে বলেন, শ্যামাপ্রসাদ নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। শ্যামাপ্রসাদ বলেন, তিনি কোথাও গভর্নরের নাম উল্লেখ করেননি, সুতরাং এ বিষয়ে কাউকে অভিযুক্ত করতে হলে মিঃ স্টার্ককেই অভিযুক্ত করা উচিত, অন্য কাউকে নয়।[৩০] স্তব্ধ বিধানসভায় প্রায় দু'ঘণ্টা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে শ্যামাপ্রসাদ তাঁর বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, আলোচ্য পর্বে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিষয়ে শ্যামাপ্রসাদের ইতিবাচক বক্তব্য ও কর্মসূচীর সঙ্গে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে তাঁর অবস্থানের মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক।

পদত্যাগ পত্রের সপক্ষে ফজলুল হক বিধানসভায় যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি সরাসরি ইংরেজ সরকারকে অভিযুক্ত করেন। প্রথমেই তিনি বলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত-ভাবেই বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে ভারতসচিব পার্লামেন্টকে জানিয়েছেন, স্বেচ্ছায় ফজলুল হক পদত্যাগ করেছেন, তাঁকে যে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে এটা পার্লামেন্টের কাছে গোপন রাখা হয়েছে। ভাইসরয়ের কাছে এ বিষয়ে প্রতিবাদও করেছেন বলে তিনি বিধানসভাকে জানান। ২ আগস্ট, ১৯৪২ গভর্নরের কাছে লিখিত

চিঠির তথ্যও তিনি বিধানসভায় পেশ করেন। ফজলুল হক জানান কিভাবে গভর্নরের নির্দেশে আমলারা বলপূর্বক খাদ্যশস্য আদায় করে বাংলাকে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাছাড়া নোয়াখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচার, সেনাবাহিনীর জন্য লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ অধিগ্রহণ, নৌকা ক্রোক ইত্যাদি গভর্নরের একতরফা সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে তিনি বিধানসভাকে অবহিত করেন। ফজলুল হক চিঠিতে গভর্নরকে আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব গভর্নরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে মুখ্যমন্ত্রীই গভর্নরের উপদেষ্টা। সরকারি আমলারা নন। মুখ্যমন্ত্রীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে যদি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তার দায়িত্ব বর্তাবে গভর্নরের ওপর।[৩১] গভর্নর এই চিঠির কোনও জবাব দেননি বলে ফজলুল হক বিধানসভাকে জানান। এরপর থেকেই গভর্নর আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য মন্ত্রিসভার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন।

মেদিনীপুরের সরকারি কর্মচারীদের অত্যাচার বিষয়ে তদন্ত কমিটি নিয়োগের কথা বিধানসভায় ঘোষণা করা হলে, গভর্নর ১৫ ফেব্রুয়ারি ফজলুল হকের কাছ থেকে কৈফিয়ত দাবি করেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি এক কড়া চিঠিতে ফজলুল হক "স্যার জন"-কে জানান, "আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে বিধানসভায় আমি যে ঘোষণা করেছি সেজন্য আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করেছেন। কৈফিয়ত দেওয়ার দায়িত্ব আমার নয় কিন্তু আপনাকে সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য বলে আমি মনে করি। যে অশোভন ভাষা আপনি ব্যবহার করেছেন, ভবিষ্যতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পত্রালাপে তা পরিহার করে চলবেন বলেই আমার আশা।" চিঠিতে ফজলুল হক আরও জানান, "তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের দায়িত্ব প্রধানত আইনসভার কাছে। সেদিক দিয়ে আইনসভাকে অবহিত করা তাঁদের কর্তব্য।" এই চিঠিতে ফজলুল হক গভর্নরকে আরও জানিয়ে দেন, চিঠির ভাষা সংশোধন না করলে, "আগামীকাল ১৭ ফেব্রুয়ারি গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাতের যে দিন ধার্য করা আছে তা বাতিল বলে গভর্নর ধরে নিতে পারেন।

এর পরেই শুরু হয় ব্রিটিশ বাণিজ্যিক পুঁজি ও ইউরোপীয় গোষ্ঠী-মুসলিম লীগ আঁতাতের সাংবিধানিক তৎপরতা। তমিজুদ্দিন খাঁ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করে এক ছাঁটাই প্রস্তাব আনেন। বিধানসভায় এই নিয়ে তিন দিন বিতর্ক হয়। ইউরোপীয় গোষ্ঠী ও তাদের সমর্থকরা প্রস্তাবের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন ; কিরণ-শংকর রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সদস্যরা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। প্রস্তাব ৮৬-১১৫ ভোটে বাতিল হয়ে যায়।[৩২] মন্ত্রিসভার সংকট আসন্ন দেখে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন দলেও ভাঙন শুরু হয়। বেশ কিছু মুসলিম সদস্য ও কয়েক জন হিন্দু বিধায়ক মন্ত্রিসভার প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। তবুও বিধানসভায়

ফজলুল হকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে যায়। ২৭ মার্চ হ্যামিলটন যে ছাঁটাই প্রস্তাব আনেন তাও ১০ ভোটের ব্যবধানে প্রত্যাখ্যাত হয়। ২৮ মার্চ গভর্নরের আহ্বানে ফজলুল হক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পূর্বে টাইপ করা পদত্যাগ পত্রে সই দিতে বাধ্য হন। পদত্যাগ পত্রে অবশ্য লেখা ছিল, সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা আছে বলেই ফজলুল পদত্যাগ করেছেন। ২৯ মার্চ বিধানসভার অধিবেশন শুরু হলেই কিরণশংকর রায় মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ফজলুল জানান, পদত্যাগ পত্রে সই করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। নলিনাক্ষ সান্যাল গভর্নরের পদচ্যুতি দাবি করেন এবং বলেন বিধানসভার অধিকাংশ সদস্য এখনো ফজলুল হক মন্ত্রিসভার প্রতি আস্থাভাজন। অধ্যক্ষ নৌশের আলি মনে করেন, ফজলুল হকের পদত্যাগের পর মন্ত্রিসভার আর অস্তিত্ব নেই। তিনি পক্ষকালের জন্য বিধানসভা স্থগিতের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ৯৩ ধারা আনুযায়ী বাংলার গভর্নরের শাসন প্রচলিত হয়। ২৪ এপ্রিল, ১৯৪৩ নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। টাউন হলে এক জনাকীর্ণ প্রতিবাদ সভায় হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হওয়ার জন্য ক্লাইভ স্ট্রিট ও গভর্নরের ষড়যন্ত্রকেই দাবি করেন।[৩৩]

প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ১৬ মাসের বেশি স্থায়ী হয়নি। বাংলা ও ভারতীয় রাজনীতির তৎকালীন পরিস্থিতি এই মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের প্রধান অন্তরায় ছিল। যুদ্ধের বিশেষ অবস্থায় প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা অনেকাংশে গভর্নর ও কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল। গভর্নরের "বিশেষ দায়িত্ব" মন্ত্রিসভাকে প্রায় অকেজো করে রেখেছিল। ইংরেজ সরকার বিশেষ করে গভর্নর হারবার্ট উদগ্রীব ছিলেন মুসলিম লীগকে বাংলায় ক্ষমতাসীন করতে। মন্ত্রিসভার অসাফল্যের জন্য হিন্দু নেতৃত্বের "সংকীর্ণতাকে" আবুল মনসুর দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল প্রত্যাহার, আজিজুল হকের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-পদের অবসান, সিরাজগঞ্জে জিন্নার উপর ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা জারি, এ আর পি প্রতিষ্ঠানে ঢালাওভাবে হিন্দু নিয়োগ, কিশোরগঞ্জে মসজিদের সামনে পুলিশের গুলিবর্ষণ ইত্যাদি বিষয় মুসলিম জনগণকে বিক্ষুব্ধ করেছিল।[৩৪] আবুল মনসুর আরও মনে করেন, "প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশনকে সত্যসত্যই প্রগতিবাদী জাতীয় পার্টি হিসেবে রূপ দিতে পারতেন যিনি সেই শরৎচন্দ্র বসুর গ্রেপ্তার ও দীর্ঘ অনুপস্থিতি মন্ত্রিসভার সংকট বাড়িয়ে দিয়েছিল।" অবশ্য এই মন্ত্রিসভার অসাফল্যে ফজলুল হকের দায়িত্বও কম ছিল না। তাঁর স্ব-বিরোধী কথা ও আচরণ, অসঙ্গতিপূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মন্ত্রিসভার ক্ষমতাচ্যুতি ত্বরান্বিত করেছিল। ১৯৪২-এর নভেম্বরে ফজলুল হক তাঁর সমর্থকদের নিয়ে লীগে ফিরে আসার অভিপ্রায় জানিয়ে জিন্নার নিকট যে চিঠি দেন, জিন্না তা

প্রকাশ করে দেওয়ায় হিন্দু নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই ফজলুল হকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্ধিহান হন। সর্বোপরি, প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা সাধারণ মানুষের দুর্গতি লাঘবের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী নিতে ব্যর্থ হয়। বিধানসভায় সদস্যরা অভিযোগ করেন, মন্ত্রিত্ব রক্ষার কাজে নেতারা এত ব্যস্ত যে সাধারণ মানুষের সমস্যার দিকে নজর দেওয়ার সময় তাদের নেই। খাজনা বাকি পড়ে থাকার দরুন বহু প্রজার জমি অন্যায়ভাবে নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। এই নিলামি জমি কৃষকদের ফেরত পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রিসভার সদস্যরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধও ছিলেন। আবুল হাশিম এ সম্বন্ধে এক বেসরকারি বিলও বিধানসভায় পেশ করেন। অসিমুদ্দিন আহমদ, মফিজুদ্দিন আহমদ প্রমুখ কৃষক নেতারা এই বিলের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখেন বিধানসভায়। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সরাসরি বিলটি প্রত্যাখ্যান না করে জনমত যাচাই করার জন্য বিধানসভায় সুপারিশ করেন এবং তা গৃহীত হয়। আইনসভার স্তরে এই ধরনের সমস্যার মোকাবিলা না করে ধামাচাপা দিতেই মন্ত্রীদের বেশি উৎসাহিত হতে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের সঙ্গে কোয়ালিশনে দলের বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগ এর সুযোগ নিয়ে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা-বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

নবম অধ্যায়

মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি (১৯৪৩-১৯৪৭)

১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬-এর দাঙ্গা

১৯৪৩ সাল থেকে বঙ্গ বিভাগ পর্যন্ত এক বছর গভর্নরের শাসন ছাড়া তিন বছর তিন মাসের বেশি সময় বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মুসলিম লীগ বাংলার শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বে থাকে। নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার সময় থেকেই পাকিস্তান দাবির রাজনৈতিক যৌক্তিকতা বাংলার মুসলিম জনগণের সমর্থন লাভ করে। সংসদীয় রাজনীতির আবর্তের বাইরে গণসংযোগের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ অভাবনীয় সাফল্যলাভ করে এবং দলীয় সংগঠন মুসলিম রাজনীতিতে গুরুত্ব পেতে থাকে। ১৯৪৪ সালে মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা বাংলায় পাঁচ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। যুব-ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশ মুসলিম লীগের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। শুধু ধর্মীয় আবেগ বা উত্তেজনা নয়, হিন্দু-প্রাধান্য মুক্ত ও সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র বাংলার ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যভিত্তিক এক সুস্থ মানসিকতা মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ করে। এই পর্বেই গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ও পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতিকে নতুন করে উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। বাঙালী মুসলিমের পৃথক সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনার উপর গুরুত্ব দেন বুদ্ধিজীবীরা। লাহোর প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের চেতনায় প্রাধান্য পায় তা হলো ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের চিন্তা—একটি উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা ও আসামকে নিয়ে। অন্যটি উত্তর-পশ্চিম ভারতে। এক অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভাগের চিন্তা লাহোর প্রস্তাব করেনি বলে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন। 'মুসলমান চাষীর সঙ্গে কাবুলি মুসলমান মহাজনের বন্ধুত্ব অকল্পনীয়। একমাত্র বাংলাই হতে পারে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা, কোনমতেই উর্দু নয়—এই ধরনের বক্তব্য প্রকাশ পায় বুদ্ধিজীবীদের লেখায়।[১]

সংসদীয় রাজনীতির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ যে তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, মহম্মদ আলি জিন্না তা সঠিকভাবেই অনুধাবন করেন। ১৯৪৩ সালে জিন্না বাংলার মুসলিম লীগকে নির্দেশ দেন, লীগের কোনো পদাধিকারী মন্ত্রী বা অন্য কোনও সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না। সুরাবর্দীকে

সেজন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক পদে ইস্তফা দিতে হয়। ঐ বছর নভেম্বর মাসে মুসলিম লীগের বার্ষিক সাধারণ সভায় ইস্পাহানি, আদমজী প্রমুখ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা নির্বাচনে পরাজিত হন। তাঁদের দুজনকেই সহ-সভাপতির পদ হারাতে হয়। আবুল হাশিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। হাশিম ছিলেন মুসলিম লীগে বামপন্থার সমর্থক। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ তখন প্রকৃতপক্ষে "ঢাকার আহসান মনজিলের খাজাদের পকেটভুক্ত ছিল"।[২] খাজা পরিবার থেকেই নাজিমুদ্দিন সহ ন'জন সদস্য বঙ্গীয় বিধানসভায় নির্বাচিত হন। "নাইট-নবাব ও খাজাদের" নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে মুসলিম লীগকে গণমুখী করার উদ্যোগ নেন হাশিম। জেলা, মহকুমা, এমনকি গ্রাম বাংলার অনেক অঞ্চলে মুসলিম লীগের সংগঠন স্থাপিত হয়। ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগ মঞ্চ থেকে আবুল হাশিম তাঁর বিখ্যাত "ম্যানিফেস্টো" প্রচার করেন। ইসলামী আদর্শ এবং বামপন্থী নীতি ও কর্মসূচীর সমন্বয়ে রচিত ছিল এই "ম্যানিফেস্টো"। "নিখিল চক্রবর্তী নামে একজন খুবই যোগ্য কমিউনিস্ট যুবক খসড়াটি তৈরি করার ব্যাপারে" তাঁকে সাহায্য করেন বলে হাশিম লিখেছেন।[৩] ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলমানদের যোগদানের আহ্বান জানিয়ে খসড়াটিতে জমির একচেটিয়া মালিকানার অবসান, জমিতে কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা, শিল্প জাতীয়করণ, পুরুষ ও মহিলার সমানাধিকার ইত্যাদির সুপারিশ করা হয়। কমিউনিস্ট ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত বলে খসড়াটি মুসলিম লীগ নেতৃত্ব কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় কিন্তু ছাত্র-যুব ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা খসড়াটি অভিনন্দিত হয়। এইভাবে একটি ব্যাপক "গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দল" হিসেবে মুসলিমদের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার আমলে ফজলুল হক ছিলেন বিরোধী দলের নেতা। কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী মুসলমান ও কৃষক প্রজাদলকে নিয়ে এক মোর্চা গঠনে সক্ষম হয়। বিধানসভার অভ্যন্তরে এই মোর্চা যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। কংগ্রেস ও কৃষক প্রজার সদস্যরা মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি যাতে বৈধতা না পায় সে বিষয়ে বিধানসভায় সোচ্চার ছিলেন। "সোনার বাংলাকে মুসলিম লীগ পাকিস্তান তথা গোরস্থানে পরিণত করেছে" বলে বিধায়ক আবদুল রজ্জাক অভিযোগ করেন।[৪] "পাকিস্তানী মন্ত্রিমণ্ডলী দেশের সর্বনাশ করে ছাড়বে"—বিধায়কদের এই ধরনের আক্ষেপ করতে দেখা যায়। কংগ্রেস বিধায়ক হেমপ্রভা মজুমদার লীগ সদস্যদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "ইসলামের দোহাই আপনারা দেবেন না, ইসলাম আপনাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে।"[৫] ফজলুল হক বাংলার সার্বিক অবনতির জন্য লীগ মন্ত্রিসভাকে দায়ী করে বিধানসভায়

অভিযোগ করেন, "অতীত দিনের তুলনায় বাংলা আজ কত নিঃস্ব, দুর্বল ; বাংলাদেশে যে স্বৈরতন্ত্র চলছে তা মর্লেমিন্টো সংস্কারে প্রবর্তিত স্বৈরাচারকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।"[৬] গিয়াসুদ্দিন আহমদ মন্ত্রিসভাকে অভিযুক্ত করে বলেন, "বাংলার জনসাধারণ যখন মুসলিম লীগের ধোঁকাবাজি বুঝতে পারবে, তখন তাদের প্রভাব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।"[৭] বিধানসভায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা কোণঠাসা হলেও বাইরের রাজনীতি মুসলিম লীগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা তো দূরের কথা, দলের প্রভাব বৃদ্ধিতেই সাহায্য করে। বাংলায় ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিনিধি ইউরোপীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাও নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আগাগোড়া মুসলিম লীগকে সাহায্য করে চলে। ইতিমধ্যে রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাবও পরোক্ষভাবে মুসলমানদের পাকিস্তান দাবিব বৈধতা স্বীকাব করে নেয়। বাংলার মুসলমানরা মুসলিম লীগের পতাকাতলেই আশ্রয় নেন। আবুল মনসুর আহমদ, শামসউদ্দিন আহমদ, গিয়াসুদ্দিন আহমদ, হাসান আলি, নুরুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ লীগ-বিরোধী অ-সাম্প্রদায়িক নেতারা ক্রমে ক্রমে মুসলিম লীগে যোগ দিতে থাকেন।

পূর্ববর্তী বিধানসভার চেয়ে মুসলিম লীগ নিয়ন্ত্রণে বিধানসভা অনেকটা স্তিমিতই ছিল বলা যায়। ১৩ জন মন্ত্রী, ১৩ জন সংসদীয় সচিব ও ৪ জন হুইপ নিয়ে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ২৪ এপ্রিল, ১৯৪৩। দু'বছর (এপ্রিল '৪৩, মার্চ '৪৫) ক্ষমতাসীন থাকার পর অধ্যক্ষ নৌশের আলি তাঁর বিখ্যাত রুলিং দিয়ে মন্ত্রিসভাকে অবৈধ ঘোষণা করেন। এরপর একবছ্ব চলে ৯৩ ধারা বলে গভর্নরের শাসন। ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনের পর সুরাবর্দী মন্ত্রিসভা গঠন করেন (২৮ এপ্রিল, ১৯৪৬)। দেশ বিভাগ পর্যন্ত সুরাবর্দী-মন্ত্রিসভাই বাংলায় বহাল থাকে। প্রায় উনচল্লিশ মাসের দুই মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভাই ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ। বঙ্গীয় আইনসভার প্রতিটি অধিবেশনেই মন্ত্রিত্বের রদবদল নিয়ে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলত বলে হাশিম অভিযোগ করেছেন। শঙ্কিত জিন্না মুসলিম বিধায়কদের কাছে আবেদন জানান, মন্ত্রিত্ব ও পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি অন্তত দু'বছরের জন্য তাঁরা বন্ধ রাখুন। 'টিপিক্যাল বেঙ্গল মেথডস্', অর্থাৎ চাকরি, কন্ট্রাক্ট, ঘুষ ও স্বজন-পোষণ, এমনকি কাঁচা টাকা ছড়িয়ে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রেখেছেন বলে গভর্নর কেসি ভাইসরয় ওয়াভেলকে জানান।[৮] এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলায় মুসলিম লীগের প্রভাব বৃদ্ধি পায় কারণ পাকিস্তান-চিন্তা মুসলিম জনগণের মধ্যে ততদিন তৃণমূলে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার আমলে বিধানসভার দলগত অবস্থান ছিল নিম্নরূপ

সরকার পক্ষ		বিরোধী পক্ষ	
মুসলিম লীগ	৭৯	কংগ্রেস (সরকারি)	২৫
তফসিলী	২০	কংগ্রেস (বসু)	১৯
দলছুট কংগ্রেস ও নির্দল	৯	প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন	২৪
ইউরোপীয়	২৫	কৃষক প্রজা	১৭
শ্রমিক	২	তফসিলী	৮
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৪	জাতীয়তাবাদী	১৩
ভারতীয় খ্রীস্টান	১	ভারতীয় খ্রীস্টান	১
		নির্দল	১
মোট	১৪০	মোট	১০৮

নাজিমুদ্দিন যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন তার মধ্যে তিনজনই ছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের। নাজিমুদ্দিন ছাড়া অন্য দুজন হলেন খাজা শাহাবুদ্দিন ও খাজা নসরুল্লা। সুরাবর্দী গোষ্ঠীর একমাত্র সুরাবর্দী ছাড়া আর কেউ মন্ত্রিসভায় স্থান পাননি। তফসিলী সম্প্রদায় থেকে নেওয়া হয় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, প্রেমহরি বর্মা ও পুলিনবিহারী মল্লিককে। কংগ্রেস দলছুট সদস্য তুলসীচরণ গোস্বামী ও বরদাপ্রসন্ন পাইন মন্ত্রিসভায় স্থান পান। হিন্দু জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে তারকনাথ মুখার্জিকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়। যে মন্ত্রিসভা নাজিমুদ্দিন গঠন করেন তার মধ্যে ছিলেন নবাব, জমিদার ও বিত্তশালী সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিবিদরা। এ মন্ত্রিসভার নড়বড়ে গঠন দেখে ইস্পাহানির মনে হয়, তাসের ঘরের মতো এ ভেঙে পড়বে। তবে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আনুকূল্য ও ব্রিটিশ-রাজের সক্রিয় সমর্থন নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভাকে দু'বছর টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। লক্ষণীয়, ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য নাজিমুদ্দিনকে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করতে দেওয়া হয়। ফজলুল হককে কিন্তু ১১ জন মন্ত্রী ও ১ জন সংসদীয় সচিব নিয়েই কাজ চালাতে হয়েছিল। মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত ফজলুল হকের প্রস্তাব বারবারই গভর্নর হারবার্ট প্রত্যাখ্যান করেন।

সন্দেহ নেই নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা জিন্নার পাকিস্তান দাবি কার্যকর করার ব্যাপারে সক্রিয় ছিল সবচেয়ে বেশি কিন্তু সততা বা দেশশাসনের দক্ষতা কোনটাই এই মন্ত্রিসভার ছিল না। বিধানসভাকে বিশেষ ভূমিকা দিতে মন্ত্রিদের ছিল প্রবল অনীহা। বস্তুত এমন স্তিমিত সরকারি দল সাঁইত্রিশোত্তর বাংলার বিধানসভায় দেখা যায়নি। ইউরোপীয়দের সমর্থন ছাড়া এই মন্ত্রিসভার ক্ষমতায় থাকার কোন পথ ছিল না ; ফলে নাজিমুদ্দিন ও মন্ত্রীদের সামনে রেখে পোর্টার ও ইউরোপীয় আমলারাই শাসন

চালাতেন। বিধানসভায় সদস্যরা প্রায়শই অভিযোগ করতেন, বাংলায় নামে মাত্র মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা আছে, সরকার চালাচ্ছে সাহেবরা। নাজিমুদ্দিন-সুরাবর্দীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই মন্ত্রিসভার সংকট আরও বাড়িয়ে দেয়। মন্ত্রিত্ব নিয়ে দর কষাকষি, বিধায়ক কেনাবেচার ষড়যন্ত্রেই মুসলিম লীগ নেতারা ব্যস্ত ছিলেন, জনকল্যাণমূলক কোনও কাজে তাদের তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি। "গভর্নমেন্ট পার্টির কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে নগদ টাকা ও উৎকোচ দেওয়া হতো এবং অন্যপ্রকারে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হতো। স্বজনপ্রীতি ও অনুগ্রহ খাজা নাজিমুদ্দিনের ক্ষমতার রাজনীতিতে কার্যনির্বাহের পদ্ধতি ছিল। কংগ্রেসের বিরোধী দলের আশিজন সদস্য এই পরিস্থিতি খুবই মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করেন এবং সরকারি দলের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন"—লিখেছেন আবুল হাশিম।[৯] এই অবস্থায় নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা দু'বছরের বেশি টিকে থাকতে পারেনি। মুসলিম লীগের পক্ষে তা শাপে বর-ই হয়। দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতার জন্য নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে দিয়ে ৯৩ ধারা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন গভর্নর কেসি।

মন্ত্রিসভা গঠন করেই নাজিমুদ্দিনকে সমস্যায় পড়তে হয় বাজেট অনুমোদন নিয়ে। ফজলুল হককে যখন ক্ষমতাচ্যুত করা হয় তখন দৃশ্যত তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল (দু'দিন আগে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে হ্যামিলটনের ছাঁটাই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়)। স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের আক্রমণের মুখে নাজিমুদ্দিনকে প্রথম থেকেই যথেষ্ট নাজেহাল হতে হয়। বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের অনুমোদন চেয়ে অর্থমন্ত্রী তুলসীচরণ গোস্বামী (প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য) বিধানসভায় প্রস্তাব রাখতে গেলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পয়েন্ট অব অর্ডার তোলেন ; তিনি বলেন বাজেট অভিন্ন ; পূর্বতন সরকারের আমলে যে সব ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে, মন্ত্রিসভা বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে এখন তার আর বৈধতা নেই। ৭ জুলাই, ১৯৪৩ অধ্যক্ষ নৌশের আলি রুলিং দিয়ে বলেন, শ্যামাপ্রসাদের পয়েন্ট অব অর্ডার সংবিধান স্বীকৃত, যুক্তিসঙ্গত।[১০] নাজিমুদ্দিন-মন্ত্রিসভাকে নতুন করে বিধানসভাকে দিয়ে বাজেট বরাদ্দ অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। সাময়িকভাবে নাজিমুদ্দিন বিপাকে পড়েন। নাজিমুদ্দিন-মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা ছাড়া মুসলিম লীগ সদস্যরাও সমালোচনায় মুখর ছিলেন। "খাদ্য বস্ত্র সমস্যার কীভাবে সমাধান করা যাবে তার কোন ইঙ্গিত মন্ত্রীরা দিতে পারছেন না, অথচ বড় বড় গালভরা পরিকল্পনার কথা বলছেন"—এই ধরনের অভিযোগ আনতেন বিধায়করা। লুঙ্গির উপরও নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা কর ধার্য করে। লীগ বিধায়করা অনুরোধ জানান, ৪ টাকা বা তার কম দামের লুঙ্গিকে যেন এই কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়।

১৩৫০ বঙ্গাব্দের ভয়াবহ মন্বন্তর নিয়ে নাজিমুদ্দিন আমলের বিধানসভার

অনেকগুলো অধিবেশনকেই ব্যাপৃত থাকতে দেখা যায়। কোন কোন অধিবেশনের পুরোটাই মন্বন্তর নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কে কেটে যায়। এটা ঠিক, ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ছিল জন-জীবনের প্রায় নিত্যসঙ্গী। কিন্তু ১৯৪৩-এর মন্বন্তর পূর্ববর্তী সমস্ত দুর্ভিক্ষকে ছাড়িয়ে যায়। বিধানসভায় সদস্যরা এই দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা উল্লেখ করেন ৪০/৫০ লক্ষ, বেসরকারি মতে অবশ্য ৩০/৩৫ লক্ষ। দুর্ভিক্ষ কমিশন মৃতের হিসেব দিয়েছেন ১৫ লক্ষ। একাধিক কারণকে এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করা হয়। পূর্ববর্তী কয়েক বছর খাদ্য শস্যের উৎপাদন হ্রাস পায়, যুদ্ধের দরুন ব্রহ্মদেশ থেকে চাল আমদানিও বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরে খাদ্য-শস্য চলাচলও অনেকাংশে ব্যাহত হয়। যুদ্ধাবস্থার জন্য চাহিদাও কিছুটা বেড়ে যায়। কলকাতা বন্দর দিয়ে চাল রপ্তানির অভিযোগ ওঠে বিধানসভায়। উদ্বৃত্ত জেলা থেকে সরকারের উদ্যোগে ধান ক্রয় করে নেওয়ার ফলে সর্বত্র এক ত্রাসের সঞ্চার হয়। মজুত করার প্রবণতাও এর ফলে বাড়তে থাকে। চালের মূল্য ১৯৪৩-এর মার্চ মাসে যেখানে মণ প্রতি ১৫/১৬ টাকা, মে মাসে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০/৪০ টাকা। এর মধ্যে আবার সরকারের পক্ষ থেকে ধানচালের দাম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ফলে বাজার থেকে সব চাল উধাও হয়ে যায়। রেশন ব্যবস্থা চালু করতেও সরকার ব্যর্থ হয়। ভাইসরয় পদে নিযুক্ত হওয়ার পর লর্ড ওয়াভেল দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ঢাকা, চব্বিশ পরগনা ও অন্যান্য অঞ্চল সফরান্তে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবিলায় মন্ত্রিসভার সদিচ্ছা, কর্মকুশলতা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁর মনে হয়, পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝার মতো সামর্থ্য তো দূরের কথা, মানসিকতাও মন্ত্রীদের নেই। ভারত সচিবের কাছে ৯৩ ধারা প্রয়োগ করে গভর্নরের শাসন প্রচলনে সুপারিশও তিনি করেন। পরে ভারতসচিবকে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তিনি জানান, প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করতে না পারলে বাংলায় ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে ভয়াবহ পরিস্থিতি উদ্ভূত হবে। ভারত সচিবের কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া না পাওয়ায় ওয়াভেল পদত্যাগের অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করেন।[১১]

গ্রাম বাংলার মানুষই দুর্ভিক্ষের শিকার হন বেশি। এঁদের মধ্যে ছিলেন চাষী, প্রান্তিক চাষী ও ভূমিহীন কৃষক। লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবার নিজেদের জোতজমা এমনকি ভিটে মাটি বিক্রি করেও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারেন না। এক মুঠো ভাতের জন্য দলে দলে লোকেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে থাকেন। ভাত তো জোটেই না এমন কি ফেনও না।

জুলাই মাসে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হলে সদস্যরা দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায় সরকারি নীতির সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। খাদ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী সদস্যদের আশ্বাস দিয়ে বলেন খাদ্য-পরিস্থিতি মোটেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়, যথেষ্ট খাদ্য আছে। সরকার

উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন।[১২] কিন্তু বিধায়করা এতে আশ্বস্ত হন না, খাদ্য সমস্যা নিয়ে বিধানসভায় ১৯টি প্রস্তাব পেশ করা হয়, এর মধ্যে ৯টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। কংগ্রেস নেতা কিরণশংকর রায় সুরাবর্দীর আত্মসন্তুষ্টিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে এক নিন্দাসূচক প্রস্তাব এনে বলেন, 'বাংলায় খাদ্য ঘাটতি নেই, যথেষ্ট চাল আছে, জিনিসপত্রের দাম নিম্নগামী'—খাদ্যমন্ত্রীর এই ধরনের উক্তি ভারতসচিব আমেরির হাত শক্ত করবে, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর কোনও উপকারে আসবে না। তবে মোটামুটিভাবে কংগ্রেস নেতারা গঠনমূলক সমালোচনার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন। নলিনাক্ষ সান্যাল দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সাতদফা এক কর্মসূচীও বিধানসভায় পেশ করেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশ বলে ঘোষণার দাবি করেন। ১২ জুলাই তিনি যে প্রস্তাব বিধানসভার সামনে রাখেন তাতে খাদ্য-সংকট সমাধানে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ওপর গুরুত্ব দেন। কলকাতা বন্দর দিয়ে চাল রপ্তানি অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানান কংগ্রেস সদস্যারা। সরকার অবশ্যই এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। যে প্রতিষ্ঠান চাল রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত, কংগ্রেস সদস্যরা তার নামও সরকারকে জানাতে প্রস্তুত বলে জানান। খাদ্যমন্ত্রী অবশ্য এর কোনও জবাব দেন না। সবচেয়ে বেশি অভিযোগ ওঠে ইস্পাহানি অ্যান্ড কোম্পানির বিরুদ্ধে। মুসলিম লীগ নেতা ইস্পাহানির কোম্পানিকে বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে চাল কেনার অধিকার দেওয়া হয়। প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার এই কন্ট্রাক্ট থেকে ইস্পাহানি অ্যান্ড কোম্পানি পুকুরচুরি করেছে বলে সদস্যরা অভিযোগ করেন। মন্বন্তর নিয়ে কৃষক প্রজা সদস্যদেরই আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখতে দেখা যায়। গ্রামবাংলাতেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ছিল বেশি আর এই গ্রামবাংলার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কৃষক প্রজা সদস্যদের। কৃষক প্রজার গিয়াসুদ্দিন আহমদ খাদ্যমন্ত্রীকে অভিযুক্ত করে বলেন, সুরাবর্দী খাদ্যমন্ত্রী হওয়ার পর চালের দাম বেড়ে উঠেছে, মণ প্রতি ৩০/৪০ টাকা যা ফজলুল হকের সময় ছিল ১৫/১৬ টাকা। সুরাবর্দীর মজুত-বিরোধী অভিযান থেকে পকেট ভর্তি হয়েছে ইস্পাহানি কোম্পানির, অন্য কারও নয়। মজুত-বিরোধী অভিযানের নামে যেভাবে কৃষক জনসাধারণের বাড়িতে বাড়িতে খানাতল্লাশি করা হয়েছে তাতে তাদের "মান-ইজ্জতে আঘাত করা হয়েছে।" এই ঘটনা সভ্য মানুষের কল্পনার বাইরে বলে তিনি বিধানসভাকে জানান। সরকার এক আদেশ জারি করে গ্রামের বয়স্ক লোকদের জন্য দৈনিক সাড়ে সাত ছটাক (৫০০ গ্রামের কম) চাল বরাদ্দ করেন, চার বছরের কম যাদের বয়স তাদের জন্য কোনও খাদ্যই বরাদ্দ করা হয়নি। গিয়াসুদ্দিন বিধানসভায় তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "মন্ত্রীদের দলে মফস্বলের মেম্বার যাঁরা আছেন—তাঁদের আমি জিজ্ঞাসা করছি—তাঁরা কি জানেন না—গ্রামের চাষীরা প্রত্যহ কতটা করে চালের ভাত খায়? তারা রুটি পায় না, বিস্কুট পায় না,

ফল পায় না, চপ, কাটলেট পায় না, আর কিছুই পায় না শুধু নিজের উৎপন্ন করা চাল এবং সেই চালের ভাত খেয়ে পেটের খিদে মিটিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করে যায়। কম করে ধরলেও তিন বেলায় সোয়া সের চালের কমে একজন কৃষকের হয় না। কৃষক জনসাধারণকে যদি সাড়ে সাত ছটাক চাল দৈনিক খেতে দেওয়া হয়, ১৫ দিনের ভিতর তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না।" চার বছরের কম শিশুদের কোনও খাদ্যের ব্যবস্থা না করার জন্য সরকারের সমালোচনা করে গিয়াসুদ্দিন আরও বলেন, "বাংলাদেশের বড়লোকদের কথা জানি না, কিন্তু কৃষকের ছেলের জন্য ছ'মাসের পর থেকেই ভাতের বন্দোবস্ত করা হয়। তার জন্য এক ছটাক চালও কেন ধরা হলো না তার কারণটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?[১৩] কৃষক প্রজার অন্যান্য সদস্যরাও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আরও নানা অভিযোগ আনেন।

দুর্ভিক্ষের ধ্বংসলীলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভাও উত্তেজনা মুখর হয়ে ওঠে। সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে নরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত অভিযোগ করেন, পটুয়াখালির বাজারে ৫ থেকে ৪০ টাকায় ছেলে-মেয়ে বিক্রি হচ্ছে।[১৪] আবদুল ওয়াহেব বলেন, "গ্রাম বাংলায় না খেয়ে পোকামাকড়ের মতো লোক মরছে।"[১৫] হেমপ্রভা মজুমদার বলেন, "খাদ্যমন্ত্রী প্রতিদিনই বলছেন খাদ্য আছে, ওখান থেকে এত খাদ্য আসছে, এখানে এত খাদ্য আছে, খাদ্য যদি থাকে তবে রাস্তায় কেন এত মানুষের কঙ্কাল, কেন কলকাতা নগরীর আনাচে কানাচে অলিতে গলিতে খাবার দাও, ফেন দাও বলে বুভুক্ষের আর্তনাদ"।[১৬] ফজলুল হকের মতে এই অভিশপ্ত সরকারকে দু'কোটি বাঙালীর অভিশাপ মাথায় নিয়ে যেতে হবে।[১৭] শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক বিশেষ মোশান এনে মন্ত্রিসভাকে অভিযুক্ত করে বলেন, এই মন্ত্রিসভার ক্ষমতায় থাকার কোন নৈতিক অধিকার নেই। আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, ডাঃ সানাউল্লা, কমলকৃষ্ণ রায়, শামসুদ্দিন আহমদ, দেবীপ্রসাদ খৈতান প্রমুখ অনেক বিধায়ক আলোচনায় অংশ নিয়ে সরকারি ব্যর্থতার খতিয়ান বিধানসভায় তুলে ধরেন। ইস্পাহানি কোম্পানির বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এসেছে তা খণ্ডন করতে গিয়ে আবদুর রহমান সিদ্দিকি বিধানসভায় হেনস্থা হন। খাদ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী আত্মরক্ষামূলক বক্তৃতা দেন। বিরোধীদের কাছে তো বটেই, সরকার পক্ষের সদস্যদের কাছেও সুরাবর্দী হাস্যাস্পদ হন। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সমর্থন থাকায় শেষ পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদের প্রস্তাব ৮৮-১২৮ ভোটে পরাস্ত হয়।[১৮] দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গ নিয়ে বিধানসভায় বিরোধীরা ওয়াক-আউটও করেন। ১৯৪৪-এর বাজেট আলোচনার সময় বারবারই সদস্যরা ১৩৫০-এর মন্বন্তরের মোকাবিলায় সরকারি ব্যর্থতার উল্লেখ করেন। "কি প্রয়োজন এই বাজেটের যখন ৪০/৫০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে প্রাণ দিল?" বলেন গিয়াসুদ্দিন আহমদ।[১৯] ফজলুল

হক ইংলন্ডে প্রথম চার্লসের আমলে ওলিভার ক্রমওয়েলের প্রসঙ্গও টেনে এনে বলেন, বিধানসভার দায়িত্ব সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা। বাংলা সরকার তাঁদের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য বিধানসভার কাছে কৈফিয়ৎ দিন, ব্যর্থতা মেনে নিন।[২০]

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গঠনমূলক। রাজনৈতিক লাভ-লোকসানের দিকে না তাকিয়ে দুর্ভিক্ষে সমস্যার সমাধানে জাতীয় জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন দলের কাছে আবেদন জানায় কংগ্রেস। নলিনাক্ষ সান্যাল, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কিরণশংকর রায় প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা বিধানসভায় তাঁদের বক্তৃতায় দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব দেন। কমিউনিস্ট সদস্য বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, যিনি তখন "কংগ্রেস বেঞ্চে" বসতেন, পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে পূর্ববর্তী ফজলুল হক-মন্ত্রিসভা এবং বর্তমান মন্ত্রিসভা উভয়কেই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করেন। কংগ্রেস সদস্যরা বিধানসভায় যে সমস্ত প্রস্তাব দিয়েছেন সেই প্রস্তাবগুলির মধ্যে দুর্ভিক্ষ সমস্যার সমাধানের সূত্র নিহিত আছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। কংগ্রেস ও লীগের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, এই দুই দলের "বন্ধনীর মধ্যে সমস্ত দলকে আনতে হবে"।[২১] শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামক পুস্তিকায় মুসলিম লীগ ও নাজিমুদ্দিন সরকারকেই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করেন। মুসলিম লীগ সদস্যরা মনে করেন দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব আসলে ফজলুল হক-শ্যামাপ্রসাদের কোয়ালিশন সরকারের। হবিবুল্লা বাহারের 'মিলাত' পত্রিকায় প্রবন্ধ এবং আবুল মনসুর আহমদের 'আকাল আনিল কারা' শীর্ষক পুস্তিকায় এই মতেরই অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই দুর্ভিক্ষ সাম্প্রদায়িক বিরোধের অন্যতম ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। লক্ষণীয়, এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে ভারত সরকার এবং ইংরেজ শাসকদের দায়িত্ব সম্বন্ধে বিধানসভার সব পক্ষই প্রায় নীরব ছিলেন।

১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি নিয়ে বিধানসভার আলোচনার মধ্যে বিধায়কদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সরকার নিযুক্ত দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন (উডহেড কমিশন) দুর্ভিক্ষের কারণ, প্রকৃতি ও বিস্তৃতি বিষয়ে যে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেন তার সঙ্গে বিধায়কদের বক্তব্যের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।[২২]

দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবিলার ব্যর্থতা ছাড়াও জনবিরোধী অন্যান্য নীতির জন্য নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জনমত ক্রমশ সোচ্চার হতে থাকে। ১৯৪৪-এর বাজেটে ২০ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়। ঘাটতি পূরণের জন্য সাধারণ ক্রেতার ওপর বিক্রয় করের বোঝা চাপানোর প্রস্তাব করা হয়। চার টাকার অধিক মূল্যের লুঙ্গির উপর কর বসানো হয়, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পুনরায় বিধানসভায় এনে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বিধায়কদের উত্থাপিত প্রশ্ন, প্রস্তাব ইত্যাদির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রাধান্য পেতে থাকে, সর্বোপরি মন্ত্রিসভার ইংরেজদের তোষণ করার নীতির বিরুদ্ধে বিধায়করা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। মন্ত্রী তুলসী গোস্বামী

বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিল বিধানসভায় উত্থাপন করলে ইউরোপীয় সদস্য আর ওয়াকার এক সংশোধনী এনে বলেন, যে-সব পাট ও চা-বাগিচা কোম্পানির হেড অফিস বিদেশে তাদের এই করের আওতা থেকে রেহাই দেওয়া হোক। যুক্তি হিসেবে তিনি দেখান, এই কোম্পানিগুলিকে ইংলন্ডে কর দিতে হয়। ভারতে কর দেওয়া তাদের পক্ষে বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। নলিনাক্ষ সান্যাল, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্য সদস্যরা বিদেশীদের এই ধরনের বিশেষ সুবিধা দেওয়ায় আপত্তি জানান। "বিদেশী" শব্দটি নিয়ে বিধানসভায় তুমুল হই চই হয়। ইউরোপীয় দলের হুইপ মিঃ স্টার্ক অভিযোগ করেন এই সভার সম্মানিত এক গোষ্ঠীকে "বিদেশী" বলা সংসদীয় রীতিবিরুদ্ধ। ধীরেন্দ্রনাথ আবার বলেন, "এই সরকার পুরোপুরিভাবে বিদেশীদের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে।" বিধানসভায় এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এই সংশোধনী নিয়ে দু'জন ভারতীয় সদস্যের মন্তব্য আমরা উল্লেখ করছি।

নরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত : "মিঃ স্পীকার, এই দেশে একটা কথা আছে, রাজার নন্দিনী যা করবে তাই শোভা পায়। কাজেই এই রাজার নন্দিনীগণ (প্রমথনাথ ব্যানার্জি : রাজার নন্দিনী নয়, নন্দন বলুন) আচ্ছা নন্দনই বলা গেল— যাঁরা এই অ্যাসেম্বলি হলে শোভা করে বিরাজ করছেন তারা যা করবে তাই শোভা পাবে, এতে আশ্চর্য কিছু নেই। তাঁরা এসেছে আমাদের দেশে সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে উড়ে। উড়ে এসে আমাদের দেশের সমস্ত শস্য খাবে, দেশে নিয়ে যাবে, আর দু-একটা টাকা ট্যাক্স বাবদ যে ফেলে যাবে তাতেও তারা নারাজ। এতবড় নির্লজ্জ আবদার আমাদের দেশেই শুধু সম্ভবপর হয়। তারা রিলিফ চাইছেন। কিসের রিলিফ? রিলিফ নিতে হয় তো বিলেত থেকে নাও। এদেশ থেকে টাকা নেবেন, আবার রিলিফও চাইবেন। এমন উলটো বুদ্ধি, উলটো ব্যবস্থার দাবি এক সাদা জাতি ছাড়া আর কেউ করে না।"[২৩]

মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ : "বাংলাদেশে চা-বাগান, চিনির কল, পাটের কল ইত্যাদি স্থাপন করে কোটি-কোটি টাকা এদেশ থেকে লুটপাট করে ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে। আর তার জন্য একটি কানাকড়িও ট্যাক্স বাবদ দিতে চাইছে না ; আর মন্ত্রিসভা এদের সমর্থন করছে, কারণ সমর্থন না করলে তারা গদিতে টিকে থাকতে পারবে না।"[২৪]

শেষ পর্যন্ত ১১০-৭৫ ভোটে সংশোধনী প্রস্তাব পাস হয়ে যায়। বিধায়কদের কাছে যাঁর কবি খ্যাতি ছিল সুবিদিত সেই কমলকৃষ্ণ রায় বলেন,

"তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
ওরে বঙ্গভূমে জন্ম নিবে,
কৃষি আয়ের কর।

ভাইরে সাহেব সহায় যার
ভাবনা কি আর তার।"[২৫]

বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ও শিল্পশ্রমিক ও গরিব চাষীর দুরবস্থা নিরসনে সরকারের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করেন।

ইউরোপীয় গোষ্ঠী ও ইংরেজ শাসকরা চাইছিলেন নাজিমুদ্দিনকেই ক্ষমতায় আসীন রাখতে। বিধায়কদের মধ্যে নাজিমুদ্দিনের প্রতি সমর্থন দিন দিনই হ্রাস পাচ্ছিল। ১৯৪৪-এর নভেম্বরে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনের পর বেশ কয়েকজন বিধায়ক নাজিমুদ্দিন গোষ্ঠী থেকে নিজেদের সরিয়ে নেন। লীগে সুরাবর্দীর সমর্থন ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। লীগ সম্পাদক আবুল হাশিম জিন্নাকে জানান, মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। যেভাবে নাজিমুদ্দিন চাকরি, কন্ট্রাক্ট ও অনুগ্রহ বিতরণ করে চলেছেন তাতে মুসলিম সদস্যদের কাছে লীগের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় থাকছে না। ১৮ মার্চ, ১৯৪৫ কৃষিমন্ত্রী মোয়াজুদ্দিন হোসেন খাঁ তাঁর দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের দাবি বিধানসভায় পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কংগ্রেস) কালক্ষেপ না করে এর বিরোধিতা করেন। ইতিমধ্যে ২১ জন এম এল এ মুসলিম লীগ দল ত্যাগ করে বিরোধী দলে যোগ দেন। বিধানসভায় সরকারি দল তখন সংখ্যালঘিষ্ঠ। বিরোধীপক্ষ প্রথানুযায়ী কোনও ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন না করে বা সাধারণভাবে বাজেট বরাদ্দের উপর কোনও বক্তৃতা না দিয়ে ভোট দাবি করেন। সরকার পক্ষ টালবাহানা করতে থাকে। মন্ত্রী মিনিট দশেক তাঁর প্রস্তাবের সপক্ষে বক্তৃতা করেন। এরপর মুসলিম লীগ বিধায়ক আহমদ আলি মৃধা আরও কিছু সময় নেন দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করে। শেষ পর্যন্ত ডিভিসন হয়। সরকার পক্ষ হেরে যায় ৯৭-১০৬ ভোটে। ১০৬ জনের মধ্যে ছিলেন ৪৩ জন মুসলমান বিধায়ক। নৌশের আলির রুলিং-এর ফলে[২৬] নাজিমুদ্দিন সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং বাংলায় আবার ৯৩ ধারার প্রবর্তন হয়। প্রকৃত পক্ষে বাংলার নাজিমুদ্দিন-বিরোধী মুসলিম লীগ নেতৃত্ব যা চেয়েছিলেন তাই ঘটে। নাজিমুদ্দিন সরকারের পতন কিন্তু বাংলায় মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বৃদ্ধিতে কোন বাধা হয় না। 'মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল', জাতীয় কংগ্রেসের এই নেতিবাচক প্রচার সাধারণ মুসলমানের চেতনায় কোন রেখাপাতই যে করতে পারেনি তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

১৯৪৬ সালের প্রথমদিকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। বাংলা ও ভারতে তখন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি বিদ্যমান। ২১ নভেম্বর, ১৯৪৫ কলকাতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনানী শাহনওয়াজ, সেহগল, ধীলন ও অন্যান্য বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ছাত্র-মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুস সালাম নিহত

হন ; আহত হন অনেকে। ২২ নভেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে যে ধর্মঘট পালিত হয় তাতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ সহ রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা যোগ দেন। এর প্রায় তিন মাস পর 'রশিদ আলি' দিবসে লক্ষাধিক হিন্দু-মুসলিমের যৌথ মিছিল থেকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধ্বনি ঘোষিত হয়। সব কিছু মিলিয়ে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর এক নতুন বাতাবরণ তৈরি হয় এই সময়। কিন্তু ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচন ঘোষণার পর সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নই ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য পায়। জিন্না ঘোষণা করেন, নির্বাচনকে পাকিস্তানের পক্ষে ভারতীয় মুসলমানদের গণভোট হিসেবে গণ্য করা হবে। কংগ্রেসের নির্বাচনী স্লোগান হয় ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারত। নির্বাচনে মুসলিম লীগের আশাতীত সাফল্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, মুসলিম লীগই মুসলমান জনগণের প্রতিনিধি, অন্য কোনও রাজনৈতিক দল নয়। বাংলা থেকে কেন্দ্রিয় আইনসভার ৬টি মুসলমান আসনই পায় মুসলিম লীগ। বাংলার বিধানসভার ১২১টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৩টি পায় মুসলিম লীগ, বাকি ৮টির মধ্যে ৫টি ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি, ২টি নির্দল মুসলমান ও ১টি মুসলিম শ্রমিক প্রতিনিধি। শহরাঞ্চলের সবকটি আসনই মুসলিম লীগের দখলে আসে। মোট ২৪ লক্ষের বেশি মুসলমান ভোটারের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ২০ লক্ষ ৩৬ হাজার ভোট। কেন্দ্রিয় আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ সদস্যরা, মুসলমান ভোটারের শতকরা ৮৬.৭ অংশ ভোট পান ; কংগ্রেস পায় মুসলমান ভোটের মাত্র ১৩ শতাংশ। সাধারণ আসনে অবশ্য কংগ্রেস দল সাফল্য লাভ করে। কমিউনিস্ট দলের তিনজন প্রার্থী বিধানসভায় নির্বাচিত হন।

১৯৪৬-এর নির্বাচনে দলগত অবস্থান

মুসলিম লীগ	১১৫	নির্দল হিন্দু	১
কংগ্রেস ও তফসিলী	৮৬	হিন্দু মহাসভা	১
ইউরোপীয়ান	২৫	খ্রীস্টান	২
কৃষক প্রজা	৫	অ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৪
নির্দল তফসিলী	৫	কমিউনিস্ট	৩
নির্দল মুসলিম	২		

নির্বাচনে যথেষ্ট কারচুপি হয়েছিল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মুসলিম লীগকে নানাভাবে সাহায্য করেন। মৌলনা আজাদ এ নিয়ে অভিযোগও করেন। বাংলার সাংবিধানিক রাজনীতির দ্বি-মেরু প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় মুসলিম লীগ থেকে উদ্যোগ নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের কথাবার্তা শুরু হয়। সুরাবর্দী কংগ্রেস নেতা

কিরণশংকর রায়ের সঙ্গে এ নিয়ে সলাপরামর্শও করেন। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হয় কারণ কংগ্রেস যে শর্ত দেয় (যেমন মন্ত্রিসভায় সমান সংখ্যক কংগ্রেস ও লীগ প্রতিনিধি, বন্দীমুক্তি, স্বরাষ্ট্র ও খাদ্যদপ্তর কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণাধীন, বিধানসভায় বিতর্কিত সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে আইন প্রণয়নের প্রস্তাবের উপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি) মুসলিম লীগের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বও মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনের বিরোধী ছিলেন। আবুল হাশিমের মতে কংগ্রেস দিক্‌পালরা যৌথ মন্ত্রিসভার বিষয়ে রাজি হতে পারেননি। কারণ তাঁদের সন্দেহ হয়, "যদি বাংলায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় তাহলে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও একইভাবে যুক্ত মন্ত্রিপরিষদ গঠনের দাবি করবে।[২৭] উল্লেখ্য বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক বারোজও যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন।[২৮]

২৪ এপ্রিল সুরাবর্দী মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা প্রথমে ছিল ৮, পরে ১১ করা হয়। নাজিমুদ্দিন গোষ্ঠীর একজনই মন্ত্রী ছিলেন মোয়াজুদ্দিন হোসেন খাঁ। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন একমাত্র হিন্দু প্রতিনিধি। প্রথম আটজন মন্ত্রীর মধ্যে পাঁচজন ছিলেন খান বাহাদুর ও খান সাহেব। ক্ষমতার লড়াইয়ে সুরাবর্দী-নাজিমুদ্দিন দ্বন্দ্ব তখন চরম পর্যায়ে। অন্তত ৩৫ জন মুসলিম লীগ বিধায়ক ছিলেন নাজিমুদ্দিনের গোঁড়া সমর্থক। কংগ্রেস বিধায়কদের মধ্যে ছিলেন কিরণশংকর রায়। বিমলচন্দ্র সিংহ, সুরেশ ব্যানার্জি প্রমুখ নেতারা। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নির্বাচিত হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে। জমিদার-সংরক্ষিত নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে আসেন বর্ধমানের মহারাজা। বিপ্লবী বীণা দাস কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন।

১৪ মে বেলা আড়াইটায় নবগঠিত বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের জন্য একদিনের এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি মিঃ ডি. গ্লাডিং। প্রথমেই মুলতুবি প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভায় উত্তপ্ত বাদানুবাদ হয়। নিশীথনাথ কুণ্ডু সভা শুরু হলেই উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, রানাঘাট মহকুমার চর নওদাপাড়া থেকে হিন্দু চাষীদের বলপূর্বক উৎখাত করে পূর্ববঙ্গ থেকে মুসলমান চাষীদের বসিয়ে দেওয়ার বিষয়ে তিনি এক মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিস দিয়েছিলেন কিন্তু প্রাক্তন স্পিকার নৌশের আলির সই করা আদেশে মুলতুবি প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়া হয়। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কিরণশংকর রায়, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিধায়করা মুলতুবি প্রস্তাব গ্রহণের সপক্ষে যুক্তি দেন। গ্লাডিং ভারতশাসন আইনের ৬৫ নং অনুচ্ছেদে ২ নং ধারা উল্লেখ করে বলেন, এই অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নৌশের আলিই অধ্যক্ষ ছিলেন, সুতরাং তাঁর সই করা আদেশ আইনসঙ্গত। কমিউনিস্ট সদস্য

জ্যোতি বসুও রাজবন্দীদের মুক্তির বিষয়ে যে মুলতুবি প্রস্তাব দেন তা একইভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়, সেই মুলতুবি প্রস্তাব পুনর্বিচারের জন্য বসু অস্থায়ী অধ্যক্ষের কাছে আবেদন জানান, কিন্তু গ্লাডিং এই প্রস্তাব গ্রহণেও অসম্মতি জানান।[২৯]

স্পিকার নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী নুরুল আমিন কৃষক প্রজার মহম্মদ আফজলকে ১৩৭-৯৩ ভোটে পরাজিত করেন। ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন মুসলিম লীগের তফজুল আলি ১৩০টি ভোট পেয়ে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রমথনাথ ঠাকুর পান ৯৯টি ভোট।

জুলাই মাসে বাজেট অধিবেশন শুরু হলে প্রথমেই বন্দী মুক্তির বিষয়ে বিধানসভাকে সোচ্চার হতে দেখা যায়। জ্যোতি বসু এ বিষয়ে একটি মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিস উত্থাপন করলে স্পিকার তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। কারণ জানতে চাইলে, মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী কিছু মন্তব্য করেন। জ্যোতি বসু উত্তরে বলেন তিনি স্পিকারের রুলিং মেনে চলবেন, মুখ্যমন্ত্রীর নয়। কংগ্রেসের কিরণশংকর রায়, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ সদস্য জ্যোতি বসুর বক্তব্য সমর্থন করেন এবং বাইরে অপেক্ষমান হিন্দু-মুসলিম ছাত্র-শোভাযাত্রার কাছে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ জানান। এ নিয়ে বিধানসভায় বেশ উত্তেজনা হয়।[৩০] সুরাবর্দী এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ১৫ আগস্টের মধ্যে রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। বন্দীরা মুক্তি পান। উল্লেখ্য, বন্দীমুক্তি আন্দোলনে কমিউনিস্টরাই উদ্যোগ নেন এবং বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্যদের তাঁরা সমর্থন পান।

২৪ জুলাই অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন। বাজেট আলোচনার শুরুতেই হিন্দু ও মুসলমান বিধায়করা খাদ্যসংকট ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয় উত্থাপন করে সরকারকে বিব্রত করার চেষ্টা করেন। কংগ্রেস সদস্য বিমলচন্দ্র সিংহ চাল ও খাদ্যশস্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য হ্রাসের সরকারি ব্যর্থতা সম্বন্ধে মুলতুবি প্রস্তাব বিধানসভায় উত্থাপন করেন। কমলকৃষ্ণ রায়, সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু, আবুল খালেক প্রমুখ বিধায়করা সরকারি নীতি ও কর্মসূচীর সমালোচনা করে মুলতুবি প্রস্তাব সমর্থন করেন। ধান চাল সংগ্রহে সরকারি নীতি এবং খাদ্যবণ্টন ও রেশনিং ব্যবস্থায় সরকারের ব্যর্থতা সদস্যরা সভায় তুলে ধরেন। বিমলচন্দ্র সিংহ খাদ্যসংকট সমাধানে কংগ্রেসের পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।[৩১] জ্যোতি বসু তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ধানচাল সংগ্রহ ও খাদ্যবন্টনে জনসাধারণের সহযোগিতা নিতে হবে। বাংলার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ প্রচেষ্টার উপর তিনি গুরুত্ব দেন।[৩২] অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী আবদুল গফরান খাদ্য সমস্যা সমাধানে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীর বিবরণ দিয়ে তাঁর জবাবী ভাষণ পেশ করেন। বিমল সিংহের মুলতুবি প্রস্তাব ৮৬-১২৫ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। কমিউনিস্ট

সদস্যরা প্রস্তাবের পক্ষেই ভোট দেন। অর্থমন্ত্রী মহম্মদ আলি তাঁর বক্তৃতায় বাজেটের অভিনবত্ব ব্যাখ্যা করলে মুসলিম লীগের আবদুল মালিককে বলতে শোনা যায়, "এ বাজেট যদি পাকিস্তানী বাজেট হয় তবে এই পাকিস্তান আমরা চাই না"।[৩৩] বাজেট বক্তৃতার অংশ নিয়ে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও তার দালালদের হাত থেকে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের হাতে যতদিন দেশের শাসনব্যবস্থা না আসবে ততদিন সত্যিকারের বাজেট তৈরি হতে পারে না।" লাট্‌সাহেবরূপী যে শ্বেতহস্তীর জন্য সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে, তিনি তার সমালোচনা করেন। পাকিস্তানের নামে দেশে যে অপশাসন চলছে, তা আর কিছুদিন চললে "বাংলা হবে ঠগী স্থান, জুয়াচোরের স্থান এবং গোরস্থান," এই বলে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন।[৩৪] বাজেট আলোচনায় মুসলিম লীগ বিধায়কদের আত্মরক্ষামূলক বক্তব্য রাখতে দেখা যায়।

বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে সদস্যরা জনসাধারণের দুঃখকষ্ট ও তার নিরসনে সরকারি ব্যর্থতার উপর গুরুত্ব দেন বেশি। মুসলিম লীগ সদস্য মহম্মদ হবিবুল্লা চৌধুরীর মতো অনেক লীগ বিধায়ক মনে করেন বাজেট উপরতলার নেতাদের তৈরি, সাধারণ লোকের দুঃখকষ্ট মোচনের জন্য এই বাজেট নয়। কংগ্রেস সদস্য কমলকৃষ্ণ রায় বিধানসভায় বলেন, "বাজেট শব্দটির 'ট' বাদ দিলে যা দাঁড়ায়, সরকারের আর্থিক আয় ব্যয়ের হিসেবকে তা-ই বলা উচিত"। হবিবুল্লা চৌধুরীর দীর্ঘ বাজেট বক্তৃতার একটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি—

> "বৎসরের পর বৎসর আসে, বৎসর যায়, মন্ত্রিমণ্ডল আসে, মন্ত্রিমণ্ডল যায়। বাংলা পরিষদের এয়ার কন্ডিশন্‌ড কামরায় বসে বাংলার গণপ্রতিনিধিরা বাজেট বিতর্কের অভিনয় করেন, কেউ বলেন, চমৎকার বাজেট, খাসা বাজেট, কেউ বলেন প্রতিক্রিয়াশীল বাজেট—হৃদয়হীনের তৈরি, এ্যাসেম্বলি হলের বাইরে বিশাল বাংলাদেশ। সেখানে ঘুরে বেড়ায় ৩৫ লক্ষ দুর্ভিক্ষে মরা মানুষের ছায়া। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় সর্বহারা কৃষকের দুঃখবেদনার কাহিনী। কী দেবে তাদের এই বাজেট?"

তিনি মনে করেন, বাংলার অর্থনৈতিক দেউলিয়ার জন্য দায়ী "সাম্রাজ্যবাদ, দায়ী সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি জমিদার, মহাজন, পুঁজিবাদী আর সাম্রাজ্যবাদের পোষ্য আমলারা'।[৩৫]

কমিউনিস্ট সদস্য রূপনারায়ণ রায় বাজেটের সমালোচনা করে বলেন, "গভর্নমেন্টকে আমরা একটি বিষয়ে স্পষ্ট কথা বলিতে চাই, দুর্ভিক্ষ ডাকিয়া আনিবার পর, কৃষককে দুঃস্থে পরিণত করিবার পর কয়েকটি টাকা খয়রাতি দান করিবার নীতি তাহারা পরিহার করুন। কৃষক ভিক্ষা চায় না, সে চিরদিন ভিক্ষা দিয়েছে। যে চিরদিন অন্যকে

দান করিয়াছে, সেই কৃষক লঙ্গরখানার অতিথি হইতে চায় না।" তিনি অভিযোগ করেন, "বাংলার কাপড় বণ্টনের সব ভার চোরাকারবারী অ্যাসোসিয়েশনের হাতে দেওয়া হইয়াছে। দেশের মা-বোন উলঙ্গ, আর শয়তান গভর্নমেন্টের সাথে ষড়যন্ত্র করিয়া দেশদ্রোহী কাপড় ব্যবসায়ীরা শ্যাম ও মধ্যপ্রাচ্যে কাপড় রপ্তানি করিতেছে।"[৩৬]

দার্জিলিং থেকে নির্বাচিত সদস্য ডাম্বের সিং গুরুং চা-বাগান শ্রমিকের অসহনীয় জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরেন।[৩৭]

বাজেট বক্তৃতায় জ্যোতি বসু পাটশিল্প, কয়লা শিল্প ইত্যাদির জাতীয়করণ ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সুপারিশ করেন।[৩৮]

কংগ্রেস সদস্যরাও ইংরেজ শাসন ও অসাধু মন্ত্রিমণ্ডলীর অপদার্থতাকে বাংলার অর্থনৈতিক দৈন্যদশার জন্য দায়ী করেন।

আসামে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ নিয়েও ১৯৪৬-এর বিধানসভায় তুমুল বাদানুবাদ হতে দেখা যায়। বাংলার মৈমনসিং জেলা থেকে বেশ কিছু মুসলমান আসাম উপত্যকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। প্রধানত অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যই এদের নিজ বাসভূমি ত্যাগ করতে হয়। আসামের সাদুল্লা মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে এই সব মুসলমানদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসার পর বাংলা থেকে আগত মুসলমানদের বিতাড়নের উদ্যোগ নেয়। মুসলিম লীগ সদস্য তফজুল আলি ২৬ জুলাই বিধানসভায় এক প্রস্তাব এনে আসাম থেকে মুসলমান বিতাড়ন বন্ধ করতে গভর্নর জেনারেলের হস্তক্ষেপ দাবি করেন। কংগ্রেস সদস্যরা বৈধতার প্রশ্ন তুললে স্পিকার তা বাতিল করে দেন। কংগ্রেস সদস্য বীণা দাস তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আসামকে জিন্নার প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে মুসলমান পাঠানো হচ্ছে। শ্রমিক প্রতিনিধি এম এ জামানও প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। জ্যোতি বসু বাঙালী ও অসমীয়াদের মধ্যে এভাবে বিদ্বেষ সৃষ্টির নিন্দা করে বলেন, জমিদারদের অত্যাচারের ফলেই দরিদ্র মুসলমানদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে হয়েছে। জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ, ভূমিহীনদের মধ্যে জমিবণ্টন ও শিল্পবিকাশ ত্বরান্বিত করে বাস্তুত্যাগ বন্ধ করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আবেদন জানান। তফজুল আলির প্রস্তাব অবশ্য ৯৯-৯০ ভোটে গৃহীত হয়। কমিউনিস্ট সদস্যরা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন।[৩৯]

ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থনে বাংলায় ২৯ জুলাই যে সার্বিক হরতাল পালিত হয়, তার জন্য সব রাজনৈতিক দলের সম্মতিতে বিধানসভার অধিবেশন ঐ দিন স্থগিত রাখা হয়। তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে আইনসভার ইতিহাসে এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা বলে উল্লিখিত হয়েছে।[৪০]

বিধায়কদের অধিকারের প্রশ্নে এই পর্বের বিধানসভাকে খুবই সক্রিয় হতে দেখা

যায়। ৬ আগস্ট বিধানসভায় প্রবেশের পথে জ্যোতি বসু পুলিশের ডেপুটি কমিশনার সামসুদ্দোহা দ্বারা নিগৃহীত হন এবং পরে গ্রেপ্তার হন। কিরণশংকর রায় এ বিষয়ে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং দেরি না করে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। ঈশ্বরদাস জালান এরস্কিন মে-র 'পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস' থেকে নজিরও বিধানসভায় পেশ করেন। অধিবেশন মুলতুবি রাখা হয় এবং স্পিকারের নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী সংশ্লিষ্ট অফিসারকে ক্ষমা চাইতে বলেন। ইংরেজ পুলিশ কমিশনার এতে আপত্তি জানান। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সামসুদ্দোহা ক্ষমা চান। সুরাবর্দী এ নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন। দলমত নির্বিশেষে সব সদস্যই পুলিশের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হন এবং স্পিকার পুলিশের এই ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান। বাংলার বিধানসভা সদস্যদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এক নজির সৃষ্টি করে।[৪১]

সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার আমলে আইন প্রণয়নের পরিবর্তে মাত্রাতিরিক্ত অর্ডিন্যান্স জারির বিষয় বিধানসভায় প্রায়শই উত্থাপিত হতে দেখা যায়। ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ এক দিনেই ১০টি অর্ডিন্যান্স অনুমোদনের প্রস্তাব আসে বিধানসভায়। কংগ্রেস সদস্য বিমলচন্দ্র সিংহ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন ; অন্যান্য কংগ্রেস সদস্যও অর্ডিন্যান্স-রাজ দ্বারা বাংলা শাসিত হচ্ছে এই অভিযোগ আনেন। জ্যোতি বসু বলেন, অর্ডিন্যান্স জারি করে পুলিশ ও আমলাদের হাত শক্ত করা হয়েছে। বিমলচন্দ্র সিংহের প্রস্তাব ৭০-১১৮ ভোটে নাকচ হয়ে যায়।[৪২]

১৯৪৬-৪৭ এর গৌরবোজ্জ্বল তেভাগা আন্দোলন বাংলার বিধানসভার অন্যতম আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ আধিয়ারের খোলানে তোলার দাবিতে বর্গাদার ও আধিয়াররা যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম রংপুর, দিনাজপুর, যশোর, জলপাইগুড়ি ও ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই তেভাগা আন্দোলন প্রসঙ্গে কয়েকবারই বিধানসভায় উত্থাপিত হতে দেখা যায়। সাধারণভাবে তেভাগা সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ না পেয়ে বাজেটের বিভিন্ন খাতে বিতর্কে অংশ নিয়ে জ্যোতি বসু কিভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে পুলিশ গরিব বর্গাদার ও আধিয়ারদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে তার বিবরণ দেন। কৃষককর্মী সমীরুদ্দিন ও শিবরামের আত্মত্যাগের কাহিনী তিনি সদস্যদের সামনে তুলে ধরেন।[৪৩] কংগ্রেস বিধায়ক বীণা দাস এলাকার মহিলাদের উপর নৃশংস অত্যাচার এবং নারী ও শিশু হত্যার অভিযোগ অভিযুক্ত করেন সুরাবর্দী সরকারকে। বীণা দাস জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাস্তিনের শাস্তি দাবি করেন।[৪৪] সুরাবর্দী বলেন, কৃষকরা চৌকিদারি কর দিচ্ছে না। পুলিশের হেফাজত থেকে আসামীকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। জোর করে ধান কেটে নিচ্ছে। এই ধরনের অরাজকতা সরকার বরদাস্ত করতে পারেন না বলেও

তিনি বিধানসভাকে জানান।[৪৫]

১৬ আগস্ট, ১৯৪৬ পরবর্তী প্রায় প্রতিটি অধিবেশনে দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নিয়ে বিধানসভাকে উত্তাল হতে দেখা যায়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় মুসলিম লীগের নির্দেশে প্রত্যক্ষ দিবস উপলক্ষে ১৬ আগস্ট থেকে কলকাতা দাঙ্গার। এই দাঙ্গায় নিহত হন ৫০০০ এর বেশি, আহত ১৫,০০০ মানুষ, গৃহহীন হন লক্ষাধিক নরনারী। দাঙ্গার দায়িত্ব কার কতদূর, এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। গভর্নর জেনারেল ওয়াভেল, গভর্নর বারোজ, কলকাতায় অবস্থিত সামরিক বাহিনীর সেনানী ও আমলারা সবাই এ নিয়ে লিখেছেন ও বলেছেন। রাজনৈতিক নেতারা পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করেছেন। মৌলনা আজাদ, কিরণশংকর রায় দাঙ্গার জন্য লীগকেই দায়ী করেছেন। অন্যদিকে সুরাবর্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ লীগ নেতারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা শুরু করার অভিযোগ এনেছেন। এই বীভৎস ভয়াবহ দাঙ্গাকে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' বলে অভিহিত করে। বলা হয়, এটা দাঙ্গা নয়, মধ্যযুগীয় রোষানল, স্বতঃস্ফূর্ত নয়, পরিকল্পিত। স্টেটস্‌ম্যান মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভাকেই দাঙ্গার জন্য প্রধানত দায়ী করে। সুরাবর্দীর বিরুদ্ধে দাঙ্গার ইন্ধন যোগানোর অভিযোগ আনা হয়। লালবাজার কন্ট্রোলরুমে বসে সুরাবর্দী পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছেন—এ অভিযোগ এনেছেন গভর্নর বারোজ। সুরাবর্দী সামরিক বাহিনীর সাহায্য চান অনেক দেরিতে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সফলের জন্য সুরাবর্দী সব ধরনের ব্যবস্থাই নেন। "যিনি ১৯২৬-এ শ্বশুর মহাশয়ের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য কলকাতায় দাঙ্গা বাধিয়েছিলেন, তিনি নবলব্ধ পৃষ্ঠপোষক জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাকে সাড়া দেবেন—এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কলকাতার নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র বেকার মুসলমান। পশ্চিমী মুসলমান, সমাজবিরোধী মুসলমান, সরকারি পুলিশ তো তাঁর হাতে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্য। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট সেই দৈত্য কলকাতার উপর ছেড়ে ছিলেন তিনি। তার্‌পর তিনি বা জিন্না কেউ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না।"[৪৬] মুসলিম লীগ নেতারা অবশ্য সুরাবর্দীর সপক্ষে বলেন, সৈন্যরা তাঁর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল না, পুলিশ তার কথা শোনেনি ইত্যাদি। আবুল হাশিম সুরাবর্দীকে "মহৎ পুরুষ" বলে আখ্যায়িত করে বলেন, দাঙ্গার সময় নিজের জীবন বিপন্ন করেও কলকাতার রাস্তায় তাঁকে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। হাশিম মনে করেন, সুরাবর্দীর জন্য দাঙ্গা হয়নি, সুরাবর্দী থাকা সত্ত্বেও দাঙ্গা হয়েছে এটাই বড় কথা।[৪৭] বেগম শায়েস্তা সুরাবর্দী ইক্রামুল্লা কলকাতার দাঙ্গার জন্য সুরাবর্দীর উদ্বেগ, দাঙ্গা প্রতিরোধে সুরাবর্দীর নিরলস প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অনেক লিখেছেন, তাঁর অধুনা প্রকাশিত সুরাবর্দী জীবনীতে।

লীগ সম্পাদক আবুল হাশিম বলেছেন, ১৬ আগস্ট এই ধরনের ভয়াবহ ঘটনা

যে ঘটবে লীগ নেতারা তা কল্পনাও করতে পারেননি।[৪৮] ১৬ আগস্টের অভূতপূর্ব সংঘর্ষ যা সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলেছিল, সে বিষয়ে মুসলিম লীগের কোনই জ্ঞান, সন্দেহ বা ধারণা ছিল না। হাশিমের এই বক্তব্য যে নির্ভরযোগ্য নয় বাস্তব ঘটনাই তার প্রমাণ দেয়। ১৯৪৬-এর জুলাই মাসে মুসলিম লীগের বোম্বাই অধিবেশনে পাকিস্তান অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়। কর্মসূচীর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মুসলিম লীগ নেতারা ইংরেজের দেওয়া উপাধি ত্যাগ করেন। স্পিকার নুরুল আমিন সহ বাংলার অনেক লীগ নেতা উপাধি ফিরিয়ে দেন। এ নিয়ে বিধানসভায়ও আলোচনা হয়। নুরুল আমিন জানান স্পিকার হিসেবে তিনি নিরপেক্ষ, কিন্তু মুসলিম লীগের সদস্য হিসেবে দলের নির্দেশ তিনি মেনে চলতে বাধ্য। বোম্বাই অধিবেশনে বাংলার নেতাদের বক্তব্য যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করে। আবুল হাশিম তাঁর বক্তৃতায় বলেন, অখণ্ড ভারত মানেই হিন্দু আধিপত্য, শোষণ ও মুসলমানের প্রতি অবিচার। মুসলমান সমাজকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে কংগ্রেস লিপ্ত। সুরাবর্দী অভিযোগ করে বলেন, ব্রিটিশ দাসত্ব ও বর্ণ-হিন্দু আধিপত্য থেকে মুক্তির দাবিতে মুসলিম লীগের এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। ১০ আগস্ট এক বিবৃতিতে সুরাবর্দী প্রয়োজনে বাংলায় বিকল্প সরকার এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার হুমকি দেন। নাজিমুদ্দিন এক সাক্ষাৎকারে বলেন, অহিংস পন্থায় তাঁরা বিশ্বাসী নন। কীভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করতে হবে মুসলমানরা তা ভালভাবেই জানেন।[৪৯] দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্ররোচনামূলক লেখা মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ায়। ১৬ আগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণা, কলকাতার বাইরে থেকে লোক আমদানি, মন্ত্রিদের নামে ইস্যু করা পেট্রোল কুপন মুসলিম লীগ নেতা এবং তাঁদের মাধ্যমে সমাজবিরোধীদের মধ্যে বিতরণ এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সংঘর্ষ সম্বন্ধে মুসলিম লীগের কোন ধারণা ছিল না, আবুল হাশিমের এই মন্তব্য মেনে নেওয়া কঠিন।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঠিক পরে পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী ২০ আগস্ট বিধানসভার অধিবেশন (৪:২৫ মিনিটে) বসলে দেখা যায়, স্পিকার ও ৮ জন মন্ত্রী ছাড়া মাত্র ২ জন সদস্য সভায় উপস্থিত। ২ সেপ্টেম্বর অধিবেশনেও কোরাম হয় না। বিভিন্ন দলের ঐকমত্যে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি রাখা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আগস্টের নারকীয় হত্যালীলার প্রতিবাদে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বিধানসভায় প্রথমে মুলতুবি প্রস্তাব আনা হয় ১২ সেপ্টেম্বর। দীর্ঘ বিতর্কের পর মুলতুবি প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। তারপরে সুরাবর্দী-মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর। বিধানসভার কার্যবিবরণীতে প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা জুড়ে এর বিস্তৃত বিবরণ আছে। অনাস্থা প্রস্তাব আনেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁকে সমর্থন করেন বিমলকুমার

ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র জালান, ভূপতি মজুমদার, কিরণশংকর রায়, বীণা দাস প্রমুখ কংগ্রেস বিধায়করা। কংগ্রেস সদস্যরা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে দেখান এই ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত ও সুরাবর্দীর নির্দেশে পরিচালিত। মুসলিম লীগ থেকে বক্তব্য রাখেন আবুল হাশিম, মন্ত্রী শামসুদ্দিন আহমদ, হবিবুল্লা চৌধুরী, ইস্পাহানি, তফজল আলি ও অন্যান্যরা। মুসলমান লীগ নেতারা মূলত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরই দাঙ্গার জন্য দায়ী করে বলেন, অনাস্থা প্রস্তাব প্রকারান্তরে ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি আস্থাসূচক প্রস্তাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা মনে করেন, হিন্দু নেতারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দীর জবাবী ভাষণ[৫০] এবং মুসলিম লীগ সদস্যদের বক্তব্য হয় অনেকটা আত্মরক্ষামূলক। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক (যিনি সদ্য মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছেন) মনে করেন দাঙ্গা পূর্ব পরিকল্পিত। দাঙ্গার ক'দিন কলকাতায় নাদির শাহী তাণ্ডব চলেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। পুলিশ শুধু নিষ্ক্রিয়ই ছিল না, লুটের ভাগীদারও ছিল। বাংলার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে জাতীয় সরকার গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে হক আবেদন জানান।[৫১] শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা সবচেয়ে দীর্ঘ হয়। তথ্য ও যুক্তি সমন্বিত তাঁর বক্তব্য সুরাবর্দী ও মুসলিম লীগের অস্বস্তির কারণ হয়।[৫২] জ্যোতি বসু ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকেই এই দাঙ্গার জন্য দায়ী করেন। মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বক্তৃতা এবং 'আজাদ' পত্রিকা ও লীগের প্রচারমাধ্যম দাঙ্গায় উস্কানি দিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর মতে শ্রমিক শ্রেণী এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা থেকে মোটামুটিভাবে মুক্ত ছিল। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী বজায় রেখে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের উপর জ্যোতি বসু গুরুত্ব দেন।[৫৩] ইউরোপীয় গোষ্ঠী আলোচনায় বিশেষ অংশ না নিয়ে নিরপেক্ষ ছিলেন।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অনাস্থা প্রস্তাবের প্রথমেই ১৬ আগস্ট সাধারণ ছুটি হিসেবে ঘোষণার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এই ছুটি ঘোষণা দাঙ্গার অন্যতম কারণ বলে আরও অনেকেই উল্লেখ করেন। ১২ সেপ্টেম্বর ধীরেন্দ্রনাথ ছুটি ঘোষণার বিষয়ে একটি মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি চান স্পিকারের কাছে। ডেপুটি স্পিকারের সঙ্গে এ নিয়ে কংগ্রেস সদস্যদের বাদানুবাদও হয়। বিতর্কে কিরণশংকর রায়, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, ফজলুর রহমান, অর্থমন্ত্রী মহম্মদ আলি সহ অনেকে জড়িয়ে পড়েন। তুমুল উত্তেজনার মুখে অর্থমন্ত্রী জানান, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ যাতে না হয় এবং শান্তি যাতে বজায় থাকে, সেজন্যই ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বিতর্কের স্তরে মহম্মদ আলি এক সময় বলেন মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতা, সুতরাং মুসলিম লীগের নির্দেশ মেনেই তিনি ছুটি ঘোষণা করেছেন। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর নেতা মিঃ মরগ্যানও বলেন, আশঙ্কা হয়েছিল, ছুটি ঘোষণা করলে সাম্প্রদায়িক

সংঘর্ষ অনিবার্যভাবে দেখা দেবে। আশঙ্কা যে যথার্থ তা বাস্তবেও প্রমাণিত হয়েছে।[৫৪]

সুরাবর্দী, নাজিমুদ্দিন ও আবুল হাশিমের প্ররোচনামূলক বক্তৃতা ছাড়া সিন্ধুপ্রদেশের দুই মন্ত্রী ও কলকাতা জেলা মুসলিম লীগ সম্পাদক ওসমানের বক্তব্য বিধানসভায় উত্থাপিত হতে দেখা যায়। সিন্ধুর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোলাম আলি প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ বলে উল্লেখ করেন। রাজস্বমন্ত্রী পীর ইলাহি বক্স ভারতে মুসলিম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিতে আহ্বান জানান। ওসমানের স্বাক্ষরিত উর্দু প্রচারপত্র কলকাতার উর্দুভাষী মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনা সৃষ্টি করে বলে হিন্দু বিধায়করা অভিযোগ করেন। মিলিটারি প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও সুরাবর্দী ১৭ আগস্ট রাত্রির আগে সামরিক সাহায্য চাননি বলে বাংলা ও আসাম অঞ্চলের অস্থায়ী সেনাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার সিক্সস্মিথ যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিধানসভায় তা উল্লেখিত হয়। কংগ্রেস সদস্য বীণা দাসের আবেগপূর্ণ বক্তব্য মুসলমান বিধায়কদের মনেও রেখাপাত করে। বীণা দাস বলেন, "এই অভিযোগ যখন আমি করছি, তখন কোনও দলের বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে করছি না। আমি যে একজন কংগ্রেস কর্মী সে পরিচয়ও আমার কাছে বড় হয়ে উঠছে না। মানুষের চরম নির্যাতন নিজের চোখে দেখেছি বলেই আজকের মন্ত্রিমণ্ডলীকে প্রশ্ন করছি। কেন তারা এতগুলি অসহায় সবচেয়ে নিরপরাধ মানুষকে এমন করে নিহত হতে দিলেন? কেন পুলিশ মিলিটারি বেষ্টিত কলকাতায় যেখানে সামান্য দু-একটা মিলিটারি লরি পুড়লে সমস্ত কলকাতা পুলিশ মিলিটারিতে ছেঁকে ধরে, রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেয়, সেই কলকাতায় পাঁচ-পাঁচটি দিন ধরে গুণ্ডার রাজত্ব চলল, অথচ কোথাও কোনোরকম প্রতিরোধ দেখা গেল না।"[৫৫]

মুসলিম লীগ বিধায়করা প্রায় সকলেই মনে করেন এই দাঙ্গার পিছনে ব্রিটিশের চক্রান্ত কাজ করছে। একমাত্র ইস্পাহানি ইংরেজদের দাঙ্গার ব্যাপারে দায়ী করার জন্য উষ্মা প্রকাশ করেন। দাঙ্গার অভিজ্ঞতা হিন্দু ও মুসলমানের বিভেদ দূর করতে সক্ষম হবে এবং ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে সহায়ক হবে বলে আবুল হাশিম মনে করেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের একজন প্রাক্তন কংগ্রেস কর্মী হিসেবে মন্ত্রী শামসুদ্দিন আহমদ বলেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ না হলে আসন্ন দুর্দিন থেকে ভারতকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।[৫৬] মহম্মদ হবিবুল্লা চৌধুরীর বক্তৃতার মধ্যে একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়, "যে বাংলা প্রেমের দেশ বলে খ্যাত, যে বাংলায় শ্রীচৈতন্য ও চণ্ডীদাস জন্মেছিলেন, যে বাংলায় রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেম প্রচার করেছেন, এবারকার দাঙ্গায় সেই বাংলার লোকেদের হাত কেঁপে ওঠে নাই শিশুদের হত্যা করতে, নারীদের হত্যা করতে। এই বর্বরতার কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় সত্যিই

ছেলেবেলা থেকে যে গর্ব অনুভব করেছি বাংলাদেশে জন্মেছি বলে সে গৌরবের আমরা অধিকারী কি না?" সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিণতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলিম সকলকে সাবধান করে হবিবুল্লা চৌধুরী বলেন, "এই মনোবৃত্তির যদি পরিবর্তন না হয় তা হলে পাকিস্তান-হিন্দুস্থান তো পরের কথা, সমস্ত বাংলাদেশ গোরস্থানে পরিণত হবে এবং কায়েম হবে অখণ্ড হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান নয় ; কায়েম হবে ইংলিস স্থান"।[৫৭] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এক নম্বর শত্রু বলে চিহ্নিত করে জ্যোতি বসু বলেন, সুতো টানা হচ্ছে হোয়াইট হল, দিল্লি ও কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউস থেকে। আর আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশনকে দায়ী করে তিনি বলেন, "কবে ইংরেজ তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ভারত ছেড়ে যাবে এ বিষয়ে কিছু না বলে মন্ত্রিমিশন দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মন পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুললো এবং যার পরিণতি হলো কলকাতার এই নারকীয় হত্যালীলা।"[৫৮] এই অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলের সদস্যদের বেশ কয়েকজন কোনও সম্প্রদায়ের ওপর দোষারোপ না করে মূলত শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষা এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর জোর দেন। তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ দাঙ্গায় ব্রিটিশ শাসকদের ভূমিকা সম্বন্ধে মুসলিম লীগ বিধায়কদের সোচ্চার হতে দেখা যায়। কংগ্রেস সদস্যরা কিন্তু দাঙ্গার জন্য ইংরেজদের ভূমিকাকে অনেক কম গুরুত্ব দিয়েই দেখেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিই বোধ হয় এর কারণ। মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ৮৭-১৩১ ভোটে বাতিল হয়ে যায়।

অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হওয়ার পর দাঙ্গা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ২৬ সেপ্টেম্বর বিধানসভার অধিবেশনে শ্রীমতী আশালতা সেন মহিলা ও শিশুরা কীভাবে দাঙ্গার শিকার হচ্ছে তার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ দেন। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা চট্টগ্রামে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার উল্লেখ করেন।[৫৯] কিরণশংকর রায় ২৮ সেপ্টেম্বর বিধানসভাকে জানান, দাঙ্গা বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাঙ্গা দমনে সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে কিরণশংকর রায় বলেন হিন্দু ও মুসলমান বিধায়করা যৌথভাবে জেলা সফর করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করুন। মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী কংগ্রেসের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান এবং বলেন, দাঙ্গা করে, একে অপরকে মেরে হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান কোনোটাই আনা যাবে না। দাঙ্গা মোকাবিলায় পুলিশকে কাজে লাগানো হবে বলে সুরাবর্দী প্রতিশ্রুতি দেন।[৬০] বাস্তবে এই প্রস্তাব কার্যকরের আগেই বিহার ও নোয়াখালির দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। নোয়াখালির দাঙ্গা নিয়েও হারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরী বিধানসভায় এক মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিধানসভায় এ নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ হয়। শ্যামাপ্রসাদ, ফজলুল হক, আবুল হাশিম প্রমুখ বিধায়করা বিতর্কে অংশ নেন। হিন্দুরা মুসলমানদের এবং

মুসলমানরা হিন্দুদের দায়ী করেন। মুসলিম লীগ সদস্য হবিবুল্লা চৌধুরী অবশ্য মনে করেন, অর্থনৈতিক কারণের জন্যই দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে। তিনি বলেন লক্ষ লক্ষ লোক এই জেলায় গৃহহীন। যুদ্ধ ফেরত বেকারের সংখ্যা দেড় লক্ষের উপর। তাছাড়া জমিদার, মহাজন ও শোষকদের পীঠস্থান এই জেলা। রাষ্ট্র নিয়ন্তাদের অবহেলা এবং জমিদার ও মহাজনদের শোষণের ফলে নোয়াখালি বহুদিন থেকে বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে। বাইরে থেকে কিছু লোক এসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দেশলাই না লাগালেও এখানে আগুন জ্বলত। মূলত অর্থনৈতিক ইন্ধনই দাঙ্গাপ্রসারে সহায়ক ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন।[৬১]

বিধায়ক গোলাম সারোয়ারের ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা হয়। বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যরা হিন্দু-মুসলিম শান্তি কমিটি গঠন করে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার আবেদন জানান। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "হিন্দু-মুসলিম দুই সহোদর ভাই। কারণ, দেশজননী—ভাষাজননী আমাদের এক। আমাদের আত্মকলহ ভাই-ভাই বিবাদ সর্বাগ্রে বন্ধ করা উচিত। তৃতীয় পক্ষ আমাদের আত্মকলহ-ই চায়। যে পৃথক নির্বাচনের বিষবৃক্ষের চারা তারা রোপণ করেছে, তাই আজ মহামারীরূপে পরিণত হয়ে সমস্ত দেশকে ধ্বংস করার উপক্রম করেছে। নোয়াখালি ও ত্রিপুরার জনবিহীন ভস্মীভূত পল্লীগুলির ধ্বংসস্তূপ এই সাক্ষ্যই দেয়। ভাই-ভাই যাতে ঠাঁই ঠাঁই না হয় আজ সরকারের সর্বাগ্রে তাই দেখা কর্তব্য। আর তা না হলে বাংলা সরকার যদি নিজেই সাম্প্রদায়িক দোষযুক্ত হয় তবে বাংলার হিন্দু-মুসলমান বাঙালী জাতির ধ্বংস অনিবার্য।[৬২] লক্ষণীয়, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে দেশবিভাগের তিন/চার মাস আগেও বাংলার বিধানসভার বিভিন্ন দলের সদস্যরা বাংলার ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপনের প্রচেষ্টা চালান। বিভক্ত ভারতে অবিভক্ত বাংলার আন্দোলন এই সময় যথেষ্ট শক্তিশালী হয় এবং এক সময় মনে হয় বঙ্গ-বিভাগ হয়ত এড়ানো সম্ভব।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও জটিল হতে থাকে। একদিকে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, অন্যদিকে নৌ-বিদ্রোহ, সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভ, শ্রমিক ধর্মঘট, আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচার ও গণবিক্ষোভের ফলে পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখা সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ৩ জুন ভারত বিভাগের ঘোষণা কংগ্রেস ও লীগকে মেনে নিতে হয়। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ নির্ধারিত হয়।

বিভাগ-পূর্ব বাংলার বিধানসভার শেষ কার্যকরী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ৯ মে ১৯৪৭। অধিবেশনের শেষে স্পিকার নুরুল আমিন সদস্যদের নিজ নিজ কেন্দ্রে গিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের প্রয়াস চালানোর আবেদন জানান এবং

আশা প্রকাশ করেন, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের বাতাবরণের মধ্যে বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশন শুরু হবে।[৬৩] সুরাবর্দীও সদস্যদের আশ্বাস দেন ১৫ জুলাই বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশন আহ্বান করা হবে। ২০ জুন, ১৯৪৭ বাংলার বিধানসভার পশ্চিমবঙ্গের সদস্যরা ৫৮-২১ ভোটে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ; পূর্ববঙ্গের সদস্যরা ১০৬-৩৫ ভোটে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পক্ষে মত দেন। সমাপ্তি অধিবেশনের আর প্রয়োজন হয় না, দীর্ঘ ঐতিহ্যসম্পন্ন অবিভক্ত বাংলার বিধানসভার আয়ুষ্কাল এভাবেই শেষ হয়।

দশম অধ্যায়

অখণ্ড বাংলা আন্দোলন : শরৎচন্দ্র বসু ও আবুল হাশিমের প্রয়াস

ভারত ও বঙ্গবিভাগ আসন্ন জেনেও "অখণ্ড সার্বভৌম সমাজবাদী" বাংলা গঠনের জোর তৎপরতা শুরু হয় ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে। এই আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্বে ছিলেন তিনজন—শরৎচন্দ্র বসু, মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম এবং বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন সুবাবর্দী। প্রথম দু'জন আন্তরিকভাবেই চেয়েছিলেন অখণ্ড সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলার অভ্যুদয়। তৃতীয় জন অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দীর কোন বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল না। কংগ্রেসের কাছে যেমন, তেমনি তাঁর নিজের দল মুসলিম লীগের কাছেও তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। ইংরেজ সরকার, দিল্লির বড়লাট ও বাংলার লাট বারোজও সুরাবর্দীকে বিশ্বাস করতেন না। অথচ এই সুরাবর্দীর উপরই ন্যস্ত ছিল অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রূপায়ণের দায়িত্ব। একসময় অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব গান্ধীজীর আশীর্বাদধন্য হয়। মহম্মদ আলি জিন্নাও এই পরিকল্পনা সমর্থন করেন এই ভেবে যে, স্বাধীন বাংলা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানেই যোগ দেবে। আর ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থ রক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার ও ব্রিটেনের সামরিক কর্তারা অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার পক্ষে জোর ওকালতি করেন। পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত অখণ্ড সার্বভৌম বঙ্গের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়। সাংবিধানিক রাজনীতি ও উপরের তলার নেতৃবৃন্দের মধ্যেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থেকে যায়। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ এই প্রস্তাবে উৎসাহ দেখায়নি। সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই এর বিরোধিতা করে। অমৃতবাজার পত্রিকা যে জনমত যাচাই করে, তাতে শতকরা ৯৮.৩ জন হিন্দু বঙ্গ-বিভাগের পক্ষে মত দেন।[১]

ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলার আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করেছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে কলকাতা বিহার, নোয়াখালি ও পাঞ্জাবের দাঙ্গার পর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে ক্রমশ এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দেশবিভাগ এড়ানো যাবে না। মুসলিম লীগ নেতারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন, পাকিস্তান হাতের মুঠোর মধ্যে। ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি জানান, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারগুলোর হাতেও ক্ষমতা হস্তান্তর হতে পারে বলে এটলির ঘোষণায় উল্লেখ থাকে। ৮ মার্চ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়, ভারত বিভক্ত হলে পাঞ্জাব বিভাগ অনিবার্যভাবে দেখা দেবে। বাংলা বিভাগের কোনও উল্লেখ অবশ্য এই

প্রস্তাবে রাখা হয় না, কিন্তু বড়লাট ওয়াভেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরু জানান, একই নীতিতে বাংলা বিভাগও অপরিহার্য বলে কংগ্রেস মনে করে। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনীও সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, কংগ্রেস বঙ্গবিভাগের পক্ষে। মুসলিম লীগ অবশ্য বাংলা ও পাঞ্জাব এই দুই প্রদেশেরই বিভাগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। জিন্না বড়লাটকে জানান, পোকায় কাটা পাকিস্তানে তাদের প্রয়োজন নেই।

ইতিমধ্যে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কর্তৃত্ব পেয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ২৪ মার্চ, ১৯৪৭ গভর্নর জেনারেলের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তিনি উদ্যোগী হন। সর্বস্তরের ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। প্রায় দেড়মাসে প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি মিলিয়ে ১৩৩টি সাক্ষাৎকার তিনি দেন। এপ্রিল মাসে প্রদেশপালদের সভায় মাউন্টব্যাটেন যে খসড়া পরিকল্পনা পেশ করেন, তাতে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের উল্লেখ থাকে। পাঞ্জাবের গভর্নর জেনকিন্‌স পাঞ্জাব ভাগের এবং অনুপস্থিত বাংলার গভর্নর বারোজের প্রতিনিধি জে এফ টাইসন বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। গান্ধীজী অবশ্য বরাবরই দেশবিভাগের বিরোধিতা করে আসছিলেন। বিভিন্ন প্রস্তাবও তিনি দেন। যেমন জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করুক, মুসলিম লীগ-কংগ্রেস কোয়ালিশন হোক ইত্যাদি ; কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতিতে তাঁর কোনও প্রস্তাবই কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কাছে গুরুত্ব পায় না। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা 'প্ল্যান বলকান' (যা রচনা করেছিলেন মাউন্টব্যাটেনের চীফ অব স্টাফ লর্ড ইসমে) ধরনের এক প্রস্তাব ভারত সরকারের কাছে পাঠায়। এর মধ্যে শুধু ভারত ও পাকিস্তান নয়, প্রদেশগুলির স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণার সংস্থান ছিল। ভারতসচিব লিস্টওয়েল মাউন্টব্যাটেনকে জানান, প্রত্যেকটি প্রদেশ স্বাধীনভাবে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করুক—ব্রিটিশ সরকারের তা কাম্য। সারা দেশকে এভাবে বিভক্ত করার পরিকল্পনায় তীব্র আপত্তি জানায় কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া নেহরু মাউন্টব্যাটেনের গোচরে আনেন। ফলে মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশে ভি পি মেনন যে সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরি করেন তাতে অবশ্য ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ভাগে ভারতকে বিভক্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়। বাংলার ক্ষেত্রে বলা হয় প্রাদেশিক আইনসভা যদি স্বতন্ত্র থাকার প্রস্তাব নেয় তা বিবেচনা করে দেখা হবে। এরপর বিলেতে মাউন্টব্যাটেনের উপস্থিতিতে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ভারতবিভাগ সংক্রান্ত যে চূড়ান্ত পরিকল্পনা স্থির করে তাতে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠনের প্রস্তাব পুরোপুরি নাকচ হয়ে যায়। মাউন্টব্যাটেন কিন্তু আশা ছাড়েননি। 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার' গ্রন্থে দেখানো হয়েছে কীভাবে মাউন্টব্যাটেন

বারবার অখণ্ড বাংলার পক্ষে ওকালতি করেন ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থরক্ষার জন্য। ৩ জুন, ১৯৪৭ ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত চূড়ান্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে মাউন্টব্যাটেনের বেতার বক্তৃতার জন্য দুই প্রস্থ বক্তৃতা তৈরি করে রাখা হয় গভর্নর জেনারেলের দপ্তর থেকে। এক প্রস্থ বাংলা অখণ্ড থেকে গেলে, অন্য প্রস্থ বাংলা বিভক্ত হলে। শেষ পর্যন্ত বেতার ভাষণে বঙ্গভঙ্গের কথাই মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করেন।[২]

শরৎচন্দ্র বসু ও বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃত্বের একাংশ কিন্তু অখণ্ড স্বাধীন বাংলা গঠনের পরিকল্পনা করে আসছিলেন অনেক দিন থেকেই। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের ভাষাগত ও ঐতিহ্যগত অভিন্নতা বাংলার রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এক অনন্য উপাদান এনে দিয়েছে বলে এঁরা বিশ্বাস করতেন। দেশ বিভাগের মুখোমুখি সময় তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে অখণ্ড বাংলা পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের বিষয়ে হিন্দু-মুসলিম নেতৃত্ব সক্রিয় হন। মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবের (১৯৪০) কাঠামোর মধ্যে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠনের সুযোগ আছে বলে আবুল হাশিম প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতারা প্রচার করতে থাকেন। লাহোর প্রস্তাবে ভারতে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস বা স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠনের উল্লেখ ছিল তাঁদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি। অবশ্য ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে নির্বাচনের পর মুসলিম লীগের নবনির্বাচিত বিধায়কদের সম্মেলনে জিন্না একটি মাত্র ও অখণ্ড পাকিস্তানের কথাই বলেন। আবুল হাশিম প্রতিবাদ করলে জিন্না বলেন, "স্টেটস" শব্দটির "এস" যুক্ত হয়েছে ছাপার ভুলে। শেষ পর্যন্ত জিন্নার প্রস্তাবই গৃহীত হয়। মুসলিম লীগের কাছে দুই পাকিস্তান অর্থাৎ স্বাধীন বাংলার কোনও অস্তিত্ব থাকে না। স্বাধীন বাংলা নিয়ে মুসলিম লীগের মধ্যে এই বিতর্ক কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা "পিপল্স এজ"-এ প্রকাশিত হয়।[৩] অবশ্য এর আগে ১৯৪৪ সালেই কেন্দ্রীয় মুসলিম নেতৃত্ব পরিষ্কার করে বলে দেন, লাহোর প্রস্তাব স্বতন্ত্র পূর্বপাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।[৪] এভাবে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলার দাবি বাতিল করে দিলেও বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃত্বের প্রভাবশালী কিন্তু সংখ্যায় অত্যল্প একটি গোষ্ঠী আবুল হাশিমের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলা গঠনের জন্য প্রয়াস চালাতে থাকেন। শরৎচন্দ্র বসু ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে অন্তর্বর্তী সরকার থেকে পদত্যাগের পর আবুল হাশিম ও শরৎচন্দ্র বসুর মধ্যে স্বাধীন বাংলা গঠন নিয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর সারা ভারত সম্মেলনে (৬ জানুয়ারি, ১৯৪৭) শরৎচন্দ্র বসু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করে স্ব-শাসিত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত করার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন।[৫] তাঁর মনে হয় এই স্ব-শাসিত অঞ্চলগুলিই স্ব-ইচ্ছায় ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সুভাষচন্দ্র এক সময় ভারতের ক্ষেত্রে সোভিয়েতের ইউনিয়ন রিপাবলিক ধাঁচের স্ব-শাসিত

ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছিলেন। কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার পর শরৎচন্দ্র বসু সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনেও উদ্যোগ নেন। আবুল হাশিমের সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর কথাবার্তাও হয়। সুরাবর্দীও এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখান, জিন্নার কাছে দরবারও করেন। বারোজকে তিনি কোয়ালিশনের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে বলেন।

বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্ব অখণ্ড স্বাধীন বাংলা সম্বন্ধে বরাবরই সন্দিগ্ধ ছিলেন। ৪ এপ্রিল, ১৯৪৭ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কে. সি. নিয়োগী প্রমুখ নেতা বিশেষ আমন্ত্রণ ক্রমে উপস্থিত থাকেন। এই সভায় সুরাবর্দী-সরকারকে সাম্প্রদায়িক সরকার বলে অভিহিত করে দাবি করা হয়, ভারত বিভক্ত হলে বাংলার যেসব জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তাদের সে সুযোগ দিতে হবে। ভারত অখণ্ড থাকলেই অখণ্ড বাংলা সম্ভব বলে কংগ্রেস মনে করে। বাধ্য হয়েই যে কংগ্রেস কর্মীরা বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব নেন তা প্রকাশ পায় তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের কথায়, "চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে আমরা এই বঙ্গবিভাগের সময়ই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করি। আজ যখন আমরা বাংলাকেই ভাগ করিবার প্রস্তাব সমর্থন করি তখন তা আমাদের খুব সুখের বিষয় বলিয়া মনে হয় না।"[৬] হিন্দুমহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও অনুরূপ দাবি করে প্রবল আন্দোলন শুরু করার উদ্যোগ নেন। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হলে বাংলার হিন্দু-প্রধান অঞ্চল নিয়ে পৃথক প্রদেশ গঠনের নির্দিষ্ট কর্মসূচী বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার তারকেশ্বর সম্মেলনে গৃহীত হয়। বস্তুত বাংলা বিভাগের পক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা অনেক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচার ও আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বিধানচন্দ্র রায় মিলিতভাবে দিল্লিতে ঐক্যবদ্ধ বাংলার বিরুদ্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানান। গণপরিষদের ১১ জন কংগ্রেস সদস্য ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ নিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে পৃথক প্রদেশ গঠনের দাবি জানান। ভারতীয় শিল্পপতিরাও অবিভক্ত বাংলার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন। ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভায় কলকাতাসহ হিন্দুপ্রধান অঞ্চল নিয়ে আলাদা প্রদেশ গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তা বাস্তবায়িত করতে বি. এম. বিড়লা, বি. এল. জালান, বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা ও বাঙালী শিল্পপতিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, মেঘনাদ সাহা, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা ৭ মে ভারতসচিবের কাছে এক তারবার্তায় পৃথক প্রদেশ গঠনের দাবি জানান।[৭]

মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বৃহত্তর ও শক্তিশালী অংশ স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। এদের মধ্যে লীগ সভাপতি আক্রম খাঁ এবং তাঁর পরিচালিত দৈনিক "আজাদ', নাজিমুদ্দিন সহ খাজা পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত "মর্নিং নিউজ" বৃহত্তর বঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। "মুসলমানের জাতিত্বের ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়া কোনও কোনও লীগ নেতার মুখে বাঙালীর অখণ্ড জাতিত্বের মহিমা" প্রচারে "আজাদ" খুবই বিক্ষুব্ধ হয়।[৮] "যাঁহারা হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত একটি বাঙালী জাতির উপর ভিত্তি করিয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের আন্দোলন শুরু করিয়াছেন, তাঁহাদের মুসলিম জনগণের শত্রু বলিয়া আক্রম খাঁ অভিহিত করেন।"[৯] স্পষ্টতই আক্রম খাঁ ও আজাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল আবুল হাশিম। মুসলিম ছাত্র ও যুবনেতাদেরও অবস্থান ছিল পরস্পরবিরোধী। সংবাদপত্রে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে কেউ কেউ সমর্থন করেছিলেন সার্বভৌম বাংলার আন্দোলন। আবার অন্যরা অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাব লাহোর প্রস্তাব-বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেন। বদরুদ্দিন উমর লিখেছেন, "এ সময় সাপ্তাহিক মিলাত পত্রিকায় পর পর অনেক সম্পাদকীয় অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার পক্ষে প্রকাশিত হয়।" এছাড়া বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধও এই সময় এ বিষয়ে সাপ্তাহিক "মিলাত" পত্রিকা প্রকাশ করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, কলকাতা মুসলিম ছাত্র লীগের নেতা নূরুদ্দীন আহমদের "বাঙালী যুবসম্প্রদায় বাংলায় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবে" (৯ মে, ১৯৪৭), কলকাতা ছাত্র লীগের নেতা শরফউদ্দীনের "স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের নেতৃত্বে ইতিহাসের পাতায় যেন দেওলিয়া প্রমাণিত না হয়" (৩০ মে, ১৯৪৭) ও আলতাফুন্নেসা সোলারমানের "লর্ড কার্জনের প্রেতাত্মা বঙ্গভঙ্গের দাবিদারদের গর্দানে আজ সওয়ার হয়েছে" (২৫ মে, ১৯৪৭)।[১০]

মনে রাখা দরকার, ১৯৩৭ সালে বাংলায় মুসলিম লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র হিন্দু-মুসলিম প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়াস চালাচ্ছিলেন। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র এ বিষয়ে গান্ধীজীর সম্মতিও আদায় করেন, কিন্তু পরে মৌলানা আজাদ, নলিনীরঞ্জন সরকার ও ঘনশ্যাম বিড়লার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর গান্ধীজী তাঁর মত পরিবর্তন করেন, এতে সুভাষচন্দ্র বসু ক্ষুব্ধ হন। প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় মূলত শরৎচন্দ্র বসু ও ফজলুল হকের উদ্যোগে। শরৎচন্দ্র বসু কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গার পরও ১৯৪৭-এর জানুয়ারি মাসে বাংলায় নতুন এক মন্ত্রিসভা গঠন ও বাংলার জন্য স্বতন্ত্র সংবিধান রচনার পরিকল্পনা করেন।[১১] বঙ্গবিভাগের পক্ষে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে যে প্রচার শুরু করেন, শরৎচন্দ্র তার প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, কংগ্রেসের প্রস্তাব কার্যকর হলে

ভারতবর্ষ বেশ ক'টি ধর্মীয় রাষ্ট্রে বিভক্ত হবে।[১২]

১৯৪৭-এর মার্চ থেকে কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে বঙ্গবিভাগের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রায় প্রতিদিনই বক্তৃতা, বিবৃতি প্রকাশিত হতে থাকে। ঐ সময় মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দীও অখণ্ড স্বাধীন বাংলার দাবি সমর্থন করতে থাকেন। ১৩ মার্চ বিধান পরিষদকে জানান, বাংলার ভবিষ্যৎ সংবিধান কী হবে তা তিনি জানেন না, কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলার অভ্যুদয় আসন্ন। এরপর তিনি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলার দাবিকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানান ৮ এপ্রিল এক বিবৃতি মারফত। বরাবরই যে তিনি ঐক্যবদ্ধ ও বৃহত্তর বঙ্গের দাবি করে আসছেন এ বিবৃতিতে তিনি তা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেন। বড়লাটের সঙ্গে সুরাবর্দীর সাক্ষাৎকার হয় ২৬ এপ্রিল এবং অবিভক্ত বাংলা যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের স্বার্থরক্ষায় সক্ষম হবে এ বিষয়ে তাঁর স্থির বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। বড়লাটকে তিনি নিশ্চয়তা দেন অবিভক্ত বাংলায় ব্রিটিশ পুঁজি নিরাপদ থাকবে এবং বাংলা কমনওয়েলথেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। ঐ দিন মাউন্টব্যাটেন জিন্নার মতামত জানতে চাইলে জিন্না কলকাতাকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানের যে অংশ বাংলায় পড়বে তার কোনও গুরুত্বই থাকবে না বলে মত প্রকাশ করেন এবং ঐক্যবদ্ধ বাংলার দাবিতে সায় দেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ঐক্যবদ্ধ বাংলা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানেই যোগ দেবে। ২৭ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুরাবর্দী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন মোটেই জনসমর্থন লাভ করেনি। ১৯৪১ সালের আদমসুমারির হিসেবের উল্লেখ করে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বাংলা বিভাগের পরিকল্পনা যে জনগণের মৌলস্বার্থের বিরোধী সুরাবর্দী তা প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং বলেন, "বাংলাকে যদি আমরা অবিভক্ত রাখিতে পারি এবং উহাকে বড় করিয়া তুলিবার নিমিত্ত সমবেতভাবে প্রয়াস পাই তাহা হইলে সিংভূম, মানভূম, সম্ভবত পূর্ণিয়া জেলা ও বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইতে চাইবে এবং সুরমা উপত্যকা ও আসাম বাংলায় যোগ দেবে। এইভাবে বাংলার আয়তন বৃদ্ধি হইলে সেই বাংলা যে-কোনো দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। এই কারণে আমি বরাবর বাংলাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে কল্পনা করিয়া আসিয়াছি, ভারতের কোনো ইউনিয়নের অংশ বলিয়া কল্পনা করি নাই"। স্বাধীন বাংলা পাকিস্তানে যোগ দেবে কিনা এ প্রশ্ন করলে সুরাবর্দী বলেন, "এ বিষয়ে আমার কোনো কিছু বলা চলে না।" ঐ মুহূর্তে সার্বভৌম বাংলার সপক্ষে পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাস বর্জন করতে তিনি প্রস্তুত আছেন কি না জানতে চাইলে সুরাবর্দী কিছু বলতে অস্বীকার করেন।[১৩] পাকিস্তানে যোগদান সম্বন্ধে আগাগোড়াই সুরাবর্দী অস্পষ্ট থেকে যান।

সুরাবর্দী কলকাতায় ফিরে শরৎ বসু, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা নিয়ে অলোচনা করেন। ২৯ এপ্রিল কলকাতার কাগজগুলোতে আবুল

হাশিমের দীর্ঘ বিবৃতি ছাপা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের দেশপ্রেমের উল্লেখ করে হাশিম বলেন, "বাংলাকে হীনতাবোধ ও পরাজিত মনোভাব পরিহার করিয়া অতীত ঐতিহ্য পুনরানুসরণ করিতে হইবে এবং প্রতিভার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া নিজের ভাগ্য নির্ধারিত করিতে হইবে।" ঐক্যবদ্ধ বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য বহির্ভারতীয় ও ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিকে হাশিম দায়ী করেন বেশি করে। "আমাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শোষকগণ তাহাদের সম্পত্তিচ্যুত হইবার ভয়ে ভীত হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীন ও সম্মিলিত বাংলায় তাহাদের যে কি অসুবিধা হইবে সেকথা কল্পনা করিবার বুদ্ধি তাহাদের আছে। বিদেশী পুঁজিপতিরা তাহাদের নিজেদের স্বার্থের জন্যই চায় যে বাংলা বিভক্ত, পঙ্গু ও শক্তিহীন হইয়া পড়ুক ; কেননা তাহা হইলে বিদেশীদের প্রতিরোধ করার মত শক্তি কাহারও থাকিবে না।" বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে আক্রমণের পাশাপাশি হাশিম প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার সমর্থন করেন।[১৪]

এরপর অখণ্ড বাংলার পরিকল্পনা নিয়ে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশংকর রায়, সত্যরঞ্জন বকসি প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের কয়েক দফা আলোচনা হয়। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে সুরাবর্দী, আবুল হাশিম ছাড়া মহম্মদ আলি, ফজলুর রহমান প্রমুখ মন্ত্রীরা আলোচনায় উপস্থিত থাকেন। খাজা নাজিমুদ্দিনও একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। নাজিমুদ্দিন ঐ সময় স্বাধীন অখণ্ড বাংলার পক্ষে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন কিন্তু অচিরেই তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে বঙ্গ বিভাগের দাবিকেই সমর্থন করতে থাকেন। মুসলিম নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে শরৎচন্দ্র স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার একটি খসড়া পরিকল্পনাও তৈরি করেন। এতে বলা হয়, "সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক" বাংলা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভিত্তি হবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা। ৪ জন হিন্দু ও ৪ জন মুসলমান নিয়ে একটি অন্তবর্তী সরকার গঠিত হবে এবং এই সরকারের কাছে ইংরেজরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। এরপর একটি সংবিধান প্রণয়নকারী পরিষদ গঠিত হবে এবং ভারত না পাকিস্তান কোন্ রাষ্ট্রে যোগ দেবে তা স্থির করবে স্বাধীন বাংলা। ৯ মে শরৎচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে সোদপুরে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলার হিন্দু-মুসলমানের অভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় অনুজ্ঞা বহির্ভূত দীর্ঘ ঐতিহ্যের উল্লেখ করে খসড়ার বাস্তব রূপায়ণের বিষয়ে আলোচনা করেন। গান্ধীজী ঐক্যবদ্ধ বাংলার প্রস্তাবে উৎসাহ দেখান এবং সোদপুরে কয়েকবার আবুল হাশিম, সুরাবর্দী, মহম্মদ আলি প্রমুখ লীগ নেতারা তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেন। গান্ধীজীর সচিব প্যারেলাল "মহাত্মা গান্ধী : দ্য লাস্ট ফেজ", দ্বিতীয় খণ্ডে সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় মুসলিম নেতারা

সাধারণ ভাষা, সাধারণ সংস্কৃতি এবং সাধারণ ইতিহাস যা হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেছে তার উপর গুরুত্ব দেন। তারা গান্ধীজীকে বোঝান, বাঙালী একই জাতি, এক ভাষাভাষী, বহু বিষয়ে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিল রয়েছে। তারা পরস্পরকে অনুধাবন করতে পারে ইত্যাদি।[১৫] গান্ধীজী ঐক্যবদ্ধ বাংলার প্রস্তাব সমর্থন করেন। কারণ, তাঁর মনে হয় এই মূলনীতি মেনে নিলে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিই নস্যাৎ হবে, ভারত বিভাগ হয়ত পরিহার করা সম্ভব হবে।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অখিলচন্দ্র দত্ত বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে ঐক্যবদ্ধ বাংলার আন্দোলন সমর্থন করেন। গান্ধীজীকে লেখা এক পত্রে অখিল দত্ত বলেন, "জীবনের শুরুতে কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আমাকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে জীবন-সায়াহ্নে আমার স্বজাতীয়দের উদ্যোগে বাংলাকে বিভক্ত করার যে প্রয়াস চলছে তার বিরুদ্ধে আমাকে দাঁড়াতে হচ্ছে। আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার মতামত ব্যক্ত করে যথাযথ নেতৃত্ব দিয়ে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালিত করুন।"[১৬] সর্দার প্যাটেলকে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অখিল দত্ত বলেন, বঙ্গ বিভাগ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সব দিক থেকেই অবাঞ্ছিত। পরাজিত মনোভাব থেকেই এর উৎপত্তি ; সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের এটা ভুল পথ।[১৭]

ঐক্যবদ্ধ বাংলার বিরুদ্ধে আন্দোলনও ততদিনে বেশ প্রসারিত হয়েছে। মুসলিম লীগ নেতারা যখন গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কথাবার্তা বলেন, সেই স্তরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সার্বভৌম বাংলা সম্বন্ধে তাঁর তীব্র বিরোধিতা জানান। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলা স্বীকৃতি পেলে বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে সুরাবর্দী বাংলাকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করবেন বলে শ্যামাপ্রসাদ গান্ধীজীকে সতর্ক করে দেন। গান্ধীজী অবশ্য তাঁকে নিশ্চয়তা দেন, সিদ্ধান্ত সংখ্যাগুরুর ভোটে গৃহীত হবে না, দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন পেলেই তা কার্যকর হবে।

২০ মে শরৎচন্দ্র বসুর বাসভবনে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের অনুমোদন সাপেক্ষে সার্বভৌম অখণ্ড বাংলার এক দলিল গৃহীত হয় এবং এতে স্বাক্ষর করেন কংগ্রেসের পক্ষে শরৎচন্দ্র বসু ও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে আবুল হাশিম। অনেকটা শরৎচন্দ্র বসুর পূর্বেকার প্রস্তাবের ছকে রচিত দলিলটির প্রধান শর্ত হলো :

(১) বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হবে। ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে স্বাধীন বাংলা।

(২) যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য

আসন সংরক্ষিত থাকবে বর্ণহিন্দু ও তফসিলী সম্প্রদায়ের আসন তাদের জনসংখ্যার হার অনুপাতে অথবা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে বণ্টন করা হবে। যে প্রার্থী তাঁর সম্প্রদায়ের প্রদত্ত অধিকাংশ ভোট এবং অন্য সম্প্রদায়ের অন্তত পঁচিশ শতাংশ ভোট পাবেন তাকেই নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হবে। যদি কোনও প্রার্থী এসব শর্ত পূরণ করতে না পারেন তবে যিনি নিজ সম্প্রদায়ের সর্বাধিক ভোট পাবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন।

(৩) ব্রিটিশ সরকার স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের প্রস্তাব গ্রহণ করলে এবং বাংলাকে বিভক্ত করা হবে না এই মর্মে ঘোষণা করলে বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হবে এবং অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে সমান সংখ্যক মুসলিম ও হিন্দু সদস্য নিয়ে (তফসিলী হিন্দু সহ) একটি অন্তর্বর্তী মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হবে। এই মন্ত্রীপরিষদে মুখ্যমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন একজন হিন্দু।

(৪) নতুন সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন বাংলার আইনসভা ও মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানের চাকুরিতে সমান অংশ (৫০:৫০) ও অধিকার থাকবে। মিলিটারি ও পুলিশ বিভাগের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকবে। সকল চাকুরিতে কেবলমাত্র বাঙালীরাই নিযুক্ত হবেন।

(৫) সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠিত হবে ১৬ জন মুসলিম ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য নিয়ে। ইউরোপীয়দের বাদ দেওয়া হবে। বর্তমান আইনসভার হিন্দু ও মুসলমান সদস্যরা গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন করবেন। ইউরোপীয় বিধায়কদের কোন ভোট থাকবে না।[১৮]

২৩ মে গান্ধীজীর অনুমোদনের জন্য দলিলটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে শরৎচন্দ্র আশা প্রকাশ করেন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় সংগঠনই দলিলের পক্ষে ঐকমত্য হবে। গান্ধীজীর সাহায্য, নির্দেশ ও উপদেশে এই চুক্তিটি বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব বলে তিনি তাঁর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

গান্ধীজী ২৪ মে শরৎ বসুকে জানান, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কিছু করা যাবে না। আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য সিদ্ধান্তে আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন থাকতে হবে। দলিলে সাধারণ সংস্কৃতি ও মাতৃভাষা হিসেবে বাংলার বিশেষ উল্লেখ থাকা উচিত বলে গান্ধীজী মনে করেন। ২৬ মে শরৎ বসু এক পত্রে গান্ধীজীকে জানান, প্রায় প্রতিদিনই শর্তগুলো নিয়ে মুসলিম লীগ নেতা ও বিধায়কদের সঙ্গে তিনি, কিরণশংকর রায় ও অন্যান্যরা আলোচনা করছেন। শীঘ্রই গান্ধীজীর সুপারিশ দলিলে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হবেন বলে তাঁরা আশা করেন।[১৯] গান্ধীজীর আপত্তির কথা মনে রেখে আবুল হাশিম ও শরৎ বসুর উদ্যোগে দলিলের প্রথম অনুচ্ছেদ সংশোধিত

হয়। সংশোধনীতে বলা হয়, "কোনো ইউনিয়নে যোগদানের প্রশ্নে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের বিধানসভায় দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যা গরিষ্ঠতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।" তবে পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয়, সুরাবর্দী বা মুসলিম লীগকে এই সংশোধনীতে রাজি করানো যায়নি।[২০]

অবশ্য ইতিমধ্যে ভারত ও বঙ্গ বিভাগ অনুমোদন সম্পর্কে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নেয়। জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল সহ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব সক্রিয়ভাবে স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রস্তাব বিরোধিতা করেন। মহাত্মা গান্ধীকে এঁরা সতর্ক করে দেন, বৃহত্তর বঙ্গ গঠনের ব্যাপারে তিনি যেন নিজেকে যুক্ত না রাখেন। কিরণশংকর রায়ও সর্দার প্যাটেলের নির্দেশে ঐক্যবদ্ধ বাংলার আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান। শরৎচন্দ্র বসুকেও প্যাটেল অনুরোধ করেন ঐক্যবদ্ধ বাংলার আন্দোলনে নেতৃত্বে দিয়ে তিনি যেন সর্বভারতীয় রাজনীতি ও প্রাদেশিক রাজনীতিতে নিজেকে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন না করেন। শরৎ বসু অবশ্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভাকে দেশবিভাগ বিষয়ে সমর্থন করার অভিযোগ আনেন এবং বলেন ভবিষ্যৎ বংশধররা দেশবিভাগ এবং বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের জন্য আমাদেরই দায়ী করবে।[২১] ২৮ মে জওহরলাল নেহরু জানান কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ বাংলা সমর্থন করতে পারেন যদি বাংলা ভারতীয় ইউনিয়নে থাকে। ঐ দিনই প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় স্বাধীন বাংলা চুক্তির সঙ্গে মুসলিম লীগের কোন সম্পর্ক নেই। কমিটি দৃঢ়ভাবে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন জানায়। স্বাধীন বঙ্গের নাম হবে "আজাদ পাকিস্তান", মুসলিম লীগ নেতারা তা প্রচার করতে থাকেন। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সালেরে সুবা মনে করেন, সতেরো জন মুসলিম যদি বঙ্গ বিজয় করতে পারেন, তবে কয়েক কোটি মুসলিম বাংলাকে সহজেই নিজেদের অধিকারে রাখতে পারবে।[২২]

এদিকে কলকাতাকে মুক্ত নগরী হিসেবে ঘোষণা করার প্রচেষ্টা বাংলার গভর্নর বারোজ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যান কিন্তু কংগ্রেসের আপত্তি এবং মাউন্টব্যাটেন গররাজি থাকায় এই প্রস্তাব আর এগোয়নি।

৩ জুন ভারত বিভাগ সম্পর্কিত মাউন্টব্যাটেনের বেতার ঘোষণার পরও শরৎচন্দ্র বসু ও আবুল হাশিম তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ৯ জুন লীগ কাউন্সিলের দিল্লি অধিবেশনে জিন্না মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সদস্যদের বলেন, "হয় মাউন্টব্যাটেনের রোয়েদাদ সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে হবে ; নয়তো সম্পূর্ণভাবে নাকচ করতে হবে।" মৌলানা হযরত মোহনী ও আবুল হাশিমকে সভায় বক্তব্য রাখারও তিনি অনুমতি দেন না। সভার বিবরণ দিয়ে আবুল হাশিম লিখছেন, হাত উঠিয়ে ভোট নেওয়া হলো। সুহরাওয়ার্দী ভোট গণনা করে বিজয়ীর সুরে

বললেন, "কায়েদে আজম", কেবলমাত্র এগারোজন আমাদের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করেছেন।"[২৩] সুরাবর্দী ঐ দিন সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, "ঢাকা এখন পাকিস্তানে।" এভাবেই জিন্না একসময় যাকে ছিন্নভিন্ন পোকায় কাটা পাকিস্তান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, সেই পাকিস্তানই শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও ১৪ জুনের অধিবেশনে ভারত, বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভাগে সম্মত হয়।

বাংলাকে অখণ্ড রাখার শেষ চেষ্টা করেন শরৎচন্দ্র বসু জিন্নার নিকট লিখিত তাঁর ৯ জুন পত্রে। জিন্নাকে তিনি অনুরোধ করেন, ৩ জুন ঘোষণা অনুযায়ী ইউরোপীয়ানদের বাদ দিয়ে অবিভক্ত বিধানসভার যে অধিবেশন হবে তাতে মুসলমান বিধায়করা যাতে অবিভক্ত বাংলার পক্ষে ভোট দেন, সে বিষয়ে জিন্না যেন লীগ সদস্যদের স্পষ্ট নির্দেশ দেন। উভয় অংশের সদস্যদের পৃথক বৈঠকেও মুসলিম লীগ সদস্যরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যাতে ভোট দেন সেরূপ ব্যবস্থা নিতে শরৎ বসু জিন্নার কাছে আবেদন জানান। স্বভাবতই জিন্নার পক্ষে এই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। তিনি মুসলিম বিধায়কদের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এবং অখণ্ড অবিভক্ত কিন্তু পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বাংলার পক্ষেই ভোট দিতে নির্দেশ দেন।

২৯ জুন অবিভক্ত বিধানসভার অধিবেশনে মুসলিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় বাংলাকে অবিভক্ত রাখার ও পাকিস্তানের যোগদানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই যৌথ অধিবেশন শেষ হওয়ার পরই বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সদস্যরা দুটি পৃথক সভায় মিলিত হন। পূর্ববঙ্গের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়করা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে ভোট দেন। পশ্চিমবঙ্গের সদস্যরা বঙ্গভঙ্গ ও ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের পক্ষে ভোট দেন। পূর্ববঙ্গের সভায় সভাপতিত্ব করেন নুরুল আমিন এবং পশ্চিমবঙ্গের সভা অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাবের সভাপতিত্বে। দেশভাগের আগেই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত বৈধতা পায়।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়, কমিউনিস্ট পার্টিও ঐক্যবদ্ধ বাংলার আন্দোলন সমর্থন করেছিল। অধিকারী থিসিসের সমালোচনায় কমিউনিস্টদের আক্রমণ করা হয় কিন্তু ভারত ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির যুক্তিনিষ্ঠ প্রস্তাবের স্বীকৃতি ইতিহাসবিদ্‌দের লেখায় পাওয়া যায় না। গান্ধীজী, শরৎচন্দ্র বসু ও লীগ নেতাদের আলোচনার সফল পরিণতি আশা করে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশি ও প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক ভবানী সেন এক যুক্ত বিবৃতি দেন। তাঁদের মনে হয় স্বাধীন বাংলা গঠন সম্ভব যদি কংগ্রেস ও লীগ নেতারা ন্যূনতম কয়েকটি বিষয়ে একমত হতে পারেন। এই বিষয়গুলো হলো : "সার্বজনীন ভোট, যুক্ত নির্বাচন প্রথা, জমিদারি প্রথার অবসান, বিদেশী মূলধনকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা,

ভারতের সঙ্গে বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক স্থির করার জন্য গণভোট, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংযুক্ত ফ্রন্ট বা মোর্চা এবং সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন"। তারা এ আশঙ্কাও প্রকাশ করেন, এই শর্তগুলোর ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ আপস না হলে বাংলা স্বাধীন হলেও কার্যত "সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের" অধীনেই থাকবে।[২৪] এর আগে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের কাছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে স্বেচ্ছামূলক ভারতীয় ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব করে। কমিউনিস্ট পার্টির মনে হয়, একমাত্র এভাবেই মুসলমানদের মন থেকে হিন্দু প্রভুত্বের আশঙ্কা দূর করা যেতে পারে। ফলে জিন্নার পাকিস্তান প্রস্তাবের বৈধতা অনেকাংশে স্তিমিত হবে বলে কমিউনিস্টরা আশা করেন। ভবানী সেন ১৯৪৭ সালের মে মাসে লেখেন, "পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারসহ স্বেচ্ছামূলক ভারতীয় ইউনিয়নের সপক্ষে কংগ্রেস যদি তাহার সমগ্র শক্তি নিযুক্ত করিয়া আন্দোলনে অগ্রসর হয়, তবে কংগ্রেস কৃষক-মজুরদের সমবেত প্রতিরোধের সাহায্যে সাম্প্রদায়িকতা বিদূরিত করিয়া হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া সর্বভারতীয় ইউনিয়ন স্থাপন করিতে এখনও পারে।" আসামের শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার সমতলভূমি, বিহারের মানভূম জেলা, ধলভূম মহকুমা ও পূর্ণিয়া জেলার বৃহদাঞ্চল নিয়ে "পূর্ণ বঙ্গ" গঠনের প্রস্তাবও করা হয় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে। পূর্ণবঙ্গের সাতকোটি অধিবাসীর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান-সমান হওয়ার ফলে "হিন্দু বা মুসলমান কাহারো তথাকথিত কোন জবরদস্তিসুলভ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এই বঙ্গে থাকিবে না।" পূর্ণবঙ্গের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীল নকসাও কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ করে। পরিশেষে বলা হয়, "আমাদের বিশ্বাস, এই পথ অবলম্বন করিলে পূর্ণ বাংলার জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের ভিতর স্বেচ্ছায় যোগদান করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে পারিবে। স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ইহাই একমাত্র পথ।"[২৫] কমিউনিস্টরা বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য সক্রিয় আন্দোলনও সংগঠিত করেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবিভক্ত বাংলার বার অ্যাসোসিয়েশন ও পৌরসভায় বঙ্গ বিভাগের সপক্ষে প্রস্তাব পাস করানোর চেষ্টা হলে কমিউনিস্টরা অখণ্ড বাংলার পক্ষে বিকল্প প্রস্তাব রাখেন।[২৬] সংখ্যালঘিষ্ঠতার জন্য স্বভাবতই তাদের প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায় এবং ভারত ও বঙ্গ বিভাগের সপক্ষেই প্রস্তাব পাস হয়। কমিউনিস্টদের স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবের যথেষ্ট বাস্তব ভিত্তি ছিল, কিন্তু মুসলিম লীগ, কংগ্রেস এমনকি শরৎচন্দ্র বসুর কাছেও তা যথাযথ মর্যাদা পায় নি।

বহুবিধ কারণেই অখণ্ড স্বাধীন বাংলার আন্দোলন ব্যর্থ হয়। ঔপনিবেশিক কাঠামোয় প্রায় তিনি দশকের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ক এমন এক স্তরে

নিয়ে যায়, যার ফলে স্বাধীনতার প্রাক্কালে নেতৃবৃন্দের মনে হয় দেশবিভাগই সমাধানের একমাত্র পথ। ইংরেজ বাণিজ্যিক স্বার্থের ইন্ধন, (শরৎ বসু কয়েকবার অভিযোগ করেন, বাংলার জনগণের ভাগ্য নির্ধারিত হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট ক্লাইভ স্ট্রিটের কয়েকজন বণিক ও বিধায়কদের দ্বারা) বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের বেশ কিছু ভুল এবং মুসলিম লীগের গোঁড়ামি হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও হিংসা ক্রমশ প্রসারিত করে। কলকাতার হত্যালীলার পরে নোয়াখালি ও বিহারের দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৭-র পর নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও কংগ্রেস নেতাদের মনে হয় দেশবিভাগ আর পরিহার করা যাবে না। স্বভাবতই এই পরিস্থিতিতে ১৩ আগস্ট, ১৯৪৭ মাত্র কয়েমাস আগে পরিকল্পিত ঐক্যবদ্ধ বাংলার আন্দোলন জনমানসে কোন রেখাপাত করতে পারেনি। উপরতলার নেতৃবৃন্দের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থেকে যায়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের কোনোটিরই সমর্থন অখণ্ড বাংলার আন্দোলনের প্রতি ছিল না। গভর্নর বারোজ মাউন্টব্যাটেনকে জানান, হিন্দু মহাসভার তারকেশ্বর সম্মেলনে বঙ্গ বিভাগের পক্ষে এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি ও শরৎ বসুর ফরওয়ার্ড ব্লক ছাড়া অন্য কোনও দল এই ঐক্যবদ্ধ বাংলার আন্দোলন সমর্থন করেনি। সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস কোনসময়ই এই আন্দোলনকে স্বীকৃতি দেয়নি। কংগ্রেস মনে করতো এই আন্দোলন একটি ফাঁদ যার ফলে জিন্নার উদ্দেশ্যই সফল হবে। শরৎ বসু ও কয়েকজন মাত্র কংগ্রেসকর্মী ব্যক্তিগতভাবে এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। মুসলিম লীগ আলোচনার স্তরে একটি সাবকমিটি গঠন করে, কিন্তু পরে তা প্রত্যাহার করে নেয়। একমাত্র শরৎ বসু এবং আবুল হাশিম ছাড়া অখণ্ড স্বাধীন বাংলার সমর্থক রাজনৈতিক নেতারাও নিজেদের মধ্যে লাভ লোকসানের কথা ভেবেই একসময় আন্দোলন সমর্থন করেও পিছিয়ে আসেন। জিন্না, সুরাবর্দী ও মাউন্টব্যাটেনকে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলা আন্দোলনে তাঁর সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছিলেন। জুন মাসে শরৎ বসু যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন তখনও জিন্না বলেন, স্বাধীন বাংলাই সিদ্ধান্ত নেবে ভারত না পাকিস্তানে সে যোগ দেবে। কিন্তু কয়েকদিন পর নিজেই তিনি মুসলিম লীগ কাউন্সিলে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব আনেন। সভায় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনও বক্তব্য রাখতে দেন না। জিন্না বরাবরই চাইছিলেন স্বাধীন বাংলা পাকিস্তানে যোগ দিক ; যখন বুঝেছেন তার সম্ভাবনা নেই তখন তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসেন। গভর্নর বারোজের মাধ্যমে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিনিধিরাও ঐক্যবদ্ধ বাংলার জন্য ওকালতি করেন। বারোজ যখন দেখেন বঙ্গবিভাগ অবধারিত, তখন তিনি কলকাতাকে মুক্ত নগরী ঘোষণা করার জন্য মাউন্টব্যাটেনের কাছে দরবার করেন। মাউন্টব্যাটেনও 'সোভারেন বেঙ্গল'—

এর জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যান। একসময় তিনি প্রস্তাব দেন, বারোজ যেন জুট মিল (যার অধিকাংশের মালিকানা ছিল ইংরেজদের হাতে এবং যেগুলো ডাণ্ডি থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো) কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দেন যাতে তারা পূর্ববঙ্গে তাদের মিলের যন্ত্রপাতি সরিয়ে নেন। ৩ জুনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার বিধায়করা ঐকমত্য হয়ে অখণ্ড বাংলা চাইলে এবং গভর্নর বারোজ তা সুপারিশ করলে তিনি ভেবে দেখবেন বলে শেষ মুহূর্তেও সুরাবর্দীকে আশ্বাস দেন। সবচেয়ে বিতর্কিত ভূমিকা ছিল সুরাবর্দীর। পাকিস্তান ছিল তাঁর 'প্যাশন', আবেগ, আসক্তি। অনেকটা নিজের রাজনৈতিক সত্তা বজায় রাখার জন্য তিনি সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাব সমর্থন করেন, কারণ সুরাবর্দী ভালভাবেই জানতেন, পূর্বপাকিস্তানের রাজনীতিতে নাজিমুদ্দিনের প্রাধান্য থাকবে ; আর পাকিস্তানী রাজনীতিতে জিন্নাও তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দেবেন না। ৯ জুন লীগ-কাউন্সিল বৈঠকের আগে বাংলার মুসলিম লীগ সদস্যরা সুরাবর্দীর বাসভবনে মিলিত হয়ে মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের বিরুদ্ধাচরণ করবেন বলে স্থির করেন। দু'দিন পর দিল্লি পৌঁছে এই সুরাবর্দীই বাংলার প্রতিনিধিদের বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাব সমর্থনের জন্য প্ররোচিত করেন। আবুল হাশিম স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিলেন, "স্বাধীন বঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের স্ব-স্ব ধর্মীয় ব্যাপারে ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে কোনোপ্রকার স্বতন্ত্র অধিকার সংরক্ষিত থাকবে না।" সুরাবর্দীর পক্ষ থেকে কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্ব অস্বীকার করে হিন্দুদের আশ্বস্ত করার মত কোন বক্তব্য আসেনি। তাছাড়া বাঙালী মানসিকতা সুরাবর্দীর মধ্যে একান্তভাবে অনুপস্থিত ছিল যা স্পষ্ট ছিল ফজলুল হক, আবুল হাশিম প্রমুখ অগণিত মুসলিম নেতাদের মধ্যে। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ, আর বাংলার ক্ষেত্রে ভাষা ও সাংস্কৃতিক দোহাই দিয়ে অখণ্ড বাংলা পরস্পর বিরোধী এই যুক্তি স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুদের মনেও কোনও উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেনি। আর মুসলিম জনমত তো ছিল পুরোপুরি লীগের নির্দেশের মুখাপেক্ষী। শরৎ বসু অবশ্য শেষ পর্যন্ত অখণ্ড বাংলা সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে ১৪ জুন গান্ধীজীকে লেখেন, যদি গণভোট নেওয়া হতো, তাহলে বাংলার হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধেই ভোট দিতেন। দেশবিভাগ পূর্ব-পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে এ প্রত্যয়ের কোন ভিত্তি ছিল না।

একাদশ অধ্যায়

ঔপনিবেশিক কাঠামোয় স্বাধীন ভারতে বিধানসভা (১৯৪৭-১৯৫১)

অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভক্ত কংগ্রেস

স্বাধীন ভারতের অভ্যুদয়কে স্বাগত জানিয়ে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর বিখ্যাত 'ট্রায়েস্ট উইথ ডেস্টিনি' বক্তৃতায় বলেন, 'জীবন ও মুক্তির এক সতেজ আস্বাদ আজ দেশে অনুরণিত ; নিয়তির সঙ্গে আজ আমরা অভিসারে মিলিত হয়েছি'। বস্তুত, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ নতুন সংবিধান গ্রহণ করে প্রজাতন্ত্রী ভারতের আত্মপ্রকাশের পর ভারতীয় রাজনীতিতেও গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোয় ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অনেক কিছুই পরিত্যক্ত হয় (দায়িত্বহীন, সংসদ কর্তৃত্ব-বিহীন শাসন ব্যবস্থা, পৃথক নির্বাচন ইত্যাদি)। কিছু কিছু আবার থেকে যায় (কেন্দ্রীয় প্রাধান্যসহ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা), সংযুক্ত হয় বেশ কিছুর (প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশিকা ইত্যাদি)। সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা, জোট-নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্রের অভিমুখীনতা, সামাজিক ন্যায় ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা জাতীয় নীতি ও কর্মসূচীতে প্রাধান্য পায়। সর্বোপরি সংসদ-নির্ভর গণতন্ত্র হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিচালিকা শক্তি। কিন্তু কখনও এই গণতন্ত্রের গতি সাবলীল হতে পারে না। বাধা-বিপত্তি, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সংসদীয় গণতন্ত্রকে নিস্তেজ করে রাখে। সময় সময় এর সংকট অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, ফলে অন্য বিকল্প ব্যবস্থার প্রস্তাব ওঠে। ১৯৫২ সালের প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতেও পরিবর্তন আসে। ঔপনিবেশিক কাঠামোর আবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে জন্মলগ্নের প্রায় ৯০ বছর পর বাংলার বিধানসভাকেও নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। সংসদীয় রাজনীতিতে নতুন শক্তিবিন্যাস ঘটে। মুসলিম লীগ সদস্যরা ঘোষণা করেন, "যদিও আমরা নির্বাচিত হয়েছি সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার ভিত্তিতে কিন্তু এখন থেকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল দৃষ্টিতে সমস্ত কিছু বিবেচনা করব।"[১] বিধানসভায় ইউরোপীয় গোষ্ঠীর প্রভাব পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়। জাতীয় আন্দোলনের চালিকা হিসেবে স্বীকৃত কংগ্রেস দল রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে সরকারি দপ্তরে আসীন হয়, বিরোধী দলের কাছেও অনুরূপ দায়িত্ব প্রত্যাশা করে ভারতীয় সংবিধান।

দেশ বিভাগের পর বিধানসভার প্রথম অধিবেশন হয় ২১ নভেম্বর, ১৯৪৭। সদস্য

সংখ্যা তখন কমে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ৮৩-তে। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠিত প্রায় সব নেতাই পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান, এমনকি সুরাবর্দীও। যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে থেকে যান তাদের মধ্যে ছিলেন আবুল হাশিম, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, খুদা বকস, সৈয়দ মিয়া, মুদাসির হুসেন প্রমুখ। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, নিশাপতি মাঝি, হেমচন্দ্র নস্কর প্রমুখ নেতারা রয়ে যান এই বঙ্গেই। কংগ্রেস নেতা কিরণশংকর রায় চলে যান পূর্ব পাকিস্তানে। কিছুদিন পর তিনি অবশ্য ফিরে আসেন। কমিউনিস্ট সদস্য রূপনারায়ণ রায়ের নির্বাচনী এলাকা পূর্ব পাকিস্তানে পড়ে যাওয়ায় দলের হয়ে জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণকেই বিধানসভায় দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম বিধানসভায় মহিলা সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেসের বীণা ভৌমিক (দাস), মুসলিম লীগের হুসেন আরা বেগম ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রতিনিধি মিসেস ই. এম. রিকেট্‌স। বিধানসভায় তখন স্বীকৃত কোন বিরোধী দল ছিল না। কমিউনিস্ট ও মুসলিম লীগ সদস্যদেরই কার্যত বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। সরকারের বিরোধিতায় শ্রমিক প্রতিনিধি শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। ২৬ মার্চ, ১৯৪৮ কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণার পর বিধানসভায় কমিউনিস্ট সদস্যদের উপস্থিতি অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে বিধানসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন গান্ধীবাদী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং সেই সুবাদে তিনি ছায়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন ১ জুলাই, ১৯৪৭। মন্ত্রিসভায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে অন্তর্ভুক্ত করে ড. ঘোষ তাঁর উপর অর্থ, স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসনের মত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করেন। ডাঃ রায় তখন আমেরিকায়। ফিরে এসে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে তিনি অসম্মতি জানান। ড. ঘোষ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও ছায়া মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে অনুরোধ জানান ; কিন্তু তিনিও রাজি হন না। ১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রে বাংলার নতুন রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী প্রফুল্ল ঘোষকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ করান। প্রফুল্ল ঘোষ তখন বিধানসভার সদস্য ছিলেন না ; পরে নভেম্বর মাসে বীরভূমের এক নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে হিন্দু মহাসভা প্রার্থীকে প্রায় ৯ হাজার ভোটে পরাজিত করে তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হন।

১৯৪৭-'৫১ পর্বে পশ্চিমবাংলার রাজনীতি বহুলাংশে প্রভাবিত হয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর পশ্চিমবঙ্গে আগমন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খাদ্য সমস্যা, ঘাটতি বাজেট ও অর্থনৈতিক সংকটজনিত সমস্যা দ্বারা। কংগ্রেসের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তীব্রতা, সহকর্মীদের নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কংগ্রেস ত্যাগ, বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয়তা, দক্ষিণ কলকাতা বিধানসভা কেন্দ্রে শরৎচন্দ্র বসুর জয়লাভ ও তজ্জনিত পরিস্থিতি বহুলাংশে রাজনৈতিক টানাপড়েনের জন্য দায়ী ছিল।

মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরই প্রফুল্ল ঘোষকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ড. ঘোষ ছিলেন খাঁটি গান্ধীবাদী। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ছিল তাঁর জীবনযাত্রা। কৃতী ছাত্র ছিলেন তিনি, রসায়নে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি। কিছু কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন। যেমন—দুর্নীতির বিরুদ্ধে, কালোবাজারী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, ভেজালের বিরুদ্ধে। অর্ডিন্যান্স জারি করে কলকাতা কর্পোরেশনে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা রহিত করা হয় তাঁর সময়েই। তবে তাঁর উদ্যোগেই নিরাপত্তা আইনের মত দমনমূলক আইন পাস করে বিধানসভা। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে বিনা বিচারে আটক রাখার আদেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা না করে একদিনেই দু'হাজারের বেশি দেশি মদের দোকান বন্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস তখন তিনটি বিবদমান গোষ্ঠীতে বিভক্ত। দেশভাগের সময় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন যুগান্তর গোষ্ঠীর সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। কিছুদিন পর সভাপতি হন ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তিনি বেশিদিন সভাপতি থাকতে পারেননি। কংগ্রেসে তখন হুগলী-বর্ধমান গ্রুপেরই (প্রফুল্ল সেন, ধীরেন মুখার্জি, আবদুস সাত্তার) প্রাধান্য। খাদি গ্রুপ (প্রফুল্ল ঘোষ) ও যুগান্তর (সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ) অনেকটা কোণঠাসা। এমতাবস্থায় পাঁচ মাস যেতে না যেতেই প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে বিদায় নিতে হয় কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য। হুগলী-বর্ধমান গ্রুপই প্রফুল্ল ঘোষ বিতাড়নে মুখ্য ভূমিকা নেয়। ড. ঘোষ অবশ্য পরে অভিযোগ করেন, মন্ত্রিসভা গঠনের সময় হিন্দিতে স্বহস্তে লিখিত চিঠিতে গান্ধীজী তাঁকে নির্দেশ দেন কলকাতার মারওয়াড়ী ব্যবসায়ীদের মধ্যে থেকে বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা বা দেবীপ্রসাদ খৈতান-এর মধ্যে যে-কোন একজনকে যেন মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয় কিন্তু তিনি সে নির্দেশ মানেননি (গান্ধীজী এই পত্র প্রত্যাহার করে নেন বলে প্রকাশ)। ব্যবসায়ী মহল প্রফুল্ল ঘোষের পদত্যাগে সন্তুষ্টই হয়।

পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ২৩ জানুয়ারি, ১৯৪৮ তিনি শপথ নেন। গান্ধীজীর নির্দেশেই তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন বলে ডাঃ রায় জানান। নলিনীরঞ্জন সরকার, হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর মত লোক যাঁরা আইনসভার সদস্য নন, কংগ্রেস দলভুক্তও নন, তাদেরও মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করে ডাঃ রায় ১২ জনের মন্ত্রিসভা গঠন করেন। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য বিধান রায়কে চার মাসের মধ্যে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত করতে হয়। কংগ্রেসের মুখ্যসচেতক অমরকৃষ্ণ ঘোষ সেই সময় মন্ত্রিসভার অপসারণের উদ্যোগ নেন। অভিযোগ : মন্ত্রিসভার ব্যর্থতা এবং কংগ্রেস দলভুক্ত নন এমন লোকদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভায় অবশ্য বিক্ষুব্ধরা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন। বিধান রায়ও বিক্ষুব্ধদের সমর্থনকারী তিনজন মন্ত্রীকে

মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়ে দেন, পরে অবশ্য তারা আনুগত্য প্রদর্শন করায় তাদের মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন ভূপতি মজুমদার, হেমচন্দ্র নস্কর।

১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গে বেআইনী ঘোষিত হয়। কমিউনিস্ট দলের শক্তি ও প্রভাব কিন্তু বাড়তেই থাকে। ১৯৫২ এর নির্বাচনী ফলাফল থেকে তা প্রমাণিত হয়। ২৭ এপ্রিল (১৯৪৯) বৌবাজারে লতিকা সেন সহ ৪ জন মহিলা কমিউনিস্ট নেত্রী পুলিশের গুলিতে নিহত হন। শরৎচন্দ্র বসু পরিচালিত "দ্য নেশন" পত্রিকা তখন খুবই জনপ্রিয়। এই ঘটনার উপর শরৎচন্দ্র বসু স্বাক্ষরিত বিবৃতি "দ্য নেশন" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে শরৎচন্দ্র বলেন "যে সরকার নিরস্ত্র মহিলাদের গুলি করে হত্যা করা ছাড়া অন্য কাজ করতে পারে না, সেই সরকারের ক্ষমতায় টিকে থাকার অধিকার নেই। প্রতিটি রুচিসম্পন্ন নাগরিকের আজকের দাবি : "ডাঃ বিধান রায় মন্ত্রিসভা বাংলা ছাড়ো। আমি সেই দাবিরই অভিব্যক্তি জানাই।"

২৯ এপ্রিল ১৯৪৯ তারিখে "দ্য নেশন" পত্রিকায় শরৎচন্দ্র বসুর ইংরেজীতে প্রকাশিত বিবৃতির বয়ান ঃ

"A government which cannot function except by shooting down unarmed women has no right to exist, the demand that is on every decent citizen today is that "Dr. Bidhan Roy's Ministry Must Quit Bengal". I give expression to that demand.

Calcutta
28.4.49 Sarat Chandra Bose

এর কিছুদিন পর ১২ জুন, ১৯৪৯ দক্ষিণ কলকাতা বিধানসভা কেন্দ্রে শরৎচন্দ্র বসু ১৩ হাজারের বেশি ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী সুরেশচন্দ্র দাসকে পরাজিত করেন। শরৎচন্দ্র পান ১৯,৩০০ ভোটে। কংগ্রেস প্রার্থী মাত্র ৫,৭৫০ ভোট। কলকাতা ও মফস্বল বাংলায় তখন জোর কংগ্রেস-বিরোধী হাওয়া। প্রধানমন্ত্রী জওহরলালও তিনদিন কলকাতা সফরের পর রায় মন্ত্রিসভার পদত্যাগ সমীচীন বলেই মনে করেন। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভা (২৮ জুলাই, ১৯৪৯) ছয় মাসের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচন, অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা গঠন ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পুনর্গঠনের সুপারিশ করে। বিধানচন্দ্র রায় তখন বিদেশে। দেশে ফিরে তিনি বাংলার রাজনীতি সম্বন্ধে নেহরু ও কার্যকরী কমিটির সমালোচনার প্রতিবাদ করেন এবং পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কংগ্রেস পরিষদীয় দল কিন্তু ৩৪-১৪ ভোটে বিধান রায়ের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে। কিছুদিন পরই অবশ্য ঘোষণা করা হয়, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শরৎ

বসুর মৃত্যু (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০) কংগ্রেস-বিরোধী শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। ইতিমধ্যে ১৯৫০ সালে অতুল্য ঘোষ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হন, বিজয় সিংহ নাহার হন সম্পাদক। মন্ত্রিসভা, বিধানসভা ও কংগ্রেস দলে বিধান রায়ের কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীত হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তানের দাঙ্গার ফলে উদ্বাস্তু আগমন বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। শরণার্থী ও সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল ও কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডনের বিরোধ তখন তুঙ্গে। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির ফলে দুই রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষার জন্য দু'জন মন্ত্রী নিযুক্ত হন—ভারতে চারুচন্দ্র বিশ্বাস, পাকিস্তানে ও এম. মালিক।

এই সমস্ত ঘটনারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় বিধানসভার আলাপ-আলোচনায়, প্রস্তাব ও বিতর্কে।

৬৮ জন সদস্যের উপস্থিতিতে প্রথম দিনের অধিবেশনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঈশ্বর দাস জালান অধ্যক্ষ ও আশুতোষ মল্লিক উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথম প্রস্তাবের পূর্ণ বয়ান :

"পশ্চিমবাংলার ব্যবস্থা পরিষদ এই প্রথম অধিবেশনে প্রদেশের সকল অধিবাসীকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছে এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য যাঁহারা অশেষ দুঃখবরণ ও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে।'

'এই ব্যবস্থা পরিষদ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান সেনাপতি মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছে এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনে তাঁহার মৌলিক অবদান কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করিতেছে।'

'এই ব্যবস্থা পরিষদ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহার দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছে।"

প্রস্তাব উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি বিশেষ বক্তৃতা করতে চাই না। এই প্রস্তাবের মধ্যে যে কথা রয়েছে তার থেকেই সকলে বুঝতে পারবেন আমাদের অন্তরের ইচ্ছা কি এবং আমি চাই যে এই প্রস্তাব সকলে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করুন।"

মহম্মদ খুদা বক্স কয়েকটি কথা বলে প্রস্তাব সমর্থন করেন। সকলে দণ্ডায়মান হলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়।[২]

১৯৪৭-৫১ পর্বের বিধানসভায় বিধায়কদের ভূমিকার যথেষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও প্রভাব তখন বিলুপ্ত। সংসদীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব যে অত্যন্ত প্রকটভাবে প্রকাশ পায় তার উল্লেখ

পূর্বেই করা হয়েছে। মুসলিম লীগ সদস্যরাও গঠনমূলক কোন ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হন। দু'জন কমিউনিস্ট সদস্য বিধানসভায় যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন কিন্তু পার্টি বেআইনী হওয়ার পর বিধানসভার সব অধিবেশনে তাদের পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে এই পর্বের বিধানসভায় অনেক বেশি আইন প্রণীত হয়। ১৯৫০ সালে বিধানসভার ফেব্রুয়ারি অধিবেশনেই আইন প্রণয়নের জন্য ২৭টি বিল উত্থাপিত হয়। যে-সব আইন এই পর্বে প্রণীত হয় তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ কালোবাজারি আইন, পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন, মহাজাতি সদন আইন, পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ভারতের খসড়া সংবিধানের আলোচনায়ও বিধানসভাকে বিশেষ ভূমিকা নিতে দেখা যায়। রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়া এবং এ বিষয়ে আলোচনার রীতিও প্রচলন হয় এই পর্বে। বাজেট বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর, প্রস্তাব, মোশন ইত্যাদির মধ্যে তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনেকাংশে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

এই পর্বে বিধানসভার আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ভারতীয় সংবিধানের খসড়া নিয়ে বিতর্ক। সংবিধান প্রণয়নকারী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া সংবিধান বিভিন্ন রাজ্য আইনসভায় পাঠানো হয় মতামত দেওয়ার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় খসড়া সংবিধান নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয় ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮। ৭ দিন এ নিয়ে বিধানসভায় বিতর্ক চলে, অংশ নেন ৪০ জনের বেশি বিধায়ক। শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বলেন, সদস্যদের মধ্যে প্রস্তাবিত সংবিধান নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকার দরুন হয়ত সর্বসম্মত কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হবে না। সেজন্য সদস্যদের বক্তব্য সহ আলাপ আলোচনার পূর্ণ বিবরণী তিনি গণপরিষদের সভাপতির নিকট প্রেরণ করার প্রস্তাব রাখেন। প্রস্তাবিত সংবিধানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে ডাঃ রায় দীর্ঘ বক্তৃতা দেন।[৩]

আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি মনে করেন ইংরেজ আমলে গভর্নররা যে ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করতেন স্বাধীন ভারতেও তার পুনরাবৃত্তি হওয়ার যথেষ্ট আশংকা আছে।[৪] কানাইলাল দে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির বেতন হ্রাস করার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দেখান। তাঁর মতে, "দরিদ্র ভারতবর্ষে যিনি রাষ্ট্রপতি হবেন, তিনি দরিদ্রের মতোই জীবনযাপন করবেন।"[৫] বিধায়ক হরিপদ চট্টোপাধ্যায় খসড়া সংবিধানের তীব্র সমালোচনা করেন, তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার একাংশ-র উদ্ধৃতি দেওয়া হলো : "বড় বড় পণ্ডিতরা যে সংবিধান তৈরি করেছেন, তাতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারছি না। এই সংবিধান যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁরা অর্থশালীদের লোক। এদের ভাল ভাল বাড়ি আছে, বড় মোটর গাড়ি আছে, ভাল ভাল পোশাক পরা সুন্দর চেহারার লোক এরা। তাই মনে হচ্ছে এই রাষ্ট্রতন্ত্রে যারা

মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে ঘোরে সেই জনসাধারণের স্বরাজ বুঝি এল না। স্বরাজ এল বড়লোকের, সাদা লোকেরা চলে গেলেন কিন্তু সেই মাথা-মোটা শাসন ব্যবস্থা থেকে গেল। তাদের জায়গায় এল কালো অর্থশালী লোকেরা। কৃষক-প্রজা-মজুর যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকল।"[৬] আবুল হাশিম পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রচলনের জন্য সংবিধান রচয়িতাদের ধন্যবাদ জানান। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইনের স্বীকৃতি জানানো উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। খুদা বক্স মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনের নিশ্চয়তা দিয়ে সংবিধানে নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব আনেন, কিন্তু ১৮-৩৭ ভোটে তা বাতিল হয়ে যায়। মুদাসির হুসেন যৌথ নির্বাচন প্রথা বাতিলের দাবি জানান। সৈয়দ বদরুদ্দোজা সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংবিধানে যে সংস্থান রাখা হয়েছে তা অপর্যাপ্ত বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হুসেন আরা বেগম শরিয়তের বিধান অনুযায়ী মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ সংস্থান রাখার অনুরোধ জানান।[৭] জ্যোতি বসু মনে করেন, সংবিধান রচনার এক্তিয়ার এই গণপরিষদের নেই, কারণ এই পরিষদ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয়নি। ১৮ বছর বয়স্ক প্রত্যেকের ভোটাধিকার, বিনা ক্ষতিপূরণে শিল্প জাতীয়করণ, ব্রিটিশ পুঁজির বাজেয়াপ্তকরণ, জমির উপর কৃষকের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, শ্রমিকের বাঁচার মত মজুরির অধিকার, বৃদ্ধ বয়সে পেনশনের অধিকার, বক্তব্য প্রকাশ ও সভা সমিতির অধিকার, জাতীয় জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ইত্যাদির দাবি তিনি জানান। ১৮ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় এক প্রস্তাব এনে "অগণতান্ত্রিক, কর্তৃত্বপূর্ণ এবং কায়েমী স্বার্থের রক্ষক এই খসড়া সংবিধান" প্রত্যাখ্যানের সুপারিশ করেন তিনি। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন,

(১) মৌলিক অধিকার থেকে নাগরিকদের বঞ্চিত করে রাষ্ট্রের হাতে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই সংবিধানে ;

(২) নির্দেশাত্মক নীতি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য করার কোন সংস্থান সংবিধানে রাখা হয়নি ;

(৩) জাতীয়করণের কোন সংস্থান সংবিধানে নেই ;

(৪) সংবিধানে রাজা-মহারাজাদের স্বার্থ অব্যাহত রয়েছে ;

(৫) অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে প্রদেশগুলিকে বঞ্চিত করা হয়েছে ;

(৬) বাঙালী, আসামী, বিহারী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি জাতীয় জনসমাজের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি ;

(৭) রক্ষণশীল ও অপ্রয়োজনীয় দ্বিতীয় কক্ষ বিলোপ করা হয়নি ;

(৮) নির্বাচনী এলাকা বৃহৎ করা হয়েছে যার ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে ;

(৯) অর্ডিন্যান্স জারি সহ রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ;

(১০) পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সংস্থান রাখা হয়েছে খসড়া সংবিধানে।[৮]

উল্লেখ্য বিধায়কদের মধ্যে অনেকেই সংবিধান সম্বন্ধে সাধারণভাবে দীর্ঘ বক্তৃতা রাখেন কিন্তু জ্যোতি বসুর মত নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখতে কাউকে দেখা যায়নি। বিমলচন্দ্র সিংহ সদস্যদের সমালোচনার উত্তরে বলেন, খসড়া সংবিধান ত্রুটিমুক্ত বলা যায় না। তবে ভারতের গণতান্ত্রিক পরিবেশ সংবিধানের অভাবাত্মক দিকগুলো দূর করতে সক্ষম হবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। খসড়া সংবিধান গ্রহণের পক্ষে মত দেওয়ার জন্য তিনি সদস্যদের অনুরোধ জানান। জ্যোতি বসুর প্রস্তাব ভোটে বাতিল হয়ে যায়।

স্বাধীনতার পর যে সমস্ত আইন প্রণয়নের প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভায় তীব্র বাদানুবাদ হয় পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন তার অন্যতম। ২৭ নভেম্বর, ১৯৪৭ পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা বিলের (পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন) প্রস্তাব পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। দেশ বিভাগের আগে সুরাবর্দী মন্ত্রিসভা যে 'বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স' জারি করে, সেই অর্ডিন্যান্সেরই খানিকটা পরিবর্তন করে প্রফুল্ল ঘোষ-মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা আইনের প্রস্তাব বিধানসভায় পেশ করা হয়। বিলে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে পুলিশ ও আমলাদের অঢেল ক্ষমতা দেওয়া হয়। যে কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র-বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ এনে নিবর্তনমূলক আটক করার অধিকার পায় পুলিশ। উল্লেখ্য সুরাবর্দী সরকার যখন এই অর্ডিন্যান্স জারি করে, কংগ্রেস থেকে তখন তার প্রবল বিরোধিতা করা হয়। ২৭ নভেম্বর উত্থাপনের পর সভায় বিলটি নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। প্রস্তাবক বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর সুপারিশ করেন। জ্যোতি বসু বিলটি জনমত যাচাই করার জন্য এক প্রস্তাব আনেন। বিলের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখার সময় তাঁকে জওহরলাল নেহরুর 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' থেকে উদ্ধৃতি দিতে দেখা যায়। আবুল হাশিম, খুদা বক্‌স ও অন্যান্য মুসলিম লীগ সদস্য জ্যোতি বসুকে সমর্থন করেন। কিন্তু প্রস্তাব ভোটে দিলে দেখা যায়, একমাত্র জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ ছাড়া সকলেই সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর পক্ষে মত দিয়েছেন। মূল প্রস্তাব ৬১-২ ভোটে পাস হয়ে যায়।[৯] বিলের বিরুদ্ধে আইনসভার বাইরেও আন্দোলন সংগঠিত হয়। শরৎচন্দ্র বসু, মৃণালকান্তি বসু, ক্ষিতিশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৭ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা বিধানসভা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে একজন নিহত হন, আহত হন অনেকে। ১১ ডিসেম্বর জ্যোতি বসু বিধানসভায় এক মুলতুবি প্রস্তাব এনে গুলি চালনার প্রতিবাদ ও বিলটি প্রত্যাহারের দাবি জানান। মুসলিম লীগের আবুল হাশিম তাঁকে সমর্থন করেন। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার জ্যোতি বসুর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে কমিউনিস্টদের

বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। আলোচনার নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার দরুন মুলতুবি প্রস্তাব স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়ে যায়। নিরাপত্তা বিলের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মধ্যেও যথেষ্ট বিরোধিতা ছিল। বিলের বিরুদ্ধে সভাসমিতি, মিছিল, স্থানীয় ধর্মঘট, ছাত্র বিক্ষোভ ইত্যাদিতে অনেক কংগ্রেস কর্মীরও সমর্থন ছিল। এই পরিস্থিতিতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কলকাতায় আসেন এবং বেশ কয়েকটি জনসভা করেন। তাঁর হস্তক্ষেপে বিলের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কর্মীদের বিক্ষোভ অনেকটা প্রশমিত হয়।

বিলটি নিয়ে বিচার বিবেচনা করার জন্য ১১ জন সদস্যের (যার মধ্যে ৮ জনই ছিলেন কংগ্রেস দলের) এক সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করা হয়। সরকার চেয়েছিলেন দু'-এক দিনের মধ্যেই বিধানসভাকে দিয়ে বিলটি পাস করিয়ে নিতে, কিন্তু কমিউনিস্ট ও মুসলিম লীগ সদস্যদের বিরোধিতার জন্য বিল নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক চলে। আলোচনা শুরু হয় ৫ জানুয়ারি, বিতর্ক শেষ হয় ১৫ জানুয়ারি। জ্যোতি বসু ৬০ বারের বেশি বিভিন্ন স্তরে বিলের বিরুদ্ধে বিধানসভায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ অসংখ্য সংশোধনী প্রস্তাবও পেশ করেন। মুসলিম লীগ সদস্যরাও বিলের বিরোধিতা করে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। আবুল হাশিম বলেন, এই বিল আনা হয়েছে সকল প্রকার প্রগতিশীল আন্দোলন দমন করার জন্য। তিনি এর পিছনে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্ত দেখতে পান। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও অন্য কয়েকজন বিধায়ক ছাড়া সাধারণভাবে কংগ্রেস সদস্যদের বিলের প্রতি খুব দৃঢ় সমর্থন ছিল না। তারা স্বীকার করেন, বিলটি ক্ষতিকারক কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলায় অপরিহার্য। বিমলচন্দ্র সিংহ নিশ্চয়তা দেন অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান হলেই নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার করা হবে। ১৫ জানুয়ারি ৪৭-১২ ভোটে নিরাপত্তা বিল বিধানসভায় গৃহীত হয়।[১০]

কয়েকমাস পর (সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন সংশোধনের জন্য সরকার থেকে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। বিচারালয়ের অধিকার খর্ব করা এবং পুলিশ ও প্রশাসনের হাতে আরও অধিক ক্ষমতা অর্পণ করাই ছিল অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য। বিধানসভায় ৭ সেপ্টেম্বর কিরণশংকর রায় এই অর্ডিন্যান্স অনুমোদনের জন্য আইনসভায় পেশ করলে জ্যোতি বসু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্য সি ডি উইল্কিস, খুদা বক্স, আবদুল রহমান সিদ্দিকি ও অন্যান্য সদস্য এর বিরোধিতা করেন। জ্যোতি বসু অর্ডিন্যান্স বাতিলের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু তা ১২-৪০ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। এই অধিবেশনেই কিরণশংকর রায় নিরাপত্তা আইনের কিছু কিছু সংশোধন করে একটি বিল বিধানসভায় পেশ করেন। জনমত যাচাইয়ের জন্য বিলটি

প্রচার করা হোক, এই মর্মে জ্যোতি বসু এক প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাব ১১-৪৯ ভোটে নামঞ্জুর হয়ে যায়। জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ ছাড়া হুসেন আরা বেগম সহ ৯ জন মুসলমান সদস্য সংশোধনের পক্ষে ভোট দেন। আবদুর রহমান সিদ্দিকি, মহম্মদ রফিক ও অন্যান্য সদস্য আগাগোড়া সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ সালে কিরণশংকর রায়ের মূল প্রস্তাব পাস হয়ে যায়। পক্ষে ৪১ এবং বিপক্ষে ৩ ভোট পড়ে। জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ ও মহম্মদ রফিক বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেন।[১১]

১৯৫০ সালে আবার নিরাপত্তা আইন সংক্রান্ত এক সংশোধনী বিধানসভায় উপস্থিত হয়। তখন এই সংশোধনীর বিরোধিতা করেন শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রতনলাল ব্রাহ্মণ। বিলের বিরোধিতা করে শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সরকার নির্লজ্জভাবে এই বিল পাস করেছেন, কারণ তাদের ভোটের সংখ্যা বেশি আছে। ব্রিটিশরা এই বিল পাস করিয়েছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, আজ কংগ্রেস এই বিল পাস করাচ্ছে বিরোধীদের বিরুদ্ধে। একদিন কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধেও এই বিল প্রয়োগ করা হতে পারে"। রতনলাল ব্রাহ্মণ সরকারকে সাবধান করে বলেন, "আপনারা বিল পাস করাতে পারেন কিন্তু জনসাধারণ এই বিল মানবে না।'[১২] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, নিরাপত্তা আইন প্রণীত হওয়ার প্রায় দুই দশক পরে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর এই আইন বাতিল করা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, বর্গাদার বিল ইত্যাদি নিয়ে বিতর্কে সরকারকে অনেক সময় বিরোধীদের কিছু কিছু বক্তব্য মেনে নিতে দেখা যায়। ১৯৪৭-'৫১ পর্বে বার্ষিক বাজেটের আলোচনাকে কেন্দ্র করে বিধানসভাকে যথেষ্ট তৎপরতা লক্ষ করা যায়। দেশ ও জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকারি নীতির সমালোচনায় মুখর ছিলেন এই পর্বের বিধায়করা। অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার প্রথম বাজেট পেশ করে কীভাবে "সীমিত সম্পদ ও আর্থিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বাজেট তৈরি করতে হয়েছে" তা ব্যাখ্যা করেন। অসুস্থ নলিনীরঞ্জন প্রায় ১৭ হাজার শব্দের বাজেট বক্তৃতার পাঠ শেষ করতে না পারায় বিমলচন্দ্র সিংহ বাকি অংশ পাঠ করেন।[১৩] বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে মুসলিম লীগ সদস্য সৈয়দ মিয়া বলেন, "নলিনী সরকারের বাজেটে ধনী আরও ধনী হবে এবং গরিব আরো গরিব হবে"। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ অভিযোগ করেন, আগাগোড়া এই বাজেট কংগ্রেসের দীর্ঘ দিনের স্বীকৃত নীতির বিরোধী। ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট রচিত হয়েছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। আবুল হাশিম মনে করেন, বাজেটের ত্রুটির জন্য অর্থমন্ত্রী দায়ী নন, দায়ী কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি। কংগ্রেস বিধায়করাও বাজেটে ঘোষিত সরকারি আর্থিক নীতি সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হননি। কংগ্রেসের বীণা ভৌমিক আলোচনায়

অংশ নিয়ে বলেন, "অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তৃতা শুনতে শুনতে অনেকেরই মনে হবে তারা কি কংগ্রেস মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা শুনছেন, না শিল্পপতি ও ধনিক সম্প্রদায়ের কোন মুখপাত্রের বক্তৃতা শুনছেন। বক্তৃতার মূল সুর শুনে অনেকেই আশ্চর্য হবেন। কারণ, তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত যে কংগ্রেসের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দেশের ধনিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে"।[১৪] তিনি অভিযোগ করেন, ধনিকরা সরকারের উপর চাপ দিচ্ছে, তবে কংগ্রেস সরকার ধনিকদের এই ফাঁদে পা দেবে না বলে তিনি তার বিশ্বাস ব্যক্ত করেন।

পুলিশ, আবগারি, শিক্ষা, শ্রম, কৃষি ইত্যাদি খাতের আলোচনায় সদস্যদের বেশি তৎপর হতে দেখা যায়। পুলিশের অত্যাচার, দুর্নীতি, জনসাধারণকে অযথা হয়রানি, মাথাভারী পুলিশ প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় পুলিশ বাজেট আলোচনায় সদস্যারা উত্থাপন করেন। বাজেটে আবগারি শুল্ক বিষয়ে সদস্যরা নানা অভিযোগ আনেন সরকারের বিরুদ্ধে। সৈয়দ মিয়া বলেন, সরকার মাদকতা নিবারণ তো দূরের কথা, বিদেশ থেকে মদ, গাঁজা, ভাং আমদানি দ্বারা দেশবাসীকে আরও মাতাল ও নেশাখোর হওয়ার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী অভিযোগ করেন, মাদক দ্রব্য থেকে লব্ধ আয় দিন দিন বাড়ছে, সরকার মদ খাওয়ার প্রশ্রয় দিচ্ছেন, গাঁজা, মদ, আফিং-এর প্রচলন বাড়ছে। সরকারি আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিতে সদস্যরা সন্তুষ্ট হতে পারেননি।[১৫]

স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতি পুরোপুরি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণে গড়ে উঠেছে বলে সদস্যরা অনুযোগ করেন। দেশের মাটির সঙ্গে এই শিক্ষা ব্যবস্থার কোন যোগ নেই বলে বিধায়করা ক্ষোভও প্রকাশ করেন। আবুল হাশিম তাঁর বক্তৃতায় অভিযোগ করেন, বিদেশীদের অন্ধ অনুকরণ আমাদের মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "আমরা বিলেতী ধরনে হাসি, আমরা ফরাসী ধরনে কাশি।"[১৬] কোন কোন সদস্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি বেশি নজর দেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান।

বাজেট আলোচনায় বেশ কয়েকজন সদস্যকে জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায়। সৈয়দ মিয়া, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, বীণা ভৌমিক, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সদস্য জমিদারি প্রথা বিলুপ্তিতে সরকারি গড়িমসির নিন্দা করেন। বর্গাদারদের স্বত্ব দেওয়ার ব্যাপারেও সদস্যদের মধ্যে ভিন্ন মত দেখা যায়। জসিমুদ্দিন জমির উপর বর্গাদারদের স্বত্ব নিশ্চিত কবার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে সরকারের উপর চাপ দেন। মুদাসির হুসেন মনে করেন, যে সমস্ত লোকের দু' হাজার, চার হাজার বিঘার বেশি জমি আছে, তাদের কিছু জমি বর্গাদারদের মধ্যে বিলি করা যেতে পারে ; অন্যদের নয়।

সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজু বিধানসভার প্রথম বাজেট অধিবেশনে সংবিধানের ১৭৬ নং ধারা অনুযায়ী তার উদ্বোধনী ভাষণ দেন। রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিধানসভায় আলোচনা ও বিতর্কের রেওয়াজ ঐ সময় থেকেই প্রচলিত হয়। বক্তৃতায় রাজ্যপাল জওহরলাল নেহরু ও ফিরোজ খাঁ নূন-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির উল্লেখ করেন। প্রায় সকল সদস্যই এই চুক্তিকে স্বাগত জানান। হুসেন আরা বেগম ও অন্যান্য মুসলমান বিধায়ক এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব আলোচনা করে চুক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। রাজ্যপালের ভাষণে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের উল্লেখ নিয়ে বিধানসভায় যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দেয়। রাজ্যপাল তার ভাষণে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু আবার পূর্ববঙ্গে ফিরে গিয়েছেন বলে উল্লেখ করায় সদস্যরা খুবই ক্ষুব্ধ হন। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিয়ে দেন, "পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী ৭০০ মাইল ব্যাপী সীমারেখা অতিক্রম করে কত লোক যে কত দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসছে তার হিসেব কেউ রাখতে পারে না। রাজ্যপাল বলছেন ১২ লক্ষ উদ্বাস্তু ফিরে গিয়েছে ; কোথা থেকে এই হিসেব তিনি পেলেন আমরা কেউ তা জানি না।"[১৭] জ্যোতি বসুও উদ্বাস্তুদের দুঃখদুর্দশা দূর করে তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান। প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও বীণা ভৌমিক উদ্বাস্তু সমস্যাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন। বীণা ভৌমিক মনে করেন, উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে সরকারের কোন নির্দিষ্ট নীতি নেই। মুসলমান সদস্যরাও সরকারি নীতির সমালোচনায় মুখর ছিলেন। তাঁরা বলেন, সরকার না পারছেন পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের আগমন বন্ধ করতে, না পারছেন পশ্চিমবাংলার মুসলমানদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে। রাজ্যপালের ভাষণের উপর কংগ্রেস বিধায়কদের মন্তব্য হয় অনেকটা আত্মরক্ষামূলক। বিরোধী সদস্যরা অভিযোগ করেন, বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে সরকারের যে সুনির্দিষ্ট কোন নীতি নেই তা সহজেই বোঝা যায় রাজ্যপালের ভাষণ থেকে। বিতর্কে অংশ নিয়ে শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রাজ্যপালের ভাষণে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় না, এটা একটা প্রশাসনিক রিপোর্ট মাত্র। মনে হয় একজন সচিব লিখে দিয়েছেন, বড়জোর একজন মন্ত্রী।"

মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় সরকারি নীতি ব্যাখ্যা করেন ও সমালোচকদের বক্তব্যের জবাব দেন। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন সম্বন্ধে সরকার ভাবছেন বলে তিনি বিধানসভাকে জানান। তাঁর জবাবী বক্তৃতার পর রাজ্যপালের ভাষণের উপর ভোট নেওয়া হয় এবং ৪১-১ ভোটে গৃহীত হয়। একমাত্র শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরুদ্ধে ভোট দেন। মুসলমান সদস্যরা ভোটদানে বিরত থাকেন। বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা তখন বিধানসভায় অনুপস্থিত।

সংখ্যালঘু ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়েও এই পর্বে বিধানসভায় জোর বিতর্ক চলে। ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর মুসলমানদের মনে নিরাপত্তার বিষয়ে নতুন করে প্রশ্ন দেখা দেয়। জসিমুদ্দিন আহমেদ, মহম্মদ রফিক, বদরুদ্দোজা, খুদা বক্স প্রমুখ বিধায়কগণ এ বিষয়ে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন। হিন্দু সদস্যরা মুসলিম বিধায়কদের আশ্বাস দেন এবং ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ব্যাহত হবে না বলে তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমার ব্যক্তিগত ধারণা গ্রামে মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্যের অভাব নেই। অভাব হচ্ছে শহরের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে। তাঁরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।"[১৮]

কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণার প্রসঙ্গও বিধানসভায় উত্থাপিত হয়। খুদা বক্সের এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশংকর রায় ৩০ মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে বিধানসভাকে জানান, হিংসাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা ও কৃষকদের সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কানি দেওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। জ্যোতি বসুর গ্রেপ্তার নিয়েও বিধানসভায় প্রশ্ন ওঠে। সদস্যদের অনেক সময় কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ ও কমিউনিজমের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখা যায়। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একবার বিতর্কে অংশ নিয়ে বলেন, "কমিউনিজমের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন বিরোধ নেই ; বিরোধ কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে"। মুসলিম লীগের আবুল হাশিম কমিউনিস্ট যুব ও ছাত্রদের সাহস, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠায় অভিভূত হন কিন্তু মার্কসবাদ মানবতার পক্ষে মঙ্গলজনক নয় বলে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রায়শই উৎকট কমিউনিস্ট-বিরোধী বক্তৃতা দিতেন। সদস্যরা এর দ্বারা প্রভাবিত হতেন বলে মনে হয় না ; বরঞ্চ সময় সময় তাঁদের উষ্মাই প্রকাশ পেত। শ্রমমন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায় একবার বিধানসভায় জ্যোতি বসুকে 'কমরেড' বললে জ্যোতি বসু এতে আপত্তি করেন। তাঁর দলের লোক ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে কমরেড বলুক এটা তিনি পছন্দ করেন না বলে বিধানসভাকে জানান।

বিধানসভার কার্যবিবরণীতে দেখা যায়, অনেক সদস্যই গীতা, কোরাণ, বাইবেল ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। মুসলিম লীগের মুদাসির হুসেন সব চেয়ে বেশি উল্লেখ করতেন গীতার নানা শ্লোকের। একবার বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের গরিবদের সঙ্গে কেউ নেই, কেবল হরি আছেন। তার জন্য আমার বক্তৃতা ইংরেজীতে আরম্ভ করার আগে গীতার প্রার্থনা দিয়ে শুরু করবো।" তিনি গীতার শ্লোক দিয়ে তার বক্তৃতা শুরু করে কোরাণ থেকেও উদ্ধৃতি দেন। বক্তৃতা শেষ হলে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় মন্তব্য করেন, মুদাসির হুসেন গীতা না কোরাণের সমর্থক

বোঝা গেল না। উত্তরে হুসেন জানান, তিনি উভয়েরই সমর্থক। এই ধরনের আরও সরস মন্তব্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রথম চার বৎসরের কার্যবিবরণীতে পাওয়া যায়।

আততায়ীর গুলিতে মহাত্মা গান্ধীর নিহত হওয়ার পর দলমত নির্বিশেষে সব সদস্য যেভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, বিধানসভার ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। বিধানচন্দ্র রায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর অবদান এবং ভারতীয় জীবনে গান্ধী দর্শনের প্রভাব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। অধ্যক্ষ ঈশ্বরদাস জালান বলেন, ধর্ম ও রাজনীতির এমন অভূতপূর্ব সমন্বয় অন্য কোন রাজনৈতিক নেতার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের জে. আর. ওয়াকার জাতির পিতাকে শান্তি ও অহিংসার প্রতীক বলে আখ্যায়িত করেন। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রতিনিধি ই. এম. রিকেটস গান্ধীর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব কীভাবে তাঁকে প্রভাবিত করেছে তার উল্লেখ করেন। জ্যোতি বসু মনে করেন, সাম্প্রদায়িকতাকে রোধ করাই হবে গান্ধীজীর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য। একের পর এক মুসলিম লীগ সদস্য মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। খুদা বক্স বলেন, "মহাত্মাজী আমাদের কাছে ছিলেন পিতৃতুল্য। বস্তুত মুসলমানদের রক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হলো। একথা আমরা ভুলবো না"। আবদুর রহমান সিদ্দিকি গান্ধীজীকে ভারতীয় মুসলমানদের প্রকৃত নেতা বলে অভিহিত করেন এবং বলেন, "মুসলমানদের মনোবেদনা তিনি যেভাবে অনুভব করতেন অন্য কোন ভারতীয় নেতার পক্ষে তা সম্ভব হয় নি, তিনি ছিলেন আমাদের চোখের মণি"। নিশাপতি মাঝি মহাত্মার কাছে হরিজনদের ঋণ স্বীকার করেন।[১৯]

প্রথম দিকে কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শের প্রতি অধিকাংশ বিধায়কই আস্থাবান ছিলেন। একজন বিধায়ক বিধানসভায় তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "কৃষক-প্রজা-মজুররাজ প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের কাম্য। যদি দেশের লোকের আমরা প্রত্যয় জন্মাতে পারি যে আমাদের আদর্শ, নিষ্ঠায় ফাঁকি নেই, আমরা কংগ্রেস-নির্দিষ্ট পথে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যই আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি, তাহা হইলে তাহারা আমাদের আগে নিশ্চয়ই দাড়াইবে।" অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভক্ত কংগ্রেসের পক্ষে এই ভাবমূর্তি বেশিদিন বজায় রাখা সম্ভব হয় না। কিছুদিন পর এই বিধায়ককেই অভিযোগ করতে দেখা যায়, "মন্ত্রীদের যাঁরা একদা হাঁটুর ওপরে খদ্দর পরে পায়ে-হাঁটা পথে গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন, এখন মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁরাই লম্বা বহরের ধোপদুরস্ত খদ্দর গিলে দিয়ে পরেন। টাক মাথায় জবাকুসুম তেল মাখেন। বড় বড় মোটর গাড়ী চড়ে বেড়ান।"[২০] এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস বিভক্ত হয় এবং প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে বেশ কিছু কর্মী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে কৃষক-

মজুর-প্রজা দল গঠন করেন। বিধানসভায় এই দলকেই ১৯৫০ সাল থেকে সরকার বিরোধী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

কমিউনিস্ট দলকে বেআইনী ঘোষণার আগে দু'জন কমিউনিস্ট সদস্য এবং মুসলিম লীগ ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভূমিকা পালন করতেন তার চেয়ে অনেক স্তিমিত ও নিরুত্তাপ ভূমিকা হয় কৃষক প্রজা দলের। মুসলিম বিধায়কদের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রভাব এই পর্বে ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে, পূর্বেকার সংহতিও তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে হতাশার মনোভাবও অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে। দাবার গুটির মতো ক্ষমতার রাজনীতিতে মুসলমানদের ব্যবহার করা হচ্ছে বলে মুসলিম বিধায়কদের অভিযোগ করতে দেখা যায়।[২১] অনুন্নত ও তফসিলী গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এই পর্বে বিলুপ্ত হয়। কংগ্রেস দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তফসিলী সদস্যরা বিধানসভায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্যরাও মোটামুটিভাবে সরকারি দলকেই সমর্থন করেন। পূর্বেকার দশকের অশান্ত, উত্তপ্ত পরিবেশ থেকে অনেকাংশে মুক্ত ছিল এই পর্বের বিধানসভা। সংসদীয় তৎপরতাও ছিল এই পর্বের অনেকাংশে অনুপস্থিত।

ঔপনিবেশিক আমলে ১৯৪৬ সালে যে বিধানসভা গঠিত হয় স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গে তার শেষ অধিবেশন হয় ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে। সমাপ্তি অধিবেশনে অধ্যক্ষ ঈশ্বরদাস জালান বলেন, বাংলা অতীতে সারা ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছে, ভবিষ্যতেও নেতৃত্ব দেবে ; সংসদীয় কাঠামোর গতি নির্দেশ করবে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ বিধানসভা আরও প্রাণবন্ত হবে, অতীত গৌরবে সমৃদ্ধ হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দলের নির্বাচনী সাফল্য (১৯৫২-১৯৫৭)

রায়-বসু বিধানসভা

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সাড়ে চার বছর ঔপনিবেশিক সংসদ কাঠামোকে নির্ভর করেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে এতদিন একাধিপত্য ছিল শহরাঞ্চলের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের একাংশ এবং গ্রামাঞ্চলের জমিদার-জোতদার ও সম্পন্ন ভদ্রজনের। ভোটাধিকার প্রসারিত হওয়ার ফলে বৃহৎ জনতা, প্রান্তিক পর্যায়ে হলেও, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বিধানসভা হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক চালচিত্রের দর্পণ।

বিশদ আলোচনার পূর্বে প্রথমেই অধ্যায়ের শিরোনাম সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। ১৯৫২ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও তৎসংক্রান্ত প্রক্রিয়া পর্যালোচনার পক্ষে সাধারণ নির্বাচনের বিশ্লেষণ যে অপরিহার্য তা সবাই স্বীকার করবেন। অবশ্য ২৩৮ সদস্য বিশিষ্ট বিধানসভার বেশ কয়েকজন দিকপাল ও অভিজ্ঞ বিধায়কের ভূমিকার গুরুত্ব না দিয়ে দুজন রাজনীতিবিদ—মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ও কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুকে এত প্রাধান্য দেওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে। বিশেষ করে জ্যোতি বসু সম্বন্ধে। কারণ, কমিউনিস্ট দলে তখন ছিলেন জ্যোতি বসুর চেয়ে অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান বিধায়ক বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমবাবু ছিলেন বড় মাপের বক্তা' ; সংসদীয় কায়দা-কানুনে রপ্ত। তাঁর কথার ভাব ও ভঙ্গি ছিল আকর্ষণীয়। গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর সময় সময় উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে আবার মাত্রাবোধে তাকে সংযত করার কৌশল তাঁর আয়ত্তে ছিল। "মাননীয় সভাপতি মহাশয়" বলে অধ্যক্ষকে সম্বোধন করে তিনি যখন বলতে উঠতেন তখন তিনি সমগ্র কক্ষের সমীহ পেতেন। তাঁর বক্তৃতার সময় কংগ্রেস দলের কোন সদস্য বিরূপ মন্তব্য করলে বা বাধা দিলে অধ্যক্ষ বা বিধান রায় সদস্যকে ভর্ৎসনা করতেন। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ছাড়া কমিউনিস্ট দলে ছিলেন বিনয় চৌধুরী, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, কানাই ভৌমিক, রণেন সেন, অজিত বসু, মণিকুন্তলা সেনের মত নেতা ও নেত্রী। পার্টি স্থিরীকৃত কর্মপন্থা অনুসারেই কমিউনিস্ট বিধায়করা বিধানসভায় তাদের ভূমিকা পালন করতেন।

১৯৫২-১৯৫৭ পর্বের বিধানসভার দলিল নথিপত্র, কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করলে বিধানচন্দ্র রায় ও জ্যোতি বসুকে কেন্দ্র করেই যে বিধানসভা পরিচালিত হতো তার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

কংগ্রেস দলে বিধানচন্দ্র রায়ই ছিলেন সর্বেসর্বা। বাঁকুড়া থেকে নির্বাচিত হিন্দু-মহাসভা নেতা রাখহরি চট্টোপাধ্যায় বিধানসভায় একবার অভিযোগ করে বলেন, "একচ্ছত্রাধিপতি, দাম্ভিক চূড়ামণি" ডাঃ রায়ের "পক্ষপুট অবলম্বন করেই কংগ্রেস দল পরিচালিত হচ্ছে।"[১] বস্তুত একা কুম্ভসম বিধানচন্দ্রই বিরোধী পক্ষের আক্রমণের মুখে কংগ্রেস গড় রক্ষা করতেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে প্রফুল্লচন্দ্র সেন, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র সিংহ সহ রায় মন্ত্রিসভার সাতজন মন্ত্রী পরাজিত হন। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন অনভিজ্ঞ, ডাঃ রায়ের মুখাপেক্ষী। মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্করের কথায়, রায়মন্ত্রিসভার সদস্যরা ছিলেন "কচ্ছপ মন্ত্রী"—রাইটার্স বিল্ডিংসে এসে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদের কচ্ছপের মত উলটে দিতেন। সারাদিন মন্ত্রীরা শূন্যে হাত-পা ছুঁড়তেন, দিনশেষে মুক্তি পেতেন। কংগ্রেস বিধায়কদের মধ্যেও সুবক্তা বা দক্ষ সংসদবিদের ছিল একান্ত অভাব। কাজেই বিধান রায়কেই সব কিছু সামাল দিতে হতো। প্রশ্নোত্তর পর্বে যখন বিরোধীরা মন্ত্রীকে নাজেহাল করতেন তখন বিধান রায়ই ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। শিক্ষামন্ত্রী পান্নালাল বসু বাজেট বিতর্কের জবাব দিতে উঠে আমতা আমতা করছেন, ডাঃ রায়ই তখন দীর্ঘ সময় ধরে মন্ত্রীর জবাবী ভাষণ দেন। পৌরমন্ত্রী ঈশ্বরদাস জালান বিলের বিতর্কে বিরোধীদের কাছে হেনস্থা হতে পারেন ভেবে মুখ্যমন্ত্রীই এগিয়ে এসে বলেন, মন্ত্রীর পরিবর্তে তিনিই বিতর্কের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছেন।[২] একবার বাজেট আলোচনার দিন অসুস্থতার জন্য ডাঃ রায় বিধানসভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে আলোচনা স্থগিত রাখার জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ জানান। অধ্যক্ষ বলেন, প্রফুল্ল সেনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জ্যোতি বসু এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। কারণ, প্রফুল্ল সেন ছিলেন উচ্চকক্ষ, বিধানপরিষদের সদস্য আর তাছাড়া তিনি কার্যকর হবেন না, সামলাতে পারবেন না বলে আশঙ্কা করেন বসু।[৩] এই ধরনের আরও নজির আছে কার্য-বিবরণীতে। ডাঃ রায় তাঁর সদস্যদের ভালভাবে তালিম দিতে পারছেন না বলে বিরোধী সদস্যরা প্রায়ই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেন। জমিদারি অধিগ্রহণ বিলের আলোচনায় এস ইউ সি সদস্য সুবোধ ব্যানার্জি মন্তব্য করেন, "কংগ্রেসী সদস্য হওয়া সুখের কথা। তাঁদের তো আর সংশোধনী বিল পড়তে হয় না, মূল আইনটিও পড়তে হয় না। ১৬০টি ভোট আছে, ডাঃ রায় যা আদেশ করেন, তা অবনত শিরে পালন করা এবং সেইমত ভোট দেওয়া, এই তো কংগ্রেসী দলের সদস্যদের একমাত্র কাজ।"[৪] বিধান রায়ের ব্যক্তিত্ব, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, প্রদেশ

কংগ্রেসের ওপর তাঁর প্রভাব—সব কিছু মিলিয়ে তাঁকে কেন্দ্র করেই সরকারি দল চালিত হতো বিধানসভায়।

অনুরূপভাবে, জ্যোতি বসুও ছিলেন বিধানসভার কেন্দ্রবিন্দু। বিধানসভায় কমিউনিস্ট দলের নেতা ছাড়াও প্রধান বিরোধী পার্টির নেতা (বিরোধী পক্ষের নয়) হিসেবে তিনি অধ্যক্ষের স্বীকৃতি পান এবং এই সুবাদে কিছু সাংবিধানিক অধিকার তিনি পান। বিরোধী পক্ষ ১৯৫২-৫৭ পর্বের বিধানসভায় যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল ; অনেক অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা, দক্ষ বিধায়ক, সুবক্তা ও জ্ঞানী-গুণী লোক ছিলেন বিরোধী পক্ষে। বিরোধী বিধায়কদের অনেক বিষয়ে একই সঙ্গে সরকারের বিরোধিতা করতে দেখা যেত। বিভিন্ন প্রশ্নে তাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়াও ছিল। বিরোধী পক্ষকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে জ্যোতি বসু বিশেষ প্রয়াস নেন, কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চালিত হননি। কমিউনিস্ট বিধায়করা যাতে অন্য বিরোধী দলের সদস্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, সদ্ভাব রাখেন, সে ব্যাপারেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। স্বভাবতই সব বিরোধী সদস্যের তিনি ছিলেন আস্থাভাজন, শ্রদ্ধাভাজন। অ-কমিউনিস্ট বিরোধী সদস্যরা জ্যোতি বসুর সঙ্গে সহযোগিতা করতেন, তাঁর পরামর্শ মেনে চলতেন। বিচারমন্ত্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসুর উত্থাপিত বিলের বিভিন্ন ধারার বিরোধিতা করে জ্যোতি বসু যখন বক্তৃতা করছেন তখন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে (ফরওয়ার্ড ব্লক) প্রাসঙ্গিক বিষয়ে একটি লিখিত "নোট" জ্যোতি বসুর দিকে এগিয়ে দিতে দেখা যায়। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে জ্যোতি বসু শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া কাগজ থেকে পড়ে শোনান।[৫] প্রজা সমাজতন্ত্রী নেতা চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী কয়েকবারই অধ্যক্ষকে অনুরোধ জানান, জ্যোতি বসুর বক্তৃতার সময়সীমা যেন বাড়িয়ে দেওয়া হয়, প্রয়োজনে অন্য সদস্যদের সময় কমিয়ে। নিজ দলের সদস্যদের সমর্থনেও অনেক সময় জ্যোতি বসুকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। ভারত-পাকিস্তান পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তনের ফলে সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা ভেবে এই ব্যবস্থা রহিত করার জন্য কমিউনিস্ট সদস্য প্রভাস রায় বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবের পক্ষে মূল বক্তব্য কিন্তু পেশ করতে দেখা যায় জ্যোতি বসুকে। তিনি দীর্ঘ বক্তৃতাও দেন। সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে অধ্যক্ষ জ্যোতি বসুকেই "প্রকৃত প্রস্তাবক" বিবেচনা করে তাঁকে বলতে দেন। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাবের ওপর একটি সংশোধনীও আনেন। জ্যোতি বসুর সংশোধনী গ্রহণ করেন। সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে বিধানসভায় গৃহীত হয় এবং ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়।[৬] ১৯৫৪ সালে শিক্ষক ধর্মঘট চলার সময় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে জ্যোতি বসুর ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ দিন বিধানসভা ভবনে আশ্রয় নেওয়া, শিক্ষকদের ওপর পুলিশি অত্যাচার বিষয়ে মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন, বিতর্কে সরকারকে কোণঠাসা করা ইত্যাদি সংসদীয় ইতিহাসে নজির হয়ে আছে। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে

টেক্কা দিতে পারতেন একমাত্র জ্যোতি বসুই। কার্যবিবরণীতে দেখা যায়, জ্যোতি বসু বিধান রায়কে বলছেন, 'আপনি তো ক্ষুদে হিটলারের মতো।' বিধান রায়ের উত্তর : 'আমি তো ক্ষুদে স্টালিনেরই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।' আরেকবার ডাঃ রায়ের দীর্ঘ ভাষণের পর জ্যোতি বসু বলেন, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ সবই তো হলো কিন্তু আসল কাজটা তো দেখতে পাচ্ছি না। ডাঃ রায়ের জবাব : দেখার মত চোখ থাকা চাই। এই ধরনের আরও নানা বক্তব্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিধানসভার নথিপত্রে। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিতর্কের স্তরে জ্যোতি বসুর হস্তক্ষেপ, প্রশ্নোত্তরের সময় তাঁর সক্রিয়তা, জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা বিধানসভায় তুলে ধরা, সভার কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে তাঁর আন্তরিকতা, সব কিছু মিলিয়ে জ্যোতি বসুর উপস্থিতি পশ্চিমবাংলার বিধানসভাকে বিশিষ্টতা দেয়। বিধানচন্দ্র রায় অনেক সময়ই দলীয় মনোভাব দ্বারা চালিত হতেন না। সব দলের সদস্যদের মতামতকে স্বীকৃতি দিতেন, "জেদি" ছিলেন কিন্তু রূঢ় ব্যবহার করতেন না।

এই পর্বের বিধানসভার কার্যবিবরণীর প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে এক-পঞ্চমাংশের মত স্থান জুড়ে আছে বিধান রায় ও জ্যোতি বসুর বক্তব্য।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ১৯৫২-৫৭ পর্বের বিধানসভা যে বিধান রায় ও জ্যোতি বসুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল, তা অতিশয়োক্তি নয়।

১৯৫২-১৯৫৭ পর্বে যে সব বিষয় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি প্রভাবিত করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত প্রায় চল্লিশ লক্ষ শরণার্থীর পুনর্বাসন সমস্যা, খাদ্য সংকট, এক পয়সার ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি, সাংবাদিকদের ওপর পুলিশের আক্রমণ, শিক্ষক ধর্মঘট, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট, বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রশ্ন ইত্যাদি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের "সাফল্য" ও "ব্যর্থতা", শিল্প বিকাশ, ছাঁটাই, বেকারী ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে বিধানসভার ভিতরে বাক-বিতণ্ডা ও বাইরে আন্দোলন সংগঠিত হতে দেখা যায়। ভূমি সমস্যা সমাধানে 'পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ আইন ১৯৫৩' (জমিদারি উচ্ছেদ আইন নামে সাধারণভাবে যা পরিচিত) এবং 'ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫' গ্রাম বাংলার সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের আগ্রহ ও নির্লিপ্ততা এবং আইনের প্রায়োগিক বাধা ভূমি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়। বরঞ্চ এই দুই আইনের নানা ফাঁক-ফোকরের সুযোগ নিয়ে জমিদার-জোতদারদেরই কর্তৃত্ব বজায় থাকে ; কৃষির ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার সিংহভাগ, ভাগচাষী, ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুররা চরম দুর্গতির সম্মুখীন হয়। গ্রাম বাংলায় বর্গাদারদের আন্দোলনও সংগঠিত হয়। নিরাপত্তা আইনের সময় সীমা বৃদ্ধি এবং অন্য কয়েকটি আইন নিয়েও বিধানসভাকে উত্তাল হতে দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বেহাল অর্থনীতির পুনর্গঠন প্রয়াসে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে মত পার্থক্য এই পর্বের রাজনৈতিক টানাপড়েন বহুলাংশে প্রভাবিত করে। স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে বাংলার অর্থনীতি ভারতের অন্য প্রদেশের তুলনায়, এমনকি বোম্বাইয়ের চেয়েও ছিল উন্নত ও সবল। শিল্পে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, কলকারখানায় উৎপাদন ও শ্রমশক্তি নিয়োগে বাংলা ছিল এগিয়ে। দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামোয় বিরাট পরিবর্তন আসে। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে এলোমেলোভাবে দুই বাংলার সীমারেখার বিভাজন হয়, ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যা আরও বেড়ে যায়। পাট উৎপাদনের অঞ্চলগুলি পড়ে যায় পূর্ববঙ্গে, আর চটকলগুলি রয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গে। এই ধরনের আরও অসঙ্গতি দেখা যায় অর্থনীতিতে। ১৯৪৭-এর পর পশ্চিমবঙ্গ পরিণত হয় ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্যে, অথচ জনসংখ্যার দিকে সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান হয় পঞ্চম ; জনবসতির ঘনত্বের দিক থেকে কেরালার পরই। ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭-এ আড়াই কোটি টাকা ঘাটতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক কর্মোদ্যম শুরু হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অধোগতি আরও বাড়িয়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আয়কর থেকে প্রাপ্য অংশ ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২ শতাংশ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় দরবারও করেন ; প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এনিয়ে তাঁর বাদানুবাদ হয়। পুনর্বাসন, ত্রাণ, খাদ্য সমস্যা, উন্নয়ন ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নীতি ও কর্মসূচী নিয়ে কংগ্রেস ও বিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা নানা রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে।

বিধানসভার আইন প্রণয়নে, বাজেট বিতর্কে, রাজ্যপালের ভাষণে, প্রশ্নোত্তর-প্রস্তাব-মোশন ও আলাপ আলোচনায় এই সব কিছুই প্রতিফলিত হয়।

১৯৫২ থেকে ১৯৬২-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত তিনটি সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই যা পরিলক্ষিত হয় তা হলো জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান নির্বাচনী সাফল্য। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সারা ভারতে ভোটাধিকার পান ১৭ কোটি ৩২ লক্ষ মানুষ, পশ্চিমবঙ্গে ভোটারের সংখ্যা হয় ১ কোটি ২৮ লক্ষ। ১৯৫২-র নির্বাচনে বিধানসভার ২৩৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পায় ১৫০, সিপিআই ২৮, কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি (পরবর্তীকালে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি) ১৫, ফরওয়ার্ড ব্লক ১৪, জনসংঘ ৯, হিন্দুমহাসভা ৪, স্বতন্ত্র ১৮। শরৎচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান দলের ১, ফরওয়ার্ড ব্লক (সুভাষবাদী) ১, এস ইউ সি ১—এই ৩ জন বিধায়ক স্বতন্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৮ জন স্বতন্ত্রের মধ্যে ১২ জন ছিলেন সরকারের সমর্থক, ৬ জন বিরোধী পক্ষের। সব নিয়ে বিধানসভায় সরকার পক্ষকে সমর্থন করতেন মোট ১৬২ জন বিধায়ক, বিরোধী পক্ষকে ৭৬ জন (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)।

উল্লেখ্য, নির্বাচনের পূর্বে শরৎচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত ইউ এস ও বা সমাজবাদী ঐক্য জোটের সঙ্গে দুই বছর বে-আইনী থাকার পর কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের ফলে আইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী মৈত্রী হয়। এই মৈত্রী ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী শক্তির নির্বাচনী সাফল্য বহুলাংশে নিশ্চিত করে। আর. এস. পি, আর সি পি আই ইত্যাদি দল নিয়ে পি ইউ এস এফ (পিপলস্ ইউনাইটেড সোস্যালিস্ট ফ্রন্ট) নামে অন্য একটি মোর্চা গঠিত হয়। এই মোর্চা থেকে অধ্যাপক অতীন বসুই একমাত্র বিধায়ক নির্বাচিত হন সুভাষবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে। পরে তিনি পিএসপি-তে যোগ দেন।

১৯৫২-র বিধানসভা নির্বাচনে জনসংঘ ও হিন্দুমহাসভার নির্বাচনী সাফল্যও লক্ষণীয়। এই দুই দল মিলে প্রদত্ত ভোটের প্রায় ৮.৯ শতাংশ পায়। তবে ১৯৫৭ ও তার পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে জনসংঘ ও হিন্দুমহাসভার প্রভাব প্রায় বিলুপ্ত হয়। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে জনসংঘ শতকরা একভাগ ভোটও পায় না, তার চেয়ে অনেক কম ভোট পায় হিন্দুমহাসভা।

১৯৫২-র নির্বাচনের অপর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো কংগ্রেস বিধায়কদের শতকরা ৭০ জনই নির্বাচিত হন গ্রামীণ এলাকা থেকে। শহরাঞ্চলেও কংগ্রেস মোটামুটি সাফল্য লাভ করে। সিপিআই-র প্রাপ্তি সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত শহর ও শিল্পাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্ট দলের গণভিত্তি ছিল দুর্বল। যেমন নদীয়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, বীরভূম ইত্যাদি জেলা থেকে কোনও আসনই পায় না সিপিআই। এই জেলাগুলি থেকে কংগ্রেসের ৬০ জন বিধায়ক নির্বাচিত হন।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩৮.৯ অংশ পায়, সিপিআই পায় ১০.৮ ভাগ।

নির্বাচিত বিধায়কদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক-ভাবেই দুজন প্রখ্যাত বিদেশী গবেষক, মার্কাস এফ. ফ্রান্ডা ও মাইরন ভীনারের সমীক্ষার উল্লেখ করতে হয়।[৭] পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের নেতৃত্বের ক্ষমতার উৎস, রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে এঁরা আলোচনা করেছেন। এঁদের মতে, ভোটদাতাদের কাছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সভাসমিতি ও প্রচারের মাধ্যমে সরাসরি আবেদন করার চেষ্টা করেন সন্দেহ নেই, কিন্তু দলকে, বিশেষ করে কংগ্রেস দলকে, নির্ভর করতে হতো এমন কিছু লোকের ওপর যারা নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রভাবিত করতে এবং কাঙ্ক্ষিত প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়াতে সক্ষম হতো। জমিদারি প্রথা বিলুপ্তি বা ভূমি সংস্কার আইন তখনও পাস হয়নি। গ্রামাঞ্চলে ভূস্বামী, জোতদার, সম্পন্ন চাষীরাই ছিল ক্ষমতার উৎস, নির্বাচনে ভোটের সংগ্রাহক। এম এল এ এবং মন্ত্রীদের ওপর এরা খবরদারি করত ; দল ও মন্ত্রী মারফত

প্রশাসনের ওপরও চাপ সৃষ্টি করত। ফ্রান্ডার মতে এরাই ছিল নিয়োজক—নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী শ্রেণী এবং এম এল এ-দের নিয়োগকারী। বস্তুত নিয়োজক, রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনের মধ্যে মেলবন্ধনের সূত্রপাত হয় প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকেই। কংগ্রেস দল ছিল এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির উদ্ভাবক। কারণ, অর্থ, সরকারি দাক্ষিণ্য ও পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণের মারফত কংগ্রেসের দলীয় কাঠামো বিস্তৃত ছিল শহর ও গ্রামে। কংগ্রেস দলের শতকরা ৭০ জন বিধায়কই গ্রামাঞ্চল থেকে নির্বাচিত হওয়ায় স্বভাবতই গ্রামমুখী বেশ কিছু কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দেয় এই পর্বের বিধানসভা ও সরকার। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ও সেচের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি।

১৯৫২-৫৭-র বিধানসভায় কংগ্রেসের মধ্যে আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক, সাংবাদিক সহ বিভিন্ন পেশার লোক ছিলেন। প্রিয়রঞ্জন সেন, মীরা দত্তগুপ্তা, বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের মত শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সদস্য ছিলেন। মহিষাদলের রাজা সহ কয়েকজন ভূস্বামী কংগ্রেস টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। জোতদার ও সম্পন্ন চাষী ছিলেন বেশ কিছু সদস্য। নিশাপতি মাঝির মত দরিদ্র তফসিল শ্রেণীভুক্ত সদস্যও ছিলেন কংগ্রেস দলে। তবে বিরোধীদের তুলনায় কংগ্রেস দল ছিল অনেকটা নিষ্প্রভ। স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সব নেতা ও কর্মী অগ্রণী ভূমিকা নেন তাঁদের অনেকেই তখন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের দলে। প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের দাশরথি তা একবার ব্যঙ্গ করে বলেন, কংগ্রেস দলের মধ্যে এমন সদস্যরা আছেন যাঁরা "জেলের ভিতর না গেলেও যাদের জেলের কাছে বাড়ি।" হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (পি এস পি) আক্ষেপ করেন, "আজ যে সব কংগ্রেসী হয়ে আমাদের সামনে বসে রয়েছেন তারা নিতান্ত নাবালক। তেঁতুলতলা দিয়ে গেলে তাদের গলায় দই জমে যায়।"[৮] প্রজা সমাজতন্ত্রী দলে ছিলেন প্রখ্যাত গান্ধীবাদী চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, দীর্ঘদিনের বিধায়ক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, দাশরথি তা কলকাতার মেয়র সুধীর রায় চৌধুরী, ডঃ অতীন বসুও পরে পি এস পিতে যোগ দেন। কমিউনিস্ট বিধায়কদের অধিকাংশই ছিলেন দলের সর্বক্ষণের কর্মী। শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ছিলেন কমিউনিস্ট দলে। ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক ছিলেন হেমন্ত বসু, কানাই ভট্টাচার্য, বিভূতি ঘোষ প্রমুখ। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ও এই দলের সদস্য ছিলেন। হিন্দু মহাসভা নেতা রাখহরি চট্টোপাধ্যায় ও জনসংঘের জ্ঞানেন্দ্র কুমার চৌধুরীও বিধাসভায় সক্রিয় ছিলেন। এস ইউ সি-র সুবোধ ব্যানার্জি সরকারি দলকে প্রায়শই বিব্রত রাখতেন। মুসলমান সদস্য ছিলেন ২২ জন। আবুল হাশিমের মতো মুসলিম নেতাদের অনেকেই ইতিমধ্যে পূর্বপাকিস্তানে চলে যাওয়ায় ১৯৪৭-৫১-র

বিধানসভার মতো এই পর্বের বিধানসভায় মুসলমান সদস্যদের তেমন ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। দুজন মন্ত্রী অবশ্য ছিলেন, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ রফিউদ্দিন আহ্‌মদ (পূর্ণমন্ত্রী) ও মুর্শিদাবাদের নবাব কাজেম আলি মির্জা (উপমন্ত্রী)। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্য ছিলেন ৩ জন। শিল্পপতি আলামোহন দাশও বিধানসভার সদস্য ছিলেন, ছিলেন কয়েকজন ব্যবসায়ীও।

স্বভাবতই বিধানসভা সদস্যদের বাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক অবস্থান দ্বারা ১৯৫২-৫৭ পর্বে পশ্চিমবাংলায় আইন-প্রণয়ন, সরকারি নীতি, উন্নয়নের কর্মসূচী, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বহুলাংশে প্রভাবিত হয়।

সাংগঠনিক দিক দিয়ে কংগ্রেস ছিল তখন অপেক্ষাকৃত সংহত। কংগ্রেসের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তীব্রতা পূর্বের চেয়ে হ্রাস পায়। হুগলী-বর্ধমান-মেদিনীপুর জোটের প্রতিপত্তি তখন লুপ্ত। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষ ও সম্পাদক বিজয় সিংহ নাহার দুজনই বিধানচন্দ্র রায়ের শুধু সমর্থক ও গুণগ্রাহী নন ; অনুগতও ছিলেন। কংগ্রেস সংগঠনে বিধান রাযই ছিলেন শেষ কথা ; তা আইনসভার প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে হোক, আর জেলাস্তরে পদাধিকারী নিয়োগের ব্যাপারেই হোক। নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে কংগ্রেসকে নির্ভব কবতে হতো বিধান রায়ের উপরই। কীভাবে ডাঃ রায় নির্বাচনের জন্য অর্থসংগ্রহ করতেন তার বিববণ আছে মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিবের লেখায়।[৯] মন্ত্রিসভা ও প্রশাসন ছিল মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রিক। নির্বাচনে ৭ জন মন্ত্রী পরাজিত হন কিন্তু দুজন পরাজিত মন্ত্রী—প্রফুল্ল সেন ও কালীপদ মুখোপাধ্যায়কে ডাঃ রায বিধান পবিষদেব সদস্য করে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন। মুখ্যসচিব এস. এন. রায়ের স্ত্রী রেনুকা রায় লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হতে পারেননি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী করেন। ১৪ জন মন্ত্রী ও ১৬ জন উপমন্ত্রী নিয়ে বিধান রায় মন্ত্রিসভা গঠন করে বিভিন্ন মহলের বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হন। লোকসভায় এ নিয়ে হৈ চৈ হয়, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এইভাবে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য বিধান রায়েব সমালোচনা করেন, কিন্তু ডাঃ রায় নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

কংগ্রেস-বিরোধী শক্তিও এই পর্বে যথেষ্ট সংহত ছিল। ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক বিভিন্ন দলকে নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি একটি মোর্চা গঠনে প্রয়াসী হয় এবং সফলও হয়। সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এই মোর্চা কলকাতা ও অন্যত্র ছাঁটাই-বিরোধী আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন ইত্যাদি সংগঠিত করে। তরাই অঞ্চলে চা-বাগান শ্রমিকদের ধর্মঘট, মার্গারেট হোপ চা বাগানে পুলিশের গুলিচালনা নিয়ে বিরোধীরা সরকারকে কোণঠাসা করে রাখেন বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে। সরকার বিরোধী বিভিন্ন দলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এই পর্বে বিশেষ

মাত্রা পায়। এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে গঠিত ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটির প্রধান শক্তি ছিল কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু পি এস পি নেতা ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসুর মত ব্যক্তিরা ছিলেন এই কমিটির নেতৃত্বে। মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে সুরেশ ব্যানার্জি, হেমন্ত বসু। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, সুধীর রায় চৌধুরী, সুবোধ ব্যানার্জি, মণিকুন্তলা সেন প্রমুখ বিরোধী বিধায়করা সরকারকে নাজেহাল করতেন প্রায় প্রতিটি অধিবেশনে। ১৯৫২-৫৭-র বিধানসভা ছিল সক্রিয়, সময় সময় উত্তাল কিন্তু সংযত। নিয়ম-বিধির বাধ্যবাধকতার প্রতি সদস্যরা ছিলেন অনুগত। প্রশ্নোত্তর, মোশন, বে-সরকারী প্রস্তাব, বাজেট আলোচনা ছিল গণমুখী। সরকারী নীতি ও কর্মসূচীর সমালোচনা ছিল তীব্র কিন্তু রচনাত্মক। বিতর্ক ছিল উচ্চমানের। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পশ্চিমবাংলার দাবির বিষয়ে কয়েকবারই সরকার ও বিরোধী পক্ষ ঐকমত্য হয়ে প্রস্তাব নিয়েছে বিধানসভায়। জ্যোতি বসু, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, সুধীর রায় চৌধুরী প্রমুখ বিধায়করা অধ্যক্ষের রুলিং অনেক সময়ই পছন্দ করতেন না, প্রশ্ন করতেন কিন্তু যথাযথভাবে নিয়ম মেনে নিয়ে এবং সৌজন্য সহকারে। বিরোধীদের মধ্যে ছিলেন ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ অতীন বসুর মতো কৃতী অধ্যাপক। বেশির ভাগ সময়ই এঁরা ইংরেজীতে বলতেন, ঝরঝরে সাবলীল ইংরেজী। এঁদের বাংলা বক্তৃতাও ছিল সমানভাবে আকর্ষণীয় ও অনুকরণযোগ্য। বিরোধী সদস্যরা যুক্তিজালে সরকারকে প্রায়শই বিপাকে ফেলতেন, হেনস্তা হতেন মন্ত্রীরা। বিরোধীদের চাপের মুখে একবার বিধান রায়, অজয় মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরদাস জালান সহ ২৮ জন কংগ্রেস সদস্য ভুলক্রমে সরকার উত্থাপিত একটি বিলের বিশেষ ধারার বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে দেন। ধারাটি বাতিল হয়ে যায় ; বিরোধীরা জিতে যান।[১০]

সাধারণ নির্বাচনের পর পুনর্গঠিত বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৮ জুন ১৯৫২। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন ড. হরেন্দ্র কুমার মুখার্জি। ড. মুখার্জি ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীতে প্রথম পি-এইচ. ডি। ১৯৩৭-এর বিধানসভায় তিনি খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতেন, সংবিধান প্রণয়নকারী পরিষদেরও তিনি সহসভাপতি ছিলেন। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচনে সরকার ও বিরোধী পক্ষের শক্তি প্রমাণিত হয়। অধ্যক্ষ পদে কংগ্রেস দলের প্রার্থী ছিলেন হাওড়া থেকে নির্বাচিত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। বিরোধীদলের প্রার্থী হন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও "মাস্টারমশাই" বলে খ্যাত ফরওয়ার্ড ব্লকের জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। তাঁর নাম প্রস্তাব করেন জ্যোতি বসু, সমর্থন করেন চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী। শৈল কুমার মুখার্জি পান ১৪৮ ভোট, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ৭৪। উপাধ্যক্ষ পদে কংগ্রেস প্রার্থী আশুতোষ মল্লিক পান ১৪৪ ভোট। বিরোধী পক্ষের কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির

(পরে পি এস পি) সদস্য নটেন্দ্রনাথ দাস ৭৪ ভোট পান।

পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫২-১৯৫৭-র মধ্যে বিধানসভায় অনেকগুলি আইন প্রণীত হয়। গুরুত্ব বিবেচনা করে এই আইনগুলির মধ্যে কয়েকটি আইনের আলোচনা করা হলো।

পশ্চিমবঙ্গ বেতন ও ভাতা ১৯৫২ আইন। নবগঠিত বিধানসভার প্রথম অধিবেশনেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করে ২৩ জুন একটি বিল বিধানসভায় উত্থাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গে তখন চরম অর্থনৈতিক সংকট। খাদ্যাভাব ও উদ্বাস্তু সমস্যায় রাজ্য জর্জরিত। এই অবস্থায় সাধারণ নির্বাচনের পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই বেতন বৃদ্ধির এই প্রস্তাব জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সংবাদপত্রেও সমালোচনা হয়। বিরোধীপক্ষ বিলটি জনমত যাচাই করার দাবি জানান কিন্তু সরকার বিলটি সরাসরি বিধানসভায় আলোচনায় পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বিলের বিরুদ্ধে বিরোধীপক্ষের মুখ্যবক্তা ছিলেন চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী (পি এস পি)। দীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি বলেন, "সন্দেহ নেই, যে-মিনিষ্ট্রি এখন পশ্চিমবাংলায় আছে তা বৃহৎ কায়েমী স্বার্থবাদীদের। বৃহৎ শিল্পপতি প্রভাবিত মিনিষ্ট্রি। যে পরিমাণে মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা বাড়ানো হয়েছে তাতে মাথা হেঁট হয়ে যায়।" অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ফরওয়ার্ড ব্লক) তাঁর দীর্ঘ ইংরেজী বক্তৃতায় বলেন, অঙ্ক বা সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে নয়, কংগ্রেসের ঘোষিত আদর্শ ও নীতির কথা বিবেচনা করেই তিনি এই বিলের বিরোধিতা করছেন। গণেশ ঘোষ, মণিকুন্তলা সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সদস্যরা মনে করেন, নির্বাচনে জয়লাভের সুযোগ নিয়েই কংগ্রেসী নেতারা এই বিল আনতে সাহসী হয়েছেন। বিরোধীপক্ষ থেকে বিলের বিরুদ্ধে অনেকগুলি সংশোধনী আনা হয় এবং ভোট রেকর্ড করিয়ে সরকারকে হেনস্তা করা হয়। বিধানসভার সামনে বিক্ষোভ মিছিলও সংগঠিত করেন বিরোধীরা।

কিছু সংখ্যক কংগ্রেস সদস্য যে বিলটি পছন্দ করেননি, তা প্রমাণিত হয় বিধানসভার ভোট থেকে। ১৬২ জন সরকার সমর্থকের মধ্যে ১৩৯ জন বিলের পক্ষে ভোট দেন, বিরোধীদের ৭৬ জন সদস্যের মধ্যে ৭৫ জনই বিলের বিপক্ষে ভোট দেন। ১৩৯-৭৫ ভোটে বিলটি পাস হয়।

আরেকটি বিতর্কিত আইন প্রণয়ন নিয়ে বিধানসভাকে উত্তাল হতে দেখা যায়। বিচারমন্ত্রী সত্যেন্দ্র কুমার বসু "অপরাধমূলক কাজের এক্তিয়ারভুক্ত ট্রাইব্যুনাল ১৯৫২" বিলটি ১লা জুলাই বিধানসভায় পেশ করেন। বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বেড়ে চলছে, শিল্পে শান্তি ব্যাহত হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক শক্তি উস্কানি পাচ্ছে। এইসব অপরাধের সঙ্গে যুক্ত আসামীদের দ্রুত বিচার করা সম্ভব

হচ্ছে না আইনের অপ্রতুলতার জন্য। অপরাধীদের দ্রুত বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠনই বিলের উদ্দেশ্য। বিরোধীরা মনে করেন অপরাধীদের বিচারের জন্য প্রচলিত আইন ও আদালতই যথেষ্ট, বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কোনও প্রয়োজন নেই। বিলটিকে বিরোধীরা গোড়া থেকেই বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, বিলের ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট—শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলন দমনই ট্রাইব্যুনাল গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জ্যোতি বসু বলেন, ডাঃ রায় ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট ভাষণে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পবিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর কেন "আইনের অনুশাসন" বাতিল করে দেওয়া হবে। "আইনের অনুশাসন" কথাটির তাৎপর্য ডাঃ রায়ের সম্ভবত জানা ছিল না, তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলে জ্যোতি বসু ইংলন্ডের প্রধান বিচারপতি লর্ড হেওয়ার্ডের লেখা, "দ্য নিউ ডেসপোটিজম" বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিতে এই ধরনের আইন এবং আদালতের কোন প্রয়োজন নেই। জ্যোতি বসু অভিযোগ করেন, এই বিল আইনে পরিণত হলে সরকার যে ক্ষমতা ভোগ করবে তা থেকে লাভবান হবে বিত্তবান শ্রেণী, প্রকৃত অপরাধীরা নিষ্কৃতি পাবে। গঠনমূলক প্রস্তাবও দেন জ্যোতি বসু। বিলের বিরুদ্ধে চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, হেমন্ত বসু, বিভূতি ঘোষ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাশরথি তা প্রমুখ সদস্য বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিলটি জনমত সংগ্রহের দাবি জানিয়ে কংগ্রেস সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, "এই রকম একটি অবাঞ্ছিত বিলের সমর্থন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারত্ব কি তাঁরা গ্রহণ করেছেন?" দাশরথি তা (পি এস পি) স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন, "এই বিলের গুণের কথা কহনে না যায়।"

কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে প্রধান বক্তা ছিলেন শঙ্কর প্রসাদ মিত্র। তিনি কমিউনিস্ট দলকে দোষারোপ করেন এই ধরনের বিল আনতে সরকারকে বাধ্য করার জন্য। বিরোধী সদস্যরা বিল পাসে সব ধরনের সংসদীয় প্রতিবন্ধকতার আশ্রয় নেন। প্রতিটি ধারার ওপর সংশোধনী দেওয়া হয় এবং ভোট দাবি করা হয়। ১০ জুলাই বিলটি পাস হয়ে যায়।

বিধানসভাকে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা (সংশোধন) আইন ১৯৫৫ পাস করিয়ে রায় মন্ত্রিসভা প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হয় এবং রাজনৈতিকভাবে অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

১৫ জানুয়ারি, ১৯৪৮ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের আমলে দমনমূলক নিরাপত্তা আইন পাস হয়। ঐ সময় এই আইন নিয়ে তুমুল রাজনৈতিক ঝড় ওঠে। "তার মন্ত্রিত্ব পতনমুখী জেনেও তিনি এই সিকিউরিটি অ্যাক্ট

বিধিবদ্ধ করেছিলেন", বলেন ডাঃ ঘোষের একজন সহকর্মী।[১১] ১৯৪৮-এর পর দু'বার (১৯৫০ ও ১৯৫৩ সাল) তিন বছর করে এই আইনের মেয়াদ বাড়ানো হয়।

নিরাপত্তা আইনের সময়সীমা আরও পাঁচ বছর বাড়ানো এবং কিছু সংশোধন প্রস্তাব করে ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় একটি বিল পেশ করেন। বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয় সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবিলা, সীমান্ত এলাকার অসামাজিক কাজকর্ম দমন ও অর্থনৈতিক অপরাধ ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য এই আইনের সময় প্রসারণ ও সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিধানচন্দ্র রায় এই নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন এবং বাধ্য হয়েই সরকারকে এই বিল আনতে হয়েছে বলে বিধানসভাকে জানান। জে. সি. গুপ্ত সহ কংগ্রেস সদস্যরা বিলের সমর্থনে বক্তৃতা দেন। সব বিরোধীদলকেই বিধানসভায় এই বিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায়। এমন কি একসময় যাঁরা নিরাপত্তা আইন সমর্থন করেছিলেন তাঁরাও বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা আইনের সময়সীমা বাড়ানো অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রমাণ বলে রায় মন্ত্রিসভাকে অভিযুক্ত করেন। বিল পেশ করার প্রতিবাদে সব বিরোধী সদস্য একযোগে ওয়াক-আউট করেন।

প্রধান বিরোধী দলের নেতা জ্যোতি বসু আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন, গত আট বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করা হয়েছে শ্রমিক-কৃষক-শিক্ষক ও গণতান্ত্রিক মানুষের আন্দোলন দমন করার জন্য, সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবিলা বা অর্থনৈতিক অপরাধে চিহ্নিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নয়। হিন্দু মহাসভা নেতা রাখহরি চট্টোপাধ্যায় বিধান রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন, "ডাঃ রায় শুধু শাসনই করেন, পালন করেন না।" সুবোধ চৌধুরী, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, মণিকুন্তলা সেন, হেমন্ত ঘোষাল প্রমুখ সদস্য বিলের বিভিন্ন ধারার সমালোচনা করে বিধানসভায় বক্তব্য রাখেন।

তবে বিলের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সোচ্চার হতে দেখা যায় প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের হরিপদ চট্টোপাধ্যায়কে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র (রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম. এস-সি) দীর্ঘদিনের বিধায়ক সুবক্তা ও নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মী হরিপদবাবু ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সহযোগী। ঘোষ মন্ত্রিসভার আমলে কী পরিস্থিতিতে প্রথম নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রচলিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের যে অবস্থা তখন চলছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আজকের পরিস্থিতি মোটেই তা নয়। হরিপদবাবু তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কমিউনিস্ট দল সম্বন্ধে মনোভাব, আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেন। বিধান রায়কে উদ্দেশ্য করে হরিপদবাবু বলেন, তিনি আশা করেছিলেন

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী সব দলের লোককে ঐক্যবদ্ধ করতে প্রয়াসী হবেন, কিন্তু তা না করে তিনি "গণতন্ত্রের ধ্বংস কার্যে কোমর বেঁধে নেমেছেন।" তিনি মনে করেন, কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই কারণ এই পার্টির বহু নেতা একসময় কংগ্রেসের মধ্যে থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন। "অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ—এঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে না, এমন লোক দেশে নেই." হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ বক্তৃতার কিছু অংশের উদ্ধৃতি : "কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুরা এক সময় জনযুদ্ধ করেছিলেন, তা মানি। একসঙ্গে জেলে গিয়েছিলাম বঙ্কিমবাবু আর আমি। খবরের কাগজে যুদ্ধের খবর আমরা পড়তাম। মতেরও আমাদের মিল ছিল। ইংরেজদের পরাজয় কামনা আমরা করতাম। তারপর রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানির লড়াই বাধল, অমনি ইংরাজের যুদ্ধ জনযুদ্ধ হয়ে গেল। বঙ্কিমবাবু ইংরাজের জয় কামনা করতে লাগলেন, আমাদের সঙ্গে মতভেদ হয়ে গেল। এতদিন সেইভাবেই চলেছে, আজকে প্রয়োজন হলে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ গঠনমূলক কাজ একসঙ্গে করবো।" বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "এই সিকিউরিটি অ্যাক্ট মারফত বিরোধী দলকে বিলো দি বেল্ট হিট না করে কমিউনিস্ট পার্টি, প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লককে ব্যান করুন, বে-আইনী ঘোষণা করুন।" পুলিশ ও প্রশাসকের মদতে কীভাবে সীমান্ত এলাকায় অসামাজিক কাজকর্ম চলছে, তার বিবরণ দিয়ে হরিপদবাবু বলেন, এদের বিরুদ্ধে কিন্তু নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে না, রাজনৈতিক আশ্রয় এরা পাচ্ছে। বিরোধীদের প্রচণ্ড বাধার মধ্যে অবশ্য ভোটের জোরে সরকার বিলটি পাস করিয়ে নেন।

গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির পুনর্বিন্যাসের সম্ভাবনা নিয়ে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তি ও ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইন বিধানসভা কর্তৃক প্রণীত হয়। কংগ্রেস সদস্যরা আইন দুটিকে স্বাগত জানান। বিরোধী বিধায়করা আইনের "ছিদ্র" ও দুর্বলতার সমালোচনা করেন। জমির সঙ্গে যুক্ত সুবিধাবাদী শ্রেণীর স্বার্থ যাতে ব্যাহত না হয়, সে ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃত্বের যোগসাজশের অভিযোগও আনেন। কিছুদিনের মধ্যেই আইন দুটির সংশোধনও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বাস্তব রূপায়ণে প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনীহার জন্য কোন সুবিধাই সাধারণ কৃষকের কাছে পৌঁছয় না। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র "স্বাধীনতা" পত্রিকায় এই বিলকে "মেকী জমিদারী উচ্ছেদ বিল" বলে অভিহিত করা হয় কারণ "বিলে চাষীদের জমিদান ও খাজনা হ্রাসের ব্যবস্থা নাই অথচ জমিদারদের চড়া হারে খেসারত" দেওয়ার সংস্থান আছে।

৭ মে, ১৯৫৩। ৫৩ ধারা সম্বলিত পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ বিল

বিধানসভায় পেশ করেন রাজস্বমন্ত্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসু। বিলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো :

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়ে সমস্ত জমিদারি ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয় সরকারকে।

২. ক্ষতিপূরণের হার নির্দিষ্ট করা হয়—নগদে ও বন্ডে।

৩. খনি-মালিকের জমি অধিগ্রহণের আওতায় আনা হয়।

৪. খাস জমির মালিকরা সর্বোচ্চ ২৫ একর আবাদী জমি, বাস্তু ও বাগান ইত্যাদির জন্য ১৫ একর এবং দেবোত্তর ও ওয়াকফ প্রভৃতি ধর্মীয় কাজের জন্য অনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি রাখার অধিকার পায়।

৫. অনির্দিষ্ট পরিমাণ ফলের বাগান, পুকুর, দীঘি, মেছোঘেরি ইত্যাদি রাখার অধিকার দেওয়া হয় বিলে।

৬. জমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারিত হয় ব্যক্তি ভিত্তিক।

৭. জরিপের দ্বারা নির্ধারিত উদ্বৃত্ত জমি সরকারে ন্যস্ত করা হবে বলে বিলে উল্লেখ থাকে।

বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় জমিদারি উচ্ছেদ আইনকে "মুণ্ডহীন কবন্ধ আইন" বলে অভিহিত করেন কারণ তাঁর মনে হয় ভূমিসংস্কার আইন প্রণীত না হলে জমিদারি উচ্ছেদ আইন থেকে কোন সুফলই পাওয়া যাবে না। এই প্রেক্ষিতে রাজস্বমন্ত্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসু ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫ বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার বিল পেশ করে এর উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বিলে বলা হয়,

১. জমির খাজনা বাড়ানা হবে,

২. বর্গাদার উৎপন্ন ফসলের ৬০ ভাগ পাবে, তেভাগা নয়,

৩. বর্গা জমির মালিকরা বর্গা উচ্ছেদ করতে পারবে কেবলমাত্র ভাগ চাষ কোর্টের সম্মতি নিয়ে।

৪. ২ একর পর্যন্ত জোত এবং ১ বিঘা পর্যন্ত বাস্তু জমি নিষ্কর হবে যদি প্রমাণ করা হয় সত্যিই তা বাস্তু জমি।

৫. উদ্বৃত্ত জমি সরকারে ন্যস্ত হওয়ার পর ভূমিহীনদের মধ্যে বিনামূল্যে বিলি করা হবে।

১৯৫৩-১৯৫৫-র বিধানসভার বেশিরভাগ অধিবেশনই এই দুটি আইনের বিতর্ক, ধারা-উপধারা নিয়ে ভোট ডিভিসন ইত্যাদিতে ব্যয়িত হতে দেখা যায়। আইন প্রণীত হওয়ার স্তরে বিধানসভায় বিভিন্ন দলের সদস্যরা যে বক্তব্য রাখেন তা কার্যবিবরণীর এক হাজারের বেশি পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ভূমিসংস্কার আইন নিয়েই বিতর্ক হয় ৪০ ঘণ্টা, বিরোধীপক্ষ থেকে ৬২টি ডিভিসন দাবি করা হয়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়,

সত্যেন্দ্রকুমার বসু, শংকরপ্রসাদ মিত্র, নিশাপতি মাঝি প্রমুখ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিলের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন এবং সমালোচনার জবাব দেন। বিরোধী বিধায়কদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন বিনয় চৌধুরী, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু, কানাই ভৌমিক, অজিত বসু, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, দাশরথি তা, সুধীর রায় চৌধুরী, হেমন্ত বসু, বিভূতি ঘোষ, সুবোধ ব্যানার্জি, জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ বিধায়ক।

দুটি আইনের মধ্যে জমিদারি অধিগ্রহণ আইনে এত বেশি ত্রুটি ছিল যে জমির মালিকের পক্ষে ফাঁকি দেওয়ার কোন অসুবিধা হয়নি। জমিদারি অধিগ্রহণ বিল পেশ ও আইন প্রণয়নের মধ্যবর্তী সময়ে জমিদাররা প্রচুর জমি আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, গৃহভৃত্য এমনকি পোষা জীবজন্তুর নামে (সোনামণি হাতি, বাঘা ঘোটক ইত্যাদি) বেনামী করে সরকারের কাছে জমি ন্যস্ত করার দায় এড়িয়ে যায়, গোচর, শ্মশান গোরস্তান ভাগাড় প্রভৃতি বিবিধ স্বত্বের জমি নিজেদের দখলে রেখে দেয়। সরকারের পক্ষ থেকে বেনামী জমি উদ্ধারের যে চেষ্টা হয় তা ছিল ঢিলেঢালা। তৎকালীন ভূমি ও ভূমি রাজস্বমন্ত্রী শঙ্করপ্রসাদ মিত্র অবশ্য ২৯ জানুয়ারি, ১৯৫৭ বিধানসভাকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে বিরোধী সদস্যরা যে সব বেনামী হস্তান্তর সরকারের গোচরে এনেছেন, সরকার তার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন। বিরোধী সদস্যরা ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দিতে থাকেন বেনামী হস্তান্তরের। প্রজা সমাজতন্ত্রী সদস্য দাশরথি তা মন্তব্য করেন জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে আমরা দ্রুততরভাবে পশ্চাৎপদ হচ্ছি। উচ্ছেদের হিড়িকে অসংখ্য কৃষক ভূমিহীন হয়ে পড়ে। ১৯৫৫-৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২৫ হাজারের মত উচ্ছেদ মামলা দায়ের হয় বলে প্রকাশ। সর্বোপরি ছিল জরিপের দুর্নীতি। সরকারি কর্মীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে জমিদাররা গরিব ও দুর্বল চাষীর জমির নিজেদের খাস করে নেন। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় বিধানসভায় অভিযোগ করেন, "বনগাঁ অঞ্চলের কিছু কৃষক, যারা নীল বিদ্রোহের সময় থেকে জমি চাষ করে আসছিলেন, সেটেলমেন্টে তাদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। তিনি নিজে মন্ত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়ার পর মন্ত্রী তদন্তের নির্দেশ দেন কিন্তু যিনি এনকোয়ারী করতে গিয়েছিলেন তিনি ডাক বাংলোতে বসে বসে রিপোর্ট লিখলেন, কৃষকদের ডাকলেনও না। অর্থাৎ যিনি চোর ধরতে গেলেন তিনি আরও পাকা চোর।"

বিধানসভায় কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় জমিদারি উচ্ছেদ ও ভূমি সংস্কার আইন পাস হওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে "বৈপ্লবিক ও যুগান্তকারী" পরিবর্তন ঘটেছে। বিরোধী বিধায়করা প্রত্যুত্তরে জমিদারি উচ্ছেদ আইনকে "চাষী উচ্ছেদ আইন", "কৃষক উচ্ছেদ আইন" বলে অভিহিত করে মন্তব্য করেন, লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত জমিদারি অধিগ্রহণ আইনের প্রবর্তকেরা ইতিহাসে নিন্দিত হবেন। ভূমিসংস্কার আইনের আলোচনায় অবশ্য বিরোধীদের নরম মনোভাব নিতে দেখা যায়। বিলকে বিরোধীরা কৃষক স্বার্থের সহায়ক বলে মনে করেন। ডঃ শ্রীকুমার

কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিলের আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, "অসম্পূর্ণতা ও অপর্যাপ্ততা সত্ত্বেও" তিনি এই আইনকে স্বাগত জানাচ্ছেন কারণ "আগামী দিনের বৈপ্লবিক ভূমিসংস্কারের ভিত্তি বলে এই আইন পরিগণিত হবে।"[১২] যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) আইন, বর্গাদার আইন, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ইত্যাদি আরও বেশ কিছু আইন এই পর্বের বিধানসভা কর্তৃক প্রণীত হয়।

বিভিন্ন আন্দোলন যে এই পর্বে পশ্চিমবাংলার রাজনীতি প্রভাবিত করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৫৩ সালে একমাস ব্যাপী এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলন থেকে। সরকারি অনুমোদন নিয়ে বিলেতি ট্রাম কোম্পানি যাত্রী ভাড়া এক পয়সা বৃদ্ধি করার প্রতিবাদে সারা জুলাই মাসব্যাপী কলকাতা ও হাওড়ায় লাগাতার আন্দোলন হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জির নেতৃত্বে "ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি" গঠন করে। কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নও এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। বর্ধিত ভাড়া না দেওয়া এবং প্রয়োজনে ট্রাম বয়কট করার আহ্বান জানায় প্রতিরোধ কমিটি। পুলিশের সাহায্য নিয়ে বর্ধিত ট্রামভাড়া আদায়ের চেষ্টা হলে জনসাধারণ পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ যাতায়াতের ঝক্কি নেন এবং ট্রাম বয়কট করেন। ৯ জুলাই হরতাল পালিত হয়। ১৪৪ ধারা অমান্য করে ২২ জুলাই ময়দানে এক জনসভা করে প্রতিরোধ কমিটি। এই সভায় উপস্থিত সাংবাদিকদের ওপর বিনা প্ররোচনায় পুলিশ হামলা চালায়, ১৮ জন সাংবাদিক আহত হন ; ১৬ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশের "বর্বরোচিত ও বেপরোয়া আক্রমণের" জন্য প্রতিটি সংবাদপত্রই ধিক্কার জানায়। 'সত্যযুগ' পত্রিকায় প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লেখেন, "এরা জননীর জঠরের লজ্জা।" ২৩ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদের একাংশ ঃ

"বস্তুত মনুমেন্টের পাদদেশে প্রতিরোধ কমিটির আহ্বান সমবেত ৫০ জন বিক্ষোভকারীর তুলনায় সাদা পোষাকের পুলিশই এইদিন ময়দানে উচ্ছৃঙ্খল জনতার সৃষ্টি করিয়াছিল বলা যায়। থানায় থানায় যাহারা উর্দি পরিয়া পুলিশি মেজাজ দেখায়, উর্দি ফেলিয়া তাহারাই এই জনতার সৃষ্টি করে এবং মাকড়সার মতো জাল ফেলিয়া শিকার সন্ধানে ফিরিতে থাকে।" পুলিশের নির্মম প্রহারের ফলে বর্ষীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সত্যপ্রিয় ব্যানার্জিও আহত হন।

এত ব্যাপক ও গভীর এবং বহুলাংশে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের পূর্বে দেখা যায়নি। অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও তাঁর সহকর্মীরা পরিস্থিতির সামাল দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ডাঃ রায়কে তাঁর বিদেশের কর্মসূচী বাতিল করে দেশে ফিরে আসতে হয়। ফিরে এসেই মুখ্যমন্ত্রী বর্ধিত ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি বাতিল

বলে ঘোষণা করেন, সাংবাদিক নিগ্রহ ও ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রশ্ন নিয়ে বিচার বিভাগীয় নির্দেশ দেন। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়।

বিধানসভায় বিরোধীরা কয়েকবারই তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন করেন। সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ নিয়ে গঠিত কমিশনের প্রতিবেদনে পুলিশকে নির্দোষ বলে রায় দেওয়া হয়। বিরোধী সদস্যদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও ট্রামভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করতে সরকার রাজি হয়নি। বিধানসভায় হেমন্তকুমার বসুর এক প্রশ্নের উত্তরে বিধানচন্দ্র রায় জানান, এই আন্দোলনে ৪৬৯০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ১৫০৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং ২৩৯ জন শাস্তি পেয়েছেন। মণিকুন্তলা সেন এক বেসরকারি প্রস্তাব এনে অত্যাচারী পুলিশ কর্মীদের শাস্তির দাবি জানান কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এই দাবি নাকচ করে দেন।

জ্যোতি বসুর মতে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন বিভিন্ন প্রশ্নের ওপর বাম ঐক্যকে শক্তিশালী ও সংহত করার ভিত্তি প্রস্তুত করে। এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত লোকসভার দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনের ফলাফলে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ফলে এই শূন্য আসনের নির্বাচনে সিপিআই প্রার্থী সাধন গুপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইন বিশেষজ্ঞ কংগ্রেস প্রার্থী রাধাবিনোদ পালকে ২২ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে লোকসভায় নির্বাচিত হন। জনসংঘ ও অন্যান্য প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। এই নির্বাচনের পর বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে বিরোধীপক্ষ খাদ্য সমস্যা, পচা চাল ও গম সরবরাহ, সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধি নীতি, পুলিশি অত্যাচার প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করে সরকারকে নাজেহাল করে তোলেন। উল্লেখ্য, এই ঝক্কির মোকাবিলায় কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বিধানচন্দ্র রায়কেই সব কিছু সামাল দিতে দেখা যায়।

১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৮ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষকের ধর্মঘটের ঢেউ বিধানসভাকে উত্তাল করে তোলে। বেতনবৃদ্ধি ও অন্য কয়েকটি দাবি নিয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শিক্ষকরা ধর্মঘট শুরু করেন। ১২ ফেব্রুয়ারি শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হরতালের ডাক দেয় এবং তা সফলও হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাজভবনের সামনে অবস্থানরত শিক্ষকদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরদিন শিক্ষকদের প্রতি সরকারের আচরণের প্রতিবাদে সব বিরোধী সদস্য রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির ভাষণের সময় একযোগে বিধানসভা কক্ষ ত্যাগ করেন। রাজ্যপালের প্রতি অসম্মান নয়, শিক্ষকদের প্রতি সরকারের অনমনীয় মনোভাবের প্রতিবাদেই সভাকক্ষ ত্যাগ বলে জ্যোতি বসু জানান। ১৬ ফেব্রুয়ারি বিধানসভার সামনে এক বিরাট জনসমাবেশে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে, নিহত হন ৬ জন, আহত হন অনেকে। সারা কলকাতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে

যাওয়ায় সরকার সামরিক বাহিনীর সাহায্য নেন, জনপ্রতিরোধও ছড়িয়ে পড়ে। ঐ দিনই জ্যোতি বসু গ্রেপ্তার এড়িয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দেন এবং অধ্যক্ষের আশ্রয় সাহায্য চান। মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে অধ্যক্ষ জ্যোতি বসুকে বিধানসভায় থাকার অনুমতি দেন এবং গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি সব বিরোধী দল থেকেই বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, অধ্যক্ষ কেবলমাত্র জ্যোতি বসুর মুলতুবি প্রস্তাবই আলোচনার জন্য গ্রহণ করেন। যেভাবে সরকার শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া অগ্রাহ্য করে পুলিশি অত্যাচার চালিয়েছেন তার সমালোচনা করে জ্যোতি বসু বলেন, "একদিকে সারা কলকাতা যখন জ্বলছে পশ্চিমবঙ্গের 'নীরো' তখন এই ধ্বংসলীলা অবলোকন করছেন।" একের পর এক বিরোধী সদস্য জ্যোতি বসুর বক্তব্য সমর্থন করেন। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকদের বিড়ম্বিত জীবনের এক মর্মস্পর্শী চিত্র বিধানসভায় তুলে ধরেন। আবেগে আপ্লুত কংগ্রেস সদস্যরা সরকারি নীতি সমর্থন করতে পারেন না, নীরব থাকেন। মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনার জবাব দেন কিন্তু বাদানুবাদ চলতেই থাকে।

১২ দিন কর্মবিরতির পর শিক্ষক ধর্মঘটের অবসান হয়, শিক্ষকদের দাবি দাওয়ার কিছুটা সুরাহা হয়। আটক শিক্ষকরা মুক্তি পান।

লক্ষণীয়, ১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলনের ব্যাপকতা ছিল, জনসমর্থনও ছিল তবে সরকারের মনোভাব পরিবর্তনে এবং আন্দোলনের অবসান ঘটাতে বিধানসভা এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। সংকট নিরসনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এই ভূমিকা বিভিন্ন মহলে সমাদৃত হয়।

দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের সীমানা নিয়ে বিধায়কদের প্রায়শই উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায়। ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার সীমারেখার পরিবর্তন হয়েছে কয়েকবারই। এক সময় বাংলার আয়তন উত্তরভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৮৭৪ সালে শ্রীহট্ট জেলা বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করেন, পরে অবশ্য তা রদ হয়। কিন্তু ১৯১২ সালে বিহার ও ওড়িশা আলাদা প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় বাংলার সীমারেখা আরও সংকুচিত হয়। "বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে" বিভিন্ন অঞ্চল "নির্বাসিত" হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকেও আক্ষেপ করতে দেখা যায়। ১৯৪৭ সালে ভারত দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে বাংলাও দ্বিখণ্ডিত হয়। উদ্বাস্তু সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি সংকুলান নিয়ে বিধানসভায় কয়েকবারই আলোচনা হয়। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতির স্বীকৃতি দিয়ে বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও ওঠে বিধানসভায়। বৈদ্যনাথ ভৌমিক এ নিয়ে ২২ দিনের অনশনও করেন। ৭ মে ১৯৫৩ মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এক বিশেষ মোশন বিধানসভায় উত্থাপন করে, "(১) ভাষা ও প্রশাসনিক

সমস্যার সমাধানের জন্য, (২) পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন সমস্যা সমাধান কল্পে এবং (৩) বিহারের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য, বাংলার সীমানা বৃদ্ধি এবং বিহারের আয়তন খর্ব করার দাবি করেন। বিধানসভায় এই মোশন গৃহীত হয় ; বৈদ্যনাথ ভৌমিকও অনশন ভঙ্গ করেন।[১৩]

ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর যেভাবে দেশকে বিভিন্ন রাজ্যে ভাগ করা হয়, তাতে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। এলোমেলোভাবে রাজ্যের সীমা নির্ধারিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ফজল আলির সভাপতিত্বে "রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন" গঠন করেন। কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা ও মতামত দেওয়ার জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট আইনসভাকে অনুরোধ জানান। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ৫ ডিসেম্বর (১৯৫৫) এক প্রস্তাব পেশ করে দেড় ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় কমিশনের রিপোর্টের বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে বাংলার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার উল্লেখ করে বিহারের মানভূম, সিংভূম ও ধলভূমের কিয়দংশ ও পূর্ণিয়া জেলা বাংলার অন্তর্ভুক্তির দাবি করেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন পশ্চিমবাংলার আয়তন তখন ছিল ৩০,৭৭৫ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ১০ হাজার ৩০৮। প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাছে যে স্মারকলিপি দেয় তাতে বিহার ও আসামের ২২ হাজার বর্গ মাইল ভূমি দাবি করে। বিহার ও আসামে এই অযৌক্তিক দাবির প্রতিক্রিয়াও হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত স্মারকে ৬৮ লক্ষ জনসংখ্যা সমন্বিত ১৫ হাজার বর্গ মাইল বাংলার সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।

বিধানসভায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে পাঁচদিন আলোচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার ও বঞ্চনার অভিযোগ আনেন কংগ্রেস ও বিরোধী উভয়পক্ষের সদস্যরা। ডাঃ রায় কমিশনের রিপোর্টের বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে সুপারিশের অসঙ্গতির দিকে সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আনন্দ গোপাল মুখার্জি (কং) মানভূম জেলা, ধলভূম মহকুমা, পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগনার বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল, আসামের গোয়ালপাড়া, এমনকি ত্রিপুরা রাজ্যকেও পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেন। পুরুলিয়া মহকুমার "চাষ" থানাকে বিহারে রেখে দেওয়ার বিরুদ্ধে অনেকেই সোচ্চার হন। কারণ ওখানকার অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হলেন বাঙালী। টাটা কোম্পানির সুবিধার জন্য বাংলাকে ন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে সদস্যরা অভিযোগ করেন। বিরোধীপক্ষ থেকে জ্যোতি বসু, সুধীর রায় চৌধুরী, বঙ্কিম মুখার্জি, হেমন্ত বসু, রাখহরি চট্টোপাধ্যায়, রণেন সেন, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ ব্যানার্জি প্রমুখ বিতর্কে অংশ নেন। দীর্ঘদিনের স্বীকৃত ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবি থেকে কংগ্রেস সরে আসার দরুনই বাংলা বঞ্চিত হয়েছে বলে বিরোধীরা

অনুযোগ করেন। বঙ্কিম মুখার্জি বলেন, "কেন্দ্রীভূত সেন্টার এবং নামে মাত্র প্রাদেশিক সরকার" এই নীতির ফলে কংগ্রেস ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবি জলাঞ্জলি দিয়েছে। কংগ্রেসের নীতিকে তিনি "নীতিহীনতার নীতি" বলে অভিহিত করেন। তাঁর মনে হয় কমিশনের রিপোর্টের কোন "ডাইরেকশন" নেই কারণ কমিশন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকেই গুরুত্ব দিয়েছে কিন্তু তাও বিজ্ঞানসম্মতভাবে নয়। এতে "মানোপলি ক্যাপিটেলিস্টদের সুবিধা হচ্ছে" বলে তিনি মন্তব্য করেন। জ্যোতি বসুর মতে, ভাষা, ভৌগোলিক নৈকট্য এবং জনগণের ইচ্ছা, এই নীতিগুলি মেনে নিলে রাজ্য পুনর্গঠনের প্রশ্ন আরও ভালভাবে মীমাংসা করা সম্ভব হতো। কিছু কিছু সদস্যের বক্তব্যে উৎকট প্রাদেশিকতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। দীর্ঘ বিতর্কের পর আলোচনার পূর্ণ বিবরণী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বাংলার দাবি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পুনর্বিন্যাসের বিষয় না ভারত সরকার, না বিহার সরকার, কোন মহলেই আমল পায় না। উপরন্তু বিহার বিধানসভা এক প্রস্তাব পাস করে বিহারের ভূমিখণ্ড পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ঘোষণা করেন, পুরুলিয়া, পূর্ণিয়া ইত্যাদি অঞ্চল গত ১২০ বছর ধরে বিহারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে (যদিও আলাদা প্রদেশ হিসেবে বিহার স্বীকৃতি পায় ১৯১২ সালে)। কিষানগঞ্জে ছাত্র বিক্ষোভও হয়। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ (শ্রীবাবু) ২৩ জানুয়ারি, ১৯৫৬ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব আনেন। জওহরলাল নেহরু এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান, কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি দুই মুখ্যমন্ত্রীর "দূরদর্শিতার" প্রশংসা করে। সংযুক্ত প্রদেশের নামকরণও হয়ে যায় — "পূর্বপ্রদেশ"।

সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব প্রায় হঠাৎই জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত হওয়ার প্রতিক্রিয়াও হয় বিরূপ। সারা পশ্চিমবঙ্গ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। প্রখ্যাত সাংবাদিক মোহিতকুমার মৈত্রকে আহ্বায়ক করে কমিউনিস্ট পার্টি, পিএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, এস ইউ সি ইত্যাদি রাজনৈতিক দল "সংযুক্তি বিরোধী কমিটি" গঠন করে। কংগ্রেস কর্মীরাও বাংলা-বিহার সংযুক্তি সমর্থন করতে পারছিলেন না। "বাঙালীর বুদ্ধি, বিহারের পরিশ্রম যুক্ত হলে দেশ বিরাট শক্তিশালী হবে" বলে ডাঃ রায় কংগ্রেস কর্মীদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন কিন্তু সাড়া পান না।[১৪]

বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রীকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়। বিধানসভা ও বিধানপরিষদের যৌথ অধিবেশনের শুরুতেই বিরোধীপক্ষের নেতা জ্যোতি বসু রাজ্যপালকে সম্বোধন করে বলেন, "রাজ্যপাল মহাশয়, আপনার ভাষণ আরম্ভ করার আগে আমরা প্রতিবাদ জানাতে

চাই। বাংলা-বিহার একত্রীকরণ করার পক্ষে এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করার বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব এখানকার মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিয়েছেন আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। এইজন্য আজকের এই সভায় অংশ গ্রহণ করতে পারছি না।" সুধীর রায় চৌধুরী (পিএসপি), বিভূতি ঘোষ (ফরওয়ার্ড ব্লক), জ্ঞানেন্দ্রকুমার চৌধুরী (জনসংঘ) এবং অন্যসব বিরোধী সদস্য জ্যোতি বসুর বক্তব্য সমর্থন করেন এবং সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। বিধানসভায় প্রায় প্রতিদিনই চলে সংযুক্তিকরণ নিয়ে সদস্যদের আবেগ ও উষ্মা জড়িত বক্তৃতা, বিধানসভার বাইরে সমাবেশ, বিক্ষোভ, মিছিল ইত্যাদি।

ডাঃ রায় চাইছিলেন বিধানসভাকে দিয়ে সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নিতে। প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিসও তিনি দেন। ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি আলোচনার দিন ধার্য হয়। নিজ দলের সদস্যদের ওপরও মুখ্যমন্ত্রী নির্ভর করতে পারছিলেন না। জ্যোতি বসুও বিধানসভায় ডাঃ রায়ের কাছে আবেদন জানান এই প্রস্তাব না আনার জন্য। একদিকে নিজ দলের সদস্যদের মনোভাব সম্বন্ধে সন্দেহ অন্যদিকে বিরোধীদের আপত্তি এই অবস্থায় সরকারপক্ষ কৌশলের আশ্রয় নেন এবং এক সুযোগও এসে যায়। এস ইউ সি সদস্য সুবোধ ব্যানার্জি মূল প্রস্তাবের ওপর এক সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। সংশোধনীর মর্মার্থ হলো : ভাষা ও ভৌগোলিক সান্নিধ্যের নীতি কার্যকর করতে এবং বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির অপচেষ্টা বন্ধ করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এই সংশোধনীর ওপর পৃথকভাবে বিধানসভার মতামত নেওয়ার জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ জানান। অধ্যক্ষ এই সংশোধনী ভোট দেন। বিরোধী পক্ষ থেকে কোন ডিভিসন দাবি করা হয় না। ধ্বনি ভোটে সুবোধ ব্যানার্জির সংশোধনী বাতিল হয়ে যায়। সংশোধনী বাতিলের অর্থ বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রশ্নে বিধানসভার সমর্থন আছে বলে সরকার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। মুখ্য সচেতক দেবেন দে এক বিবৃতিতে জানান সংশোধনী বাতিল থেকে এটা স্পষ্ট যে, সংযুক্তিকরণের প্রস্তাবে বিধানসভার সমর্থন আছে, সুতরাং এ বিষয়ে বিধানসভায় আলাদা করে প্রস্তাব নেওয়ার প্রয়োজন নেই। পরদিন কলকাতার একাধিক দৈনিকে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব বিধানসভায় অনুমোদিত হয়েছে বলে ফলাও করে সংবাদ প্রকাশিত হয়। বিরোধীরা এ বিষয়ে বিধানসভার অধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব তুললে অধ্যক্ষ শৈলকুমার মুখার্জি ২৩ ফেব্রুয়ারি এক নজির সৃষ্টিকারী রুলিং দেন। অধ্যক্ষ তাঁর রুলিং-এ বলেন, সুবোধ ব্যানার্জির সংশোধনী প্রত্যাখ্যান করার অর্থ এই নয় যে বিধানসভা বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি সমর্থন করে। নির্ধারিত দিনেই এই আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হবে বলে তিনি জানান। বিধানচন্দ্র রায় অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্তে আরও অস্বস্তিতে পড়েন।[১৫] বিরোধীরা রুলিংকে স্বাগত জানান। সরকার পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। জওহরলাল নেহরুকে লেখা এক দীর্ঘ পত্রে (১লা মার্চ, ১৯৫৬) বিধানচন্দ্র

জানান, বিধানসভায় সংযুক্তিকরণের সমর্থন পাওয়া যায়নি তবে তিনি সংযুক্তির পক্ষে ১৫০ জন কংগ্রেস বিধায়কের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন (ডাঃ রায়ের মতে বিধানসভায় তখন কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা ১৭১) এবং তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস কর্মীরা বিভ্রান্ত ও হতোদ্যম বলে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে জানান।

বিহার বিধানসভা অবশ্য ২৫ ফেব্রুয়ারি সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব ১৫৭-২৫ ভোটে অনুমোদন করে দেয়। বিহারের জনমত মোটামুটিভাবে সংযুক্তিকরণের পক্ষে ছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। বিহার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক যোগীন্দ্র শর্মা এবং পশ্চিমবঙ্গ কমিটির তৎকালীন সম্পাদক জ্যোতি বসু এক যুক্ত বিবতিতে এই প্রস্তাব প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্রবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে বলেন, বিভিন্ন ভাষাভাষী রাজ্যের একত্রীকরণে সংহতি তো আসেই না, বরঞ্চ বিভেদের প্রবণতা বাড়ে। তাঁদের আশঙ্কা হয়, "সংযুক্তিকরণের ফলে জাতীয় ঐক্য সম্প্রসারিত হওয়া দূরে থাক, এর দ্বারা বিহারী বঙ্গবাসী বিরোধ সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে। অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপট বিহার কলকাতার ভারতীয় ও বিদেশী পুঁজিপতিদের অবাধশোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হবে।"[১৬]

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার এবং তারপরই সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব, এই দুয়ের বিরুদ্ধে প্রায় চারমাসব্যাপী চলে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক গণ বিক্ষোভ, মিছিল-মিটিং, আইন অমান্য আন্দোলন, সত্যাগ্রহ ইত্যাদি। ২১ ফেব্রুয়ারি সারা পশ্চিমবঙ্গে হরতাল পালিত হয়। বিধানসভার ভিতরেও প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়, মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়, কৈফিয়ত দিতে হয়। ইতিমধ্যে মেদিনীপুরের খেজুরি উপনির্বাচনে বিভিন্ন বামপন্থী দল সমর্থিত প্রজা-সমাজতন্ত্রী প্রার্থী লালবিহারী দাস ২০ হাজার ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করেন। আসনটি কংগ্রেসের দখলেই ছিল। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহার মৃত্যুতে লোকসভার উত্তর-পশ্চিম সংসদীয় আসনটিও শূন্য হয়। এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সংযুক্তি প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক মোহিত মৈত্র কংগ্রেস প্রার্থী অশোক সেনকে ৩৩ হাজার ৭৩ ভোটে পরাজিত করে লোকসভায় নির্বাচিত হন। মোহিত মৈত্র পান ৮৪,৯৫৩ ভোট, অশোক সেন ৫১,৮৮০।

সংযুক্তির বিষয়ে এই নির্বাচনী রায়ের প্রতিক্রিয়া হয় তাৎক্ষণিক। নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করেন, নির্বাচনে যেহেতু সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে জনমত প্রতিফলিত হয়েছে, সেজন্য তিনি বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ডাঃ রায় একাই নেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বা দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে কোন পরামর্শই তিনি করেন না। এভাবে সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হওয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ

পন্থ ক্ষোভও প্রকাশ করেন। 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় 'সংযুক্তির সমাধি' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয় : "অবশেষে দম্ভের দুর্গটি একেবারেই ধসিয়া পড়িল।" বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এইভাবেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৫৬ সালের জুন মাসেই ৪৯ ধারা সম্বলিত বিহার পশ্চিমবঙ্গ (অঞ্চল হস্তান্তর) বিল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব ৬ জুলাই বিধানসভায় গৃহীত হয়। কংগ্রেস ও বিরোধীপক্ষ মিলিয়ে মোট ১৪ জন বিলের আলোচনায় অংশ নেন। শেষ পর্যন্ত বিহারের ২৯০০ বর্গ মাইল এলাকা (১৪ লক্ষ লোকসংখ্যা) পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়, পুরুলিয়া ও বিহারের ইসলামপুর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজ্য বিধানসভা ও লোকসভার (পশ্চিমবঙ্গে) আসন সংখ্যা বেড়ে হয় যথাক্রমে ২৫২ ও ৩৬। বিহারের পুরুলিয়া জেলার ৮ জন বিধায়ক পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সমাপ্তি অধিবেশনে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেস দলের ৩ জন, ৪ জন বিরোধীপক্ষে এবং ১ জন স্বতন্ত্র।

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দশকে পশ্চিমবঙ্গে যে সব আন্দোলন হয় তার মধ্যে সংযুক্তি-বিরোধী আন্দোলন নানা দিকে বিশিষ্টতা দাবি করতে পারে।

প্রথমত, এই আন্দোলন ছিল ব্যাপক ; সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ থেকে ছাত্র-যুবা-মহিলা-শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী সাংসদ বিধায়ক সহ প্রায় ৩০ হাজার সত্যাগ্রহী আইন অমান্য করেন, এঁদের মধ্যে অনেকে কারাবরণও করেন। আইন অমান্য শুধু কলকাতায় নয়, জেলা ও মহকুমা শহরেও ছড়িয়ে পড়ে। তিন বছর আগে ১৯৫৩-তে হয় এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে শিক্ষক আন্দোলন কিন্তু ব্যাপ্তি ও গভীরতায় সংযুক্তি-বিরোধী আন্দোলন ছিল অন্য ধাঁচের ও ভিন্ন মাপের। এমন প্রত্যয়সিদ্ধ কিন্তু সংযমী আন্দোলন ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, অভূতপূর্ব জনজোয়ারও পরিলক্ষিত হয় এই আন্দোলনে। এক কথায় গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংযুক্তি-বিরোধী আন্দোলন এক নতুন পথ নির্দেশ করে। বঙ্গকেন্দ্রিক আন্দোলন অন্য রাজ্যের অনুকরণীয় হয়।

দ্বিতীয়ত, আন্দোলন ছিল একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে। অন্য রাজ্যের ভূখণ্ডের দাবি নিয়ে। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল ভাষা, ছিল বাঙালীমনস্কতা। কিছুটা ভাবাবেগ যে ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। "বাঙালির আঁতে ঘা দিয়েছেন ডাঃ রায়", এ-অভিযোগও ওঠে বিধানসভায়। কিন্তু অন্তত আন্দোলনের স্তরে বাঙালী-বিহারী প্রশ্ন ওঠেনি। প্রাদেশিকতার প্রশ্ন প্রশ্রয় পায়নি। আন্দোলনের নেতৃত্ব ঘোষণা করেন, এই আন্দোলন অন্য কোন রাজ্যের জনসাধারণের বিরুদ্ধে নয়। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের

পক্ষে। যাঁরা সত্যাগ্রহ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অল্প হলেও একটা অংশ ছিলেন অবাঙালী।

তৃতীয়ত, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের যে দাবি দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় কংগ্রেস করে আসছিল, সেই দাবি থেকে কংগ্রেস ক্রমশ সরে আসে। বিভিন্ন রাজ্য একত্রীকরণের দিকেই কংগ্রেসের ঝোঁক লক্ষ করা যায়। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনও ভাষার প্রশ্নকে অগ্রাধিকার না দিয়ে প্রশাসনিক ও অন্যান্য মাপকাঠিকেই প্রাধান্য দেয়। সংযুক্তি-বিরোধী আন্দোলন কিন্তু রাজ্য পুনর্গঠনে ভাষার প্রশ্নকেই অগ্রাধিকার দেয়। দ্বিভাষিক ও বহুভাষিক রাজ্য যে রাজনৈতিক সুস্থিরতা ও জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী আন্দোলনের মঞ্চ থেকে তা ঘোষণা করা হয়। বিধানসভায় ঐ সময়ই দার্জিলিংকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার দাবি ওঠে এবং তা উত্থাপন করেন জ্যোতি বসু।

চতুর্থত, বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রবক্তা ও রূপকার ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। সংযুক্তির সিদ্ধান্ত তাঁর একার, একে কার্যকর করার দায়িত্বও নেন তিনি এবং এই প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয় তাঁর একক সিদ্ধান্তে। "বাংলাদেশের মানুষের মত নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। আমাদের সঙ্গে আইনসভায় পরামর্শ করার প্রয়োজন হলো না। .....বাংলার ওপর জোর করে এই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে বাংলাকে অবলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।" এই ধরনের অভিযোগ আসে বিধানসভায় ডাঃ রায়ের বিরুদ্ধে। ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্য বিভূতি ঘোষ হুমকি দেন, "ডাঃ রায় আগুন নিয়ে খেলছেন, এই আগুনেই তাঁর হাত-পুড়ে যাবে।" বস্তুত, বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে পুরো ঝক্কির মোকাবিলা করতে হয় একা মুখ্যমন্ত্রীকেই। কংগ্রেস কর্মীদেরও প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল এই আন্দোলনে। যে ক'জন বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির সমর্থন করেন, জনরোষের মুখে তাঁরাও হাত গুটিয়ে নেন। কংগ্রেস যে দু'-তিনটি সভা করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে তা থেকে অনুপস্থিত থাকেন। শোভাবাজার রাজবাড়িতে সংযুক্তির সমর্থনে এক সভা হয়। একমাত্র বিমলানন্দ তর্কতীর্থ ছাড়া প্রথম সারির কোন কংগ্রেস নেতাই সেই সভায় উপস্থিত থাকেন না। সভায় ডাঃ রায়কে খুবই হেনস্তা হতে হয়। সাদা পোশাকের পুলিশের সাহায্যে তিনি সভাস্থল ত্যাগ করেন। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতি বিধানচন্দ্র রায়ের দায়বদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায় যখন লোকসভার উপনির্বাচনের ফলাফল দেখে এই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ তিনি প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, জনমতের কাছে নতি স্বীকার করেই এই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। গণ অভিব্যক্তির প্রতি সম্মান জানাতে তাঁর দ্বিধা ছিল না।

মনে রাখা দরকার কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতারাও একসময় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিহারের ভূখণ্ড পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তরের বিষয়ে টালবাহানা করছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের হুমকি, চাপ ও দিল্লি-কলকাতা সংযুক্তি-

বিরোধী আন্দোলনের ব্যাপকতা কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবে পরিবর্তন আনে এবং বিহারের ভূখণ্ড বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

খাদ্য সংকট, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, শ্রমিক-ধর্মঘট, বেকারী, কৃষক, বিক্ষোভ, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, গোয়া মুক্তি আন্দোলন ইত্যাদি বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে এই পর্বের বিধানসভাকে উত্তাল হতে দেখা যায়। বিশেষ করে খাদ্য সংকট ও তজ্জনিত সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি তখন অগ্নিগর্ভ। স্বাধীনতার পর প্রথম এক দশক পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। শস্য উৎপাদনে যথেষ্ট ঘাটতি থেকে যায়। দ্রব্যমূল্য হ্রাস এবং সস্তাদরে খাদ্য ও রিলিফের দাবিতে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা প্রায়শই বিধানসভার সামনে বিক্ষোভ দেখান। বিধানসভায়ও এ নিয়ে সদস্যদের অভিযোগ করতে দেখা যায়, বাদানুবাদ হয়। ১৯৫৩ সালে চালের দাম সের প্রতি ৭ আনা (৪৩ পয়সা) থেকে বেড়ে ৯ (৫৬ পয়সা) আনা হয়। কাঁকর ও ধুলো ভর্তি থাকে চালে। বিরোধীরা এত দাম দিয়ে অখাদ্য চাল পরিবেশনের জন্য খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে বিধানসভায় হেনস্তা করেন। প্রফুল্ল সেন জানান, চাল থেকে কাঁকর বাছাইয়ের জন্য মেশিন আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। দাশরথি তা (পি এস পি) বলেন, শোনা যাচ্ছে চাল থেকে কাঁকর বাছাইয়ের নয়, চালে কাঁকর মেশানোর যন্ত্র সরকার থেকে আনা হচ্ছে। সভায় হাস্যরোল ওঠে। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় জানতে চান একসের চালে কত ছটাক খুদ ও কত ছটাক কাঁকর মেশানো হয়। প্রফুল্ল সেন জবাব দেন, "কাঁকরের পরিমাণ খুবই কম।" মণিকুন্তলা সেন অভিযোগ করেন কাঁকর বাছার কাজে গৃহবধূদের কত সময় ও পরিশ্রম লাগছে, খাদ্যমন্ত্রী তা ভেবেছেন কি? প্রফুল্ল সেনের জবাব "ভাল জিনিস খেতে গেলে সময় লাগে ভাবলে চলবে কেন?" জ্যোতি বসু একদিন বিধানসভায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, কাঁকরের চাল খেয়ে লোকের পেটের গোলমাল বাড়ছে। ডাক্তার রায় জবাব দেন—চিকিৎসকরা বলছেন তাঁরা রোগী পাচ্ছেন না। প্রত্যুত্তরে জ্যোতি বসু বলেন টাকা নেই সেজন্য লোক ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন না। এই ধরনের হালকা বাদানুবাদ ছাড়া খাদ্য সমস্যা নিয়ে বিধানসভায় বাক-বিতণ্ডা এক এক সময় চরম পর্যায়ে পৌঁছয়, প্রতিবাদে বিরোধীরা ওয়াক-আউট করেন।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ছাঁটাই, শ্রমিক ধর্মঘট উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নিয়ে রায় মন্ত্রিসভা তখন নাজেহাল। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে নেহরু ডাঃ রায়কে চিঠি দেন, যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। জবাবে মুখমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আড়াই লক্ষ বেকার, এর মধ্যে দেড়লক্ষ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত, বাকি একলক্ষ শ্রমিক। মধ্যবিত্ত বেকারের মধ্যে আবার সত্তর হাজার পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থী। শিল্প ও বিদ্যুৎ শক্তির প্রসার ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা

বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী উষ্মা প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 'মাসুল সমীকরণ' নীতি প্রচলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবিকাশ ব্যাহত হয়, আর্থিক দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রেলপথে লোহা ও ইস্পাত পরিবহনের খরচ সারা ভারতে এক করে দেওয়া হয় কিন্তু কাঁচামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে বৈষম্য থেকে যায়। বিরোধীরা এই বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হলেও কংগ্রেস দলকে সোচ্চার হতে দেখা যায় না।

ভারতীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপে ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া মুক্ত হয় কিন্তু তার থেকে আগে ১৯৫৫ সাল থেকে বিধানসভায় গোয়াকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করার বিষয়ে বিধায়করা সোচ্চার হন। গোয়া মুক্তি আন্দোলনের স্তরে অন্যান্যদের মধ্যে বাংলার সত্যাগ্রহী নিত্যানন্দ সাহা পুলিশের গুলিতে নিহত হন, আর এস পি নেতা ও লোকসভা সদস্য ত্রিদিব চৌধুরী বেশ কিছুদিন গোয়ার কারাগারে আটক থাকেন। ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ জ্যোতি বসু ত্রিদিব চৌধুরীর মুক্তির ব্যাপারে ভারত সরকারকে সচেষ্ট হতে অনুরোধ জানিয়ে বিধানসভায় এক প্রস্তাব আনেন। কংগ্রেস সদস্যরা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন কিন্তু কমিউনিস্ট কর্মী নিত্যানন্দ সাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিমুখ হন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের বিপর্যস্ত অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্ব পায় (সারণি-২)। আকাশবাণীতে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ঘোষণা করেন, পরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বছরে (১৯৫১-১৯৫৬) মোট ব্যয় ধার্য হয়েছে ৬৯.১ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনা নিয়ে বিধানসভায় অবশ্য কোন আলাপ আলোচনা হয় না। সদস্যরা কয়েকবারই আলোচনার দাবি করেন, কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বিধানসভার নেতা হিসেবে ডাঃ রায়কে চিঠিও দেওয়া হয় কিন্তু কোন ফল হয় না। তবে বিধায়করা রাজ্যপালের ভাষণের ওপর আলোচনায় এবং বাজেট নিয়ে বিতর্কের সময় প্রসঙ্গক্রমে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিষয় অবতারণা করেন কিন্তু তা হয় ভাসাভাসা, মামুলি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী (১৯৫৬-১৯৬১) পরিকল্পনার খসড়া রচনার সময় বিধায়করা, বিশেষ করে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় আরও সোচ্চার হন এবং বিধানসভায় আলোচনা দাবি করেন। ডাঃ রায় প্রথমে রাজি হন না, পরে অবশ্য বিধায়কদের দাবি মেনে নিয়ে ২০ জুলাই (১৯৫৬) তিনি পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন এবং তা নিয়ে বিধানসভায় আলোচনাও হয়।[১৭]

ডাঃ রায় বিধানসভাকে জানান, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট খরচ হয়েছে ৭২.২৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে শতকরা ৪৩ ভাগই ব্যয় হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন, আবাসন ইত্যাদি সামাজিক পরিষেবায়, পরিবহন ও যোগাযোগে ২২ ভাগ, সেচ ও শক্তি খাতেও ২২ ভাগ, কৃষিতে ১১ ও শিল্পে মাত্রা ২ ভাগ। বিভিন্ন খাতে খরচের যথার্থতা বিশ্লেষণ করে মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন, পরিকল্পনায় মাথাপিছু

বার্ষিক ব্যয় ১২ টাকা, যা খুবই নগণ্য। ডাঃ রায় বিধানসভাকে আরও জানান ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সরকারি ভাণ্ডার ছিল প্রায় শূন্য। ঐ সময় থেকে ৩১ মার্চ, ১৯৫৬ পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে খরচ হয়েছে ৯৯.৯ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য ধার্য হয় ১৫৮ কোটি টাকা। এবারও গুরুত্ব পায় সামাজিক পরিষেবা, সেচ ও শক্তি, সমবায় ও সমাজ উন্নয়ন এবং শিল্প ও খনি। জাতীয় আয় বৃদ্ধি, ভারী ও মৌল শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিল্পায়ন, ধন-বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখেই দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভাকে জানান।

আলোচনার সূত্রপাত করে জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সমস্যার চেয়ে পৃথক তার উল্লেখ করেন এবং প্রথম পরিকল্পনায় প্রাপ্তি ও ঘাটতি দুইয়েরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। তিনি স্বীকার করেন পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হওয়ার সময় যে সংখ্যক কলকারখানা ছিল, পরিকল্পনার শেষে তার সংখ্যা নিশ্চয়ই বেড়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে এই পরিকল্পনা কতটুকু সফল হয়েছে তা পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি সহমত পোষণ করেন কিন্তু খসড়া চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর বিধানসভাকে জানানোর জন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জ্যোতি বসুর দীর্ঘ বক্তৃতা হয় সমালোচনা-মূলক কিন্তু রচনাত্মক। সদস্যরা সাধুবাদ জানান। ড. অতীন বসু, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত বসু, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রকুমার চৌধুরী, প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং দুর্বলতাও। কীভাবে কেন্দ্রীয় প্রাধান্যের ফলে রাজ্যের ক্ষমতা সংকুচিত হচ্ছে সারকারিয়া কমিশনের (১৯৮৭) কিছু কিছু সুপারিশ তা দেখানো হয়েছে। বস্তুত কেন্দ্রীয় আধিপত্যের সূত্রপাত হয় পাঁচের দশকেই। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে রাজ্যকে সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয় তৃতীয় সংবিধান সংশোধনী বিল পাসের প্রক্রিয়া থেকে। ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফসিলে যুগ্ম তালিকায় (৩৩ নং) কিছু কিছু শিল্পজাত দ্রব্য—কাঁচা পাট, তুলো, তুলোবীজ, ভোজ্য তেল, খৈল ইত্যাদির উৎপাদন ও বিলি বণ্টন রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। তৃতীয় সংশোধনী বিল পাস করে এই বিষয়গুলি কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু সংবিধানের ৩৬৮ ধারা অনুযায়ী এই হস্তান্তরের জন্য ন্যূনতম অর্ধেক রাজ্যের অনুমোদন প্রয়োজন, সেজন্য অন্যান্য রাজ্যে আইনসভার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কাছেও এই বিল পাঠানো হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫ মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন, বিরোধীপক্ষ থেকে তীব্র আপত্তি আসে। বঙ্কিম মুখার্জি ও অন্যান্যরা এইভাবে রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস করার সমালোচনা করেন। বাদানুবাদ হয়। কংগ্রেস

সদস্যদেরও খুব একটা সায় ছিল না কিন্তু দলীয় নির্দেশ তাদের মেনে চলতেই হয়। প্রস্তাব ১১৮-৪৪ ভোটে পাস হয়ে যায়। ১৮ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় জওহরলাল নেহরুকে দুর্গাপুর প্রজেক্ট নিয়ে কেন্দ্রীয় টালবাহানার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় অনুমোদন যাতে শীঘ্র পাওয়া যায় তার জন্য নেহরুকে সচেষ্ট হতে অনুরোধ জানান। এই চিঠিতেই ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেন বিরোধিতা সত্ত্বেও তৃতীয় সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব বিধানসভাকে দিয়ে পাস করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ করতে হয়, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবিকাশ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কর্মসূচী নেওয়া হয় এই পর্বে। দুর্গাপুর কোক প্ল্যান্ট, হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ, হলদিয়া শিল্প নগরী, সল্ট লেক, ময়ূরাক্ষী ক্যানেল প্রকল্প ইত্যাদি রূপায়ণের সিদ্ধান্ত হয় প্রথম বিধানসভার আমলে। ভারতের তৃতীয় ইস্পাত কারখানা দুর্গাপুরে স্থাপনের প্রস্তাবে ভারত সরকারের মনোভাব প্রথমে ইতিবাচক না হওয়ায় বিধানসভায় এ নিয়ে আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাস হয়। মুখ্যমন্ত্রী এ নিয়ে দিল্লিতে জোর তদ্বির করেন ; নেহরুকে লেখেন, কৃষ্ণমাচারীকে বারবার তাগাদা দেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টি টি কৃষ্ণমাচারী জানান, তৃতীয় ইস্পাত কারখানা দুর্গাপুরেই স্থাপিত হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অস্বীকার করা যায় না, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর পাঁচের দশকে বাঙালী জীবনে অস্থিরতা ছিল, না পাওয়ার বিক্ষোভ ছিল, সুবিধাভোগীদের দাপট ছিল, সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না ; কিন্তু প্রতিরোধ ছিল, আন্দোলনও ছিল। বাংলার রাজনীতি ছিল বহুলাংশে স্বচ্ছ, এত চতুরতা ছিল না। ক্ষমতাসীন দলের দু'-এক জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আসত বিধানসভায় (দ্রষ্টব্য সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পদত্যাগকালীন বিবৃতি) কিন্তু এই অভিযোগের আঁচড় থেকে অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্য এবং কমিউনিস্ট বামপন্থী-প্রজাসমাজতন্ত্রী দল মুক্ত ছিলেন। আয়ারাম-গয়ারামের রাজনীতিও তখন ছিল না, দলত্যাগ-বিরোধী আইন প্রণয়নেরও প্রয়োজন হয়নি। রাজনীতি ছিল বহুলাংশে দ্বিচারিতা মুক্ত, তা সে রাইটার্স বিল্ডিংসে হোক, বা বিধানসভায়ই হোক। স্বাধীনতা আন্দোলনের রেশ তখনও মানুষের মধ্যে গ্রোথিত ছিল, ফলে ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস ছিল। পুনর্বাসনের ত্রুটি ও ঘাটতি সত্ত্বেও ছিন্নমূল লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন নিজেদের উদ্যম ও পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দাদের সহায়তায়। প্রত্যয়সিদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন "জেদি" বিধান রায়কে নতি স্বীকারে বাধ্য করেছিল এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, শিক্ষক আন্দোলন এবং বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি-বিরোধী আন্দোলনে। রাজনীতিতে মূল্যবোধ ছিল, বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে।

সারণি ১

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচন

দলের নাম	বিধানসভা			লোকসভা		
	১৯৫২	১৯৫৭	১৯৬২	১৯৫২	১৯৫৭	১৯৬২
কংগ্রেস	১৫০	১৫২	১৫৭	২৪	২৩	২৩
সিপিআই	২৮	৪৬	৫০	৫	৬	৮
ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসবাদী)	১৪	৮	১৩	২	২	১
কে এম পি পি (পি এস পি)	১৫	২১	৫	x	২	x
আর এস পি	x	৩	৯	১	x	১
জনসংঘ	৯	x	x	২	x	x
হিন্দুমহাসভা	৪	x	x	x	x	x
লোকসেবক সংঘ	x	৬	৪			
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	১৮	১৬	১৪	x	৩	৩
মোট	২৩৮	২৫২	২৫২	৩৪	৩৬	৩৬

'স্বতন্ত্র'-র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত : শরৎচন্দ্র বসুর সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান দল, এস ইউ সি, ফরওয়ার্ড ব্লক (সুভাষবাদী) গোর্খালীগ ইত্যাদি।

সারণি ২

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-১৯৬১)
কোন খাতে কত (কোটি টাকা হিসেবে)

	প্রথম পরিকল্পনা		দ্বিতীয় পরিকল্পনা	
	মোট খরচ	%	মোট খরচ	%
কৃষি	৮.৮৭	১২.৫৬	১৭.৮৬	১১.৩২
সমবায় ও সমাজ উন্নয়ন	x	x	১৬.৬৩	১০.৫৫
সেচ ও শক্তি	১৫.১৭	২১.৪৮	৩০.৩৪	১৯.২৪
শিল্প ও খনি	১.২০	১.৭৫	৯.৪৪	৫.০৮
পরিবহন ও যাতায়াত	১৫.২৩	২১.৫১	১৯.৪৭	১২.৩৫
সামাজিক পরিষেবা	৩০.১৫	৪২.৭০	৫৫.৩৪	৩৭.৬৪
বিবিধ	x	x	৮.১৯	২.৯২
মোট	৭০.৬২	১০০	১৫৭.৬৭	১০০

লক্ষণীয় প্রথম পরিকল্পনায় শিক্ষা, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি সামাজিক পরিষেবায় ৪২.৭০ ভাগ ধার্য হয়, পরিবহন ও যাতায়াত, সেচ ও শক্তি মিলিয়ে ৪৩ ভাগ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সংসদীয় রাজনীতি ও সংসদ বহির্ভূত রাজনীতি (১৯৫৭-১৯৬২)

অসংযত কিন্তু নিয়মাধীন বিধানসভা

স্বাধীনতার এক দশক পর অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। ইতিমধ্যে প্রতীয়মান হয়, সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও সংসদ ব্যবস্থা ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে। সাংবিধানিক কাঠামোর পরিমণ্ডলে সংসদীয় রাজনীতি ও সংসদ বহির্ভূত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যে উপেক্ষণীয় নয়, এ বোধ বামপন্থী রাজনীতিবিদদের মধ্যে ক্রমশ সমাদৃত হতে থাকে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রশমনে বা সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচীতে সংসদ বা বিধানসভাকে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিধানসভার সাফল্য, বিশেষ করে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহারে বিধানসভার ভূমিকা সারা ভারতে স্বীকৃতি পায়।

১৯৫৭-১৯৬২ পর্বে যে সব বিষয় পশ্চিমবাংলার রাজনীতি প্রভাবিত করে তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল। খাদ্য সমস্যা ও তজ্জনিত আন্দোলন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু প্রেরণ, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ ও পুনর্নির্বাচন, বেরুবাড়ি হস্তান্তর, আসাম দাঙ্গা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, জমিদারি উচ্ছেদ ও ভূমিসংস্কার আইনের প্রয়োগিক ব্যর্থতা, বর্গাদার উচ্ছেদ, উন্নয়নের কর্মসূচী ও অর্থনৈতিক বিকাশের গতি প্রকৃতি নিয়ে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে মতভেদ এবং সর্বোপরি চীন-ভারত সীমানা বিরোধ ও সংঘর্ষ এই পর্বের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। কংগ্রেসের মধ্যে কোন্দল বাড়তে থাকে, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব এই সময় থেকে অনুভূত হতে থাকে।

১৯৫৭-র জানুয়ারি মাস থেকেই দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় মার্চ মাসে। কংগ্রেস দলের প্রার্থী নির্বাচনের দায়িত্ব বর্তায় কার্যত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ওপরই। ডাঃ রায় নির্বাচনী এলাকা সফরের সময় সুটকেশ ভর্তি টাকার নোট নিয়ে যেতেন, নিজেই প্রার্থীর হাতে টাকা তুলে দিতেন বলে তাঁর একান্ত সচিব লিখেছেন।[১] সময় সময় তাঁর সঙ্গে থাকতেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ। বামপন্থী মোর্চা ছিল দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে অনেক সংহত। কমিউনিস্ট পার্টি, প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (আর এস পি), ফরওয়ার্ড ব্লক,

ফরওয়ার্ড ব্লক (মার্কসবাদী) এই পাঁচটি দলের মধ্যে নির্বাচনী আঁতাত হয়। ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে একটি ইস্তাহারও প্রকাশ করেন বামপন্থীরা। ইতিপূর্বে কমিউনিস্ট পার্টিও বিকল্প সরকার গঠিত হলে কী কী কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে সে বিষয়ে ৩৭ দফা এক কর্মসূচী প্রচার করে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিগত পাঁচ বছরের বিভিন্ন সাফল্য, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাপ্তি, শিল্পায়ন এবং আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের কর্মসূচী তুলে ধরা হয় নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে।

কংগ্রেস প্রার্থী দেয় ২৫১টি আসনে, বামপন্থী জোট ২৩৪ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে কংগ্রেস পায় ১৫২টি আসন, ১৯৫২ সালের চেয়ে ২টি বেশি। তবে কংগ্রেসের ভোটের হার বেড়ে যায় ৭ শতাংশ। মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৬.১ ভাগ পায় কংগ্রেস, ১৯৫২ সালে যা ছিল শতকরা ৩৮.৯ ভাগ। শতকরা ভোট বাড়লেও বিধানসভায় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমে যায়। ১৯৫২-র নির্বাচনে বিধানসভায় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল ৬০। ১৯৫৭-তে তা কমে হয় ৫৪।

কমিউনিস্ট দলের আসন ও ভোট বাড়ে। নির্বাচনে কমিউনিস্টদের আসন সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৬ (১৯৫২ সালে ২৮) ও শতকরা ১৭.৮ ভাগ ভোট (১৯৫২ সালে শতকরা ১০.৮ ভাগ)। কমিউনিস্ট দল সমর্থিত তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থীও নির্বাচনে জয়লাভ করেন। প্রজা সোস্যালিস্ট দল পায় ২১টি আসন ও শতকরা ৯.৫ ভাগ ভোট। ফরওয়ার্ড ব্লক মার্কসবাদীর আসন সংখ্যা হয় ৮, ভোট শতকরা ৩.৮ ভাগ, আর এস পি দলের আসন হয় ৩ ও ভোট শতকরা ১:২ ভাগ। উল্লেখ্য, সম্মিলিত বামপন্থী জোট ১৯৫৭-র নির্বাচনে শতকরা ৩৬.৮ ভাগ ভোট পায় যা ১৯৫২ সালে ছিল ২৭.৫ ভাগ। সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার পায় ২টি আসন ও শতকরা ০.৭৫ ভাগ ভোট। বিহার থেকে কয়েকমাস আগে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত পুরুলিয়ার ৬টি আসন পায় লোকসেবক সংঘ। শেষ পর্যন্ত বিধানসভায় কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থনকারী সদস্যদের সংখ্যা দাড়ায় ৫১ এবং সব মিলিয়ে বিরোধীপক্ষের দিকে আসেন ৯৯ জন সদস্য।

মোট আসনের শতকরা ৬০ ভাগই পায় কংগ্রেস। মফস্বল ও গ্রামীণ এলাকায় কংগ্রেসের সমর্থন অটুট থাকে। গ্রামাঞ্চলে যে সামাজিক শক্তির ওপর কংগ্রেসের "ভোট ব্যাঙ্ক" নির্ভরশীল ছিল তাতে কোন ফাটল ধরেনি। পক্ষান্তরে সিপিআই উদ্বাস্তু ও শ্রমিক প্রধান এলাকা থেকেই আসন পায়, গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্ট দল আগের মতই দুর্বল থেকে যায়, প্রভাব প্রসারিত করতে সক্ষম হয় না। ৪৬টি আসনের মধ্যে সিপিআই ২৮টি আসনই পায় কলকাতা (১০), হাওড়া (৪) ও ২৪ পরগনা (১৪) থেকে।

১৯৫৭-র নির্বাচনের অপর বৈশিষ্ট্য হলো, জনসংঘ ও হিন্দুমহাসভার শোচনীয় পরাজয় ও প্রভাবের বিলুপ্তি। ১৯৫২-র নির্বাচনে জনসংঘ পেয়েছিল ৯টি আসন এবং ৬·১ ভাগ ভোট, হিন্দুমহাসভা ৪টি আসন ও ২·৮ ভাগ ভোট। ১৯৫৭-র নির্বাচনে এই দুই দল কোন আসনই পায় না ; জনসংঘ পায় শতকরা ১ ভাগের কম ভোট ; হিন্দুমহাসভার ভোট ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না, ০·২৫ ভাগ। লক্ষণীয়, কংগ্রেসের ভোট বাড়ে শতকার ৭ ভাগ এবং তার প্রায় পুরোটাই আসে এই দুই দলের ভোট থেকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা। মূলত তাঁকে কেন্দ্র করেই এই দুই দলের সাফল্য আসে ১৯৫২-র নির্বাচনে। সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দুত্বের আবেগ কোনদিনই বাঙালী মানসে স্থান পায়নি, স্বভাবতই শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর ভোটারদের কাছে জনসংঘের গ্রহণযোগ্যতার অবসান ঘটে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বৌবাজার কেন্দ্র থেকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা মহম্মদ ইসমাইলের চেয়ে ৫৪০ ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হন। জ্যোতি বসু বরানগর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী কানাইলাল ঢোলকে ৯,৪১৫ ভোটে পরাজিত করেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে পরাজিত খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ১৯৫৭-তে ৩২ হাজার ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের আর যাঁরা নির্বাচিত হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিমলচন্দ্র সিংহ, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, ডাঃ আর. আহমেদ, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিজয় সিংহ নাহার, নিশাপতি মাঝি প্রমুখ। প্রজা সোস্যালিস্ট দলের ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর রায় চৌধুরী, ফরওয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত বসু, ড. কানাইলাল ভট্টাচার্য, এস ইউ সি-র সুবোধ ব্যানার্জি, সিপিআই-র জ্যোতি বসু, সোমনাথ লাহিড়ী, বিনয় চৌধুরী, বঙ্কিম মুখার্জি, মণিকুন্তলা সেন, আর এস পি-র যতীন চক্রবর্তী, প্রমুখ বিধানসভায় নির্বাচিত হন। কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা নির্বাচিত হন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে। মুর্শিদাবাদ নবাব পরিবারের সৈয়দ কাজেম আলি মির্জা নির্বাচিত হন কংগ্রেস টিকিটে। নাড়াজোলের রানী অঞ্জলি খাঁও নির্বাচিত হন কংগ্রেস প্রার্থী রূপে।

সংসদীয় ব্যবস্থায় আইনসভা সদস্যদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি একদিকে যেমন সমাজে তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির নির্দেশ দেয়, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি বহুলাংশে নির্ধারিত হয় সদস্যদের এই অবস্থান দ্বারা। ১৯৫৭-১৯৬২ পর্বে বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থান, সামাজিক সম্পর্ক, গোষ্ঠীগত স্বার্থ ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা শুধু আইন প্রণয়নই নয়, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণেও বিশেষ ভূমিকা নেয়। ২৫২ জন সদস্যের পেশা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করলে তাঁদের সামাজিক অবস্থানের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়।[২]

(ক) সদস্যদের পেশাগত বিভাজন

চিকিৎসক	২৭	ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও নেতা	১৭
আইনজীবী	৩২	ব্যবসায়ী	১৫
রাজনৈতিক ও		প্রশাসক	৪
সামাজিক কর্মী ও নেতা	৬৭	কেরানী	৪
শিক্ষক	৩১	ইঞ্জিনীয়ার	২
কৃষক	২৪	সাংবাদিক	৪
জোতদার	৫	ভূমিহীন চাষী ও ক্ষেতমজুর	১
জমিদার (ভূতপূর্ব)	৮	তথ্য নেই	১১

(খ) শিক্ষাগত মান

স্নাতকোত্তর	৩৮	এম এল এফ (চিকিৎসা)	
(বিজ্ঞান, কলা, চিকিৎসা)		বি.এইচ.এম. এস. (হোমিও)	৯
স্নাতক	৫১	প্রাক স্নাতক	৪৯
(কলা, বিজ্ঞান)		প্রাথমিক শিক্ষা ও তদূর্ধ্ব	৪৮
স্নাতক (চিকিৎসা)	১৮	তথ্য নেই	৩৯

স্পষ্টতই দেখা যায় রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও নেতা এবং আইনজীবীরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁদের অনেকের সঙ্গেই যুক্ত ছিল আত্মত্যাগের কাহিনী, ছিল স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন বেশ কয়েকজন এবং তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দলে। চিকিৎসক, আইনজীবী ও শিক্ষক বিধায়কদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নিজ নিজ পেশায় সফল ও খ্যাতিমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন অন্তত তিনজন, ছিলেন প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকা। কলেজ শিক্ষকদের অনুপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। বেশ কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য ছিলেন মিউনিসিপ্যাল ও লোকাল বোর্ডের পদাধিকারী। প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন ভারতছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২) ও আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০) অংশগ্রহণকারী ও দণ্ডপ্রাপ্ত। কমিউনিস্ট দলে ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের মত আন্দামান ফেরত রাজবন্দী। ডাঃ জ্ঞান মজুমদারের মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (এম আর সি পি, এফ আর সি এস ডিগ্রীধারী) ও বেশ কয়েকজন আইনজীবীও ছিলেন কমিউনিস্ট দলে। ফরওয়ার্ড ব্লকে ছিলেন হেমন্ত বসুর মত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও অভিজ্ঞ বিধায়ক। ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্যও এই দলে ছিলেন।

জমিদারি প্রথা বিলুপ্তি ও ভূমিসংস্কার আইন পাস হলেও জমিদারদের প্রভাব এবং সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি এই পর্বে অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে জমিদার হিসেবে চিহ্নিত হতে এদের ছিল অনীহা, এরা নিজেদের পরিচয় দেন "ভূতপূর্ব জমিদার" হিসেবে। বিধানসভার সদস্য এই ধরনের আটজন জমিদারই ছিলেন কংগ্রেস দলভুক্ত। জমিদার ছাড়া বৃহৎ জোঁতের মালিকরাও ছিলেন কংগ্রেস দলে। গ্রামাঞ্চলে এরাই ছিলেন কংগ্রেসের শক্তির উৎস। তাছাড়া কৃষক হিসেবে যারা নিজেদের চিহ্নিত করেন তাদের মধ্যেও অনেকে ছিলেন জোতদার। কোন কোন জমিদারও আবার নিজেদের সামাজিক কর্মী হিসেবে পরিচয় দেন। যেমন, নাড়াজোলের রানী অঞ্জলি খাঁ। স্বভাবতই এই পর্বে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে জোতদার ও জমিদার লবির বিশেষ ভূমিকা ছিল। ব্যবসায়ী ছিলেন প্রায় সব দলেই। কংগ্রেস দলেই বেশি, সিপিআই, পিএসপি ও ফরওয়ার্ড ব্লকে ১ জন করে।

ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার জটিলতার জন্য দরিদ্র, নিঃস্ব ও নিম্নবর্গীয় পরিবারভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সংসদ বা বিধানসভায় সদস্যপদ লাভ করা খুবই কঠিন এবং বিরলও। ফলে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় শ্রমজীবী পরিবারের মানুষের সংখ্যা এক আঙুলে গোনার মতও হয় না। যেমন, প্রথম (১৯৫২) ও দ্বিতীয় (১৯৫৭) লোকসভায় 'শ্রমিক' পর্যায়ভুক্ত কোন সদস্যই ছিলেন না ; তৃতীয়তে, (১৯৬২) একজন, চতুর্থ ও পঞ্চমেও কেউ নেই। এখনও প্রায় একই অবস্থা চলছে। একাদশে অবশ্য ৪ জন, অর্থাৎ ০.৭৫ ভাগ। ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাইরন ভীনার পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দলের ৪৩৮ জন রাজনৈতিক নেতার সামাজিক ভিত্তি নিয়ে যে সমীক্ষা করেন তাতে দেখা যায় মাত্র ৬ জন নেতা কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁদের মধ্যে আবার সবাই কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত, কারখানার শ্রমিক কেউই নেই। অন্য সবাই আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী বা ভূম্যধিকারী।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এমন দুজন বিধায়কের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় যাঁরা সংরক্ষিত আসনে এবং নিঃস্ব পরিবার থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এঁদের একজন হলেন কালনা থেকে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সদস্য জমাদার মাঝি, অন্যজন বীরভূমের রায়নগর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য নিশাপতি মাঝি। দয়ালচন্দ্র মাঝির পুত্র জমাদার মাঝি ছিলেন ভূমিহীন চাষী, দিন মজুর। দীর্ঘদিন তিনি বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি-শ্রমিকের কাজ করেছেন। জন্ম বছরও তাঁর জানা ছিল না। বিধানসভায় তিনি খুব সক্রিয় ছিলেন না, অনেকটা বেমানান। কৃষকসভার তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কর্মী, রাজনৈতিক আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। তিনবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়।

কংগ্রেস সদস্য নিশাপতি মাঝি ছিলেন বীরভূমের বনবল্লভপুর গ্রামের বাসিন্দা

অধরচন্দ্র মাঝির পুত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহকর্মী শ্রীনিকেতন পল্লী সংগঠন বিভাগের কালীমোহন ঘোষের সাহচর্য তিনি পান। নিশাপতি মাঝির একজন সহকর্মীর কথায়, "নিশাপতি মাঝি ও আমি শ্রদ্ধেয় কালীমোহনবাবুর ডানহাত ও বামহাত ছিলাম।" বোলপুর শহরের বাধগড়া অঞ্চলকে কেন্দ্র করে পল্লীসংগঠন বিভাগের কাজে তিনি গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়ান। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হন। বিধানসভায় তিনি বেশ সক্রিয় ছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে তাঁকে অংশ নিতে দেখা যায়। বন ও মৎস্য দপ্তরের সংসদীয় সচিব হিসেবে তিনি নিযুক্ত হন। তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল তফসিলী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের সংগঠিত করার কাজে এবং সমবায় আন্দোলনের প্রসারে। বেশ কয়েকটি স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা ও নানা জনহিতকর কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে বোলপুরের বাঁধগড়া অঞ্চলে কৃষি সমবায় সমিতি গঠিত হয় এবং উদ্দেশ্য হিসেবে ফলকে উৎকীর্ণ হয় :

"সমবায় সমিতি চায়—

১। গাঁয়ের ভাল করতে

২। গরিবের ভাল ঘর গড়তে

৩। কারিগরের হেতেরের জোর বাড়াতে

৪। লোকের শরীর ভাল রাখতে

৫। চাষীর হারানো জমি ফিরিয়ে দিতে

৬। গাঁয়ের ক্ষেতের ফল ফসল বেশি ফলাতে

৭। পশু-পাখি বাড়াতে ও মাছের চাষ ছড়াতে

৮। গাঁয়ের লোককে শিখিয়ে পড়িয়ে দুনিয়া চেনাতে তবেই তো ফের বাঁচবে গাঁ নবজীবনের বইবে বা।"[৩]

লক্ষণীয়, চাষীকে জমির মালিকানা, উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও পরিবেশ সম্বন্ধে গ্রামের লোককে সচেতন করার সব কিছুই উৎকীর্ণ ছিল ফলকে। ১৯৬২ সালে ক্যান্সার রোগে নিশাপতি মাঝির মৃত্যু হয়।

এই ধরনের দু-চারজন ছাড়া শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আইনসভা কক্ষে প্রবেশাধিকার নিম্নবর্গীয় মানুষের আয়ত্তাধীন ছিল না। সম্প্রতিকালে অবশ্য খানিকটা এর ব্যত্যয় ঘটেছে। গণতান্ত্রিক রাজনীতি স্বভাবতই দল-নির্ভর হলেও ব্যক্তির বিশেষ ভূমিকা থেকে যায়। এই পর্বের বিধানসভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সামাজিক অবস্থান যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির নির্ণায়ক ছিল তা উল্লেখের প্রয়োজন হয় না।

নবগঠিত দ্বিতীয় বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে ৪ঠা জুন, ১৯৫৭। ইতিমধ্যে বিধানচন্দ্র রায় ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী সহ) ৩ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১২ জন উপমন্ত্রী

নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। অধ্যক্ষ নির্বাচনে জয়লাভ করেন প্রখ্যাত আইনজীবী কংগ্রেস দলের শঙ্করদাস ব্যানার্জি, পরাজিত হন বিরোধীপক্ষ সমর্থিত পিএসপি প্রার্থী অধ্যাপক শিশিরকুমার দাস। উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন কংগ্রেস দলের আশুতোষ মল্লিক। রাজ্যপালিকা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু তাঁর ভাষণে প্রধানত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বস্তি অপসারণ, শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণে সরকার সকলের সমর্থন পাবেন বলে তাঁর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। প্রথম দিনের অধিবেশনেই সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে বৈধতার প্রশ্নে বাদানুবাদ শুরু হয়। সদস্যরা একে আগামী দিনের অশুভ সংকেত বলে মনে করেন। কথা ছিল, ঐ দিনই মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বাজেট পেশ করবেন কিন্তু শিশিরকুমার দাস আপত্তি জানিয়ে বলেন, রাজ্যপালিকার ভাষণের পর ঐদিন বিধানসভার বাজেট পেশ বৈধ নয়। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় অবশ্য এর বিরুদ্ধাচরণ করে জোরালো বক্তব্য রাখেন, বাহবাও পান কিন্তু সভার সমর্থন লাভে ব্যর্থ হন।

পরদিন ডাঃ রায় ১৯৫৭-৫৮ সালের ১০ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বহুবিধ সমস্যা সত্ত্বেও সরকার নতুন কোন কর ধার্যের প্রস্তাব রাখেননি বাজেটে। ৮০ মিনিট ব্যাপী বক্তৃতায় ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার উল্লেখ করেন এবং বেশ কড়া সুরেই কেন্দ্রের সমালোচনা করেন। শুধুমাত্র কৃষি সম্পদের ওপর কর ধার্য করা ছাড়া রাজ্য সরকারের কর আদায়ের আর বিশেষ কোন উৎস নেই বলে ডাঃ রায় অনুযোগ করেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে আয়কর আদায়ের নীতি নির্ধারিত হয় সংগ্রহ নয়, জনসংখ্যাকে ভিত্তি করে। এই নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে বেশি।

বাজেট অধিবেশনের পর বিধানসভা মোটামুটিভাবে নিরুত্তাপই ছিল যদিও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য সংকট ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে সরকারি ব্যর্থতা নিয়ে বিরোধীরা সোচ্চার ছিলেন এবং এই নিয়ে আন্দোলনও সংগঠিত হয়। ইতিমধ্যে বিরোধী দলের নেতার মাসিক মাহিনা ১২০০ টাকা ধার্য করে একটি বিল বিধানসভায় পাস হয় কিন্তু জ্যোতি বসু দলীয় নির্দেশে তা নিতে অস্বীকার করেন।

তবে রায় মন্ত্রিসভার ওপর প্রথম ধাক্কা আসে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পদত্যাগের ফলে (মার্চ ১৯৫৮)। মন্ত্রিসভা থেকে দেশবন্ধু দৌহিত্র সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পদত্যাগ, বিধানসভায় তাঁর সাড়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী বিবৃতি, বিধায়কপদে ইস্তফা ও বামপন্থীদের সমর্থনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভবানীপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীকে বিপুলভোটে পরাজিত করে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার ফলে সাময়িকভাবে হলেও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণ পালটে যায়। কংগ্রেস দল গভীর সংকটের আবর্তে পড়ে। কলকাতা

"কংগ্রেসের হাত থেকে ছিটকে যাচ্ছে" বলে নেহরু আক্ষেপ করেন। তাঁর মনে হয় কংগ্রেস যুব সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অতুল্য ঘোষকে নেহরু লেখেন, "মনে হচ্ছে কংগ্রেস যেন কলকাতার আশা ছেড়েই দিয়েছে।" ৪৯ জন কংগ্রেস নেতা ও কর্মী প্রদেশ কংগ্রেস কর্মসমিতির পুনর্গঠন দাবি জানান। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষকেই তাঁরা কংগ্রেসের এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় সিদ্ধার্থ রায় ছিলেন বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী। এক বছরেরও কম সময় তিনি মন্ত্রী ছিলেন। ৯ মার্চ, ১৯৫৮ তিনি পদত্যাগ করেন। ২৪ মার্চ, ১৯৫৮ এ নিয়ে বিধানসভায় তিনি দীর্ঘ বিবৃতি দেন। ৪১ পৃষ্ঠাব্যাপী বিবৃতিতে তিনি বলেন, কার্যভার গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানান কীভাবে দুর্নীতি প্রশাসনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, কংগ্রেস কীভাবে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনিক কিছু সংস্কারেরও তিনি পরামর্শ দেন। যেমন— প্রতি জেলা থেকে একজন মন্ত্রী, পুনর্বাসন দপ্তরের জন্য আলাদা মন্ত্রী (যা ছিল খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের অধীনে) এবং অর্থ দপ্তরের জন্য একজন পৃথক মন্ত্রী। প্রচণ্ড দুর্নীতির বিষময় ফল—দ্য গ্যানটিয়ুআন ইভিল অব করাপশন (The gargantuan evil of corruption) কিভাবে প্রশাসনকে গ্রাস করেছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বিশেষভাবে মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন ও কালীপদ মুখোপাধ্যায়দের অধীনস্থ দপ্তরের উল্লেখ করেন। বিবৃতির শেষে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন সমস্যাসংকুল পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য তিনি যেন কংগ্রেস দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন।[৪]

সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধীরা বিধানসভায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। ২৭ মার্চ আলোচনার দিন নির্দিষ্ট হয়। সাড়ে আট ঘণ্টা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক হয়। বিতর্কের সূত্রপাত করে এক ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় জ্যোতি বসু খাদ্য ও উদ্বাস্তু সমস্যার মোকাবিলায় সরকারি ব্যর্থতা, পুলিশ ও অন্যান্য বিভাগের লাগামছাড়া দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অপদার্থতার অভিযোগ আনেন। দুর্নীতি দমন সাব-কমিটির রিপোর্টে সদস্যদের সই জাল করে বসানো হয়েছে বলে জ্যোতি বসু উল্লেখ করেন। কমিউনিস্ট ও বিরোধী সদস্যরা একের পর এক অভিযোগ আনেন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে। কংগ্রেস দল থেকে বিতর্কে অংশ নেন মাত্র দুজন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ও বিজয় সিংহ নাহার।

রাত্রি ৯টায় বিধান রায় জবাব দিতে উঠে প্রফুল্ল সেন ও কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের কাজকর্মকে সমর্থন করেন, সিদ্ধার্থ রায়ের বেশ কিছু বক্তব্য খণ্ডনও করেন। দুর্নীতি দমন উপ-সমিতির রিপোর্টে সিদ্ধার্থ রায়ের স্বাক্ষর রয়েছে বলে সভাকে জানান।

সিদ্ধার্থ রায় সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ করেন এবং বিধানসভায় মূল দলিল পেশ করার দাবি জানান। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মূল দলিল দেখাতে পারেন না। বিরোধী সদস্যরা দলিল জাল হয়েছে দাবি করেন। সভায় হৈ হট্টগোল হয়, অধ্যক্ষ অধিবেশন দশ মিনিট বন্ধ রাখেন কিন্তু এরপরও সভার কাজকর্ম চালানো অধ্যক্ষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। জ্যোতি বসু ডিভিসন দাবি করেন, ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ ঘোষণা করেন ধ্বনি ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হয়ে গিয়েছে। রাত্রি ১১-০৫-এ বিধানসভার অধিবেশন শেষ হয়। বিরোধীদের তোপের মুখে কংগ্রেস একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়ে, মুখ্যমন্ত্রীকেও বিপর্যস্ত ও নিষ্প্রভ মনে হয়।

সিদ্ধার্থ রায় ঘোষণা করেন তিনি বিধানসভার সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বামপন্থীদের সমর্থনে সিদ্ধার্থ রায় কংগ্রেস প্রার্থী বিজয় ব্যানার্জিকে ১০,৫৩৮ ভোটে (২৩,২২২ ও ১২,৬৮৪) পরাস্ত করেন। ১৯৫৭-র নির্বাচনে তিনি সাত হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের প্রভাব বাড়তে থাকে।

উদ্বাস্তু ও খাদ্য সমস্যার মোকাবিলায় এই পর্বে সরকারকেও নাজেহাল হতে হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন, বিশেষ করে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পাঠানো নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এই সময় রাজনৈতিক টানাপড়েন চলে, আন্দোলন হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই বিধানসভায় তার জের চলে। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আগত উদ্বাস্তু ও পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে এমনিতে মানুষ বিক্ষুব্ধ ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতিও জনসাধারণের কাছে সহায়ক মনে হয়নি। যেমন, যে সব উদ্বাস্তু পরিবার অনেক কষ্ট করে প্রায় মাটি কামড়ে পড়ে থেকে কোথাও কোথাও মাথা গোঁজার মত ঠাঁই করতে পেরেছিলেন। ১৯৫১ সালে "অনধিকার উচ্ছেদ আইন" পাস করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের আবার আশ্রয়হীন করে তোলেন। উদ্বাস্তুদের দুটি সংগঠন, একটি ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী লীলা রায় পরিচালিত, অন্যটি জ্যোতি বসু, সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি প্রমুখের নেতৃত্বাধীন এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে কিন্তু সরকারকে দিয়ে আইন প্রত্যাহার করানো সম্ভব হয় না। পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল মানুষের আগমনের ঢেউ অব্যাহত থাকায় জটিলতা আরও বাড়তে থাকে। বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে প্রায় দু'লক্ষ উদ্বাস্তুদের রাখার দায়িত্ব নিতে হয় সরকারকে। কেন্দ্রীয় সরকার অনুযোগ করেন এর জন্য কেন্দ্রীয় খাতে বছরে খরচ করতে হয় ১০ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংকুলান পুনর্বাসন সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ওড়িশা, অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশের ৮০ হাজার বর্গমাইল এলাকায় বিস্তৃত দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা তৈরি করেন। মূলত ওড়িশার কোরাপুট ও

মধ্যপ্রদেশের বাস্তারে পুনর্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ত্রাণ শিবির উঠিয়ে দেওয়া ও ডোল বন্ধ করার আদেশ জারি হয়।

দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পাঠানোকে স্বাগত জানিয়ে বিধানসভায় ৫ জুলাই, ১৯৫৮ কংগ্রেস নেতা বিজয় সিংহ নাহার এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কংগ্রেস বিধায়করা প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন, বিরোধীরা এভাবে উদ্বাস্তুদের বাইরে পাঠানোর বিরোধিতা করেন। জ্যোতি বসু অভিযোগ করেন পুনর্বাসনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে উদ্বাস্তুদের অন্ধকারে রেখে এভাবে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো ঠিক নয়। তিনি অবশ্য স্পষ্ট করে জানান, বাঙালী উদ্বাস্তুদের বাংলার বাইরে পাঠানো যাবে না, এই নীতিতে তাঁরা বিশ্বাসী নন। ভাল বসতি ও জীবিকা অর্জনের সুযোগ থাকলে নিশ্চয়ই শরণার্থীদের বাংলার বাইরে যেতে হবে। তবে তড়িঘড়ির মধ্যে যথাযথ পরিকল্পনা না করে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর সিদ্ধান্তে আপত্তি করেন বিরোধীরা।[৫] এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় এবং তা বহুলাংশে সফলও হয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শরণার্থীকেই বাংলার বাইরে পাঠানো হবে না, "ক্যাশ ডোল"ও পুনরায় চালু করা হবে সরকার থেকে এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়।

আন্দোলন ও বাদ-বিতর্কের ফলে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু প্রেরণ ব্যাহত হয় সন্দেহ নেই কিন্তু এটা ঠিক যথাযথ পরিকল্পনা না নিয়েই উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি নামে একটি সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেন এবং একজন কেন্দ্রীয় আমলা, মি. ফ্লেচার এই সংস্থার কর্ণধার নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ২০ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে দণ্ডকারণ্য পাঠানো হয। পুনর্বাসন তো দূরের কথা, নানা দুর্ভোগের মধ্যে দীর্ঘদিন তাদের অস্থায়ী শিবিরে থাকতে হয়। জমি নেই, জল নেই, সেচের ব্যবস্থা নেই, এমনকি মাথার ওপর আচ্ছাদনেরও ব্যবস্থা ছিল না। এই অবস্থায় ডাঃ রায় প্রফুল্ল সেন ও অন্য কয়েকজন মন্ত্রী সহ দণ্ডকারণ্যে যান (১৯৬০)। এর আগে বিধায়কদের এক প্রতিনিধি দলও দণ্ডকারণ্য ঘুরে আসেন। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের অব্যবস্থায় খুবই ক্ষুব্ধ হন। কিছুদিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নেহরুর উপস্থিতিতে এক বৈঠকে দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যসচিব ও ভারতের নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনকে এই সংস্থার চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। নব নিযুক্ত চেয়ারম্যানকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়। অবস্থার খানিকটা উন্নতি হয় কিন্তু বহুবিধ প্রতিবন্ধকতার দরুন পুনর্বাসন ব্যবস্থায় ত্রুটি ও গলদ থেকেই যায়। শরণার্থীদের দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হয়। পরবর্তী চেয়ারম্যান হন প্রবীণ ও দক্ষ প্রশাসক কিন্তু তিনিও ন'মাস পর পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের কারণ এবং দণ্ডকারণ্যের প্রকল্পের অবস্থা ও সমস্যা নিয়ে তাঁর লিখিত

তিনটি প্রবন্ধ "ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি' পত্রিকায় (১৯৬৫, জানুয়ারি, ২, ৯, ১৬) প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি দণ্ডকারণ্যের চাষবাস, কুটিরশিল্প, কর্মসংস্থান ইত্যাদির সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেন। দণ্ডকারণ্যে যাঁরা গিয়েছিলেন অনেকেই স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে খাইয়ে নিতে পারছিলেন না। ১৯৭৭-এ দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তুদের আবার নিষ্ক্রমণ শুরু হয় পশ্চিমবাংলার মরিচঝাঁপিতে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাধা দেওয়ায় তাদের আবার দণ্ডকারণ্যেই ফিরে যেতে হয়।

সংসদীয় রাজনীতি অনেক সময়ই সহমতের ভিত্তিতে চালিত হয়।পশ্চিমবঙ্গেও এই নজিরের অভাব নেই। সরকার পূর্বে প্রণীত "অনধিকার উচ্ছেদ আইন"-এর এক সংশোধনী বিধানসভায় পেশ করেন। এতে অননুমোদিত জমিতে যারা বসতি স্থাপন করেছিলেন, তারা আবার উচ্ছেদের সম্মুখীন হয়। পুনর্বাসন মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন বিধানসভায় ঐ সময়েই ঘোষণা করেন, দণ্ডকারণ্যে যে সব শরণার্থী স্বেচ্ছায় যেতে চান যাবেন এবং পুনর্বাসনের সব সুযোগ-সুবিধা পাবেন। যারা যাবেন না, তাদের ছয় মাসের ডোল নিয়ে ক্যাম্প থেকে চলে যেতে হবে। একে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে যেতে অনিচ্ছা, তার ওপর উচ্ছেদ সংক্রান্ত সংশোধনী বিল, এই দুই নিয়ে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দল প্রভাবিত সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (ইউ সি আর সি) এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলন জেলাস্তরে ছড়িয়ে পড়ে, অনেকেই গ্রেপ্তার হন। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়। বিধানসভায়ও এই সমস্যার সমাধানের জন্য সদস্যরা সরকারের ওপর চাপ দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উদ্বাস্তু নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং সংশোধনী বিলে জবর দখলকারীদের উচ্ছেদ সংক্রান্ত ধারা প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সরকার থেকে জানানো হয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শরণার্থীকেই বাংলার বাইরে পাঠানো হবে না, ক্যাশ ডোল বন্ধ করা হবে না।

শরণার্থীদের প্রসঙ্গে বিধানসভায় সরকার ও বিরোধীপক্ষ অধিকাংশ সময়ই সহমত পোষণ করতেন। একটা আবেগও এর সঙ্গে জড়িত ছিল ; এর পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে "উদ্বাস্তুরা আমাদের অস্থির অস্থি, একই মজ্জার মজ্জা। একথা আমরা ভুলতে পারি না, আমরা বাঙালীরা তাদের কিছুতেই ভুলতে পারি না।"

খাদ্য সংকট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিও এই পর্বে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে আসে, আন্দোলন হয়, পুলিশের গুলিতে বহু লোককে প্রাণ দিতে হয়। বিধানসভায় যথেষ্ট সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সরকারের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। বস্তুত, পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই খাদ্য পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারকে হিমশিম খেতে হয়। বিধানসভায় রাজ্যপালিকার ভাষণ, বাজেট বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর

ইত্যাদি পর্বে খাদ্য পরিস্থিতির ভয়াবহতা নিয়ে সদস্যদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায়।" ১৯৫৮-৫৯-এ খাদ্য সংকট এক বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌছয়। কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারি ভোগ্যপণ্যের ওপর বিরাট পরিমাণ কর ধার্য করেন, ফলে জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। কৃষি পণ্যের উৎপাদনও হ্রাস পায়। সরকারি নীতি খাদ্য সংকট আরও বাড়িয়ে দেয়। কয়েকটি মাত্র জেলায় কর্ডন প্রথা চালু করার ফলে লাভবান হয় চোরাকারবারি ও ব্যবসায়ীরা। চালকলগুলির ওপর শতকরা ২৫ ভাগ লেভি ধার্য হয়। কিন্তু, লেভি আদায়ের সরকারি প্রচেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। খোলাবাজার থেকে চাল প্রায় অদৃশ্য হয়, অপ্রতুল রেশন ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। নদীয়া, ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, হুগলী প্রভৃতি জেলা থেকে দলে দলে বুভুক্ষু মানুষ কলকাতায় আসতে থাকেন। অনাহারে মৃত্যু নিয়ে বিধানসভায় প্রায়শই হৈ-হট্টগোল বাঁধে, খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার হন বিরোধীরা। "মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি" (সভাপতি : ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি (পি এস পি), সম্পাদক : হেমন্ত বসু (ফরওয়ার্ড ব্লক) সংশোধিত রেশন এলাকার সম্প্রসারণ, খাদ্যভাণ্ডার সৃষ্টি, কেন্দ্র থেকে আরও চাল সরবরাহ ইত্যাদি দাবি নিয়ে দীর্ঘ আন্দোলনের কর্মসূচী নেয়। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই (৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯) বিরোধী সদস্যরা খাদ্য সংকট নিয়ে ১৫টি মুলতুবি প্রস্তাব পেশ করেন। বিরোধীদের দাবি মেনে নিয়ে সরকার খাদ্য তদন্ত কমিটি গঠন করেন কিন্তু কমিটির সুপারিশের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ২৫ জুন সারা রাজ্যে ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়। আইন অমান্য আন্দোলন জেলাস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন উচ্চ পর্যায়ে পৌছায় আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে।

৩১ আগস্ট শহীদ মিনারে লক্ষ লোকের সমাবেশের পর এক বিরাট শোভাযাত্রা মহাকরণের দিকে এগোবার পথে জনতার একাংশের ওপর পুলিশের গুলিচালনার ফলে আহত হন অনেকে, কয়েকজনের মৃত্যুও হয়। এরপর পাঁচদিনব্যাপী চলে জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ। কলকাতার রাস্তায় সেনা মোতায়েন করা হয়। পুলিশের গুলিতে ৮০ জনের মৃত্যু হয় (মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বিধানসভাকে ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানান)। দিল্লিতে ও পশ্চিমবঙ্গ পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। খাদ্যমন্ত্রী অজিতপ্রসাদ জৈন পদত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ডাঃ রায়কে অনুরোধ করেন প্রফুল্ল সেনকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই যেন খাদ্যদপ্তরের দায়িত্ব নেন। কিন্তু প্রফুল্ল সেন গররাজি হওয়ায় স্থিতাবস্থাই বজায় থাকে। পরিস্থিতি অবশ্য অনেকটা শান্ত হয় সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ সরকার আটক বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার পর।

বাইরের আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হয় বিধানসভায়। ২১ সেপ্টেম্বর খাদ্য আন্দোলনে

নিহতদের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য এক মিনিট নীরবতা পালনের অনুরোধ জানান বিরোধীরা। কিন্তু কংগ্রেস ও পিএসপি সদস্যরা নীরবতা পালনে অংশ নেন না। কয়েকদিন ধরেই বিধানসভায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে থাকে। হৈ-হট্টগোল, এমন কি জুতো ছোঁড়াছুঁড়িও হয়। বিভিন্ন সংসদীয় পন্থা অবলম্বন করে বিরোধীরা কয়েকবারই সরকারকে হেনস্তা করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯ জ্যোতি বসু, হেমন্ত বসু, যতীন চক্রবর্তী, সুধীর রায়চৌধুরী, সুবোধ ব্যানার্জি, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। বিতর্কের সূচনা করে জ্যোতি বসু খাদ্যসংকটের জন্য মন্ত্রিসভাকে দায়ী করেন এবং পুলিশি তাণ্ডবের উল্লেখ করে বলেন, ডাঃ রায় ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় "হিলার" বলে স্বীকৃত। কিন্তু আজ তিনি সবচেয়ে বড় "কিলার" বলে ধিকৃত।[৬] বিধান রায়ের জবাবী ভাষণ হয় স্পষ্ট এবং দৃঢ় ও যুক্তিপূর্ণ। জুতো ছোঁড়াছুঁড়ির প্রসঙ্গে ডাঃ রায় বলেন, বিধানসভার মান এত নিচে নেমে যাবে তিনি ভাবতে পারেননি। শুধু এই প্রজন্মের মানুষের কাছে নয়, আগামী প্রজন্মের কাছে বিধানসভা ক্ষমাপ্রার্থী বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং সদস্যদের এই বিষয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তা করার আবেদন জানান। অনাস্থা প্রস্তাব ৬৫-১৫৭ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। কমিউনিস্ট পার্টিও রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ১৪ দফা অভিযোগ পত্র পেশ করে। অভিযোগে বলা হয় জনসাধারণকেই "সংবিধান নির্দেশিত পদ্ধতি" অনুসরণ করে কু-শাসনের অবসান ঘটাতে হবে।

বিধানসভায় (সম্ভবত এই প্রথম) জুতো ছোঁড়াছুঁড়ির ঘটনা নিয়ে সংবাদপত্রেও বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। একজন অবাঙালী পাঠক বাঙালীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম কীভাবে এই ঘটনা ম্লান করে দিয়েছে সে বিষয় অনুযোগ জানান সংবাদপত্রে। বিধায়কদের মনেও এই দুঃখজনক ঘটনা রেখাপাত করে। অধিবেশনের সমাপ্তি দিনে উপাধ্যক্ষ আশুতোষ মল্লিকের বক্তব্যে এই মনোভাবই প্রকাশ পায়। উপাধ্যক্ষ বলেন, "বাঙালীর চরিত্রের উজ্জ্বলতা এখনও সমভাবে বিদ্যমান। বাঙালীর উষ্মা তালপাতার আগুন, বাঙালী ভাবপ্রবণ। সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক পুনরায় ফিরে আসবে ; উদ্বেগের কারণ নেই।"

সন্দেহ নেই খাদ্য আন্দোলনের ফলে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের প্রভাব বাড়ে, গণভিত্তি প্রসারিত হয় কিন্তু বিরোধী রাজনীতিতে ফাটল ধরে। মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু এই সমিতির কর্মসূচীর প্রতি পিএসপি-র সমর্থন ছিল না। ২৫ জুনের ধর্মঘটে এই দল অংশ নেয়নি ; অন্যান্য কর্মসূচীতেও নয়। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ডাঃ রায়ের সঙ্গে প্রজাসমাজতন্ত্রী নেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ১৪ আগস্ট তিনঘণ্টাব্যাপী

আলোচনা হয়। রায়-ঘোষ যুক্ত বিবৃতিও প্রকাশিত হয়। গুজব ছড়ায় প্রফুল্ল ঘোষ রায় মন্ত্রিসভায় খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে যোগ দিচ্ছেন, যদিও তা গুজবই রয়ে যায়। বিধানসভায়ও প্রজাসমাজতন্ত্রী সদস্যদের এই আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার হতে দেখা যায় না। অবশ্য রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবে পিএসপি-র সুধীর রায় চৌধুরীর নাম যুক্ত ছিল। একমাত্র তিনিই অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন, অন্য কোন সদস্যের এই প্রস্তাবে সায় ছিল না। বাম আন্দোলন থেকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পিএসপি-র পক্ষেও শুভ হয় না। ১৯৬২ সালে বিধানসভার নির্বাচনে পিএসপি মাত্র ৫টি আসন পায়, যা ছিল ১৯৫৭-র নির্বাচনে ২১। খাদ্য সমস্যা ও তজ্জনিত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে এবং মাঝে মধ্যেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ি মৌজা (লোকসংখ্যা ১২ হাজার, এলাকা ৮·৭৫ বর্গ মাইল) পাকিস্তানে হস্তান্তর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছুদিন রাজনৈতিক উত্তেজনা চলে। শেষ পর্যন্ত বিধানসভায় আলাপ-আলোচনা মারফত সরকার ও বিরোধীপক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছান এবং মিলিতভাবে কেন্দ্রের কাছে পশ্চিমবঙ্গের দাবি পেশ করেন। দেশ বিভাগের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রায়শই সীমানা সংঘর্ষ চলতে থাকে। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নূনের মধ্যে এক বৈঠক হয় ১৯৫৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে। পাকিস্তানে তখন সামরিক শাসন ; জেনারেল আয়ুব খাঁ তখন পাকিস্তানের কর্ণধার। ঐ বৈঠকেই বেরুবাড়ি হস্তান্তরের চুক্তি হয়। নেহরু ৯ ডিসেম্বর ১৯৫৮ এই চুক্তির ব্যাপারে লোকসভাকে জানান, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব ও রাজস্ব সচিব যাঁরা ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মত যাচাই করেই হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই বিবৃতির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয় বিরূপ। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই চার-চারটি মুলতুবি প্রস্তাব পেশ করেন বিরোধীরা। জ্যোতি বসু, দেবেন সেন, হেমন্ত বসু, অপূর্বলাল মজুমদার একযোগে হস্তান্তর বিষয়ে বিধানসভায় আলোচনার দাবি জানান। অধ্যক্ষ সম্মতি দিতে রাজি হন না। তাঁর বক্তব্য : যেহেতু নেহরু-নূন চুক্তি কার্যকর করার জন্য পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হবে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পরামর্শ কেন্দ্রকে নিতে হবে, সেজন্য সেই স্তরেই আলোচনার পূর্ণ সুযোগ পাবেন বিধায়করা।[৭] বিরোধীরা এতে সন্তুষ্ট হন না, জ্যোতি বসু যুক্তি দেখান, নেহরু লোকসভায় বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের যে দুজন অফিসার উপস্থিত ছিলেন—মুখ্যসচিব সত্যেন্দ্রনাথ রায় ও রাজস্ব সচিব রঘু ব্যানার্জি তাঁদের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সুতরাং বিধানসভায় পূর্ণ আলোচনা হওয়া উচিত। আলোচনায় কংগ্রেস সদস্যদেরও সায় ছিল

কিন্তু দলীয় নির্দেশে তাঁরা মুখ বন্ধ রাখেন। দু'দিন পর মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভাকে জানান দুই অফিসারের ভূমিকা সম্বন্ধে ভুল ধারণার সুযোগ নেই। কারণ, প্রধানমন্ত্রী নেহরু তাঁকে জানিয়েছেন বেরুবাড়ি হস্তান্তরের দায়িত্ব সরকারের, অফিসারদের নয়। ডাঃ রায় আরও জানান, অফিসাররা কোন মত দেননি, মতামত জানানোর কর্তৃত্বও তাঁদের দেওয়া হয়নি।

বেরুবাড়ি হস্তান্তর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ক্রমশ ঘোরালো হয়ে ওঠে, সারা রাজ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থীরা ২০ ডিসেম্বর হরতাল আহ্বান করেন এবং তা সফলও হয়। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে এবং কংগ্রেস সদস্যদের চাপে সরকার বিধানসভায় বেরুবাড়ি প্রসঙ্গ আলোচনায় রাজি হয়। দলমত নির্বিশেষে প্রায় সব বিধায়কই এই হস্তান্তরের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় বলেন, "কী অধিকার আছে নেহরু বা নূনের যে ভারতবর্ষের কোন নাগরিককে বলা যে তুমি কাল থেকে পাকিস্তানের নাগরিক হবে।" মুখ্যমন্ত্রীও হস্তান্তরের সমালোচনা করে বিধানসভায় দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে একত্রে হস্তান্তরের বিরুদ্ধে এক খসড়া বয়ান তৈরি করেন। মেখলিগঞ্জ থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি বিধানসভায় যে প্রস্তাব পেশ করেন তাতে সব রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ মনোভাব এবং জনমতের প্রতিফলন পাওয়া যায়। বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে হস্তান্তরের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস হয়।[৮]

বেরুবাড়ি হস্তান্তর অবশ্য কার্যকর হয় না। সুপ্রিম কোর্ট এইভাবে ভারতীয় এলাকা হস্তান্তর সংবিধান-বিরোধী বলে মত প্রকাশ করে। সংবিধানের নবম সংশোধন করে কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তান্তর সংবিধান সিদ্ধ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এক চুক্তি মারফত (১৯৭৪) বেরুবাড়ি ভারতীয় ইউনিয়নেই থেকে যায়। পরিবর্তে তিন বিঘা হস্তান্তরিত হয়।

৩১ জুলাই, ১৯৫৯ সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে নাম্বুদিরিপাদ সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। এইভাবে একটি নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত করায় পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক আন্দোলন হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কেরালা সরকারকে বরখাস্ত করার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে তাঁর আপত্তি জানান। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তখন ছিলেন কংগ্রেসের সভানেত্রী।

১৯৬০ সালে আসামে বাঙালী বিরোধী 'বঙ্গাল খেদা' জাতিদাঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে আসে, এর জের চলে কয়েকমাস। এই সমস্যা মোকাবিলায় সরকার ও বিরোধীপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সহমতের, সংঘাতের নয়। যেমন, ১৫ আগস্ট বামপন্থীদের "শোক দিবস" পালনের কর্মসূচীতে কংগ্রেসের

পরোক্ষ সমর্থন ছিল। বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের জন্য জ্যোতি বসুর দাবি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য কংগ্রেস ও বিরোধীদের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতেই বিধানসভায় আসাম সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৭] কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী কড়া মনোভাব ব্যক্ত করেন। আসাম সমস্যা নিরসনে বিধানচন্দ্র রায়ের ভূমিকার প্রশংসা করেন কমিউনিস্ট নেতা ভূপেশ গুপ্ত।

অস্বীকার করা যায় না, অতীতে ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা বাংলার সীমারেখা পরিবর্তন, অসমে বাঙালী প্রাধান্য ইত্যাদি অসমিয়া ও বাঙালীদের মধ্যে বিভেদের সূত্রপাত ঘটায়। ১৮৭৪ সালে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ সিলেট ও কাছাড় জেলাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নবগঠিত অনগ্রসর আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সিলেট ও কাছাড়কে আসামে অন্তর্ভুক্তি অবশ্য জাতীয় নেতৃত্ব মেনে নিতে পারেন নি ; দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত এই দুই জেলার কংগ্রেস কমিটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গেই যুক্ত ছিল। আসামের প্রাক্তন চিফ কমিশনার এবং পরে কংগ্রেস সভাপতি হেনরি কটন একসময় চেষ্টাও করেছিলেন সিলেট ও কাছাড়কে বাংলার সঙ্গে পুনরায় যুক্ত করতে। বাংলা থেকে সিলেটের বিযুক্তিতে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে লেখেন, "মমতাবিহীন কালস্রোতে বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হতে নির্বাসিতা তুমি সুন্দরী শ্রীভূমি"। দেশ বিভাগের পূর্বে আসামের রাজনীতি শিক্ষা সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক স্তর বাঙালীর প্রাধান্য ছিল প্রশ্নাতীত। অসমিয়াদের বৃহদাংশ, বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই এটা মেনে নিতে পারেননি। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে সিলেট জেলাকে গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়া কেন্দ্রীয় ও আসাম কংগ্রেস নেতৃত্বের কারসাজি বলেই মনে করা হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর আসাম বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে মন্ত্রিসভার তৈরি করা প্রদত্ত ভাষণে রাজ্যপাল স্যার আকবর হায়দরি বলেন, "আসাম অসমিয়াদের জন্য। অসমিয়া ভাষা ও সংস্কৃতি এবং উপজাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসারই আসাম সরকারের লক্ষ্য। বাঙালীরা অসমিয়াদের ওপর এখন থেকে আর কিছু চাপিয়ে দিতে পারবে না।" লক্ষণীয়, রাজ্যপালের ভাষণে অসমিয়া ভাষা ও উপজাতি ভাষার উল্লেখ থাকলে আসামের ভূমিপুত্র বাঙালীদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কোন উল্লেখ ছিল না। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন আসামকে দ্বিভাষিক (অসমিয়া-বাংলা) রাজ্য বলে গণ্য করে। কিন্তু অসম সরকার একমাত্র অসমিয়াকে রাজ্যভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। অসম বিধানসভায় বাঙালী সদস্যদের বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার অধিকার থাকে না। এইভাবে অসমিয়াকরণের প্রক্রিয়া পূর্ণ হয়।

আসাম কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বও এই দাঙ্গায় ইন্ধন যোগায়। উগ্র প্রাদেশিকতা থেকে

মুক্ত আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চলিহা ছিলেন সংখ্যালঘুদের প্রতি সহানুভূতিশীল। বিধানসভায় তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন কাছাড় জেলার বাঙালী-প্রধান কেন্দ্র থেকেই। অসুস্থ বিমলাপ্রসাদকে অপসারণের চেষ্টাও চলছিল 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনের সময়।

১৯৬০ এর জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বাঙালী বিতাড়নের তাণ্ডব। সরকারি মতে নিহত ৪০, বেসরকারি হিসেবে শতাধিক। আসাম থেকে উৎখাত হয়ে কয়েক হাজার শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন, এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত ও আসামে পুনর্বাসন প্রাপ্ত এবং দ্বিতীয়বার ছিন্নমূল।

পশ্চিমবঙ্গে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি হয়। প্রাণহানি হয় ছয় জনের। রমেশচন্দ্র মজুমদার, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদ জানান। জ্যোতি বসু ও অন্যান্য বামপন্থী নেতৃবৃন্দ যৌথ বিবৃতিতে আসামের বাঙালী ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দুর্দিনে পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। ১৬ জুলাই হরতালের ডাক দেওয়া হয়। বিধানচন্দ্র রায় রানীক্ষেত থেকে কলকাতায় ছুটে আসেন এবং বিরোধী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে ১৬ জুলাই যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রশাসনিক স্তরে সব ধরনের ব্যবস্থা নেন। হরতাল সফল হয়, শান্তি ও শৃঙ্খলা পুরোপুরি বজায় থাকে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার অবসানের জন্য সচেষ্ট হন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন, কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জীব রেড্ডি উপদ্রুত এলাকা পরিভ্রমণ করেন। প্রধানমন্ত্রীও জুলাই মাসে তিনদিন আসাম সফর করেন। উপদ্রুত এলাকায় পিটুনি কর বসানোরও প্রস্তাব করা হয়।

দাঙ্গা বন্ধ হলেও আসামের কংগ্রেস সরকার বহুভাষিক আসামে একমাত্র অসমিয়াকে সারা আসামের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ নেন, ফলে জটিলতা বাড়তে থাকে ; সুরমা উপত্যকায় বাঙালীদের মধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। ২১শে মে, ১৯৬১ (রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ) কাছাড় জেলার শিলচর শহরে মাতৃভাষার অধিকার দাবি করে একজন মহিলা সহ এগারোজন তরুণ পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। বিধানসভায় জ্যোতি বসু এই ঘটনার নিন্দা করেন, ২৫ মে সারা পশ্চিমবঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়। কাছাড় জেলায় হরতাল ও প্রতিবাদ চলে, আসামের কয়েকজন বিধায়ক পদত্যাগও করেন কিন্তু বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবি উপেক্ষিত হয়েই থাকে।

আন্দোলন-বিক্ষোভ-মিছিল এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে মোটামুটিভাবে এক

ধরনের সহমত ছিল, বিশেষকরে রাজ্যের স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়ে। কিন্তু ভারত-চীন সীমানা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি রাজনীতির এই আদল পালটে দেয়। কংগ্রেসের মধ্যে উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধিতা প্রকাশ পায়। প্রজাসমাজতন্ত্রী দল এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বিলুপ্ত জনসংঘ প্রভৃতি দল এতে উস্কানি দেয়। ভারতীয় রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থীরাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণার প্রস্তাবও আসে কিন্তু জওহরলাল নেহরু এই প্রস্তাব বাতিল করে দেন।

চীন ও ভারতের দীর্ঘদিনের সম্প্রীতির সম্পর্ক সীমানা নিয়ে এমনভাবে চিড় ধরতে পারে এ ধারণা ভারতীয় নেতৃত্বের ছিল না, সাধারণ মানুষের তো নয়ই। বিপ্লবের পর পরই কমিউনিস্ট চীনকে স্বীকৃতি দেয় ভারত। রাষ্ট্রসংঘে চীনের সদস্যপদ প্রাপ্তির ব্যাপারে ভারতের নিরলস প্রয়াস, পঞ্চশীলের প্রবক্তা ভারত ও চীন, হিন্দী-চিনি ভাই ভাই যুগ—এই সব কিছুকেই পিছনে ঠেলে সীমান্ত নিয়ে সংঘর্ষে অনেক শুভবুদ্ধি মানুষকে আহত করে। ভারতের কাছে ম্যাকমোহন লাইন হয়ে দাঁড়ায় চীন-ভারতের স্বাভাবিক সীমারেখা, চীন আঁকড়ে থাকে মাঞ্চু সাম্রাজ্যের আমলে প্রচলিত সাবেকি সীমান্তরেখা। ১৯৫৯-এর অক্টোবর মাসে লাডাকে ১৭ জন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী নিহত হন, লংজু চীনের অধিকারে চলে যায়। পার্লামেন্টে এ নিয়ে হৈ-চৈ হয়। মিনু মাসানি, আচার্য কৃপালনি প্রমুখ বিরোধী নেতারা নিষ্ক্রিয়তার জন্য ভারত সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। নেহরু চীনের আগ্রাসী নীতির সমালোচনা করেন, তবে যুদ্ধ নয় শান্তিপূর্ণ উপায়ে সীমান্তে বিরোধের সমাধানের ওপর গুরুত্ব দেন।

২৭ নভেম্বর, ১৯৫৯ কংগ্রেস সদস্য নরেন্দ্রনাথ সেন চীন-ভারত সীমানা সংঘর্ষ নিয়ে বিধানসভায় একটি বেসরকারি প্রস্তাব আনেন।[১০] প্রস্তাবে "সাম্রাজ্যপ্রসারী চীন কর্তৃক ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বৃহৎ ভূখণ্ড বলপূর্বক দখল করার ফলে উদ্ভূত বিপজ্জনক পরিস্থিতি, কালিম্পং ও দার্জিলিং-এ বৈদেশিক গুপ্তচরদের ভারত-বিরোধী ষড়যন্ত্র ও কোন কোন রাজনৈতিক দলের রাষ্ট্রদ্রোহী প্রচার চালানোর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভারতের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য" কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বলেন, "হিমালয় আমাদের উত্তর ভারতের ন্যাচারেল বাউন্ডারি একথা শত শত বৎসর ধরে বৈদেশিক লেখকগণও স্বীকার করে গেছেন। চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউ-এন-সাং-ও এই সীমান্ত অস্বীকার করেননি। কিন্তু আজ তাঁদেরই বংশধর কম্যুনিস্ট চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এই সীমান্ত অস্বীকার করে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন।" মূল প্রস্তাবের ওপর জ্যোতি বসুর সংশোধনী প্রস্তাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সীমানা বিরোধের মীমাংসার এবং কালিম্পং-এ চিয়াং কাইশেকের

অনুচরদের গুপ্তচরবৃত্তি দমনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। জ্যোতি বসু তাঁর বক্তব্যে পার্লামেন্টে জওহরলাল নেহরুর বক্তৃতার কয়েকবারই উল্লেখ করেন এবং বলেন প্রধানমন্ত্রী আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার যে প্রস্তাব দিয়েছেন আমাদের সকলেরই উচিত তা সমর্থন করা। কিন্তু "এখানে একটা গরম আবহাওয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে, প্রস্তাব পড়ে মনে হয়েছে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই।" লংজু ও লাডাকের দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।[১১] কংগ্রেস নেতা বিজয় সিংহ নাহারের মনে হয় জ্যোতি বসু যেন 'চীনের বন্ধু হিসাবে' বক্তৃতা দিলেন। চীন 'কখনো অ্যাগ্রেশর হতে পারে না, যুদ্ধ করতে পারে না', জ্যোতি বসুর এই ধরনের বক্তব্যে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। নেপাল রায়, কৃষ্ণকুমার শুক্লা, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি, ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ সহ কংগ্রেস ও পিএসপি সদস্য কমিউনিস্টদের দালাল, দেশদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী ইত্যাদিতে অভিযুক্ত করে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন, চীন আগে অধিকৃত এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ করুক, তারপর আলাপ-আলোচনা শুরু হোক।[১২] শিলিগুড়ি থেকে নির্বাচিত চা-শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও বিশিষ্ট তাত্ত্বিক কমিউনিস্ট সদস্য সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের বক্তৃতা হয় সংযত, যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যবহুল। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "কমিউনিস্ট পার্টি নিজ দেশের জমি, ন্যায্য অধিকার চীনকে দিয়ে দেওয়ার কথা কখনও বলেনি। বন্ধুত্ব অটুট রাখার জন্য আলোচনার কথাই বলেছে। নিজেদের দাবি ছেড়ে অসম্মানজনক শর্তে চীনের সঙ্গে আপস করার কথা বলেনি। দেশপ্রেমিক হিসেবে চীন-ভারত মৈত্রীর কথাই বলেছে।"[১৩] ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জবাবী ভাষণ হয় সংযত। কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে তিনি সমালোচনা করেন কিন্তু তাতে বিষোদগার ছিল না। জ্যোতি বসুর বক্তব্য উল্লেখ করে ডাঃ রায় বলেন, কমিউনিস্টদের সমস্যা হলো, তারা বিশ্বাস করেন না সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীন ভারত আক্রমণ করতে পারবে। চীন ও ভারতের মধ্যে সুসম্পর্ক দুহাজার বছরের, দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ কখনও হয়নি কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পর চীন কী করে ভারত আক্রমণ করতে পারে, ভারতের জমি গ্রাস করতে পারে তা তিনি ভেবে পান না বলে বিধানসভাকে জানান। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সারা দেশের মানুষই মনে করেন কমিউনিস্ট পার্টি ভুল করছে, কমিউনিস্টদের বক্তব্যে অস্পষ্টতা আছে, দেশের মানুষকে তারা ভুল বুঝাচ্ছেন, ছুটে যাচ্ছেন চৌ-এন-লাইয়ের কাছে নির্দেশ নিতে, ফলে তাদের সঙ্গে জনসাধারণের মত মিলছে না, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। কমিউনিস্টরা ভুল সংশোধন না করলে দেশের মানুষ তাদের সহ্য করবে না বলে ডাঃ রায় কমিউনিস্টদের সাবধান করে দেন।[১৪] নরেন সেনের প্রস্তাব ১৬৯-৪২ ভোটে পাস হয়ে যায়। হেমন্ত বসু, চিত্ত বসু, যতীন চক্রবর্তী

সহ অনেক বামপন্থী নেতা প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দেন। সীমানা বিরোধ নিয়ে সিপিআই সদস্যদের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা বামপন্থী বিধায়কদের কাছেও গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে চীন-ভারত সীমানা সংঘর্ষ যুদ্ধের রূপ নেয়, দেশে জরুরী অবস্থা জারি হয়। চীন বমডিলা পর্যন্ত এগিয়ে এসে একতরফাভাবেই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। বিধানসভায়ও তার জের চলে। ১৬ নভেম্বর, ১৯৬২ ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এক প্রস্তাব পেশ করে 'বিপথগামী' দেশবাসীদের সাবধান করে দেন কমিউনিস্টদের প্রায় একঘরে হতে হয়। চীন-ভারত যুদ্ধ নিয়ে কমিউনিস্টদের মধ্যেও যে মতপার্থক্য ছিল বিধানসভার বিতর্কে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই পর্বে সরকার ও বিরোধীপক্ষকে একযোগে কয়েকবারই পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের কড়া সমালোচনা করতে দেখা যায়। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নতুনভাবে পর্যালোচনা করা দাবি ওঠে বিধানসভায়। যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার দামোদর ভেলি করপোরেশন আইন পাস করিয়ে নিয়ে ডিভিসি-কে পুরোপুরিভাবে কেন্দ্রীয় এক্তিয়ার ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন, তার বিরুদ্ধে ডাঃ রায় ও কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে একমত হয়ে সোচ্চার হন জ্যোতি বসু, প্রফুল্ল ঘোষ সহ বিরোধী বিধায়করা। বিধানসভায় এ নিয়ে আলোচনাও হয়, বামপন্থীরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশেও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার করা হয়। প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য দেবেন সেন এ নিয়ে বিধানসভায় এক প্রস্তাব পেশ করেন (৭ মার্চ, ১৯৫৮)। দীর্ঘ বিতর্ক হয়, সদস্যরা প্রাসঙ্গিক সব তথ্য দিয়ে দেখান কিভাবে কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক নীতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। সুসম আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য প্রচলিত কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস দাবি করেন জ্যোতি বসু। তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেন, দেশবিভাগ ও বঙ্গবিভাগের জন্য পশ্চিমবঙ্গের এত সমস্যা। দেশবিভাগ না হলে পশ্চিমবঙ্গ এমনভাবে পিছিয়ে যেত না। পশ্চিমবঙ্গে যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যায় জর্জরিত, তা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের দোষে নয়, তা দেশের স্বাধীনতার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে যে মূল্য দিতে হয়েছে তার জন্য। রাজ্যকে নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এইভাবে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাবৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণার বিরোধী বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিরোধী সদস্যরা ডাঃ রায়কে অনুরোধ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক সর্বদলীয় প্রতিনিধি পাঠানো হোক কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এবং রাষ্ট্রপতির কাছেও আরেকটা অর্থ কমিশন গঠনের দাবি জানানো হোক। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রের কাছে সর্বদলীয় প্রতিনিধির পাঠানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কর বণ্টনের যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার ফলে বেশি বঞ্চিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মত শিল্পোন্নত রাজ্য। আয়করের ক্ষেত্রে নীট আদায়ের ভিত্তিতে

৯০ শতাংশ ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে ১০ শতাংশ বণ্টনের নীতি মেনে নেওয়া উচিত বলে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন। রাজ্যের আত্মনির্ভরতার প্রশ্নকে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য ডাঃ রায় কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। জ্যোতি বসু ও বিরোধী সদস্যরা ডাঃ রায়কে অভিনন্দন জানান।

পরবর্তী পর্যায়েও বিভিন্ন ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে বিধানসভায় সরকার ও বিরোধীপক্ষের সদস্যদের একই সঙ্গে সমালোচনামুখর হতে দেখা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয় বা তার প্রস্তুতি চলে। এই পর্বে বস্তি উন্নয়ন, কলকাতা নগর উন্নয়ন ইত্যাদি প্রকল্পের কাজ রূপায়িত হয়। বিধানসভায় এ নিয়ে আলোচনা বিতর্ক, এমন কি ঠাট্টা-বিদ্রূপও চলে। এর মধ্যে সল্ট লেক উন্নয়ন প্রসঙ্গ কয়েকবারই বিধানসভায় উত্থাপিত হয়। কমিউনিস্ট সদস্য গণেশ ঘোষ বলেন (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯) সল্ট লেক এক অদ্ভুত স্কীম। ডাঃ রায় বা তাঁর নিজের জীবনে এই পরিকল্পনা তো বাস্তবায়িত হবেই না ; এমন কি পরবর্তী প্রজন্মও এর ফল ভোগ করতে পারবে কি না এ বিষয়ে সকলেই সন্দিহান কেবলমাত্র মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া। ইতিপূর্বে চিকিৎসার জন্য বিদেশে থাকার সময় ডাঃ রায় ব্রিটেন, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশের মন্ত্রী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে জলাভূমি উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন, পরামর্শ এবং সাহায্যও পান। বিদেশী মুদ্রার সংস্থান বাধা হয়ে দাড়ায়। কিন্তু সল্ট লেক উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলে। গণেশ ঘোষের সমালোচনার জবাবে ডাঃ রায় বলেন, "সল্ট লেক বাসযোগ্য করতে আরও ছয় বছর সময় লাগবে, ২০ হাজার প্লট তৈরি হবে। আমার জীবদ্দশায় হয়ত এই পরিকল্পনা কার্যকর হবে না কিন্তু আমার বন্ধু গণেশ ঘোষ এই প্রকল্পের সফল রূপায়ণ দেখে যেতে পারবেন বলে আমার মনে হয়। যদি একান্তই তা না হয়, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এর সুফল পাবে বলে আমার বিশ্বাস।"[১৫] সল্ট লেক পরিকল্পনা অবশ্য অচিরেই কার্যকর হয় এবং পর্যায়ক্রমে জমির প্লটও বিক্রি হতে থাকে।

রাজ্যপালিকা পদ্মজা নাইডু ১৯৫৯-এ বিধানসভার উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে সর্বস্তরের মানুষের জীবনে সর্বাধিক উন্নতির এক চিত্র তুলে ধরেন। ভাষণের শেষ দিকে তিনি বলেন, গ্রামে গঞ্জে শহরে মানুষের মধ্যে আশা উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে, জীবনের নতুন স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে, সর্বত্র "পালসেটিং এ নিউ লাইফ"। বিধানসভায় এই ভাষণ নিয়ে রাজ্যপালিকা যেমন পান অভিনন্দন, অন্যদিকে তেমনি সমালোচনা ও বিদ্রূপ। বিতর্কে অংশ নিয়ে জ্যোতি বসু বলেন, গ্রামে গ্রামে লক্ষ লক্ষ কৃষক উচ্ছেদ হচ্ছে, শহরের বিভিন্ন কারখানায় নতুন চাকরি হওয়া তো

দূরের কথা, যাদের চাকরি ছিল তাদের চাকরি যাচ্ছে। মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা কমে গিয়েছে, কারণ নিত্য ব্যবহার্য প্রত্যেকটি জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছে। ট্যাক্সের বোঝাও ক্রমশ বাড়ছে। তাছাড়া সরকার থেকেই স্বীকার করা হচ্ছে, কৃষির ব্যাপারে, শিল্পের ব্যাপারে, পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে একটা সংকট দেখা দিয়েছে। "এই অবস্থায় গ্রামে ও শহরে কোথায় লাইফ পালসেট করছে, আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। সরকারই বলুক এই গ্রাম ও শহর কোথায়?"[১৬]

ওজন মাপের মেট্রিক পদ্ধতির প্রচলন নিয়েও সরকারকে বিধানসভার ঝক্কি সামলাতে হয়। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ভূপতি মজুমদার এ নিয়ে বিধানসভায় একটি বিল পেশ করেন। বিতর্কের স্তরে কেউ কেউ একে সমর্থন করে, বেশ কয়েকজন এর প্রচলন সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কয়েকজন আবার বিরোধিতাও করেন। প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের দাশরথি তা প্রস্তাব করেন বিধানসভা একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করুক, অধ্যক্ষের কাছে সদস্যদের নামও তিনি দেন। তাঁর বক্তৃতার একাংশ : "ওজন নিয়ে বলার অধিকারী আমরা কেউ নই, এমন কি মন্ত্রীও নন। বাটখারার সের ওজন কিনতে কিনতে বাটখারার বাটপাড়িতেই আমাদের জান চলে যাবে। বাংলাদেশের যে অর্থনীতি এবং এখানকার ওজন ও ভাগের যে অথরিটি সেই শুভঙ্কর ও তাঁর অঙ্ক নিরক্ষর মেয়ে পুরুষরা মুখে মুখেই মুখস্থ করে ফেলে। কিন্তু শুভঙ্করকে আপনারা ডকে তুলে দিচ্ছেন। আপনাদের যদি মেট্রিক সিস্টেম চালু করতেই হয় তা হলে আগে ঠিক করুন গ্রামে কিভাবে নব শুভঙ্কর তৈরি করা যায় এবং মানুষকে শেখানো যায়।" ডাঃ জ্ঞান মজুমদার (সিপিআই) মনে করেন শুভঙ্কর "আমাদের জন্মগত ও সমাজগত" কিন্তু তাই বলে দশমিক যে তার থেকে সোজা হবে না বা আমরা তা শিখতে পারব না, এ কথা ঠিক নয়। বিজ্ঞানের যুগে দশমিককে বাদ দেওয়ার কথা কেউ সমর্থন করতে পারে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।[১৭] জবাবী ভাষণে মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার দশমিক পদ্ধতি ভারতবর্ষের দান, আর্যভট্টের দান বলে পৃথিবীতে স্বীকৃতি পেয়েছে, এই কথা বলে সদস্যদের স্বীকৃতি আদায় করেন।

বহুবিধ জটিলতার জন্য সাধারণ বেসরকারি সদস্যদের পক্ষে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব নিয়ে বিল পেশ করা সম্ভব হয় না। সরকারের পক্ষ থেকেই আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন পণপ্রথা নিষিদ্ধ করে একটি বেসরকারি বিল বিধানসভায় পেশ করেন (১৪ মার্চ ১৯৫৮)। যথেষ্ট পরিশ্রম ও মুসাবিদা করেই বিলটি তিনি প্রণয়ন করেন।[১৮] সরকার পক্ষে অঞ্জলি খাঁ, অনিমা হোড়, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ প্রমুখ মহিলা সদস্যদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেন এবং তাঁদের সমর্থনও পান। নীতিগত দিক থেকে বিরোধিতা না করলেও বিধানসভার অনেক সদস্যেরই কমিউনিস্ট নেত্রীর এই বেসরকারি বিল উত্থাপনে

আপত্তি ছিল। একসময় কথা হয় বিলটি জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রচার করা হবে। মন্ত্রী পূরবী মুখোপাধ্যায় সহ অনেকে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত অধ্যক্ষ বিল পেশে সম্মতি দেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় অবিভক্ত ভারতে সিন্ধু প্রদেশে ১৯৩৯ সালে পণপ্রথা বিরোধী আইন পাস হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১৯৪৫ সালে প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক কালেশ্বর রাও পণপ্রথার বিলুপ্তি, অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন ও মেয়েদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এক বিল পেশ করেন। বিভাগ-পূর্ব বাংলায় এই বিলের বিরুদ্ধে ৬০ হাজার দরখাস্ত পাঠানো হয়। সরোজিনী নাইডু এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু রক্ষণশীল শক্তির বিরোধিতার জন্য শেষ পর্যন্ত এই বিল প্রত্যাহার করে নিতে হয়। স্বাধীনতার পর পঞ্চাশের দশকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক হিন্দু কোড বিল পাস হয়, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়। হিন্দু বিবাহ আইন, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন পাস হওয়ার ফলে মহিলাদের কিছু কিছু অধিকার আইনের স্বীকৃতি পায়। স্বাধীন ভারতে পণপ্রথা-বিরোধী আইন প্রথমে পাস হয় অন্ধ্র বিধানসভায়, এরপর কেরালা ও বিহারে।

বিলের সপক্ষে মণিকুন্তলা সেন দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। রবীন্দ্রনাথের "বিলাপের ফাঁস" প্রবন্ধের থেকে উদ্ধৃতি দেন ; স্নেহলতার জ্বলন্ত আগুনে আত্মাহুতির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমাজের উন্নতি হচ্ছে, মেয়েরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন কিন্তু পণপ্রথার দৌরাত্ম্য বেড়েই চলছে।" বহু সংসারেই এই পণপ্রথা ট্র্যাজেডি নিয়ে আসছে। জমিজমা ও বসতবাটি বিক্রি করতে হয়েছে এইরকম বহু পিতামাতার সঙ্গে আমাদের সমাজ বিশেষভাবে পরিচিত। ...কন্যার বিবাহ দেবার বেলায় কন্যার পিতা যে পরিস্থিতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন, তিনিই আবার যখন পুত্রের পিতা হন তখন তিনি সে কথা ভুলে গিয়ে তিনি যে আঘাত পেয়েছেন নিজের বেলায় সেই আঘাতটাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য পুত্রের পিতা হিসেবে পণ হাঁকেন। যেন একটা ক্রিয়া এবং তার প্রতিক্রিয়া সেইভাবে এই প্রথা চলে আসছে এবং সম্পূর্ণ দাপটের সঙ্গে চলে আসছে।" অনেক আপত্তি ওঠে বিভিন্ন ধারা নিয়ে। প্রস্তাবক বিলটি সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো সঙ্গত বলে মনে করেন কারণ তাতে বিলের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হতে পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আইন পাস করে এই কুপ্রথা দূর করা যাবে না ঠিকই তবে পণপ্রথা যে জঘন্য সমাজবিরোধী অপরাধ, তার ঘোষণার দরকার আছে এবং তার সাজারও দরকার আছে। বক্তৃতার উপসংহারে মণিকুন্তলা সেন বলেন, "আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন—আইন করা সম্পর্কে আপনার এত কি মোহ? না, আইন সম্পর্কে আমার কোন মোহ নাই। আমাদের দেশে যেভাবে আইন হয় এবং তা যেভাবে কার্যকরী করা হয়, তা দেখে আমাদের ও বাইরের লোকের কোন মোহ

নাই। আমি তবু আইন চাইছি এজন্য যে যারা এই পাপ কাজ, ঘৃণিত কাজ করে, তারা সমাজের চোখে, আইনের চোখে ঘৃণিত প্রতিপন্ন হোক।" মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় মনে করেন, সামাজিক চেতনা না বাড়লে আইন পাস করে কিছু হবে না বরঞ্চ জটিলতা আরও বাড়বে কারণ যারা পণপ্রথার পক্ষপাতী তারা নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করবে। তিনি নিশ্চয়তা দেন এই বিলের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূর করে এবং মণিকুন্তলা সেন ও বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করে সরকারের পক্ষ থেকেই পণপ্রথা বিরোধী বিল আনা হবে পরবর্তী অধিবেশনে।

ডাঃ রায়ের প্রতিশ্রুতিতে মণিকুন্তলা সেন বিল প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে পণপ্রথা-বিরোধী কোন বিল পেশের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পরে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে আইন প্রণয়ন করেন সেই আইনই সংশোধন করে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত হয়।[১৯]

এই পর্বের বিধানসভার নথিপত্র ঘাঁটলে কীভাবে সরকারি দল আইনসভার নিয়ম ও বিধি বিধান সুকৌশলে এড়িয়ে কার্যোদ্ধারে সক্রিয় ছিল তার কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ৪ জুন, ১৯৫৭ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের বাজেট পেশ করার কথা ছিল। কিন্তু বিরোধী পক্ষ থেকে পদ্ধতিগত কিছু ত্রুটি উল্লেখ করায় পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী বাতিল করতে হয়, অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করতে পারেন না। তবুও তিনি যাতে অন্তত বক্তৃতাটা শুরু করতে পারেন সেবিষয়ে ট্রেজারি বেঞ্চ সচেষ্ট ছিল। সেজন্য বিধানসভার ঘড়ির কাঁটা কয়েক মিনিটের জন্য বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়। বঙ্কিম মুখার্জি এ বিষয়ে অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "কেউ ঘড়ির সুইচ টার্ন অফ করেছে কারণ হাউসকে ৭ মিনিট দেরি করিয়ে দিলে অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পাবেন।" ফ্রেঞ্চ অ্যাসেমব্লিতে একবার ১৯৪৬ সালে ঘড়ি ও ক্যালেন্ডার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বলে বঙ্কিমবাবু উল্লেখ করেন। ডাঃ রায় তাঁকে সমর্থন করেন এবং বলেন ফ্রান্সে তখন কমিউনিস্টরাই বিরোধী দলে ছিলেন। বঙ্কিমবাবু অভিযোগ করেন ফরাসী আইনসভায় তা করা হয়েছিল অধ্যক্ষের নির্দেশে "এখানে স্পীকারের অজ্ঞাতে ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়।"[২০] প্রকৃত ঘটনা কিন্তু তা নয়। ফরাসী জাতীয় সভাকে দিয়ে ১লা জানুয়ারির আগেই বাজেট অনুমোদন করিয়ে নিতে হয় এবং ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্র কিম্বা পরের দিন পর্যন্ত অধিবেশন চলে। এটা বিধিসঙ্গত। ঘড়ির কাঁটা বা ক্যালেন্ডার বন্ধ করার কারসাজি নয়। ফরাসী জাতীয় সভার অধ্যক্ষ ও প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ল্যুই মারমাজের কাছে লিখিত লেখকের চিঠির জবাবে ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ তারিখে মহাসচিবের প্রদত্ত উত্তর থেকে এই তথ্য জানা যায়। (চিঠির ইংরেজী অনুবাদ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)[২১]

দ্বিতীয় বিধানসভার সমাপ্তি অধিবেশন বসে ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১। সরকারি

কর্মচারীদের বেতন কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়। পরবর্তী ফেব্রুয়ারি মাসেই হয় তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন।

এই পর্বের বিধানসভাকে সময় সময় অসংযত হতে দেখা যায়, সদস্যদের অভব্য আচরণও প্রকাশ পায় মাঝে মধ্যে। অশোভন ঘটনাও ঘটে। তবে তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলেই দুঃখ প্রকাশ করেন, এর পুনরাবৃত্তিরোধে সচেষ্ট হন। প্রতিবাদ ছিল, সময় সময় তা উত্তাল রূপ নিত কিন্তু কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি, না বক্তৃতায়, না আচরণে। বিরোধীপক্ষ যেমন খাদ্য, উদ্বাস্তু, আসাম, বেরুবাড়ি ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে সক্রিয় ছিল তেমনি আবার বিধানসভার অভ্যন্তরে সহমতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে এইসব বিষয় প্রস্তাব পাস হতেও দেখা যায়। আলোচ্যপর্বে সংসদীয় রাজনীতি ও সংসদ বহির্ভূত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সক্রিয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২ তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালের শেষ দিকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী তোড়জোড় শুরু হয়। কংগ্রেস দল ২৫২টি আসনেই প্রার্থী দেয়। বামপন্থী জোট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২০৬টি আসনে। কমিউনিস্ট পার্টি বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক দল ও ব্যক্তিদের নিয়ে ব্যাপক ফ্রন্ট গঠন করে কিন্তু প্রজাসোস্যালিস্ট দল এই মোর্চায় অন্তর্ভুক্ত হয় না। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলনে বামপন্থীদের থেকে পিএসপি-র অবস্থান ছিল ভিন্ন। কেরালার নাম্বুদিরিপাদ সরকারের পতন ঘটানোর ব্যাপারেও পিএসপি যুক্ত ছিল। সব কিছু নিয়ে অনেক আগেই কমিউনিস্ট-পিএসপি সম্পর্কে চিড় ধরে। সিপিআই, দুই ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, আরসিপিআই, বলশেভিক পার্টি নিয়ে ছয় দলের বামপন্থী জোট হয়। সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহারে চল্লিশ দফা কর্মসূচী ও বিকল্প সরকার গঠনের আহ্বান জানানো হয়। কংগ্রেসের ইস্তাহারে স্বাধীনতা আন্দোলনে দলের অবদান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে দলের সাফল্য ইত্যাদি গুরুত্ব পায়।

নির্বাচনে কংগ্রেস ১৯৫৭-র নির্বাচনের চেয়ে আসন ও ভোট দুইই খানিকটা বেশি পায়। কংগ্রেস পায় ২৫৭টি আসন, গতবারের চেয়ে পাঁচটি বেশি, ভোট পায় ৪৭·২৯ শতাংশ, ১৯৫৭-তে যা ছিল ৪৬·১৪। সিপিআই-র প্রাপ্ত আসন হয় ৫০ (১৯৫৭-তে ৪৬) এবং ভোট পায় শতকরা ২৪·৯৬ ভাগ যা ছিল ১৭·৮২ ভাগ। অন্য বামপন্থী দলের আসন ও ভোট বাড়ে। ফরওয়ার্ড ব্লক আসন ১৩ (৮), ভোট ৪·৬১ (৩·৮৪), আর এস পি ৯ (৩) ও ২·৩৬ (১·২৪)। আর সি পি আই কোন আসন পায় না, ভোট পায় ০·৩১। পুরুলিয়ার লোকসেবক সংঘ পায় ৪টি আসন ও ০·৭২ ভোট। ২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী কমিউনিস্ট দলের সমর্থনে জয়লাভ করেন, দার্জিলিংয়ের গোর্খা লীগ পায় ২টি আসন ০·৪০ ভোট।

এই নির্বাচনে কলকাতা, হাওড়া ও ২৪ পরগনায় কংগ্রেসের আসন বাড়ে। বর্ধমান,

বীরভূম, কোচবিহার জেলায় বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। মফস্বল বাংলায় কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই নির্বাচন।

নবগঠিত তৃতীয় বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৩ মার্চ ১৯৬২। অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন কংগ্রেস দলের কেশবচন্দ্র বসু। বামপন্থী দল প্রস্তাবিত প্রার্থী অমরেন্দ্রনাথ বসু পরাজিত হন। কংগ্রেস প্রার্থী পান ১৫১ ভোট, বিরোধী পক্ষের প্রার্থী ৯১। বিধানসভায় কমিউনিস্ট দলের নেতা হন জ্যোতি বসু, সহকারী নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার। জ্যোতি বসুকে অধ্যক্ষ বিরোধী পক্ষের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

১৯৬২-র বিধানসভায় পুরোনো মুখই ছিল বেশি, কিছু নতুন সদস্য আসেন যেমন, কংগ্রেসের প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, সি পি আই-র মনসুর হবিবুল্লা (পরবর্তীকালে অধ্যক্ষ), ইলা মিত্র প্রভৃতি। যাঁদের অনুপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় তাঁরা হলেন বঙ্কিম মুখার্জি ও সৈয়দ বদরুদ্দোজা। মহিলা বিধায়কদের সংখ্যা ৭ থেকে বেড়ে তৃতীয় বিধানসভায় হয় ১৩ অর্থাৎ মোট আসনের পাঁচ ভাগ।

১লা জুলাই, ১৯৬২। ৮১তম জন্মদিনে বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয়। ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দেয় ; নেতৃত্বের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রীর দাবিদার হন দুজন—মন্ত্রিসভায় ডাঃ রায়ের পরই ছিল যাঁর স্থান সেই প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ। বিজয় সিংহ নাহার লিখেছেন ঃ "অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্লচন্দ্র সেন দুজনেই মুখ্যমন্ত্রী হতে চান। কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাধ্যমে দুজনকে নিয়ে সমস্ত রাত্রি আলোচনা হয়। কেউ ছাড়তে রাজি নন। শেষে ভোর চারটায় ঠিক হয় যে প্রফুল্লচন্দ্র সেনই নেতা হবেন। কালিদা পরস্পরের ঝগড়া মীমাংসা করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি থাকাতেই এই মীমাংসা সম্ভবপর হয়েছিল। দুপুরে পরিষদীয় দলের সভায় প্রফুল্লদাই নেতা নির্বাচিত হন। নিয়ম মতন আমাদের সবাইকে পুনরায় মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিতে হয়। আমি শ্রমমন্ত্রীই রইলাম।"[২২] কংগ্রেস দলের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন এই সময় থেকেই দানা বাঁধতে শুরু করে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস গঠনের মধ্যে।

ষাটের দশকে কমিউনিস্ট দলও বিভক্ত হয় তবে মতাদর্শগত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এই বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয় মধ্য পাঁচের দশক থেকেই। মূলত কংগ্রেস দল ও সরকারের শ্রেণীচরিত্র মূল্যায়নে মতপার্থক্য এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সিপিআই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়। এস এ ডাঙ্গে, রাজেশ্বর রাও প্রমুখ নেতারা মনে করেন কংগ্রেস মূলত জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। জাতীয় বুর্জোয়া, শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্তকে সহযোগী করে জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের ওপর এঁরা গুরুত্ব দেন। শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়ার যৌথ নেতৃত্ব জাতীয় মুক্তির সহায়ক হবে বলে এঁরা মনে করেন। পক্ষান্তরে বি টি রণদিভে,

পি সুন্দরাইয়া, বাসবপুন্নিয়া, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের মতো নেতাদের মতে কংগ্রেস সরকার বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত এবং বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত। যৌথ নেতৃত্ব নয়, একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বই শোষিত মানুষের মুক্তি নিয়ে আসতে পারে। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, বা জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এই বিতর্কই ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রাধ্যন্য পায়। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের পর বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনেও ফাটল ধরে। চীন ও সোভিয়েতের মধ্যে বৈরীর সম্পর্ক ক্রমশ বাড়তে থাকে। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনেও এর প্রভাব পড়ে।

১৯৬১ সালে বেজওয়াদায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসই অবিভক্ত পার্টির শেষ কংগ্রেস। এই কংগ্রেসেই হয়তো পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যেত, কিন্তু অজয় ঘোষের মধ্যস্থতায় একটা সমঝোতা হয়। এস এ ডাঙ্গে হন পার্টির চেয়ারম্যান, ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু চীন-ভারত সীমানা সংঘর্ষ নিয়ে উদ্ভুত পরিস্থিতি কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন ত্বরান্বিত করে। এ বিষয়ে জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত কলকাতা ও মেদিনীপুর জেলা কমিটি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নেতা ও কর্মীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। ১৯৬৪ সালে অন্ধ্র প্রদেশের তেনালি সম্মেলন এবং ঐ বছর নভেম্বর মাসে কলকাতা কংগ্রেসের পর আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং সিপিআইএম-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

পশ্চিমবঙ্গে আন্তঃপার্টি সংঘাত কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় মণিকুন্তলা সেনের লেখায়। মণিকুন্তলা সেন আইনসভায় খুবই সক্রিয় ছিলেন, কার্যকরও। বিধানসভায় তিনি সমীহ পেতেন। কিন্তু ১৯৬০-৬১ সালের সারা বছরে তিনি মাত্র ৭ মিনিট বক্তৃতা দিতে পেরেছিলেন।[২৩] পার্টির পরিষদীয় দল বক্তার যে তালিকা তৈরি করত তাতে তাঁর নাম থাকত না বলে তিনি অনুযোগ করেছেন। চীন-ভারত বিরোধের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মণিকুন্তলা সেন বলেন, "কিন্তু আমাদের পার্টির দুর্ভাগ্য যে তার উপরই ভার পড়ল অন্যায়টা চীনের নয়—ভারতের, একথা প্রচার করবার। প্রচারে আমাকেও বেরুতে হবে।" .."অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মতো আমিও পশ্চিমবাংলার জিলায় জিলায় ঘুরতে বেরুলাম এবং আর একবার সাধারণ মানুষের বিরোধিতার মুখে পড়লাম।"[২৪] বস্তুত বিধানসভায় অ-কমিউনিস্ট বামপন্থী দলগুলোও ঐ সময় সিপিআই-এর অবস্থান সমর্থন করতে পারে না। বিধানসভার আলোচনা ও বিতর্কে চীনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন কমিউনিস্ট বিধায়কদের সহজেই চিহ্নিত করতে পারতেন অন্য সদস্যরা।

সন্দেহ নেই, কমিউনিস্ট দল বিভক্ত না হলে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিমেরুকেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াই প্রাধান্য পেত। বিভাজনের ফলে নতুনভাবে রাজনৈতিক সমীকরণ হয় পশ্চিমবাংলায়। ১৯৬৭-র পরবর্তী চারটি সাধারণ নির্বাচনে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। বামপন্থীদের অগ্রগমনের ধারা অব্যাহত থাকে।

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রজাস্বত্ব ও জমিদারি উচ্ছেদের রাজনীতি

রায়তের কথা নিয়ে যখন প্রমথ চৌধুরী-রবীন্দ্রনাথ বিতর্ক চলছে, প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের তোড়জোড় তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রমথ চৌধুরী লিখছেন, "টেন্যান্সি অ্যাক্ট আজকের দিনে জমিদারের হাতে সঙ্গীন অস্ত্র। প্রজাকে হয়রান করতে চাও, নাজেহাল করতে চাও, জেরবার করতে চাও তো করো উচ্ছেদের মামলা, স্বত্বের মোকদ্দমা, জমাবৃদ্ধির নালিশ, ফসল ক্রোকের দরখাস্ত, মায় ড্যামেজ বাকি খাজনার নালিশ আর তার ভিটে মাটি উচ্ছন্নে দিতে চাও তো করো তার নামে বাকি পড়া ও খাসদখলের নালিশ।"[১] রবীন্দ্রনাথ রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করার বিরোধী ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন অবাধ হস্তান্তরের পক্ষপাতি।[২] বিধানসভায়ও তখন প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ে জোর বিতর্ক চলছে। তবে তারও আগে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই ভূমি সংক্রান্ত জটিল নিয়মকানুন, ভূমিস্বত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বিধানসভায় উত্থাপিত হতে দেখা যায়। ভূমি সমস্যার আলোচনায় ১৭৯০ সালের দশশালা বন্দোবস্ত, ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উল্লেখ পাওয়া যায় বিধানসভার কার্যবিবরণীতে। সদস্যরা অনেক সময়ই মনে করিয়ে দেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে জমিদারদের জমিতে কোনো স্বত্ব ছিল না ; যারা চাষ করত অর্থাৎ রায়ত-কৃষক, তারাই ছিল জমির মালিক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কুখ্যাত 'হপতম' ও 'পজম' আইনের ফলে রায়ত ও কৃষকদের অবস্থা আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ১৮৫৯ সালের বঙ্গীয় খাজনা আইন রায়তদের কিছু কিছু সুবিধা দিলেও সাধারণভাবে জমিদারদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের নিষ্কৃতির কোনও নির্দেশ দিতে পারে না। বরঞ্চ খাজনা ছাড়াও পার্বণী, ডাক খরচা, তহশিলানা, দাখিলা ইত্যাদির নামে যে 'আবওয়াব' আদায় হত, তার ফলে কৃষকদের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠে। ইংরেজ রাজপুরুষদেরও মাঝে মধ্যে প্রজাদের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায়। স্যর জর্জ ক্যাম্পবেলের (পরবর্তীকালে বাংলার ছোটলাট) মতে জমিদাররা ছিল অমিতব্যয়ী, অত্যুচ্চ কর আদায়কারী, প্রজাদের কাছ থেকে যেনতেন প্রকারেণ শেষ কপর্দকও আদায় করার জন্য সদা সচেষ্ট।[৩] স্যর হেনরি জে কটন (মুখ্যসচিব) ব্রিটিশ রাজের "বৈপ্লবিক" ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে বলেন, এ ব্যবস্থা কৃষক শ্রেণীকে চবম দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং ভূমিসংক্রান্ত আইন-কানুন এক বিরাট প্রহসনে পরিণত হয়েছে।[৪] বিচ্ছিন্নভাবে রাজপুরুষদের এই ধরনের বক্তব্য সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তি ভূস্বত্বের ব্যাপারে জমিদারদের স্বার্থরক্ষার

ব্যাপারেই সচেষ্ট ছিল, কারণ এই পরাশ্রিত সম্প্রদায়ের সমর্থনের উপরেই বিদেশী শাসকদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই কৃষকরা একদিকে জমিদার ও পরোক্ষভাবে বিদেশী রাষ্ট্রযন্ত্রের শোষণের শিকারে পরিণত হওয়ায় তাদের মধ্যে বিক্ষোভ ক্রমশ ব্যাপক আকারে ধূমায়িত হতে থাকে। এই বিক্ষোভ প্রকাশ পায় কৃষক অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহের মাধ্যমে। বাংলার পাবনা ও বগুড়া জেলার কৃষক অভ্যুত্থান সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়ে বাংলার আইনসভায় কৃষ্ণদাস পাল, ২৩ মার্চ ১৮৭৮ একটি বিল পেশ করেন। "কিন্তু বিলটি প্রত্যাহার করে নিতে হয়, কারণ দেখা যায় প্রচলিত আইনের সম্পূর্ণ সংশোধন ছাড়া কোনও কিছু করা সম্ভব নয় এবং ভূমিসংক্রান্ত সার্বিক আইন প্রণয়নও স্থানীয় সরকারের এক্তিয়ার বহির্ভূত।"[৫] তদুপরি, ভূস্বামী সম্প্রদায় প্রথম থেকেই এই ধরনের সংশোধনের বিরোধিতা করে। এই অবস্থায় ১৮৭৯ সালে বোর্ড অব রেভিনিউ-র সদস্য ড্যাম্পিয়ারের সভাপতিত্বে বাংলা ও বিহার খাজনা কমিশন গঠিত হয়। মোহিনীমোহন রায়, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রকুমার শীল প্রমুখ ভারতীয় এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। রায়তদের অতীত ও বর্তমান আইনগত অধিকার ও আর্থিক অবস্থার উপর এই কমিশন বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করে বেশ কিছু সুপারিশ করে।[৬] এই কমিশনের সুপারিশ ও সরকার কর্তৃক সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করে ১৮৮৫ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রজাস্বত্ব বিল পেশ করা হয। বিলটি আইনসভায় পেশ করে কেন্দ্রীয় আইন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সি পি ইলবার্ট যে ভাষণ দেন, নানা দিক দিয়েই তা গুরুত্বপূর্ণ। ইলবার্ট বলেন, "সমগ্র জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষক এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাজস্ব আদায়কারী জমিদার ও তাদের কর্মচারী। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক অধিকারের সীমা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত। যে পদ্ধতিতে রাষ্ট্র এই সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তাও ত্রুটিপূর্ণ। ফলে দুই শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছে। কোথাও জমিদারদের অমানবিক অত্যাচার, কোথাও কৃষকদের জঙ্গীপনা ভূমি ব্যবস্থায় এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে।"[৭] রায়তের দখলীস্বত্বে নিশ্চয়তা দান, জমিবন্ধকের সুযোগ এবং অবাধ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু নির্দেশ এই বিলটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভূস্বামীরা এই বিলের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা লক্ষণেশ্বর সিং প্রমুখ জমিদার সরকারের কাছে এই বিলের বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে অভিযোগ করেন।[৮] এমনকি, যিনি নিজেকে রায়তী স্বার্থের অন্যতম প্রবক্তা বলে দাবি করতেন সেই কৃষ্ণদাস পালও ভূস্বামীদের পক্ষাবলম্বন করেন। দীর্ঘ বিতর্ক ও আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত প্রজাস্বত্ব বিল আইনে পরিণত হয়।

১৮৮৫-এর আইনের বিভিন্ন ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য ১৯২৮, ১৯৩৮

ও ১৯৪০ সালে এই আইনের সংশোধন হয়। কিন্তু তারও আগে বঙ্গীয় পরিষদে এই বিষয়ে কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২০ মার্চ, ১৮৯৭ এম ফিন্যুকেন বিধানসভায় এ নিয়ে একটি বিল পেশ করেন। রায় ঈশানচন্দ্র মিত্র বাহাদুর এই ধরনের বিল প্রাদেশিক আইনসভার এক্তিয়ার বহির্ভূত বলে বৈধতার প্রশ্ন তোলেন। সভাপতি অবশ্য বৈধতার প্রশ্ন নাকচ করে দিয়ে বলেন, ১৮৮৫ সালের আইনের প্রাদেশিক আইনসভাকে আইন সংশোধনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যে সংশোধনী গৃহীত হয়, তাতে সুষম ও ন্যায্য রাজস্ব আদায়ের কিছু দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয়। ল্যান্ড হোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশন বিশেষ করে এই ধারাগুলির তীব্র বিরোধিতা করে।[৯] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংশোধনটিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এর ফলে রায়তদের স্বার্থ অনেকাংশে রক্ষিত হবে। জমিদার সদস্যরা এই সংশোধনী গৃহীত হওয়ায় খুবই ক্ষুব্ধ হন। ছোটলাট অবশ্য জমিদারদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, এই সংশোধনের ফলে জমিদারদের কোনও আর্থিক ক্ষতি হলে সেই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব বর্তাবে সরকারের উপর।

সম্পত্তির হস্তান্তর সংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয় জটিলতামুক্ত করার জন্য আরেকটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন ডব্লিউ ম্যাকফারসন ১৯০২ সালে। বি এল গুপ্ত, জয় গোবিন্দ লাহা ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে গঠিত সিলেক্ট কমিটির নিকট বিলটি প্রেরণ করা হয় এবং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিলটি পাস করা হয়। ১৯০৬ সালে আইনটি আবার সংশোধন করে জমিদারদের খাজনা আদায়ের ব্যাপারে আরও কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়। জি এ বেট্রাম নামে একজন ইউরোপীয় সদস্য সরাসরি অভিযোগ এনে বলেন, জমিদারদের প্রতি সরকারের এই বদান্যতা "উৎকোচ" ছাড়া আর কিছু নয়। ভূপেন্দ্রনাথ বসু এই সংশোধনকে জমিদারদের সামনে লোভনীয় "টোপ" বলে আখ্যা দেন। এই ধরনের বিরূপ মন্তব্যের জন্য ছোটলাট দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস সংশোধনগুলি যথাযথভাবে কার্যকর হলে সংশ্লিষ্ট সকলেই লাভবান হবেন এবং এই ধরনের সমালোচনা যে কত ভ্রমাত্মক তখন তা প্রমাণিত হবে।[১০]

ভূস্বামী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় সরকারের আগ্রহ প্রকাশ পায় বেঙ্গল সেটেল্ড এস্টেটস বিল উত্থাপনে (১৯০৪)। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আবেদনক্রমে আনীত এই বিল উত্থাপন করেন সি ই বাকল্যান্ড। জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করাই ছিল বিলের মুখ্য উদ্দেশ্য। ডঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও বিলটি সমর্থন করেন। সিলেক্ট কমিটি স্তরে অবশ্য বিলটি নিয়ে প্রচণ্ড মতভেদ হয়। শেষ পর্যন্ত বিলটি পাস হলে জমিদার সদস্যরা সরকারকে সাধুবাদ জানান।

১৮৮৫ সালের আইনের যেসব সংশোধন হয় তার ফলে লাভবান হন জমিদাররা।

রায়তরা ক্রমশ জমির স্বত্ব হারাতে থাকে এবং দারিদ্র্য ও দাসত্বের মধ্যে দিনযাপন করতে বাধ্য হয়। সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও জমিদাররা রায়তদের কাছ থেকে বর্ধিত খাজনা আদায় করতে থাকেন। জমিদারের অনুমতি ছাড়া দখলী স্বত্ববিশিষ্ট জোত হস্তান্তরের অধিকাব থেকে রায়তরা বঞ্চিত হন। তাছাড়া নিজের দখলী জমিতে প্রজাব গাছকাটা, পুকুর কাটা, কুয়ো খোঁড়া বা কোঠাবাড়ি তৈরি করাও নিষিদ্ধ ছিল। আর তার উপর ছিল বাড়তি আদায় বা আবওয়াবের দৌরাত্ম্য। সবকিছু মিলিয়ে ভূস্বত্ব সংক্রান্ত জটিলতা বাড়তেই থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ৩ ডিসেম্বর, ১৯২৫ গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্য ক্ষৌণিশচন্দ্র রায়বাহাদুর কোর্ফা রায়তদের ভূস্বত্বের উপর কিছু অধিকারেব স্বীকৃতি দিয়ে একটি বিল বিধানসভায় আনেন। বিলটি পেশ করে প্রস্তাবক বলেন, "১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর ৪০ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। ভূমিব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এই বিভিন্ন পরিবর্তন বিশেষ করে প্রজাসাধারণের এক অংশকে দখলীকৃত অধিকার প্রদানেব জন্য এই আইন সংশোধনের প্রস্তাব আনা হয়েছে"।[১১] জমিদার বিধায়ক ও স্বরাজ্য দলের বেশির ভাগ সদস্য বিলটির বিরোধিতা করেন। অসিমুদ্দিন আহমদ, এমদাদুল হক, একরামুল হক, হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখ কয়েকজন সদস্য অবশ্য বিলটি আলোচনা ও গ্রহণের পক্ষে ছিলেন, কারণ তাঁদের মনে হয় ঐ বিলে এমন কিছু সংস্থান আছে যাতে প্রজাসাধারণ লাভবান হবে। কিন্তু স্বরাজী ও জমিদার সদস্যদের বিরোধিতার ফলে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। এই পর্যায়ে বিলের আলোচনায় অংশ নিয়ে বিধায়ক সৈয়দ এমদাদুল হক বলেন, এই কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যই প্রজাসাধারণের ভোটে নির্বাচিত কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রজাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সদস্যরা সম্পূর্ণ উদাসীন। হক অভিযোগ করেন, সিলেক্ট কমিটিতে যেসব সদস্যের নাম পেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে অধিকাংশই জমিদারদের প্রতিনিধি। তিনি কৃষক সমাজের আস্থাভাজন কয়েকজন সদস্যের নাম প্রস্তাব করতে চান।[১২] সরকারের তরফ থেকে ক্ষৌণিশচন্দ্র জানান, স্বরাজ্য দলের নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এই নামগুলি সম্বন্ধে উৎসাহ দেখাননি।[১৩] সুতরাং নতুন নাম সংযোজন এই স্তরে সম্ভব নয়। সিলেক্ট কমিটির পাঠানোর ফল হয় : বর্গাদারদের যে সামান্যতম অধিকার দেওয়ার সংস্থান বিলে ছিল তাও খারিজ করে দেওয়ার পক্ষে সিলেক্ট কমিটি মত প্রকাশ করে। স্বরাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ এনে বিক্ষুব্ধ দু'তিনজন স্বরাজ্য সদস্য বলেন, জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনিচ্ছা থাকলে স্বরাজ্য দলের উচিত, হয় কাউন্সিল বর্জন করা, না-হয় সরকারে যোগ দেওয়া।

প্রজাস্বত্ব আইনে সংশোধন সংক্রান্ত বিল যেদিন বিধানসভায় পেশ করা হয়,

হেমন্ত সরকার সেই দিনই সভায় এক প্রস্তাব পেশ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নির্দেশিত জমির মালিকানার বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসন্ধান করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের কথা বলেন। এই কমিটির দায়িত্ব হবে ভারতের প্রাচীন আইন ও প্রথার পর্যালোচনা করে জমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী নির্ণয় করা। কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নাম প্রস্তাব করেন—

(১) দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত (অধ্যাপক বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ)
(২) খান বাহাদুর এম এ মোমেন
(৩) কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় (জমিদার)
(৪) মহঃ একরামুল হক (সভাপতি, টেনান্টস গ্রুপ)
(৫) মিঃ এল বিরলি (মুখ্যসচিব)
(৬) অতুলচন্দ্র গুপ্ত (এডভোকেট)
(৭) হেমন্তকুমার সরকার (সম্পাদক, সারা বাংলা টেনান্টস ফেডারেশন)

বিধানসভার সভাপতি ১০ ডিসেম্বর প্রস্তাবটি আলোচনার দিন ধার্য করেন।[১৪]

১০ তারিখ অধিবেশনের শুরুতেই সভাপতি ঘোষণা করেন, হেমন্ত সরকারের প্রস্তাব যথাযথ নয়, কারণ যে সব ব্যক্তির নাম কমিটির জন্য তিনি সুপারিশ করেছেন তাদের সম্মতি পেশ করা হয়নি। হেমন্ত সরকারও তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহারের অনুমতি চেয়ে বলেন, "যেহেতু আমার প্রস্তাব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, সেজন্য আমার দল আমাকে, এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে নির্দেশ দিয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "আমাকে বলশেভিক বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, আমি কিন্তু বলশেভিকবাদের প্রসার প্রতিরোধ করতেই চেয়েছি, এর সমর্থক আমি মোটেই নই।[১৫] বস্তুত ১৯২৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন প্রস্তাবে স্বরাজ্য দল যে ভূমিকা নেয় তা থেকে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যায়। সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক, মধ্যস্বত্বভোগীর প্রতিনিধি।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের প্রস্তাব আবার যখন ১৯২৮ সালে বিধানসভায় আসে, ভোটাধিকার তখন অনেক প্রসারিত হয়েছে ; গ্রামীণ মানুষের প্রতিনিধিত্বও বিধানসভায় বেড়েছে। লক্ষণীয়, ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নও ঐ সময় যুক্ত হয়ে পড়ে, কারণ বাংলার বেশির ভাগ রায়তই মুসলিম, আর বেশির ভাগ জমিদার হিন্দু। মহাজনদেরও বেশিরভাগ ছিলেন হিন্দু, খাতক মুসলিম। "বাংলার আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো এমনই ছিল যে, প্রজা-খাতক নামের চুলে ধরিয়া টান দিলে মুসলিম নামের মাথাটি আসিয়া পড়িত। অপরপক্ষে, জমিদার-মহাজনের নামের টানে হিন্দুরাও কাতারবন্দী হইয়া যাইত।"[১৬] ১৯২৮

সালের পূর্ববর্তী সময়ে বেশ ক'টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয়ে যায়। বস্তুত, অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক দিকে মুসলমানরা ছিলেন অবজ্ঞাত ; হিন্দু জমিদারদের কাছারিতে প্রজাদের বসবাব আসনও মিলিত না। সম্মানজনক সম্বোধনও তারা দাবি করতে পারতেন না। জমির উপব নির্ভবশীল মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সংখ্যাও যেমন বেড়ে চলছিল তেমনি খাজনার গ্রাহক ও পাওনাদাররূপে এদের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই মধ্যস্বত্বভোগীদের তৎকালীন প্রভাব বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আজিজুল হক মন্তব্য করেন, প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থায় কৃষকদের অন্ন সংস্থান না হলেও জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের লাভের অংশে কোনও ঘাটতি পড়ে নি. বরঞ্চ তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনদের অতি মুনাফা লাভের প্রবণতায় মালিক চাষীরা ক্রমশ জমিচ্যুত হতে থাকে এবং ভূমিহীন কৃষিমজুরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তী আদমসুমারির (১৯৩১) সময় কৃষি-মজুরের সংখ্যা দাঁড়ায় কৃষক সমাজের শতকরা ২৯.২ শতাংশ।

১৯২৮ সালে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন প্রস্তাব যখন আসে বাংলার কৃষি কাঠামোর তখনকার প্রবণতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভূস্বামী শ্রেণীর প্রভাব তখন অনেকটা স্তিমিত ; পক্ষান্তরে মধ্যস্বত্বভোগী, ধনী, কৃষক ও মহাজনদের প্রতিপত্তি তখন অগাধ। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তখন একদিকে যেমন কৃষিক্ষেত্র থেকে ক্রমবর্ধমান সম্পদ আহরণে সক্রিয়, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য কৃষির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সমভাবে ব্যগ্র। এই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ৭ আগস্ট, ১৯২৮ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাব বিধানসভায় পেশ করেন ভূমিরাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রভাসচন্দ্র মিত্র। বিলটি উত্থাপন করে প্রস্তাবক বলেন, কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন বিবদমান শ্রেণীর মধ্যে সমতা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে ভূমিস্বত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের নিষ্পত্তি করা এবং জমিদার ও প্রজার স্বার্থের মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে তা দূর করে সংঘাত নিরসন করাই এই সংশোধন বিলের উদ্দেশ্য। বিলে তিনটি বিষয় গুরুত্ব পায় ; (১) বর্গাদারদের জমির উপর অধিকার, (২) অধীন রায়তদের সমস্যা এবং (৩) জমির হস্তান্তরজনিত বিবিধ প্রশ্ন।[১৭] অবশ্য বিলে জমিদারের অধিকার সুনিশ্চিত করার সর্ববিধ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়, কিন্তু বর্গাদারদের অধিকারের স্বীকৃতি পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া হয়। প্রজা হিসেবে স্বীকৃতির জন্য যে সব শর্ত বিলে বর্গাদারদের উপর আরোপ করা হয়, মুসলমান সদস্যরা তার বিরুদ্ধাচরণ করেন। বিভিন্ন ধারা উপধারা নিয়ে যখন সংশোধন প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয়, তখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সাধারণ মুসলমান সদস্যরা বর্গাদার ও রায়তদের পক্ষে (কোনও কোনও সময় মুসলমান জমিদারদেরও তারা সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হন) এবং

সব স্বরাজী হিন্দু সদস্য, দু'একজন মুসলমান জমিদার সদস্য এবং ইউরোপীয় গোষ্ঠী জমিদারদের পক্ষে ভোট দেন। নলিনীরঞ্জন সরকার প্রমুখ সদস্যকে অনেক সময়ই অত্যন্ত নগ্নভাবে জমিদারদের পক্ষে বক্তব্য রাখতে দেখা যায়। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ কংগ্রেস নেতা বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মোর্চা গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে জমিদার-ঘেঁষা নীতি সমর্থন করেন। এমনকি, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতা, যিনি প্রথমে বিলটিকে "প্রজাস্বার্থ সংহারের এবং জমিদার স্বার্থ সংরক্ষণের বিল" বলে অভিহিত করেছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত বর্গাদারদের বিরুদ্ধে, জমিদারের পক্ষে ভোট দেন।

বিধানসভায় এই বিলটি নিয়ে প্রায় একমাস আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক চলে। সরকারকে সাধুবাদ জানিয়ে ইউরোপীয় গোষ্ঠী এবং হিন্দু ও মুসলমান জমিদার সদস্যরা সংশোধনী বিলটিকে স্বাগত জানান। স্যর আবদুল করিম গজনভি বলেন, জমিদার ও প্রজার স্বার্থ অভিন্ন, জমিদাররা চিরদিনই প্রজার স্বার্থরক্ষা করে এসেছেন, সুতরাং জমির উপর জমিদারের অধিকার সুনিশ্চিত করতে পারলে প্রজাস্বার্থই রক্ষিত হবে। গজনভির বক্তব্যের প্রায় প্রতিধ্বনি করে নলিনীরঞ্জন সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ সালে যে প্রথা প্রবর্তন করেছে, ১৩৫ বছর পর তার আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয় বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বংশানুক্রমিক জমিদাররা যে অধিকার অর্জন করেছেন তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। অবশ্য প্রজার স্বার্থরক্ষার জন্যও জমিদারদের যে দায়িত্ব আছে, সেটা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। সরকার এটা স্পষ্ট করে দেন যে এই বক্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত মত নয়, বরঞ্চ এটা স্বরাজ্য দলের মত বলে গণ্য করা উচিত। বর্গাদারদের যে দায়িত্ব আছে, সেটা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। বর্গাদারদের স্বার্থ অন্তত খানিকটা যাতে রক্ষিত হয়, তার জন্য তমিজুদ্দিন খাঁ দুটি মোশন আনেন। প্রথমটি তাঁকে প্রত্যাহার করে নিতে হয়, দ্বিতীয়টি ভোটে বাতিল হয়ে যায়। অখিলচন্দ্র দত্ত এই স্তরে আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, বর্গাদারী প্রথার ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা সমীচীন হবে না। "ভূমি ও শ্রমের এমন অভূতপূর্ব সমন্বয় ও সহাবস্থান অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না" বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি যুক্তি দেখান, অর্ধেক পুঁজির, অর্ধেক শ্রমের প্রাপ্য এর চেয়ে সুষ্ঠু বণ্টনের নীতি আর কি হতে পারে? অন্য কোনো শিল্পে কি তা আছে?"[১৮] জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মোটামুটিভাবে এই মন্তব্যই সমর্থন করে বর্গাদার ও আধিয়ারদের দখলীস্বত্ব দেওয়ার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, জমি যে চাষ করে তার অবদানই বেশি এটা মনে করা ভুল। জমির যিনি মালিক, বাড়তি ফসল উৎপাদনের জন্য যিনি অর্থ বিনিয়োগ করেছেন, তার কি কোনও কৃতিত্ব নেই? অখিলচন্দ্র দত্ত ও জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেরই মূল বক্তব্য, যেহেতু বর্গাদাররা মজুর ভিন্ন আর কিছু নয়,

কাজেই জমির উপর তাদের কোনও স্বত্ব বা অধিকার থাকতে পারে না।[১৯] স্বরাজীদের অবস্থান ছিল নিশ্চিতভাবে বর্গাদারদের বিরুদ্ধে কিন্তু তাঁরা যে বর্গাদার-বিরোধী তা স্বীকার করতে চাইতেন না। ফজলুল হক বর্গাদারদের পক্ষে একটি সংশোধনী আনলে স্যার আব্দুর রহিম ফজলুল হককে সমর্থন করে বলেন, স্বরাজ্য দলের নেতারা যেভাবে বর্গাদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন তাতে শেষোক্তদের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে চলেছে এবং যেভাবে তা করা হচ্ছে তা নীতিবহির্ভূত। এই অভিযোগের উত্তরে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যে জবাব দেন তাতেও প্রজাস্বত্ব আইনের বিষয়ে স্বরাজ্যদলের সুবিধাবাদী অবস্থানই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় তারা জমিদারদের পক্ষ নিয়ে প্রজাস্বার্থ-বিরোধী ভূমিকা নিয়েছে। কংগ্রেস যা চায় তা হলো বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করার জন্য জমিদার ও রায়তের মধ্যে সমন্বয়সাধন, সংঘর্ষ নয়। এই দুই পক্ষের কারুর স্বার্থে যাতে আঘাত না লাগে সেদিকেই কংগ্রেসের লক্ষ্য। জমিদার ও প্রজার মধ্যে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্ব কোনও মতেই কংগ্রেস নিতে পারে না, উভয়ের স্বার্থরক্ষা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।[২০] যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বক্তব্যে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের মনোভাবই ব্যক্ত করা হয়। ইতিপূর্বে উত্তরপ্রদেশে কৃষকদের কাছে গান্ধীজী এক আবেদনে বলেন, কংগ্রেস ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্তির বিপক্ষে। জমিদারদের স্বার্থে আঘাত লাগে এমন কোনও কর্মসূচী কংগ্রেসের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। নেহাৎ মুখরক্ষার জন্য কংগ্রেস ফজলুল হকের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে না, বিনা ডিভিসনে প্রস্তাবটি পাস হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন এই ধরনের ঘটনা ছাড়া দেখা যায়, স্বরাজী এবং স্বরাজী নন এমন সব হিন্দু সদস্যই জমিদারদের পক্ষ সমর্থন করেন, ফলে জমিদারদের বিরুদ্ধে যেসব সংশোধনী মুসলমান সদস্যরা আনেন তার সবগুলিই বাতিল হয়ে যায়। অসিমুদ্দিন আহমদ (ত্রিপুরা) জমি হস্তান্তরের সময় জমিদারকে দেয় ফি (যা ঐ সময় বছরে দু'কোটি টাকার মত হতো) পুরোপুরি বাতিল করে দেওয়ার জন্য এক সংশোধনী আনেন, কিন্তু তা ২২-৭৫ ভোটে বাতিল হয়। তমিজুদ্দিন খাঁ ও অসিমুদ্দিন আহমদের এই সংক্রান্ত প্রস্তাবও যথাক্রমে ২৫-৭৬ ও ১৬-৬৯ ভোটে পরাস্ত হয়। অনুরূপভাবে আজিজুল হক, নৌশের আলি ও একরামুল হকের প্রস্তাবও বাতিল হয়ে যায় বিরাট ভোটের ব্যবধানে।

বিতর্ক ও ভোটাভুটি বেশি হয় জমি হস্তান্তরের সময় জমিদারের প্রাপ্য ফি নিয়ে। কেউ কেউ প্রস্তাব করেন, জমিদারকে এ বাবদ একেবারেই ফি দেওয়া উচিত নয়। কেউ কেউ আবার বিক্রয়মূল্যের শতকরা ৩০ ভাগ জমিদারের প্রাপ্য বলে মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত রমেশচন্দ্র বাগচির প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়,

জমি হস্তান্তর দরুন জমিদার শতকরা ২০ ভাগ ফি পাবেন। কংগ্রেসের তরফ থেকে এর সাফাই দিয়ে অবশ্য বলা হয়, এ প্রস্তাব জমিদার-ঘেঁষা হলেও আপাতত রায়তরা যেন এই প্রস্তাব মেনে নেন। ভবিষ্যতে বিধানসভা যখন আরও "যথাযথভাবে গঠিত" হবে তখন ফি হ্রাসের কথা চিন্তা করা যাবে। বিধানচন্দ্র রায়ও বলেন, রায়তদের বেশি সুবিধা এই মুহূর্তে কংগ্রেস দিতে পারছে না। আইনসভার বাইরে এ বিষয়ে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করে নেওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।[২১]

বিধানসভায় প্রজাস্বত্ব বিলের উপর যে ভোট হয় তার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।[২২] একুশ/বাইশ জন মুসলমান সদস্য বিভিন্ন মোশন ও সংশোধনীতে বর্গাদারদের পক্ষ সমর্থন করেন। বর্গাদারদের বিরুদ্ধাচরণ করে জমিদারদের পক্ষে ভোট দেন স্বরাজ্য ও অন্যান্য গোষ্ঠীর ৪২-৪৯ জন সদস্য। অসিমুদ্দিন আহমদ, তমিজুদ্দিন খাঁ, সৈয়দ নৌশের আলি, আজিজুল হক, ফজলুল হক, নুরুল হক চৌধুরী, আবুল কাশেম প্রমুখ মুসলমান সদস্য সব সময়ই বর্গাদারদের পক্ষে ভোট দেন। কোনো কোনো সময় এঁরা সমর্থন পেয়েছেন খাজা নাজিমুদ্দিন, আবদুর রহিম, কে পি রায়চৌধুরী, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবতীমোহন সরকার প্রমুখ সদস্যের। যে সব স্বরাজী বিধায়ক বর্গাদারদের বিরুদ্ধে ভোট দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, কিরণশংকর রায়, হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, হেমচন্দ্র নস্কর, নলিনীরঞ্জন সরকার, অখিলচন্দ্র দত্ত, প্রভুদয়াল হিম্মৎ সিং, আনন্দমোহন পোদ্দার ও অন্যান্যরা। জমিদার ব্লকের শশিকান্ত আচার্য চৌধুরী, বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, মাড়ওয়ারী অ্যাসোসিয়েশনের বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা ও অন্যান্য সদস্য স্বরাজীদের সমর্থন করেন। তবে জোতদার ও অধীন রায়তদের প্রসঙ্গে শশিকান্ত আচার্য চৌধুরী, নসিপুরের রাজা, কাশিমবাজারের মহারাজা ও জমিদার ব্লকের অন্য কয়েকজন সদস্য মুসলমান বিধায়কদের সঙ্গে ভোট দেন। স্বরাজীদের সমর্থন করেন গজনভি, মুশারফ হোসেন, নবাব আলি চৌধুরীর মতো মুসলমান জমিদাররা। ইউরোপীয় ও সরকারি ব্লকের ৩৭ জন সদস্যের সমর্থনও স্বরাজীরা পান। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন মনোনীত সব সদস্য, ইন্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা বিভিন্ন সংশোধনীর বিরোধিতা করার ফলে প্রজাস্বত্ব বিল যেভাবে বিধানসভায় পেশ করা হয়েছিল সেভাবেই পাস হয়ে যায়। সরকার অত্যন্ত নিপুণভাবে বিলটির খসড়া তৈরি করেছিলেন এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার জন্য বুঝতে পেরেছিলেন, প্রকাশ্যে প্রজার মঙ্গলের জন্য যত দরদ দেখানো হক না কেন প্রজাকে জমির স্বত্ব দেওয়ার ব্যাপারে সম্পত্তির মালিকরা বিন্দুমাত্র স্বার্থত্যাগে রাজি হবেন না।

আইনসভার ভিতরে ও বাইরে এই বিল নিয়ে যেমন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তেমনি সংবাদপত্রেও এ নিয়ে নানা মন্তব্য প্রকাশিত হয়। মোটামুটিভাবে স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা ও অন্যান্য কাগজ সবকারি প্রস্তাব সমর্থন করে ; অন্যদিকে আনন্দবাজার পত্রিকা, মোহাম্মদি, গণবাণী প্রভৃতি পত্রিকা বিলের বিভিন্ন ধারা প্রজাস্বার্থ-বিরোধী বলে মত প্রকাশ করে। বিলটি পাস হওয়ার পর আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, "অত্যন্ত দুঃখের বিষয় স্বরাজ্যদল গণতন্ত্রের উপাসক, প্রজাদের প্রতিনিধি ও দেশের হিতকামী বলিয়া আত্মপ্রচার করেন। তাঁহারাই গভর্নমেন্টের সঙ্গে যোগ দিয়া প্রজাদের অনিষ্টকর আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।"[২৩]

প্রজাস্বত্ব আইন বাংলার রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন নিয়ে আসে, স্বরাজীদের অন্তর্দ্বন্দ্বও এর ফলে ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। প্রজাস্বত্ব আইনের এই পরিণতির জন্য মধ্যস্বত্বভোগী ও জমিদারদের প্রাধান্যকেই দায়ী করা হয়। স্বরাজী নেতা ও কর্মীদের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধী তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরাজ্য দলের প্রার্থীকে পরাজিত করে মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমা কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। প্রজাস্বত্ব বিলের ক্ষেত্রে অবশ্য সবসময়ই তিনি স্বরাজীদের পক্ষ সমর্থন করেন। আগস্ট মাসে বিল পাস হয়ে যাওয়ার পর প্রমথনাথ নিজের নির্বাচনী এলাকায় ফিরে যাওয়ার পর প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কাঁথি থেকে প্রকাশিত "নীহার" সাপ্তাহিক পত্রিকায় "প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন সম্পর্কে কয়েকটি ভিতরের কথা" নাম দিয়ে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন।[২৪] তিনি স্বীকার করেন, স্বরাজ্য দলে জমিদারের আধিপত্যের দরুন এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না। তিনি লেখেন, জমিদার সদস্যরা শতকরা ৩০ ভাগ ফি জমি হস্তান্তরের জন্য দাবি করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের হস্তক্ষেপের ফলে এই ফি শতকরা ২০-তে নামিয়ে আনা হয়। বর্গাদারদের দখলী-স্বত্ব দেওয়ার বিরুদ্ধে স্বরাজীদের ভূমিকা সমর্থন করে প্রমথনাথ বলেন, মুসলমান সদস্যরা এই বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে চাইছিলেন বলেই বর্গাদারদের প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও হিন্দু স্বরাজী সদস্যরা বর্গাদারদের পক্ষ সমর্থন করতে পারছিলেন না। তবে প্রমথনাথের বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় যখন তিনি বলেন, মুসলমান বিধায়করা বর্গাদারদের যে ধরনের অধিকার দিতে চাইছিলেন তা যদি বর্গাদাররা পেয়ে যেত তবে তার বিষময় ফল যে কি হতো তা ভাবা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এক সময় স্বরাজ্যদলের অবিসংবাদী নেতা ও চিত্তরঞ্জনের সহকর্মী বীরেন্দ্রনাথ শাসমলও প্রজাস্বত্ব বিলে স্বরাজীদের ভূমিকার প্রচণ্ড সমালোচক ছিলেন। এমন নগ্নভাবে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য তিনি স্বরাজ্যদলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রচার শুরু করেন। কাঁথিতে তিনি জনসভাও করেন। বীরেন্দ্রনাথের অনুগত প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় মনে

করেন সরকারকে এভাবে সমর্থন না করে স্বরাজীদের উচিত ছিল একটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা। জমিদার ও মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই স্বরাজ্য দল যে সরকারকে সমর্থন করেছিল তা নেতাদের বিতর্ক থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২৫]

প্রজাস্বত্ব আইনকে কেন্দ্র করে বাংলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আরও প্রশ্রয় পায়। আইনসভা স্পষ্টত সাম্প্রদায়িক ভাগে বিভক্ত হয়। "প্রজাস্বত্ব বিলের ভোটাভুটিতে যেভাবে হিন্দু সদস্যরা মুসলমান সদস্যদের বিভিন্ন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কাতারবন্দি এলাইমেন্ট করেন" তাতে সংসদীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতাকরণই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রজাস্বত্ব আইন পাস হওয়ার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উক্তি উদ্ধৃত করে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, "এর ফলে কংগ্রেস শুধু মুসলিম বাংলার আস্থাই হারাইল না, প্রজাসাধারণের আস্থাও হারাইল"।[২৬] প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনে বর্গাদাররা অবজ্ঞাতই থেকে যায়, রায়তদের কোনও সুবিধা হয় না। স্থিতিবান রায়তরা অবশ্য জমি বিক্রি বা দান করার কিছু সুবিধা পায়। তবে অধীন-রায়ত বা কোরফা প্রজাদের জমি হস্তান্তরের সময় শতকরা ২০ ভাগ সেলামি দিতেই হয়, না দিলে রেজিস্ট্রি অফিসে কোনও দলিল রেজিস্ট্রি করা সম্ভব হতো না।[২৭] ফলে কৃষকদের মধ্যে কংগ্রেসের মর্যাদা ও প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পায়। বিশেষ করে মুসলমান কৃষকদের থেকে কংগ্রেস অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মুসলমানরা ক্রমশ জাতীয়তাবাদের মূল ধারা থেকেই সরে আসতে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্তে আসা যায়, প্রজাস্বার্থের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে বাংলার হিন্দু সেদিন দেশভাগের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, খাজা নাজিমুদ্দিন, আব্দুর রহিমের মতো বিত্তশালী জমিদাররা যখন বর্গাদারদের পক্ষে ভোট দেন তখন সেটা তাঁদের বর্গাদার-প্রীতি বা বর্গাদারদের প্রতি সহানুভূতি বলে মনে করা ভুল হবে। সাময়িক আবেগ, হিন্দু বিরোধিতা, মুসলমান সমাজের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা, সর্বোপরি বর্গাদারদের সপক্ষে আনীত কোনও সংশোধনী গৃহীত হবে না এই স্থির নিশ্চিত ধারণা থেকেই তাঁরা বিলের আলোচনায় বর্গাদারদের পক্ষ নিয়েছিলেন। এই বিষয়ে কৃষকপ্রজা দলের নেতা আবুল মনসুর আহমদ সরাসরি অভিযোগ করে বলে, "বর্গাদারদের দখলীস্বত্ব দেওয়ার প্রশ্নে অনেক প্রজা-নেতাই হঠাৎ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেন।"[২৮] প্রজাস্বত্ব বিলের বিরুদ্ধে ঢাকার নবাব হবিবুল্লা ও অন্যান্য জমিদাররা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, কারণ তাঁদের অভিযোগ ছিল, জমিদারদের স্বার্থ এই বিলে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে।

প্রজাস্বত্ব আইনের পরবর্তী সংশোধন হয় ১৯৩৮ সালে, ফজলুল হক-মুসলিম

লীগ মন্ত্রিসভার আমলে। এই এক দশকে ভূমিব্যবস্থার জটিলতা আরও বৃদ্ধি পায়, কৃষক বর্গাদারদের বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। বেগার প্রথার নিষ্ঠুরতা, জমিদারের নজরানা, জমি থেকে উচ্ছেদ ও নানাবিধ অত্যাচার ঋণভারে জর্জরিত কৃষক সমাজকে জমিদার-বিরোধী, মহাজন-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করতে প্রেরণা দেয়। কৃষকদের সংগ্রামী ভূমিকা জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০-৩৪) সত্যিকারের গতিশীলতা এনে দিতে সক্ষম হয়। বাংলা ও বিহারের অনেক জায়গায়ই কৃষকরা চৌকিদারি কর দিতে অস্বীকার করে। মেদিনীপুর, মানভূম, সিংভূম অঞ্চলে দলে দলে কৃষকরা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেয়। ১৯৩৬ সালে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীকে সভাপতি করে নিখিল ভারত কৃষকসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় থেকেই কৃষক আন্দোলন নতুন গতিপথের সন্ধান পায়। কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষি ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান দাবি করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করার নির্দিষ্ট প্রয়াস শুরু হয়। জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি, বেগার প্রথা রদ, কৃষক ও ভূমিহীনদের মধ্যে সরকারি খাস জমির বিলি বন্দোবস্ত ও কৃষিঋণ মকুব ইত্যাদির দাবি ঐ সময় অগ্রাধিকার পায়। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা দল যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করে তার চৌদ্দ দফা দাবির মধ্যে প্রধান ছিল বিনা ক্ষতিপূরণের জমিদারি উচ্ছেদ। কংগ্রেসের ইস্তাহারেও ভূমি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের নির্দেশ ছিল। কিন্তু নির্বাচনের পর ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত "জমিদার পুষ্ট মন্ত্রিসভার" পক্ষে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কোনও নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রজা দল ও সাধারণ মুসলমান বিধায়কদের বিক্ষুব্ধ মনোভাব খানিকটা প্রশমিত করার জন্য ১৯৩৭ সালে হক-মন্ত্রিসভার ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বিজয়প্রসাদ সিংহরায় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন সংক্রান্ত বিল বিধানসভায় পেশ করেন।

সংশোধনী বিলে দখলীস্বত্ববাদ রায়ত ও অধীন রায়ত বা কোর্ফা প্রজা সকলকেই জমি হস্তান্তরের অধিকার দেওয়া হয় এবং জমিদারকে দেয় জমির বিক্রয়মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ খারিজ বা কর-খারিজ ফি রহিত করা হয়। প্রজা-উচ্ছেদের যে সব নিয়ম ছিল তাও অনেকটা শিথিল করা হয়। জমিদার ও প্রজার মধ্যে যে ধরনের চুক্তিই হোক না কেন, ১৫ বছরে তার দেনা শোধ ও মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে বলে সংস্থান রাখা হয়। খাজনা বাকি পড়ার জন্য প্রজার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করার প্রচলিত ব্যবস্থা রহিত হয়। আবওয়াব বা পার্বণী ইত্যাদির নামে প্রজার কাছ থেকে বাড়তি কোনও খাজনা আদায় ফৌজদারী অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। সুদের হার টাকায় দু'আনা থেকে কমিয়ে এক আনায় আনা হয়। পরবর্তী দশ বছরের জন্য কোনও খাজনা বৃদ্ধি হবে না বলে বিলে সংস্থান রাখা হয়।

১৯২৮-এ প্রজাস্বত্ব বিলে স্বরাজী তথা কংগ্রেস যে ভূমিকা নেয় তার খানিকটা পরিবর্তন হয় ১৯৩৭ সালে। কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী অধিবেশনে (লক্ষ্ণৌ ১৯৩৬) জওহরলাল নেহরু কৃষি ব্যবস্থায় ভূমিসংস্কার মারফত কায়েমী স্বার্থের অবসান ঘটানোর সংকল্প ঘোষণা করেন। একমাত্র সমাজতন্ত্রই ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় বিপুল ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে বলে তিনি তাঁর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আদর্শগত ও সাংগঠনিক প্রশ্নে কংগ্রেস তখন সচল ও গতিশীল। কৃষিব্যবস্থা সম্বন্ধে কংগ্রেসেব এই পরিবর্তিত মনোভাবের প্রতিফলন পাওয়া যায় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিলের আলোচনায়। প্রজাস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কংগ্রেস বিলের উপর কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাব আনে। শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ কংগ্রেস নেতা অনেকটা বামপন্থী অবস্থান থেকে বক্তব্য রাখেন, তবে ভূমি সমস্যার আমূল সমাধানের বিশেষ কোনও নির্দেশ তাঁদের বক্তব্যে পাওয়া যায় না। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ও কৃষক প্রজার নেতারা কিছু নির্দিষ্ট সুপাবিশ করেন। মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা (আংশিক) ও জমিদার গোষ্ঠী মিলিয়ে ৮০/৮৫ জন বিধায়ক বিলের পক্ষে এবং কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা দলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর ৩০/৩৫ জনকে বিপক্ষে ভোট দিতে দেখা যায়। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অধিকাংশ বিধায়কই বিলের বিরোধিতা করে এর প্রত্যাহার দাবি করেন। এঁরা মনে করেন, সম্পত্তির অধিকারের মতো মৌলিক অধিকারে এমনভাবে সরকারের হস্তক্ষেপ সঙ্গত হয়নি। কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা দলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বিলের বিরোধিতা করেন ; কারণ, তাঁদের মনে হয় এই বিলে কৃষকস্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষিত হয়নি। কৃষক প্রজার অসিমুদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার পালোয়ান, আবু হোসেন সরকার, এমদাদুল হক, সৈয়দ হাসান আলি, আবদুল মজিদ এবং বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কংগ্রেসের শরৎচন্দ্র বসু, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, হেমপ্রভা মজুমদার, নলিনাক্ষ সান্যাল প্রমুখের সঙ্গে বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে দেখা যায়। বিধানসভা থেকে বিলটি পাস হয়ে যাওয়ার পর জমিদারদের চাপে গভর্নর বিলে সম্মতি দিতে অযথা কালক্ষেপ করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য গভর্নরের সম্মতি পাওয়া যায়।

উল্লেখ করতে হয় ভূমি সমস্যা সমাধানে জমিহীন কৃষক, বর্গাদার, ক্ষেতমজুর ইত্যাদির সমস্যা কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে গুরুত্ব পায়নি। বরঞ্চ সক্রিয় কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের সংযোগ প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্ব বরদাস্ত করতে পারেননি। ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতা ও প্রখ্যাত আইনজীবী কামিনীকুমার দত্তকে ১৯৩৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী না করার মধ্যেই এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কামিনীকুমার দত্ত ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের নেতা হিসেবে জনপ্রিয় ছিলেন। জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত করার ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা ছিল। তিনি ছিলেন ত্রিপুরা কৃষক সমিতির (১৯৩৭-এর

নির্বাচনে জেলার ৭টি আসনের মধ্যে ৫টিতেই এই সমিতির প্রার্থী জয়লাভ করেন) প্রাণপুরুষ। মুকলেসুর রহমান, আবদুল খালেক প্রমুখ ত্রিপুরা কৃষক সমিতির নেতারা তাঁরই নির্দেশে পরিচালিত হতেন। জেলা শাসক তাঁকেই এই সমিতির "ব্রেন" বলে অভিহিত করেন। তাঁর নির্দেশ ও অর্থানুকূল্যে যে সমিতির কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে, এ বিষয়ে সরকার নিঃসন্দেহ ছিলেন। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বের মনঃপূত হয়নি। বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয় না।[২৯]

১৯৪০-এ প্রজাস্বত্ব আইন আবার সংশোধিত হয়। সংশোধনীতে বলা হয়, প্রতি ১৫ বছরে একবার মাত্র খাজনা বৃদ্ধি করা চলবে এবং তাও এককালীন টাকায় দু'আনার বেশি বাড়ানো যাবে না। ১৯৪৬-৪৭ সালে কৃষকসভার নেতৃত্বে ও কমিউনিস্টদের সক্রিয় অংশগ্রহণে বাংলার কয়েকটি জেলায় তেভাগা আন্দোলন চলার সময় সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার তরফ থেকে বর্গাদারদের কিছু অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে "বঙ্গীয় বর্গাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল (১৯৪৭)"-এর খসড়া কলকাতা গেজেটে প্রকাশ করা হয়। বিলে জমির উপর ভাগচাষীর দখলীস্বত্ব এবং ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিলটি প্রকাশের পর মুসলিম লীগের জমিদার ও জোতদার সদস্যরা এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করে, ফলে মন্ত্রিসভা বিলটি আর বিধানসভায় পেশ করতে সাহস পায় না। বদরুদ্দিন উমর লিখছেন, "সারা বাংলাদেশব্যাপী প্রবল কৃষক-আন্দোলনের ফলে মুসলিম লীগের যে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল অংশের প্রভাবে বিলটি প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরাও মুসলমান জোতদারদের বিরোধিতার মুখে সেটা আইনে পরিণত করার ব্যাপারে কোনো জোর উদ্যোগ নিতে উৎসাহী হলেন না। কাজেই বিলটি মুসলমান সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগঠন মুসলিম লীগের একটি অংশের 'সদিচ্ছার' বাহন হয়েই মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় কবরস্থ হলো।"[৩০] জ্যোতি বসু বিলটি ধামাচাপা দেওয়ার কারণ সুরাবর্দীকে জিজ্ঞাসা করলে সুরাবর্দী উত্তর দেন : "আমি জানতাম না যে, আমার দলে এত জোতদার আছে।"[৩১] এই বিল প্রচারের ফলে তেভাগা আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ভবানী সেন লিখেছেন, "যখন খসড়া বর্গাদার বিল প্রকাশিত হয়, আমরা তখন আত্মসন্তুষ্ট ও অসতর্ক হয়ে পড়ি, কারণ আমরা ভেবেছিলাম জয় সমাসন্ন। আমরা তাই সময়মতো সেই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকে উদ্‌ঘাটিত করিনি।"[৩২] দেশ বিভাগের চার মাস আগে ২১ এপ্রিল, ১৯৪৭ রাজস্বমন্ত্রী ফজলুর রহমান "জমিদারি ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল" নামে একটি বিল বিধানসভায় পেশ করেন। এবারও লীগের জমিদার বিধায়কদের তরফ থেকে প্রবল আপত্তি ওঠে কিন্তু বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। দেশ বিভাগের ফলে বিলটি স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়ে যায়।

স্বাধীনতার পর ভূমিসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ১৯৪৭ সালে জে সি কুমারাপ্পার সভাপতিত্বে গঠিত ভূমিসংস্কার কমিটি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কৃষকদের জমির মালিকানা দেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারা ভূমিসংস্কারের কর্মসূচী রূপায়ণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সংশোধন মারফত (প্রথম ও চতুর্থ) সাংবিধানিক প্রতিবন্ধকতা বহুলাংশে দূর হওয়ার পর পাঁচের দশক থেকে কয়েকটি রাজ্য সরকার জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। পশ্চিমবাংলার ১৯৫৩ সালে জমিদারি অধিগ্রহণ (সাধারণভাবে জমিদারি উচ্ছেদ) আইন এবং ১৯৫৫ সালে ভূমিসংস্কার আইন পাস হয়। জমিদারি উচ্ছেদ আইনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি প্রথার বিলোপসাধন, ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি অধিগ্রহণ, দেবোত্তর, ওয়াকফ মেছোঘেরি ফলের বাগান ইত্যাদি বাদ দিয়ে ব্যক্তিভিত্তিক ২৫ একর জমির সিলিং ধার্য হয়। ভূমিসংস্কার আইনে জমির খাজনাহ্রাস, বর্গাদারদের জন্য উৎপন্ন ফসলের শতকরা ৬০ ভাগ এবং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়। প্রজাস্বত্ব আইনের মতো এই দুই আইন এবং জমি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি আবর্তিত হতে থাকে। কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত জনসমষ্টির নতুন করে শক্তিবিন্যাস হয়। গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোতেও বেশ কিছু পরিবর্তন আসে, মেরুকরণ না হলেও আড়াআড়ি বিভাজনের প্রক্রিয়া শুরু হয় গ্রাম-সমাজে।

দু'টি আইন নিয়েই একদিকে যেমন সাফল্যের উল্লাস, অন্যদিকে তেমনি ব্যর্থতা ও সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। প্রায় সব কংগ্রেস সদস্য, এমনকি বিধানসভার অধ্যক্ষও আইন দুটিকে "বৈপ্লবিক ও যুগান্তকারী" বলে অভিহিত করেন। রাজস্বমন্ত্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসু দাবি করেন, আইন দুটি পাস হওয়ার ফলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান হয়েছে, মধ্যস্বত্বভোগীদের অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়েছে এবং জমির ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রকৃত চাষী, বর্গাদার ও ক্ষেতমজুররা উপকৃত হয়েছেন। "নাম কা আস্তে" আইন দুটি পাস হয়েছে, বিরোধীদের এই বক্তব্য খণ্ডন করে কংগ্রেস সদস্য নিশাপতি মাঝি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় দেখান, কীভাবে ভূমিসংক্রান্ত আইনদ্বারা গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হচ্ছে। সমবায় গঠনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, বর্গাদার, ক্ষেতমজুর ও চাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষের "সমবায় সমিতি ব্যতীত আত্মরক্ষার অন্য কোন পথ নেই।" "বৃহৎ চাষী এবং দুর্গত দুঃস্থ রায়ত এই দুই আইনের দ্বারা সমভাবে উপকৃত হয়েছে" বলে তিনি তাঁর বিশ্বাস ব্যক্ত করেন।[৩৩] ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, রাসমণি চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, রামহরি রায় প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্য ছিল, "কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত জমিচ্যুত মালিক, জমির মালিক, বৃহৎ চাষী, প্রান্তিক চাষী, ভূমিহীনদের স্বার্থ

রক্ষিত হয়েছে” এই দুটি আইনে। শঙ্করপ্রসাদ মিত্র দাবি করেন, কৃষককে জমির স্বত্ব দেওয়া হয়েছে, রায়তকে জমির মালিক করা হয়েছে, জমিহীনদের বাঁচার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রায় সব বিরোধী সদস্যই আইনের ফাঁকফোকর ও অসম্পূর্ণতার সমালোচনা করেন। দুই বিলের আলোচনায় বিরোধীদের মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রী ও অপারেশন বর্গার স্থপতি। এছাড়া কমিউনিস্ট দলের বঙ্কিম মুখার্জি, জ্যোতি বসু, কানাই ভৌমিক (বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষুদ্রসেচ মন্ত্রী), অজিত বসু, মনোরঞ্জন হাজরা ও অন্যান্য ; প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, সুধীর রায়চৌধুরী, দাশরথি তা, ড. অতীন বসু, ফরওয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত বসু, বিভূতি ঘোষ, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এস ইউ সি-র সুবোধ ব্যানার্জি এবং হিন্দু মহাসভা ও জনসংঘের রাখহরি চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রকুমার চৌধুরী প্রমুখ প্রায় সব বিরোধী সদস্যই বিলের আলোচনায় অংশ নেন। কেবলমাত্র ভূমিসংস্কার বিলের আলোচনাতেই বিরোধী দলগুলির বিভিন্ন বক্তা ২২১টি বক্তৃতা দেন।

প্রসঙ্গত, ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সঠিক পরিসংখ্যান বিধানসভার সামনে তখন ছিল না। যেমন, জমিদারি দখল বিল নিয়ে বিধানসভায় আলোচনার সময় বলা হয়—১৮ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ একর জমি সরকারের হাত ন্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিনয় চৌধুরী অবশ্য এই দাবি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন ২৫ একর জমির মালিকের সংখ্যা ২৭ হাজার ৪৮৯ জন। তাদের হাতে ১৩ লক্ষ একরের মত জমি আছে। এদের ২৫ একর করে দিয়ে ৬ লক্ষ একরের মতো জমি সরকার পেতে পারেন।[৩৪] (পরবর্তীকালে আইন সংশোধন করে জমির সিলিং ব্যক্তিভিত্তিকের বদলে পরিবারভিত্তিক এবং ২৫ একরের পরিবর্তে ১৭.৫ একর হওয়ার ফলে সরকারের হাতে ন্যস্ত জমির পরিমাণ বেড়ে ৩০-৩৫ লক্ষ একর হয় বলে প্রকাশ)

নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে বিল দুটির আলোচনা কোনও কোনও সময় সাদামাঠা, হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু বিরোধী বিধায়কদের অধিকাংশ বক্তব্যই ছিল বিশ্লেষণাত্মক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত, নিছক সমালোচনার জন্য সমালোচনা নয়। রাজস্বমন্ত্রী বিধানসভায় বিল পেশ করার পর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় বলেন, “আমার মনে হয় না, এটা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কিত বিল। জমিদারদের জমির ওপর যে রাইট আছে, সেই রাইটই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কিনে নিচ্ছেন, কাজেই abolition নয়, টাকা দিয়ে acquisition. স্টেটের হাতে ক্ষতি দিয়ে জমিদারি আনা হয়েছে, অন্যসব কিছু ঠিক আছে। সুতরাং এই বিলের ভিতর

দিয়ে যাতে করে বাংলাদেশে সত্যিকারের সামাজিক উন্নতি, কৃষির উন্নতি এবং কৃষককুলের উন্নতি হয়, তার কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না।[৩৫] কানাই ভৌমিক বলেন, "জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলে চাষী জীবনের কোন উন্নতি হবে না। আসল কথা, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের হলে কোটি কোটি টাকা জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীদের দেওয়া হবে।" .....আমার মনে হয় যতক্ষণ না জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে চাষীকে জমির মালিক করা হয় এবং ভূমিহীন চাষীকে জমি না দেওয়া হয় এবং বিনা খেসারতে ভাগচাষ সম্পূর্ণ বিলোপ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষকদের জীবনে কোন পরিবর্তন আসবে না।" বিধানচন্দ্র রায় এইসব অভিযোগের জবাব দেন কিন্তু বিতর্ক চলতেই থাকে, বিরোধীরা সন্তুষ্ট হন না। বঙ্কিম মুখার্জির প্রস্তাব অনুযায়ী বিলটি দুই কক্ষের (বিধানসভা ও বিধানপরিষদ) যৌথ সিলেক্ট কমিটির কাছে পুনরায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। ২৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত সিলেক্ট কমিটিতে বঙ্কিম মুখার্জি ও বিনয় চৌধুরী ভিন্ন মত ব্যক্ত করে একটি 'নোট' দেন। রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ হলে হেমন্ত বসু অভিযোগ করেন বিরোধী সদস্যদের বক্তব্য যথাযথভাবে প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয় নি। সুধীর রায়চৌধুরী (পি এস পি) বিলটি সিলেক্ট কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য পুনরায় পাঠানোর প্রস্তাব রাখেন কিন্তু তা ৬৬-১৩০ ভোটে বাতিল হয়ে যায়।

জমিদারি অধিগ্রহণ আইনের অকার্যকারিতা ও দুর্বলতা শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই মুণ্ডহীন কবন্ধ আইনের (বঙ্কিম মুখার্জির কথায়) বিরুদ্ধে কংগ্রেস সদস্যদেরও মাঝে মধ্যে সোচ্চার হতে দেখা যায়। আইনের কয়েকটি সংশোধনও হয় কিন্তু সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। শেষ পর্যন্ত সরকারই উদ্যোগ নিয়ে ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়ন করেন।

বিধায়কদের সমালোচনা কেন্দ্রীভূত হয় দুটি বিলের কয়েকটি প্রধান ত্রুটিকে ভিত্তি করে। যেমন ;

(ক) পরিবার ভিত্তিক না করে ব্যক্তি ভিত্তিক জমির সিলিং ধার্য এবং তাও ২৫ একর ;

(খ) ক্ষতিপূরণের বোঝা ;

(গ) মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রতি সরকারি "বদান্যতা',

(ঘ) বেনামী অবৈধ হস্তান্তর বা "ম্যালাফাইড ট্রান্সফার" সম্বন্ধে সরকারের উদাসীনতা ;

(ঙ) ফলের বাগান, মেছোঘেরি ইত্যাদি সিলিং-এর আওতা থেকে ছাড় ;

(চ) দেবোত্তর, ওয়াকফ ইত্যাদির অপব্যবহার ;

(ছ) অবাধে বর্গাদার উচ্ছেদ।

বিনয় চৌধুরী, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, সুধীর রায়চৌধুরী প্রমুখ বিধায়করা তথ্য দিয়ে দেখান ব্যক্তিভিত্তিক ২৫ একর সিলিং ধার্য করার পর চাষযোগ্য আর বেশি জমি সরকার অধিগ্রহণ করতে পারবেন না। বিধায়করা অভিযোগ করেন, সরকার সিলিং কমাতে চাইছেন না কারণ বন্ধু-বান্ধবদের চটিয়ে লাভ কি? বিনয় চৌধুরী বলেন, "ভূতের বোঝার মত কম্পেনসেসনের বোঝা আমাদের টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে।" ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের দাশরথি তা জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "জমিদারি প্রথা উঠে যাচ্ছে বলে আমরা সবাই আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি জনসাধারণের মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। আর জমিদাররা যারা প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল, এই বুঝি সব গেল ভেবে তাদের দেখছি এখন খুশি খুশি ভাব। জমিদারি দখল করা হচ্ছে, অথচ তাদের খুশি হওয়ার কারণ কি? কারণ হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে বাজার ছাড়া দরে ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে।"

মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রতি সরকারি "বদান্যতা" নিয়ে সমালোচনামুখর ছিলেন বিধায়করা। আইনে জমির স্বত্বাধিকারী ছাড়া রায়ত, অধীন রায়ত সবাইকে মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সংজ্ঞা পালটানোর প্রস্তাব করেন বিনয় চৌধুরী কিন্তু সরকার তাতে রাজি হন না। ফরওয়ার্ড ব্লকের বিভূতি ঘোষ অভিযোগ করেন, মধ্যস্বত্বভোগী বড় বড় জমিদার ও রাঘববোয়ালরা যাতে এই আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা সরকারই করে রেখেছেন। দার্জিলিং হিল ট্রাকটস, যেখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের অনেক জমি জায়গা, অবাধে ছাড় দেওয়ার ফলে লাভবান হয়েছে সম্পত্তিবান লোকেরাই।

"ম্যালাফাইড ট্রান্সফার" অবাধে চলছে, সরকার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, এ অভিযোগ আলোচনার প্রতি স্তরেই বিধায়কদের করতে দেখা যায়। সরকারের তরফ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় এবং আইনের অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে জমিদাররা প্রচুর জমি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব গৃহ ভৃত্য ইত্যাদির নামে বেনামী করে দেন। ১৯৫৪ সালে জমিদারি অধিগ্রহণ আইনের সংশোধন করে ম্যালাফাইড ট্রান্সফার বন্ধ করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় না।

ট্যাঙ্ক, ফিসারি ইত্যাদি এই আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়ার ফলে কিভাবে চাষযোগ্য জমি মেছোঘেরিতে পরিণত করা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত দেন সুবোধ ব্যানার্জি, রাখহরি চ্যাটার্জি, নগেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ বিধায়করা। প্রজাসমাজতন্ত্রী সদস্য নটেন্দ্রনাথ দাস বলেন, "অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আড়াই হাজার বিঘা জমির জন্য ট্রাক্টর এনে ৪০ হাজার টাকা খরচ করে বুলডোজার দিয়ে আবাদ করার ব্যবস্থা হয়েছে, এমন জমিতে যেই আইন পাস হলো অমনি জল ঢুকিয়ে মেছোঘেরি হয়ে গেল।"[৩৬]

মালদহ জেলায় ব্যাপক হারে আমবাগান ছাড় দেওয়া যে ওখানকার কংগ্রেস

বিধায়কদের চাপেই করতে হয়েছে, তার উল্লেখ হয় বিধানসভায়।

দেবোত্তরের নামে যে "লীলাখেলা চলছে" একের পর এক সদস্য তার দৃষ্টান্ত দিতে থাকেন বিধানসভায়। আইন পাস এবং কার্যকর হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে জমিদাররা "শ্রীশ্রী গোপাল ঠাকুর" এবং বিভিন্ন দেবতার নামে ট্রাস্ট গঠন করে প্রচুর সম্পত্তি দেবোত্তরে লিখিয়ে নিজেদের অধিকারেই রাখার ব্যবস্থা করেন। বিধায়ক হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বিদ্রূপ করে বলেন, "সমস্ত বাংলা সরকার দেখি ভক্তিতে গদগদ। আমাদের খোকা ডেপুটি মন্ত্রী (তরুণকান্তি ঘোষকে ইঙ্গিত) রাস্তায় খোলকরতাল বাজিয়ে নাচছেন।"[৩৭] দেবোত্তরে ছাড় দিয়ে বাঘের খাঁচার দরজা খোলা হচ্ছে বলে বিধায়করা মন্তব্য করেন।

ব্যাপকহারে বর্গাদার উচ্ছেদের বিরুদ্ধেও বিধানসভাকে সোচ্চার হতে দেখা যায়। হেমন্তকুমার ঘোষাল এক প্রশ্ন উত্থাপন করে বিধানসভাকে জানান, জমিদারি অধিগ্রহণ আইন পাস হওয়ার পর কেবলমাত্র সন্দেশখালি থানা এলাকায় জমিদাররা ২২১০টি অভিযোগ পেশ করেছেন বর্গাদার উচ্ছেদের জন্য। ক্যানিং এলাকায় এই সংখ্যা ৭৮৩। ভাগচাষ বোর্ডকে না জানিয়েই অনেক উচ্ছেদ হয়েছে বলে তিনি বিধানসভাকে জানান। সুবোধ ব্যানার্জি জয়নগর, মথুরাপুর, মগরাহাট, মন্দিরবাজার অঞ্চল থেকে বর্গাদার উচ্ছেদের বর্ণনা দেন। মন্ত্রী ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন কিন্তু বর্গাদার উচ্ছেদ চলতেই থাকে। অজিত বসু (সিপিআই) "৩০ লক্ষ ভাগচাষীর" দুর্বিষহ জীবনের কাহিনী বিধানসভা তুলে ধরেন এবং বর্গাদার উচ্ছেদ ও হয়রানির বিরুদ্ধে এক সংশোধনী আনেন কিন্তু তা ৫৬-১২২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

কয়েক বছরের মধ্যেই আইন দুটির সংশোধন হয় কিন্তু বাদ-বিতর্ক চলতেই থাকে। ভূমি সমস্যাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিও বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। ১৯৫২-৫৭ পর্বে বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে একটি প্রভাবশালী অংশ ছিল জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী। সরকারের ওপর এদের চাপ ছিল যথেষ্ট, এদের লবিও ছিল শক্তিশালী। কংগ্রেসকে গ্রামাঞ্চলে এই শ্রেণীর ওপরই বহুলাংশে নির্ভর করতে হতো। কৃষিজীবী মানুষের সঙ্গে সাংগঠনিক কোন যোগসূত্র কংগ্রেসের ছিল না। জমিদারি দখল আইন প্রণয়নে বাধা দেওয়া যাবে না, এই উপলব্ধির পর মধ্যস্বত্বভোগীরা আইনে তাদের স্বার্থ যাতে ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হন। সরকারকে তারা স্মারকলিপি দেন। শুধু কংগ্রেস নয়, বিরোধী হিন্দু মহাসভার সদস্যরাও মধ্যস্বত্বভোগীদের পক্ষে বিধানসভায় ওকালতি করেন। এদের বক্তব্য ঃ অনেক মধ্যস্বত্বভোগী আছেন যাদের এক ছটাক জমিও নেই ; সুতরাং যাদের স্বত্ব বিলুপ্ত হচ্ছে সরকারকে তাদের কথা ভেবে দেখতে হবে। মধ্যস্বত্বভোগী "বিত্তচ্যুত ও উদ্বাস্তু হয়ে একটা নতুন বাস্তুহারা শ্রেণী সৃষ্টি করবে" বলে অভিযোগ করেন হিন্দু মহাসভার রাখহরি

চট্টোপাধ্যায়।[৩৮] স্বাভাবিকভাবেই মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থ রক্ষিত হয়। বর্গাদারদের দখলীস্বত্ব দেওয়ার ব্যাপারে, আপত্তি আসে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীদের কাছ থেকেই। ভাগচাষী, ক্ষেতমজুররা সরকারি ঔদাসীন্যেরই শিকার হন, অগণিত কৃষক ভূমিহীন হয়ে পড়ে। পশ্চিমবাংলার কৃষক আন্দোলন এর ফলে শক্তিশালী হয়। কৃষকসভা জমিদারি দখল আইনকে "কিস্তিবন্ধ" আইন" বলে অভিহিত করে। কৃষকসভার সংগঠিত আন্দোলনের ফলে অনেক জায়গায় উচ্ছেদ বন্ধ হয়। ফলে গরিব কৃষকদের মধ্যে কৃষকসভার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কৃষকসভার সদস্য সংখ্যা ১৯৫২ সালে যা ছিল ৩০ হাজার, ১৯৫৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২ লক্ষ ১৯ হাজার।[৩৯]

জমিদারি অধিগ্রহণ আইনের রাজনীতি আলোচনায় উল্লেখ করা প্রয়োজন আইন পাস হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের রাজা-মহারাজা-জমিদাররা মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করেন। জমিদারদের অনেকেই তাদের রাজকীয় প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারছিলেন না। এই সুযোগে তারা সম্পত্তির খানিকটা অংশ সরকারকে দান কবেন, কিছুটা বিক্রি করেন, আর বাকি অধিগৃহীত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ পান। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দপ্তর জমিদারদের বেশ কিছু সম্পত্তি কিনে নেয়। এইভাবে সম্পত্তি ক্রয় কেন্দ্রীয় সরকারও সুনজরে দেখেন না।[৪০]

মেছোঘেরি, ফলের বাগান ইত্যাদি ছাড়ের ব্যাপারে ২৪ পরগনা, মালদহের কংগ্রেস বিধায়কদের স্পষ্টতই ভূমিকা ছিল। ২৪ পরগনার ৩৭ জন এম এল এ-র মধ্যে ২৫ জনই ছিলেন কংগ্রেসের এবং তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের স্বার্থ ফিশারির সঙ্গে যুক্ত ছিল। মালদহের ৯ জন বিধায়কের মধ্যে কংগ্রেসের ৫ জন বিধায়ক ফলের বাগান ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন। জমিদারি দখল আইন ও ভূমিসংস্কার আইনের মধ্যে ভূমিসংস্কার আইন নিয়ে বিধানসভায় বিরোধীদের তেমনভাবে সরব হতে দেখা যায়নি, বরঞ্চ তাঁরা সহায়ক মনোভাবই নেন। সরকার তাঁদের কিছু কিছু বক্তব্যও মেনে নেন কিন্তু প্রয়োগস্তরে আইন দুটি না পারে বর্গাদারদের জেরবার বন্ধ করতে, না পারে গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুরের জমিহীনতা, বেকারী ও অসহায়ত্বের অবসান ঘটাতে। গ্রামজীবনে জমির মালিকদেরই প্রভুত্ব বহাল থেকে যায়। পশ্চিমবাংলার ভূমি সমস্যা প্রশমিত করতে সরকারি প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে বলে বিধায়করা আক্ষেপ করেন।

জমিদারি অধিগ্রহণ আইন ও ভূমি সংস্কার আইন পাস হওয়ার পর চার দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংশোধনের ফলে পরিবারভিত্তিক কৃষি ও অকৃষি জমির সিলিং ধার্য হয়েছে ১৭.৫ একর। জমির ওপর মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়েছে। ধনী কৃষকের হাতে জমির পরিমাণ কমেছে, প্রান্তিক ও গরিব চাষী জমি পেয়েছে। "অপারেশন বর্গা" ইত্যাদির ফলে গ্রামবাংলার শতকরা

৩০ ভাগ লোক কোন না কোনভাবে ভূমিসংস্কার কর্মসূচী দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন ফজলুল হক-মুসলিম লীগ সরকারের আমলে (১৯৩৭-১৯৪০) ফ্লাউড কমিশন বর্গাদারকে প্রজাস্বত্ব অধিকার দেওয়ার সুপারিশ করেছিল। এই নিয়ে বঙ্কিম মুখার্জি ও কৃষক প্রজা দলের অনেক সদস্য জোর দাবিও করেছিলেন, বিধানসভায় বাদ-বিতর্কও হয়েছিল। কিন্তু ছয় দশক পর ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়ন ও এতবার সংশোধনের পর বর্গাপ্রথার রেশ কিন্তু রয়েই গিয়েছে। বর্গাদাররা সর্বত্র আইন অনুযায়ী ফসলের ভাগ পাচ্ছেন না বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত নির্মল মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।[৪১]

ভূমিসংস্কারের অনেক কাজ অসম্পূর্ণ। সিলিং অতিরিক্ত জমি খাস করার প্রয়াস এখনও চলছে! বৃহৎ জোতের কৃষকরা গরিব চাষীদের উচ্ছেদ করে নিজেদের পরিবারের কাউকে না কাউকে ভাগচাষী সাজিয়ে জমি নিজেদের অধিকারে রেখে দিয়েছেন। বিধানসভায় সম্প্রতি উত্থাপিত পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার সংশোধনী বিল ২০০০-এ এই ধরনের আরও ত্রুটি দূর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ভূমি সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির চাপান-উতোর আজও অব্যাহত আছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিধানসভার অধ্যক্ষ : অনুকরণীয় ভূমিকা

আইনসভার গতিশীলতা অনেকাংশে নির্ভর করে অধ্যক্ষ বা সভাপতির উপর। বাংলার বিধানসভার মর্যাদা বৃদ্ধিতে অধ্যক্ষদের অবদান ছিল অসামান্য ; বস্তুত সংসদ ব্যবস্থার বিবর্তনে অতীতের অধ্যক্ষরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অবশ্য ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে আইনসভা প্রতিষ্ঠার প্রায় প্রথম ষাট বছর বিধানসভার কোনও আলাদা সভাপতি বা অধ্যক্ষ ছিলেন না। ছোটলাট বা গভর্নরই ছিলেন আইনসভার সভাপতি। মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইনে (১৯২০) বিধানসভায় সভাপতির পদ প্রচলিত হয়। প্রথম চার বছর গভর্নরকেই সভাপতি মনোনয়নের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। বাংলার প্রথম মনোনীত সভাপতি হলেন সৈয়দ সামসুল হুদা (১৯২০-১৯২২)। সামসুল হুদার পর গভর্নর লিটন প্রখ্যাত সংসদ বিশেষজ্ঞ হেনরি ইভান কটনকে সভাপতি (১৯২২-১৯২৫) মনোনয়ন করেন। কেন্দ্রীয় সংসদে ঐ সময় সভাপতি মনোনীত হন প্রাক্তন ব্রিটিশ এম পি ফ্রেডারিক হোয়াইট। বাংলার প্রথম নির্বাচিত সভাপতি কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়, আর কেন্দ্রীয় আইনসভার বিটলভাই প্যাটেল। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে সভাপতির পদকে স্পিকার বা অধ্যক্ষ বলে অভিহিত করা হয়। বাংলার প্রথম নির্বাচিত অধ্যক্ষ আজিজুল হক (১৯৩৭-১৯৪২)। আজিজুল লন্ডনে হাইকমিশনার নিযুক্ত হওয়ার পর অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সভার কার্য পরিচালনা করেন উপাধ্যক্ষ জালালুদ্দিন হাসেমি (১৯৪২-১৯৪৩)। এর পর অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন সৈয়দ নৌশের আলি (১৯৪৩-১৯৪৬)। নৌশের আলির পর দেশবিভাগ পর্যন্ত অধ্যক্ষ ছিলেন নুরুল আমিন (১৯৪৬-১৯৪৭)। স্বাধীনতার পর প্রথম কয়েক বছর (১৯৪৭-১৯৫২) অধ্যক্ষের কার্যপরিচালনা করেন ঈশ্বরদাস জালান। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর হাওড়ার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শৈলকুমার মুখার্জি বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন (১৯৫২-১৯৫৭)। এর পরের অধ্যক্ষ (১৯৫৭-১৯৫৯) শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে ঐ সময় প্রচণ্ড রাজনৈতিক বিতর্ক হয়। শঙ্করদাসের পর তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে আসীন থাকেন বঙ্কিমচন্দ্র কর (১৯৬০-১৯৬২)। তৃতীয় বিধানসভার অধ্যক্ষ হন কেশবচন্দ্র বসু।

প্রাক মন্ট-ফোর্ড পর্বের (১৮৬২-১৯২০) বিধানসভার সভাপতির ভূমিকা পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ১৮৬২ সালে প্রণীত বিধানসভার পরিচালন সংক্রান্ত নিয়মাবলীর। এই নিয়মাবলীর ১নং ধারায় স্পষ্ট করে বলা হয়, "বাংলার

ছোটলাট অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজপুরুষদের মধ্যে পদমর্যাদার দিক দিয়ে যিনি প্রথম তিনিই সভায় সভাপতিত্ব করবেন।" কীভাবে সভাপতি সভার কার্যপরিচালনা করবেন তারও নির্দেশ দেওয়া হয় নিয়মাবলীতে। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে সভাপতি রোনাল্ডশে ও সহসভাপতি হেনরি হুইলারের অনুপস্থিতিতে ১৯১৮ সালের ২২ জানুয়ারি সভাপতিত্ব করতে দেখা যায়। ঐ সময়কার সভাপতিদের ক্ষমতা ছিল বহুবিস্তৃত। কোনো কারণ না দেখিয়ে সভাপতি যে-কোনো সময় অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত বা বন্ধ রেখে দিতে পারতেন। শৃংখলা রক্ষার বিষয়েও সভাপতির মতামত ছিল চূড়ান্ত। এ বিষয়ে সদস্যদের কোনও প্রশ্ন করার এক্তিয়ার ছিল না। সভায় প্রস্তাব বা প্রশ্ন ইত্যাদি উত্থাপন করার ব্যাপারেও সভাপতির সিদ্ধান্ত সদস্যদের মেনে নিতে হতো। নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে বেসরকারি ভারতীয় সদস্যদের সরকারের সমালোচনায় উৎসাহ দেওয়া হতো। সদস্যরা জনস্বার্থ সংক্রান্ত কোনো বিষয় উত্থাপন করলে সভাপতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্যকে যথাযথ উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। সদস্যদের অধিকার রক্ষার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেও সভাপতি বিশেষ ভূমিকা নিতেন। সভাপতিরা যে নিজেরা পক্ষপাতহীন এবং ভারতীয় সদস্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল তা দেখানোর চেষ্টা করতেন। এই প্রসঙ্গে ঐ আমলের দুজন সভাপতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। একজন হলেন লর্ড কারমাইকেল (১৯১২-১৯১৭), অপরজন লর্ড রোনাল্ডশে (১৯১৭-১৯২০)। সভাপতি হিসেবে কারমাইকেল ছিলেন সহনশীল, ভদ্র ও বিনয়ী। তিনি ছিলেন উদারনৈতিক দলের পার্লামেন্ট সদস্য এবং সংসদ পরিচালনার নিয়মকানুন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল যথেষ্ট। বিধানসভার নিয়মরক্ষায় তিনি ছিলেন যেমন সচেষ্ট, সদস্যদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারেও ছিলেন সমভাবে সচেতন। কারমাইকেলের মৃত্যুর পর বিধানসভায় যে শোক প্রস্তাব নেওয়া হয় তাতে সভাপতি হিসেবে তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।[১] রোনাল্ডশে বলতেন, শাসনবিভাগের প্রধানের চেয়ে আইনসভার সভাপতির কাজ তাঁর কাছে বেশি আকর্ষণীয়। ভারতীয় সদস্যদেরও সভাপতির ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ করতে দেখা যায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকবারই নিরপেক্ষ ভূমিকার জন্য রোনাল্ডশেকে ধন্যবাদ জানান, বিজয়চাঁদ সভাপতির ভদ্র ব্যবহারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এমনকি ফজলুল হকও স্বীকার করেন, "মহামান্য রাজ প্রতিনিধি" বেসরকারি সদস্যদের সুযোগ দিতে কোনো কার্পণ্য করেননি।" তবে এইসব স্তুতিবাক্য অনেকটা আনুষ্ঠানিক বলেই মনে হয়। একজন ইউরোপীয় সদস্য যখন বলেন, বিধানসভায় নির্দ্বিধায় সবকিছু বলার সুযোগ পাওয়া যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, "মনের ভাবনাকে গোপন রেখেই আমাদের মিষ্ট ভাষণ দিতে হয়।"

বিধানসভার প্রথম মনোনীত বাঙালী সভাপতি সৈয়দ সামসুল হুদা। পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলায় বিখ্যাত জমিদার বংশে সামসুল হুদার জন্ম। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী। কিছুদিন তিনি গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্যও ছিলেন। সামসুল হুদা ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। সাম্প্রদায়িকতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। অন্য ধর্মের আচার-আচরণের প্রতি তিনি ছিলেন সহনশীল। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের আত্মকথায় সামসুল হুদা সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। কিভাবে দরিদ্র রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সামসুল হুদা নিজের বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে ওকালতিতে প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করেছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন প্রসাদ তাঁর আত্মজীবনীতে।[২]

সামসুল হুদাকে সভাপতি মনোনীত করে বিধানসভায় গভর্নর ঘোষণা করেন, "বাংলা ভারতে আবার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারল। সামসুল হুদাই প্রথম ভারতীয় যিনি আইনসভার অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করতে পারলেন ; এজন্য নিজে আমি গর্ববোধ করছি।" সামসুল হুদা নির্ভীকচিত্তে ও অবিচলিতভাবে পরিষদের কার্য পরিচালনা করেন। একবার ১৯১৯-এর ভারতশাসন আইনেরও তিনি সমালোচনা করে বলেছিলেন এই আইনের মধ্যে এত বিধিনিষেধ আছে যা শুধু বিরক্তিজনকই নয়, ভয়াবহ।[৩] সামসুল হুদা অনেকাংশে ছিলেন পক্ষপাতমুক্ত। কার্যভার গ্রহণ করার প্রথম দিনেই জানিয়ে দেন তিনি সরকারের অনুগত কর্মচারী নন। "সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা আমার কর্তব্য। কোনদিকেই পক্ষপাতিত্ব করা সভাপতির উচিত নয় এবং আশা করি আমার কার্যকালে আমি এই নীতি থেকে বিচ্যুত হব না।" সামসুল হুদা তাঁর কার্যকাল শেষ করতে পারেননি। অসুস্থতার জন্য তিনি সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং হেনরি ইভান কটনকে পরবর্তী সভাপতি মনোনীত করা হয়।

কটনদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। কটনের পিতা হেনরি কটন ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি। কটন একসময় কলকাতায় ওকালতি করেছেন। ইংলন্ডে ফিরে গিয়ে তিনি ইন্ডিয়া অফিস অ্যাডভাইসারি কমিটির সদস্য হিসেবে মন্টেগুকে সংস্কার কার্যকরী করার ব্যাপারে সাহায্য করেন। কটন ব্রিটেনে ইন্ডিয়ান রিফর্মস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ভারতের নরমপন্থীদের প্রতি এই কমিটির সমর্থন ছিল। স্বভাবতই নরমপন্থীরা কটনের নিয়োগকে স্বাগত জানান এবং তাঁকে 'ভারতসুহৃদ' বলে আখ্যায়িত করেন। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রথম দিকে যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র মিত্র ও নবাব আলি চৌধুরী হস্তান্তর বিষয়সমূহের মন্ত্রী, কটন তখন সভাপতির কার্যভার গ্রহণ করেন। আইনসভার সভাপতিরূপে কটন নরমপন্থীদের সহযোগিতা পান এবং প্রশংসিত হন।

সংসদীয় রীতিনীতি বিষয়ে কটন একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁর

পাণ্ডিত্যও সুবিদিত। সভার কাজ তিনি দৃঢ়ভাবে পরিচালনা করতেন। আইনসভার নিয়মবিধি যাতে যথাযথভাবে পালিত হয় সেদিকেও তিনি বিশেষ নজর দিতেন। কোনো সদস্য যদি 'মাননীয় সভাপতি' বলে বক্তৃতা দিতে শুরু করে কোনো সময় সভাপতির দিকে পিছন ফিরতেন, কটন তখন তাঁকে ভৎর্সনা করতেন।[৪] বিরোধী সদস্যরা যাতে বক্তব্য রাখার সুযোগ পান সেদিকেও কটনের দৃষ্টি ছিল। একবার মন্ত্রীদের মাইনে সংক্রান্ত বরাদ্দ যখন স্বরাজীরা বাতিল করে দিতে চলেছেন, সেই সময়েও কটন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে বলেছেন, 'আপনি কম সময় কেন নেবেন? আপনার বক্তব্য পুরোপুরি শেষ করুন। আপনাকে আরও পনেরো মিনিট সময় দেওয়া হল।'[৫]

স্বরাজ্য দল ও দেশীয় সংবাদপত্র কটনের প্রতি মোটেই সদয় ছিল না। 'নায়ক' পত্রিকা ইভান কটনকে হেনরি কটনের অযোগ্য পুত্র এবং ভারতীয় স্বাধীনতার শত্রু বলে আখ্যায়িত করে।[৬] স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব আইনসভার কার্যকলাপেও প্রকাশ পেত। এমদাদুল হক (ত্রিপুরা) অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি করে বিধানসভায় প্রস্তাব আনলে অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলমান সদস্য তাঁকে সমর্থন করেন। হক শেষ পর্যন্ত ডিভিসন দাবি করলে কটন তা প্রত্যাখ্যান করেন।[৭] রাজবন্দীদের বিষয় উত্থাপিত হলে কটন ওজর আপত্তি দিয়ে প্রস্তাব না-মঞ্জুর করে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

১৯২৩-এর নির্বাচনে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে বিধানসভায় স্বরাজীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কটন একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। খাদি ধুতি ও টুপি পরিহিত চিত্তরঞ্জন বিধানসভায় প্রবেশ করলে কটন তাঁকে "রোমান সেনটর" বলে সম্বোধিত করেন। প্রথম থেকেই স্বরাজীদের সঙ্গে তাঁর তিক্ততার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। স্বরাজীরা বিধানসভার উদ্বোধনী দিনে গভর্নরের বক্তৃতায় অনুপস্থিত থাকেন। যেভাবে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে তার সমালোচনা করে বিধানসভায় তাঁরা এক প্রস্তাব আনেন।[৮] কটন সেই প্রস্তাবে প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়ে অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর থেকে স্বরাজীরা কটনের প্রায় প্রতিটি রুলিং-এ আপত্তি জানান এবং সভাপতিকে অপদস্থ করার বিভিন্ন পন্থা নেন। চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত স্বরাজী সদস্য নুরুল হক চৌধুরী এবং ব্যারিস্টার অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জিকে (মধ্য কলকাতা) কটন প্রতি অধিবেশনেই সাবধান করতেন, অনেক সময় তাঁদের সভাকক্ষ ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। সময় সময় কটন স্বরাজীদের প্রতি এত রূঢ় ভাষা ব্যবহার করতেন যে চিত্তরঞ্জন দাশকেও প্রতিবাদ করতে দেখা যেত। স্বরাজীরা কটনের আচরণে কয়েকবারই সভাকক্ষ ত্যাগ করে সভাপতির প্রতি তাঁদের অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কটন গ্যালারির দর্শকদের অনেক সময় সাবধান করে দিতেন। তারা বিক্ষোভ দেখালে তিনি উপরের

ও নিচের গ্যালারি পরিষ্কার করে দেবেন বলে হুমকিও দেন।[৯]

গুরুত্বপূর্ণ রুলিং ছাড়া কটনকে কয়েকবারই নির্ণায়ক ভোট দিতে হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল উত্থাপন করে কর্পোরেশনের নির্বাচনে মহিলাদের ভোটাধিকার সুপারিশ করেন। এর বিরুদ্ধে রিষিন্দ্রনাথ সরকার, হেমচন্দ্র নস্কর, মামুদ আলি, হামিদুদ্দিন খাঁ প্রমুখ বিধায়ক এক মোশন আনেন। প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট (৩৩-৩৩) পড়ে। কটন তখন মহিলাদের ভোটাধিকারের পক্ষে নির্ণায়ক ভোট দেন এবং বিরোধী প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।[১০] স্বরাজীরা যখন লিটনের সময় বারবার বাজেট বরাদ্দ নাকচ করে দেন, তখনও কটন কয়েকবার সমান-সমান ভোটের পরিস্থিতিতে সরকার পক্ষে ভোট দিয়ে বাজেট বরাদ্দ পাস করিয়ে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯২৮ সালে কেন্দ্রীয় সংসদে ভারত সরকার জননিরাপত্তা বিল পেশ করে এবং পক্ষে বিপক্ষে ৬১টি ভোট পড়ে। বিটলভাই প্যাটেল তখন নির্ণায়ক ভোট দিয়ে সরকারি প্রস্তাব বাতিল করে দেন। তাঁর যুক্ত ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা না দেখাতে পারলে এবং সমান সমান ভোট হলে অধ্যক্ষের উচিত হবে সরকারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া।[১১]

কটনের সভাপতিত্বকালেই চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। চিত্তরঞ্জন মারা যান ১৬ জুন ১৯২৫, সুরেন্দ্রনাথ ৬ আগস্ট। ১২ আগস্ট আইনসভার অধিবেশনে এই দুই নেতার প্রতি কটন মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। উভয়েই কটনের আমলে বিধানসভার সদস্য ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা মন্ত্রী, চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দলের নেতা। কটন বলেন, "সত্যিকারের জননেতাদের দুটি গুণ থাকা অপরিহার্য। একটি হলো চুম্বকের মতো আকর্ষণী শক্তি, অন্যটি কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। এই দুই মহান ব্যক্তির মধ্যে এই দুটি গুণ ছাড়া আরও বহু গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল।" কটন আরও বলেন, "চিত্তরঞ্জনের অবর্তমানে এই সভা অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেল। আমার কাছে বেশভূষা, আচার-আচরণে তিনি ছিলেন রোমান সেনেটর। আমি সভাপতির আসনে বসে সপ্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতাম কী অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তিনি স্বীয় দলকে পরিচালিত করছেন, যথাযথ নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই সভায় আমরা আর সুরেন্দ্রনাথের বাকপটুতা ও বুদ্ধিদীপ্ত বক্তব্য, আর চিত্তরঞ্জনের শান্ত ও প্রত্যয়সিদ্ধ বাচনভঙ্গি শুনতে পাব না। এঁদের শূন্যস্থান পূরণ হবার নয়।"[১২]

সভাপতি হিসেবে কটন বিতর্কিত ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর রসবোধ বক্রোক্তি, দক্ষ পরিচালনা শক্তি এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্ব বাংলার সংসদ কাঠামোয় অনন্যতা দিতে সক্ষম হয়েছিল। গভর্নর লিটন কটনকে প্রথমশ্রেণীর সংসদবিদ বলে আখ্যায়িত করেন।

সামসুল হুদা ও কটন দুজনেই ছিলেন মনোনীত সভাপতি। বাংলার বিধানসভার

প্রথম নির্বাচিত সভাপতি হলেন কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়। শিবশেখরও ছিলেন জমিদার, স্বরাজী আমলের বিধানসভার প্রথমদিকে তিনি স্বরাজীদের সঙ্গে চলতেন। চিত্তরঞ্জনের নির্দেশে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ঐ সময় একবার অনাস্থা প্রস্তাবও এনেছিলেন। চিত্তরঞ্জন ও শিবশেখরের মিতালিকে ব্যঙ্গ করে ফজলুল হক বলেছিলেন, একজন দেশপ্রেমিক, অন্যজন ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য উদ্যোগী। এ দুয়ের অদ্ভুত সমন্বয় সত্যিই বিরল। শিবশেখর বেশিদিন স্বরাজীদের সঙ্গে চলতে পারেননি। সভাপতি নির্বাচনের সময় সরকার সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন ড. আবদুল্লাহ অল মোমিন সুরাবর্দী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান পি–এইচ. ডি.)। সভাপতি নির্বাচনের ভোটে শিবশেখর পান ৬৭, সুরাবর্দী ৬১। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে শিবশেখরের সঙ্গে স্বরাজীদের সংঘাত বাড়তেই থাকে। স্বরাজীরা নানাভাবে তাঁকে হেনস্থা করতে থাকেন, তাঁর রুলিং অগ্রাহ্য করেন, অনেক সময় ভোটদানে বিরত থাকেন, প্রতিবাদ জানিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

শিবশেখরই প্রথম সভাপতি যাঁর বিরুদ্ধে বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। এর আগে বাংলার আইনসভার সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার নজির নেই। শিবশেখরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন স্বরাজী নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। তাঁকে সমর্থন করেন বিধানচন্দ্র রায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অখিলচন্দ্র দত্ত, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতা। সভাপতির সপক্ষে বক্তব্য রাখেন স্টিফেনসন, স্যার আবদুর রহিম, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, প্রভাসচন্দ্র মিত্র প্রমুখ সরকার পক্ষের সদস্য। অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনায় দেখা যায় বাচনভঙ্গি এবং সংসদীয় নিয়মকানুন ইত্যাদি সম্বন্ধে তখনকার সাংসদরা কত দক্ষ ছিলেন। দুই পক্ষ থেকেই যুক্তি পালটা যুক্তি দেখানো হয়। ইংলন্ড ও অন্যান্য পার্লামেন্টের নজির আনা হয়। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের। অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে তিনি বিদেশের সংসদ বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন, ইংলন্ড ও অন্যান্য সভার নজির টেনে আনেন, বিদেশী শাসনে ভারতের সংসদ কাঠামোর সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে বক্রোক্তি করেন। তিনি বলেন, "আমাদের এই দুর্ভাগা দেশ অন্য দেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এখানকার অধ্যক্ষকে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আইন এবং নিয়মবিধি এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজেই আমাদের এই অন্যায়ই সহ্য করে চলতে হবে। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে আমরা অধ্যক্ষ পদের মর্যাদা রক্ষা করতে চাই ; এই পদকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখতে চাই। সভাপতির ভুল ও অন্যায় রুলিং-এর প্রতিবিধানের আর কোনও পথ না থাকায় আমরা তাঁর বিরুদ্ধে এই অনাস্থা প্রস্তাব আনছি।"

অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বীরেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন অধ্যক্ষ কীভাবে বিধিবহির্ভূতভাবে পাবনার মৌলবী আবদুল গফুরের প্রস্তাব ভোটে দিয়ে স্বরাজীদের অনুপস্থিতিতে প্রস্তাব পাস করিয়ে নিয়েছেন। গফুর তাঁর প্রস্তাবে জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দু-মুসলমান এবং খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের দাবি জানান। এই প্রস্তাবের পিছনে গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার আবদুর রহিমের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল। স্বরাজীরা এই প্রস্তাবকে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রস্তুতি পর্ব বলে অভিহিত করেন। প্রস্তাবে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের কোনও উল্লেখ ছিল না। তাঁরা গফুরের প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন ধরে নিয়ে চতুর রহিম একটি সংশোধনী আনেন। সংশোধনীতে সংখ্যালঘু বণিক ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং যথাযথ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তারা পাবে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। আবদুর রহিম সংশোধনীর নোটিস নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে পারেননি কিন্তু সভাপতি শিবশেখর গভর্নর লিটনকে খুশি করার জন্য বিধানসভার নিয়ম লঙ্ঘন করে এই সংশোধনী উত্থাপনের অনুমতি দেন। এই অন্যায় ও বিধিবহির্ভূত নজিরের বিরুদ্ধাচরণ করে স্বরাজী সদস্যরা প্রতিবাদ করেন। স্বরাজী সদস্য নুরুল হক চৌধুরী ও অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জি সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন, এমনভাবে সরকারের আজ্ঞাধীন হওয়া সভাপতির উচিত হয়নি। নুরুল হক চৌধুরী এই প্রসঙ্গে "শেম" শব্দটিও আস্তে উচ্চারণ করেন। অধ্যক্ষ নুরুল হক চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কী বলেছেন? তিনবার নুরুল হক চৌধুরী নিরুত্তর থাকেন। চতুর্থবার উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করেন, তিনি 'শেম' শব্দ উচ্চারণ করেছেন। শিবশেখর নুরুল হক চৌধুরীকে সভাকক্ষ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেন। অশ্বিনী ব্যানার্জিকেও তিনি সভা ত্যাগ করতে বলেন। সভাপতির এই আচরণের প্রতিবাদ করলে একে একে কুমুদশংকর রায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, জে এম দাশগুপ্ত এবং শেষ পর্যন্ত স্বরাজী দলের নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকেও সভাকক্ষ থেকে বহিষ্কার করা হয়। স্বরাজী ও অন্যান্য সদস্যরা একসঙ্গে ওয়াক-আউট করেন। সভাপতির এই ধরনের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে ভারত শাসন আইনের ৭২সি (৪) নং ধারা অনুযায়ী বীরেন্দ্রনাথ ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ শিবশেখরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন।

বীরেন্দ্রনাথের পরই বলতে উঠে অখিলচন্দ্র দত্ত সভাপতির অবৈধ রুলিং সম্বন্ধে বলেন, কোনও সদস্যকে অসম্মান দেখানোর অর্থ তার নির্বাচনী এলাকা তথা সমগ্র জনগণকে অসম্মান করা। এত কর্তৃত্ব অধ্যক্ষকে দেওয়া যায় না। বহিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, সভাপতির কর্তব্য উত্তেজনা প্রশমিত করা, তাতে ইন্ধন যোগানো হয়।

বিধানচন্দ্র রায়ও বিভিন্ন দেশের সংসদীয় নজির টেনে অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থন

করেন। তিনি অভিযোগ করেন, অনাস্থা প্রস্তাবের হয়তো একটা নিষ্পত্তি হয়ে যেত যদি না অদৃশ্য হস্ত পিছন থেকে চাবিকাঠি ঘোরাত। এটা ছিল স্পষ্টত লর্ড লিটনকে উদ্দেশ্য করে বলা। লিটন নিজে সদস্যদের কাছে সভাপতিকে সমর্থনের জন্য তদ্বির করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অনাস্থা প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় ৫৭-৭২ ভোটে। বিপক্ষে যাঁরা ভোট দেন তাঁদের মধ্যে ৩০ জনই ছিলেন ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সদস্য ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের।[১৩] শিবশেখরকে লিটন পুরস্কৃত করেন, কিছুদিন পরই তিনি মন্ত্রী হন। কংগ্রেস দল আবার এই শিবশেখরকেই ১৯৩৭ সালে অধ্যক্ষ হিসেবে তাদের প্রার্থী মনোনীত করে চরম সুবিধাবাদের পরিচয় দেয়। পরবর্তী সভাপতি নির্বাচিত হন সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরী ১১ জানুয়ারি ১৯২৭ সালে। তিনি তার নিকটতম স্বরাজীদল সমর্থিত প্রার্থী ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২৭ ভোটে পরাজিত করেন (৭৭-৫০)। শিবশেখরের মতো মন্মথনাথও সরকারি সমর্থনে নির্বাচিত হন। এর আগে গভর্নর লিটন তাঁকে মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু স্বরাজীরা বিধানসভায় মন্ত্রীদের বেতন বরাদ্দ না-মঞ্জুর করায় মন্মথনাথের মন্ত্রিত্বের অবসান ঘটে। মন্মথনাথ ছিলেন উদারনৈতিক দলের সমর্থক, সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী। প্রায় দীর্ঘ দশ বৎসর তিনি বিধানসভার সভাপতি ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি, কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রুলিং দেন, বিধানসভায় 'মেস' বা দণ্ড প্রচলন করেন। তাঁর সভাপতিত্বকালেই বিধানসভা টাউন হল থেকে বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হয় (৯.২.৩১)। সভাপতি হিসেবে তিনি নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করতেন। সভার সম্ভ্রম, মর্যাদা ও সদস্যদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সচেষ্ট। সভাপতির দায়িত্ব সম্বন্ধে তার মত ছিল, সভাপতি যেমন বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের প্রশ্রয় দেবেন না, তেমনি সংখ্যালঘুরাও যাতে বিধানসভার কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে না পারে তাঁর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। অনেক সময় সরকারের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেও তিনি সদস্যদের প্রস্তাব উত্থাপন, প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয়ে সুযোগ করে দিয়েছেন। জালালুদ্দিন হাশেমি (পরবর্তীকালে উপাধ্যক্ষ) ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসির বিষয়ে একটি প্রস্তাব বিধানসভায় উত্থাপন করার জন্য সভাপতির অনুমতি চান। অনেক সদস্যই এতে আপত্তি জানান। সভাপতি শেষ পর্যন্ত হাশেমিকে অনুমতি দেন কিন্তু প্রস্তাব বাতল হয়ে যায় ২৬-৫৪ ভোটে।[১৪] উল্লেখ্য, যদুনাথ সরকার, আজিজুল হক ও অন্যান্য বিধায়ক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ২৬ জানুয়ারি, ১৯৩১ পুলিশের লাঠির আঘাতে সাংঘাতিকভাবে আহত সুভাষচন্দ্র বসুকে সারারাত লালবাজার পুলিশ হাজতে আটক করে রাখা হয়। সুভাষচন্দ্র ছিলেন তখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র। ১৪৪ ধারা অমান্য করে যখন মিছিল নিয়ে তিনি বর্তমান শহীদ মিনারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন

তখনই তাঁর উপর আক্রমণ হয়। এই বিষয়ে হাসেমি এক মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করতে গেলে বিরোধিতার সম্মুখীন হন। সভাপতি কিন্তু তাঁকে প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি দেন।[১৫] বিধানসভা পরিচালনায় অনেক সময়ই উত্তপ্ত আবহাওয়াকে রসাত্মক মন্তব্য দিয়ে মন্মথনাথ ঠাণ্ডা করতেন। সদস্যদের বক্তৃতার তুবড়ির মুখে সভাপতি যে কত অসহায় সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, সভাপতি না পারেন পাণ্ডুলিপি নির্ভর বাগ্মিতায় (ম্যানাসক্রিপ্ট এলোকোয়েন্স) ছেদ ঘটাতে, না পারেন বাগ্মিতার বরিষণে (টরেনশিয়েল এলোকোয়েন্স) বাধা দিতে। আরেকবার তিনি সদস্যদের বলেন, সভাপতিকে অনেক স্বেচ্ছাচার সহ্য করে সভার কাজ চালাতে হয় এবং সেইসব স্বেচ্ছাচারের মধ্যে রীতিনীতি বা প্রথার স্বেচ্ছাচারই প্রধান। যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি রুলিং দেন তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করতে হয় যেমন সংশোধনের উপর সংশোধনী আনা রীতিবিরুদ্ধ, প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সমালোচনা বিধিবহির্ভূত এবং বিধানসভায় কোনও ধরনের 'ক্যানভাসিং' নিয়মবিরুদ্ধ।

১৯৩৪ সালে মন্মথনাথ রায়ের আমলেই বিধানসভায় দণ্ড বা 'মেস' প্রচলিত হয়। শোনা যায়, সদস্যরা চাঁদা করে এর নির্মাণব্যয় বহন করেছিলেন। অধ্যক্ষ যখন শোভাযাত্রা করে বিধানসভায় প্রবেশ করেন, সেই যাত্রায় 'মেস' কাঁধে বহন করে আনেন মার্শাল। এই 'মেস' প্রাচীন ভারতের রাজদণ্ডের সমতুল্য এবং আইনসভার সার্বভৌমত্বের প্রতীক বলে মনে করা হয়। ১১ জানুয়ারি, ১৯৩৪ বিধায়কদের তত্ত্বাবধানে এই দণ্ড সমর্পণ করে এক আবেগময়ী বক্তৃতায় সভাপতি বলেন, "এই সুন্দর ও ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত আছে ব্রিটেনের সংসদব্যবস্থার কর্তৃত্ব। আগামীদিনে এই দণ্ড বাংলার বিধানসভার কর্তৃত্ব ও সম্ভ্রমের পরিচয় বহন করে চলবে।"[১৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই 'মেস'-এ আগে খোদিত ছিল ব্রিটেনের রাজশক্তির প্রতীকচিহ্ন, এখন সেখানে আছে অশোকচক্র। ১৯৫৩ সালে আইনসভার অধ্যক্ষদের সম্মেলনে এই 'মেস' বিলুপ্ত করে দেওয়ার প্রস্তাব উঠলে পশ্চিমবাংলার বিধান পরিষদের তৎকালীন সভাপতি ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, এই দণ্ডকে শক্তির প্রতীক বলে মনে না করে আইনসভার কর্তৃত্ব হিসেবেই গণ্য করা উচিত। অবশ্য 'মেসের' অবমাননাও বিধানসভায় কয়েকবারই হয়েছে। পরেও 'মেস' উঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৩৭-এর আগে বিধানসভার সভাপতিরা ছিলেন পুরোপুরি গভর্নরের মুখাপেক্ষী। ইভান কটন ছিলেন গভর্নর লিটনের অনুগত ও বিশ্বস্ত। যে সব বিধায়কদের উপর সরকার নির্ভর করতে পারেন তাঁদের বিষয়ে নিজের হাতে লেখা ১৭ পৃষ্ঠার এক গোপন নোট তিনি লিটনকে দেন। তাতে তিন সুরাবর্দী (হাসান,

হোসেন ও আবদুল্লাহ), রমেশচন্দ্র দত্তের পুত্র অজয়চন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বসুর পুত্র ইন্দুভূষণ বসু ও শিবশেখরেশ্বর রায় এবং অন্য কয়েকজন বিধায়ক সম্বন্ধে নিজ মতামত তিনি লিটনকে জানান। রাজানুগত্যই ছিল তাঁর মন্তব্যের ভিত্তি। তিন সুরাবর্দীর মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন ডঃ আবদুল্লাহ-অল-মামুন সুরাবর্দী। জাতীয়তাবাদের প্রতি ছিল তাঁর সমর্থন, বিধানসভায় ছিল শাসকবিরোধী ভূমিকা। স্বভাবতই লিটন তাঁর প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না।[১৭]

১৯৩৭ সাল থেকে বিধানসভার সভাপতিকে অধ্যক্ষ সম্বোধন করা হয়। বাংলার বিধানসভার প্রথম নির্বাচিত অধ্যক্ষ হলেন আজিজুল হক (১৯৩৭-১৯৪২)। শালকর পরিবারের সন্তান আজিজুল প্রথমে জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেগোর ল, প্রফেসরও ছিলেন কয়েক বছর। রাজনৈতিক মতবাদের কারণে তাঁকে অধ্যাপনা ত্যাগে বাধ্য করা হয়। প্রায় ১৫ বছর তিনি বিধানসভার সদস্য ছিলেন। দু'বার তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন ; একবার শিক্ষামন্ত্রী, পরে ব্রিটেনে ভারতের হাইকমিশনার হন। তাছাড়া, তিনি ফ্রানচাইজ কমিটির সদস্যও ছিলেন। ১৯৩৭-এ অধ্যক্ষ নির্বাচনে আজিজুলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কংগ্রেস সমর্থিত শিবশেখর রায় (যাঁর বিরুদ্ধে স্বরাজীরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন ১৯২৬-এ ; যিনি ছিলেন লর্ড লিটনের কৃপাভাজন), আর স্বতন্ত্র কৃষক প্রজা দলের তমিজুদ্দিন খাঁ। আজিজুল পান ১১৬ ভোট, শিবশেখর ৮৩, আর তমিজুদ্দিন ৪২। আবু হোসেন সরকার ও অন্যান্য প্রগতিশীল মুসলমান বিধায়করা তমিজুদ্দিনের পক্ষে কংগ্রেস সমর্থন প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র বসু ও তাঁর সহকর্মীরা শিবশেখরকে সমর্থন করাই শ্রেয় মনে করেন।

আজিজুল হকের সময়ে বিধানসভা ছিল উত্তাল। যে ধরনের ঝক্কি আজিজুলকে সামলাতে হতো, পূর্ববর্তী কোনও অধ্যক্ষকেই তা করতে হয়নি। একদিকে বিরোধীপক্ষে ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নলিনাক্ষ সান্যাল, কিরণশংকর রায় এবং স্বতন্ত্র কৃষক প্রজা দলের আবু হোসেন সরকার, অসিমুদ্দিনের মতো ঝানু সাংসদরা। অন্যদিকে সরকার পক্ষেও ছিলেন ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন, সুরাবর্দী ছাড়াও আবদুল বারি, ফজলুর রহমান, আবুল হাশিমের মতো মুসলিম লীগ সদস্যরা। চূড়ান্ত প্ররোচনার মুখেও আজিজুল বিধানসভাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হতেন। বিরোধী দলের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। তিনি মনে করতেন, বিধানসভার মতো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে পরিচালিত করতে হলে সংখ্যালঘু ও বিরোধীদের কথা সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে। আজিজুল বলতেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠের তূণে আছে ভোটের ক্ষমতা, সংখ্যালঘুকে দেওয়া উচিত বক্তব্য রাখার ক্ষমতা।"[১৮] বিরোধীরা অধ্যক্ষের কাছে বেশি প্রশ্রয় পাচ্ছেন, এই ধরনের মৃদু

অভিযোগ করতে শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে। তবে বিধানসভার সব রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীই আজিজুলের উপর নির্ভর করতে পারতেন। সবাই স্বীকার করতেন, আজিজুলের পরিচালন পদ্ধতি বিধানসভায় সংসদীয় গণতান্ত্রিক পরিবেশ অনেকাংশে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। অধ্যক্ষ হিসেবে আজিজুল ছিলেন সংযত কিন্তু বিধানসভার নিয়ম-শৃংখলার ব্যাপারে দৃঢ়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন একবার বিধানসভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করার অনুমতি চান, কিন্তু নির্ধারিত সময়ের দু'দিন পর বিলটি বিধানসভা দপ্তরে পাঠানো হয়। আজিজুল বিলটি ফেরত পাঠিয়ে দেন যথাযথ সময় না মেনে খুব কম নোটিসে বিলটি আনা হয়েছে বলে। নাজিমুদ্দিন এতে খুব ক্ষুব্ধ হন কিন্তু অধ্যক্ষ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। একবার আবদুর রহমান সিদ্দিকি (মুসলিম লীগ) অধ্যক্ষের এক নির্দেশকে অপমানজনক বলে মন্তব্য করলে আজিজুল তাঁকে সভাকক্ষ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেন কিন্তু শরৎচন্দ্র বসুর অনুরোধে এই আদেশ তিনি শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৪০-এর বাজেটের সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বরাদ্দ আলোচনার সময় আজিজুল কংগ্রেস সদস্য নলিনাক্ষ সান্যাল ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন উভয়ের আচরণের সমালোচনা করেন। এ নিয়ে বিধানসভায় কথা কাটাকাটি, হইচই, অধিবেশন মুলতুবি, ওয়াক-আউট ইত্যাদি হয়। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস দল অধ্যক্ষের নির্দেশের বিরোধিতা করে, অধ্যক্ষের বক্তব্যের কিন্তু নড়চড় হয় না। শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষকে তা মেনে নিতে হয়। আরেকবার আবদুর রহমান সিদ্দিকি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনেন। আজিজুল, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখের দাবিতে সিদ্দিকির বিষয়টি অধিকার রক্ষার কমিটির কাছে পাঠান এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্দিকি ক্ষমা প্রার্থনা করে রেহাই পান। ফজলুল হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনাকালে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে চরম উত্তেজনা দেখা যায়। সুরাবর্দী লক্ষাধিক মুসলিম লীগ সমর্থকের এক মিছিল বিধানসভার দিকে পরিচালিত করেন। সরকার ও বিরোধী উভয়পক্ষ থেকেই সদস্য চুরির অভিযোগ আসে। এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে আজিজুল কিন্তু বিধানসভাকে অনেকটা সংযত রাখতে সক্ষম হন।

আজিজুল হক ছিলেন ধীর, সহনশীল, ও সংযত। সহজে তিনি উত্তেজিত হতেন না। তাছাড়া তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত ও সুলেখক, ঝড়ের বেগে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতে পারতেন। সংসদ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানও ছিল প্রগাঢ়, রসবোধ ও সরস মন্তব্যের জন্যও তিনি সরকার ও বিরোধীপক্ষের সদস্যদের কাছে সমাদৃত ছিলেন। নলিনাক্ষ সান্যাল বারবার পয়েন্ট অব অর্ডার তুলে অধ্যক্ষকে বিব্রত করতেন। একবার নলিনাক্ষ বলেন, "আপনি বিরক্ত হলে আর পয়েন্ট অব অর্ডার তুলব না।" আজিজুল জানান, নলিনাক্ষের পয়েন্ট অব অর্ডার তিনি উপকৃতই হন, তবে

নলিনাক্ষ যেন অধ্যক্ষের দিকটাও ভেবে দেখেন।

বিধানসভা পরিচালনার ব্যাপারে আজিজুল একটা ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর অনেক রুলিং ও সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে এমনকি কেন্দ্রীয় সংসদেও উল্লিখিত হতে দেখা যায়। কোন্ কোন্ শব্দ সংসদীয় রীতিবিরুদ্ধ তার একটি তালিকা তিনি প্রণয়ন করেন। রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত এবং মন্ত্রীর দলীয় কাজকর্ম বিধানসভায় উল্লেখ করা যাবে না বলে আজিজুল মত প্রকাশ করেন। ছাঁটাই প্রস্তাব যদি গৃহীত হয় তবে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য কিনা এ বিষয়েও আজিজুলের রুলিং গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ইংলন্ডে হুইগ দল ১৮৩৪ থেকে ১৮৪০ এর মধ্যে ৫৮ বার কমন্সসভায় পরাজিত হয়। ম্যাকডোনাল্ডের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ১৯২৪-এর জানুয়ারি থেকে আগস্ট, এই ক'মাসে সরকারি দল ১০ বার ভোটে হেরে যায় কিন্তু পদত্যাগ করে না। আজিজুল সংবিধান বিশেষজ্ঞ জেনিংস-এর বক্তব্যও পর্যালোচনা করে রুলিং দেন, ছাঁটাই প্রস্তাবের সঙ্গে নীতিগত কোনও প্রশ্ন জড়িত থাকলে বা গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় প্রাধান্য পেলে পদত্যাগের প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে সবই নির্ভর করবে সরকার বিষয়টি কীভাবে দেখেছেন ; অর্থাৎ ছাঁটাই প্রস্তাবের ভিত্তিতে পদত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত একমাত্র সরকারই নিতে পারে।[১৯]

বিধানসভার কার্যপরিচালনায় আজিজুলের নিরপেক্ষতাও ছিল প্রশ্নাতীত। মুসলিম লীগের সদস্য হলেও তিনি দলীয় রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন। ফজলুল হক তখন সবেমাত্র মুসলিম লীগ ছেড়েছেন (১৯৪১) ; নাজিমুদ্দিন আশা করে আছেন গভর্নর লীগকেই মন্ত্রিসভা গঠন করতে ডাকবেন। বিধানসভা তখন অধিবেশনে ; সদস্যরা কে কোন্ দলকে সমর্থন করবেন এ নিয়েও যথেষ্ট অনিশ্চয়তা চলছে। মুসলিম লীগ চাইছিল অধ্যক্ষ বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখুন। আজিজুলকে এজন্য যথেষ্ট চাপও দেওয়া হয়। নাজিমুদ্দিন জিন্নার কাছে অনুযোগ করে লেখেন, মুসলিম লীগের সদস্য হয়েও আজিজুল হক লীগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাঁর আচরণ ব্যাখ্যার অতীত। "তিনি আমাদের সকলকেই নিরাশ করেছেন।"[২০] আজিজুল কিন্তু কিছুতেই বিধানসভার অধিবেশন স্থগিত রাখতে রাজি হননি। ফল হয়, প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন দল গঠন করে ফজলুল হকই আবার মুখ্যমন্ত্রী হন। বিধানসভা দপ্তরের পুনর্গঠনের ব্যাপারেও আজিজুলের অবদান ছিল অসামান্য। চরম প্ররোচনার মুখে আজিজুলকে বলতে শোনা যেত, সভাপতির আসনে বসে তাঁর দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি বিধানসভার চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিধানসভা ছাড়া, অন্যকিছু তিনি চোখেও দেখেন না, কানেও শোনেন না।

ব্রিটেনে ভারতের হাইকমিশনার নিযুক্ত হওয়ার পর আজিজুল পদত্যাগ করেন। সব দল ও গোষ্ঠী থেকেই আজিজুল অভিনন্দিত হন। "আপনার অবর্তমানে এই সভার গৌরব অনেকাংশেই ম্লান হয়ে পড়বে" মন্তব্য করেন বিধায়ক ডেভিড হেনড্রি।

পরবর্তী অধ্যক্ষ সৈয়দ নৌশের আলির কার্যভার গ্রহণের মধ্যবর্তী প্রায় এক বছর বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন উপাধ্যক্ষ সৈয়দ জালালুদ্দিন হাশেমি। ১৯৪২-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি মুসলিম লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে ১৩০-৬৩ ভোট পেয়ে হাশেমি কংগ্রেস দলের সমর্থনে উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ১৯৪২-এর এপ্রিল থেকে ১৯৪৩-এর ১ মার্চ হাশেমি অধ্যক্ষের কার্য পরিচালনা করেন। হাশেমি ছিলেন সাতক্ষীরার বিখ্যাত সৈয়দ বংশজাত, মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালী। শোনা যায় বাঘের সঙ্গে লড়াই করে তাঁর একটি পা বাদ দিতে হয়। কাঠের পা নিয়ে তিনি চলাফেরা করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ডিগ্রি তাঁর ছিল না ; তবে ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তিনি সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারতেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন কারাকক্ষের নির্জন সেলে তাঁকে আটকে রাখা হয়। এ নিয়ে জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বিধায়ক হিসেবে হাশেমি যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেন। বিধানসভার নিয়মকানুন, সংসদীয় রীতিনীতি বিষয়ে তিনি ছিলেন পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় পুলিশি নির্যাতন সম্বন্ধে বিধানসভায় হাশেমি খুবই সোচ্চার ছিলেন। ১৯৩৭-এ ফজলুল হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করার পর বিধানসভার উদ্বোধনী অধিবেশনে হাশেমি গভর্নরের ভাষণের সময় পয়েন্ট অব অর্ডার তুলে এক নজির সৃষ্টি করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কংগ্রেস নেতৃত্বের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচক ছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ছিল ঃ যদি ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কংগ্রেস নেতৃত্ব বাংলায় থাকত তবে বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রশ্রয় পেত না। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর ফজলুল হকের কৃষক প্রজা দলের সঙ্গে কংগ্রেসের সমঝোতা না হওয়ায় হাশেমি ক্ষুব্ধ হন। বিধানসভায় এ নিয়ে তাঁকে অভিযোগ করতেও দেখা যায়। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে কৃষকের প্রতি হাশেমি ছিলেন সহানুভূতিশীল। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট সংশোধন করে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির জন্য তিনি বিধানসভায় প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু তা বাতিল হয়ে যায়।

অধ্যক্ষ হিসেবে হাশেমি খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ফজলুল হক-শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্ত্রিত্বের আমলে বিধানসভার আবহাওয়া ছিল খুবই উত্তাল, হাশেমি কখনও খুব কঠোর হয়ে, কখনও সরস মন্তব্যে বিধানসভাকে সংযত রাখতেন। ১৯৪৩-এ কারাবাসের সময় মহাত্মা গান্ধী অনশন শুরু করেন। এ নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ বিধানসভায় এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে গান্ধীজীর অনশন প্রত্যাহারের সর্বৈব ব্যবস্থা নিতে সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে নাজিমুদ্দিনও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু বাধা আসে ইউরোপীয় সদস্যদের তরফ থেকে। ঐ গোষ্ঠীর নেতা এ এফ স্টার্ক প্রস্তাব উত্থাপনে আপত্তি জানান। হাশেমির ওপরও

সরকার থেকে চাপ দেওয়া হয় প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমোদন না দেওয়ার জন্য। হাশেমি কিন্তু সভার নিয়মাবলীর ৯৫(১) ধারার নজির টেনে প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি দেন। হাশেমির হস্তক্ষেপের ফলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ফজলুল হক-মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে বিধানসভায় তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিতে পেরেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ যাতে বিধানসভায় কোনো বিবৃতি না দিতে পারেন গভর্নর স্যার জন হারবার্ট সেজন্য সব ধরনের চেষ্টাই চালিয়েছিলেন। আজিজুল হকের মতো জালালুদ্দিন হাশেমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ রুলিং দেন। বস্তুত, হাশেমির মতো এত রুলিং অন্য কোনও অধ্যক্ষকে দিতে দেখা যায়নি।[২১]

পরবর্তী অধ্যক্ষ সৈয়দ নৌশের আলি নাজিমুদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর বিখ্যাত রুলিং দিয়ে সংসদ ব্যবস্থায় এক নজির সৃষ্টি করেন। নৌশের ছিলেন যশোহর জেলা বোর্ডের সভাপতি ; কর্মজীবন শুরু করেছিলেন আদালতের প্রসেস-সারভার হিসেবে। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। প্রাদেশিক কৃষকসভার গাজিয়া সম্মেলনে (১৯৪০) তিনি মুজফফর আহমেদ, বঙ্কিম মুখার্জি ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে সভাপতি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা দলের সদস্য হিসেবে তিনি বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ফজলুল হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। মন্ত্রী হিসেবে বিধানসভায় তিনি সব দল ও মতের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সম্মান আদায় করতে পেরেছিলেন। শরৎচন্দ্র বসু ও অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের কয়েকবারই বিধানসভায় নৌশেরকে অভিনন্দন জানাতে দেখা যায়। নৌশের আলি ছিলেন যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার সমর্থক। ১৯৩৩ সালে মিউনিসিপ্যালিটিতে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিলের সংশোধনী প্রস্তাব বিধানসভায় উত্থাপিত হলে নৌশের আলি ও ফজলুল হক তা সমর্থন করেন। পৃথক নির্বাচনের দাবিতে যেসব মুসলমান নেতারা সোচ্চার ছিলেন, নৌশের তাঁদের সাবধান করে দিয়ে বলেন, এর ফলে মুসলমান সমাজের তাঁরা ক্ষতিই করবেন, মূল জনস্রোত থেকে মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। পরবর্তী সময়ে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা কলকাতা কর্পোরেশনের প্রচলিত যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করে যখন সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ নেয়, নৌশের তার বিরোধিতা করেন। এর ফলে তিনি মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বিরাগভাজন হন এবং মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯৪৩ সালে নৌশের মুসলিম লীগ প্রার্থী আবদুর রহমান সিদ্দিকিকে ১১৮-৯৫ ভোটে পরাজিত করে বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সাধারণত নাজিমুদ্দিন-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তাঁর ঐতিহাসিক রুলিং-এর জন্যই নৌশের বিখ্যাত, কিন্তু তাছাড়া তাঁর আরও অনেক রুলিং পরবর্তীকালে সংসদ পরিচালনার ক্ষেত্রে অধ্যক্ষদের কাছে নজির হয়ে আছে। গভর্নর হারবার্ট অন্যায়ভাবে ফজলুল হকের কাছ থেকে পদত্যাগ

পত্র আদায় করে নেন। নৌশের এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মন্ত্রিসভার দায়িত্ব যৌথ এবং মন্ত্রিসভা মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। কাজেই, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের ফলে মন্ত্রিসভার কোনও অস্তিত্ব নেই। নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত আর কোনও কাজকর্ম চলতে পারে না বলে অধ্যক্ষ নির্দেশ দেন।[২২] হক মন্ত্রিসভা তখনো বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন ছিল। প্রশ্ন ওঠে, এই পরিস্থিতিতে পুরো মন্ত্রিসভাই বাতিল বলে ঘোষণা করা যায় কিনা। ফজলুল হক পরে বিধানসভায় বিবৃতি দিতে চাইলে নাজিমুদ্দিন প্রমুখ মুসলিম লীগ সদস্য আপত্তি জানান ও ব্রিটেনের নজির ও প্রথার দৃষ্টান্ত দেন। নৌশের আলি তাঁর রুলিং-এ বলেন, "আমি অন্ধভাবে এবং ক্রীতদাসসুলভ মনোভাব নিয়ে ব্রিটেনের প্রথা অনুসরণ করব না। বাংলা ব্রিটেন নয়, বঙ্গীয় বিধানসভাও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নয়। ব্রিটেনের সংসদীয় অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিক্ষা নেব কিন্তু আমাদের বিশেষ অবস্থায় আমাদের প্রথা গড়ে উঠবে।" তিনি ফজলুল হককে বিবৃতি দিতে অনুমতি দেন। বিধানসভায় বাজেট মঞ্জুরির বিষয় নিয়েও নৌশের আলি এক গুরুত্বপূর্ণ রুলিং দেন। নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ কবার পর বাজেট বরাদ্দের দাবি বিধানসভায় পেশ করলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক পয়েন্ট অব অর্ডার উত্থাপন করেন। শ্যামাপ্রসাদ বলেন, পূর্ববর্তী হক-মন্ত্রিসভার সময়ে বাজেটের বেশ কিছু ব্যয়-বরাদ্দ বিধানসভা মঞ্জুর করেছে এবং গভর্নরও তাতে সম্মতি দিয়েছেন। মন্ত্রিসভার পদত্যাগের ফলে, বিধানসভায় অধিবেশন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রেখে ৯৩ ধারা অনুযায়ী গভর্নরের শাসন জারি করা হয়েছে। পূর্বতন মন্ত্রিসভার পেশ করা বাজেটের মঞ্জুরিতে ব্যয়-বরাদ্দ বিধানসভা স্থগিত হয়ে যাওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তামাদি হয়ে গিয়েছে বলে শ্যামাপ্রসাদ মত প্রকাশ করেন। অধ্যক্ষ সব কিছু বিচার বিবেচনা করে শ্যামাপ্রসাদের পয়েন্ট অব অর্ডার যথাযথ বলে তাঁর সিদ্ধান্ত জানান। তিনি বলেন, বাজেট অবিভাজ্য, বিধানসভার যে অধিবেশনে বাজেট পেশ করা হয় সেই অধিবেশনেই বাজেট অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। অধ্যক্ষের এই রুলিংয়ের ফলে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভাকে যথেষ্ট বিপাকে পড়তে হয়।

২৯ মার্চ, ১৯৪৫ নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নৌশের ও রুলিং দেন সংসদ ব্যবস্থার ইতিহাসে তা এক অনন্য নজির হয়ে আছে। ২৮ মার্চ কৃষিমন্ত্রী সৈয়দ মোয়াজুদ্দিন খাঁ বাহাদুর তাঁর দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদন করার জন্য বিধানসভায় পেশ করেন। অনুমোদনের পক্ষে ভোট দেন ৯৭ জন সদস্য, বিরোধিতা করেন ১০৬ জন। মন্ত্রিসভার সমর্থক ক্লাইভ স্ট্রিটের বণিক সদস্যরা যথাসময়ে উপস্থিত হতে না পারায় এবং মুসলিম লীগের কিছু সদস্য দলত্যাগ করায় সরকারপক্ষ পরাজিত হন। মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন মনে করেন, এই ভোটের কোনও প্রভাব সরকারের উপর পড়বে

না, কারণ আলোচনার সুযোগ না দিয়েই অধ্যক্ষ কৃষি বাজেট ভোটে দিয়েছেন। নাজিমুদ্দিনের যুক্তি খণ্ডন করে ২৯ মার্চ নৌশের আলি বলেন, বিধানসভা মন্ত্রিসভা তৈরি করে, খারিজ করার ক্ষমতাও বিধানসভার। গভর্নরের কর্তৃত্ব আইনসভার সিদ্ধান্ত নিবন্ধভুক্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিধানসভা কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ প্রত্যাখ্যান মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থারই সমপর্যায়ভুক্ত। কাজেই, নতুন কোনো মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবি বলে অধ্যক্ষ ঘোষণা করেন।[২৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ১৯৬৭ সালে রাজ্যপাল ধরমবীর অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পরিচালিত মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। নৌশের আলির উপরোক্ত রুলিংয়ের নজির টেনে অধ্যক্ষ বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নিয়োগ অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেন।

নৌশের আলির পর ১৯৪৬-এ নবগঠিত বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে মুসলিম লীগ প্রার্থী নুরুল আমিন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী মহম্মদ আফজলকে ১৩৭-৯৩ ভোটে পরাজিত করে অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সদস্যদের তিনি আশ্বাস দেন, প্রত্যেক সদস্যই তাঁর কাছে সুবিচার প্রত্যাশা করতে পারেন। সব রাজনৈতিক দলকেই বিধানসভায় যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে তিনি সাহায্য করবেন।[২৪] বাস্তবেও তিনি তা করেছিলেন, সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার সময় অধ্যক্ষ বিরোধীদের বেশি আস্কারা দিচ্ছেন বলে মুসলিম লীগ বিধায়কদের অনুযোগ করতে দেখা যায়। বিধানসভায় তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, মুসলিম লীগ দলের সদস্য হলেও বিধানসভার কার্য পরিচালনায় তিনি দলীয় মতামত দ্বারা চালিত হবেন না, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। বিধানসভার সব রাজনৈতিক দলের সদস্যদের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য কয়েকবারই তিনি আবেদন জানান। দেশবিভাগের পর নুরুল আমিন কিছুদিন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন।

স্বাধীনতার পর প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন ঈশ্বরদাস জালান ও উপাধ্যক্ষ আশুতোষ মল্লিক। সংসদের নিয়মকানুন সম্বন্ধে ঈশ্বরদাসও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন ; অবিভক্ত বাংলার বিধানসভায় কংগ্রেস দল সংসদ বিষয়ে তাঁর মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। প্রায়ই এরস্কিন মে-র বই থেকে তাঁকে উদ্ধৃতি দিতে দেখা যেত।[২৫] কংগ্রেস দল, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের আপত্তি অগ্রাহ্য করে মহম্মদ খুদা বকস, জ্যোতি বসু প্রমুখ বিরোধী সদস্যের মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করার অনুমতি তিনি দিয়েছিলেন।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেস নেতা শৈলকুমার মুখার্জি অধ্যক্ষ নির্বাচিত

হন। ১৯৫২-১৯৫৭ পর্বে বিধানসভার বিরোধীদের দাপটের মুখে কংগ্রেস দল ছিল নিষ্প্রভ। অধ্যক্ষ কিন্তু সুষ্ঠুভাবেই সভার কার্য পরিচালনা করেন। বিরোধীদের সমর্থনও তিনি পান। তাঁর নির্দেশ ও রুলিং বিরোধীরা মেনে নেন, যদিও অনেক সময় তা তাঁদের সন্তুষ্ট কবতে পারেনি। বিরোধীদের প্রতি অধ্যক্ষের নরম মনোভাবের সমালোচনা করতে দেখা যায় কংগ্রেস সদস্যদের। ১৯৫৪ সালে শিক্ষক ধর্মঘটের সময় জ্যোতি বসু অধ্যক্ষকে অনুরোধ জানান, যতদিন তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা প্রত্যাহৃত না হচ্ছে ততদিন বিধানসভায় আশ্রয় নিয়ে অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে থাকার অনুমতি যেন তাঁকে দেওয়া হয়। অধ্যক্ষ বলেন, "আমি মাননীয় সদস্যদের আশ্বাস দিতে পারি, এই সভাগৃহ অধ্যক্ষের নয়, সদস্যদের, অন্য সদস্যদের যে অধিকার আছে, আপনারও সে অধিকার আছে। যদি কোনও সদস্য আমার হেফাজতে থাকতে চান, আশ্রয় চান, তাহলে তিনি গ্রেপ্তারের হাত থেকে নিরাপদ থাকবেন।"[২৬] অধ্যক্ষের এই আদেশ স্পষ্টতই কংগ্রেস সদস্যদের মনঃপূত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ও এর জন্য বিরক্তি প্রকাশ করেন।

জমিদারি অধিগ্রহণ বিল ও ভূমিসংস্কার বিলের বিতর্ক ও আলোচনার পর্যায়ে অধ্যক্ষ কংগ্রেস সদস্যদের চেয়ে বিরোধীদের তিনি অনেক বেশি সময় দেন বক্তব্য রাখার জন্য ; অসংখ্য সংশোধনী উত্থাপনের অনুমতি দেন।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট আলোচনার সময় সদস্যদের বক্তব্যের পর মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় তাঁর জবাবী ভাষণ দিয়ে আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটান। ডাঃ রায়ের বক্তৃতার পরই বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, তাঁর একটা বিশেষ বক্তব্য ছিল কিন্তু সমাপ্তি ভাষণের পর সে সুযোগ কি তিনি পাবেন? অধ্যক্ষ প্রচলিত প্রথা ভেঙে কিন্তু বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়কে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে অনুমতি দেন।[২৭] অধ্যক্ষের সঙ্গে সব দলের সদস্যদেরই হৃদ্যতা ছিল বলে মনে হয়। "স্যার এত পড়াশুনা করে এলাম কিন্তু সময় দিচ্ছেন না, কী আর করি, আপনার নির্দেশই মেনে নিচ্ছি।" এই ধরনের কথা শোনা যায় সদস্যদের কাছ থেকে।

অধ্যক্ষ পদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে শৈল মুখার্জীর নিরপেক্ষ রুলিং বিধানসভার মর্যাদা রক্ষায় ও বিরোধীপক্ষের যথাযথ ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়। বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রশ্নে ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ অধ্যক্ষের নজির সৃষ্টিকারী রুলিং থেকে তা প্রমাণিত হয়। এস ইউ সি-র সদস্য সুবোধ ব্যানার্জি রাজ্যপালের ভাষণের ওপর এক সংশোধনী আনেন। সংশোধনীতে ভাষা ও ভৌগোলিক সান্নিধ্যের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পুনর্নির্ধারণে এবং বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির অপচেষ্টা বন্ধ করতে সরকারি ব্যর্থতার উল্লেখ ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এই সংশোধনীর ওপর বিধানসভার মতামত জানার জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ জানান। অধ্যক্ষ এই সংশোধনী ভোটে দিলে

পর বিরোধীপক্ষ থেকে ডিভিসন দাবি করা হয় না। ধ্বনি ভোটে সংশোধন বাতিল হয়ে যায়। রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানিয়ে কংগ্রেস সদস্য বিমলানন্দ তর্কতীর্থের আনা মূল প্রস্তাব ১৫১-৪৮ ভোটে পাস হয়ে যায়। ফলে সরকারপক্ষ থেকে মুখ্যসচেতক দাবি করেন ভোটের ফলাফল থেকে এটা স্পষ্ট বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিতে বিধানসভার সমর্থন আছে ; সুতরাং এ নিয়ে বিধানসভায় আলোচনার আর প্রয়োজন নেই। কলকাতার কয়েকটি দৈনিকে ফলাও করে এই সংবাদ পরদিন প্রকাশিত হয়। বিরোধীরা অধিকার ভঙ্গের প্রশ্ন তুললে ২৩ ফেব্রুয়ারি অধ্যক্ষ এ বিষয়ে তাঁর রুলিং-এ বলেন, সুবোধ ব্যানার্জির সংশোধনী প্রত্যাখ্যান করার অর্থ এই নয় যে, বিধানসভা বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি সমর্থন করে। সুতরাং নির্ধারিত দিনেই বিধানসভায় এ নিয়ে আলোচনা হবে।[২৮]

১৯৫৭-এর নির্বাচনে শৈলকুমার মুখার্জি পরাজিত হন এবং পরবর্তী অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন প্রখ্যাত আইনজীবী শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন অধ্যক্ষের ভূমিকা ছিল বিতর্কিত। তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে বিরোধীরা অভিযোগ করেন। দুই বছরের মধ্যেই অধ্যক্ষ শঙ্করদাস ব্যানার্জির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন বিরোধীরা।

ভারতীয় সংবিধানের ১৭৯ (সি) ধারা অনুযায়ী অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সুধীর রায়চৌধুরী বলেন, আহমেদপুরের (বীরভূম) ন্যাশনাল সুগার মিলস লিমিটেড সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন খাতে ৫৩ লক্ষ টাকা সাহায্য পেয়েছে। ঐ কোম্পানির ডাইরেক্টর পদে আসীন থেকে অধ্যক্ষ সরকারি অনুগ্রহ নিয়েছেন, ফলে নিরপেক্ষভাবে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ২০ মার্চ, ১৯৫৯ রায়চৌধুরী এই প্রস্তাব আনেন। বিধানসভায় সেদিন সদস্যদের উপস্থিতি ছিল সর্বাধিক। সব ক'জন মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী এবং ২২৪ জন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্য পরিচালনা করেন উপাধ্যক্ষ আশুতোষ মল্লিক।

বিরোধীদের পক্ষ থেকে প্রধান বক্তা ছিলেন সিদ্ধার্থশংকর রায় (কিছুদিন আগে যিনি কংগ্রেস দল ছেড়েছেন), জ্যোতি বসু, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত বসু। অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন কংগ্রেসের বিজয় সিংহ নাহার, বিমলচন্দ্র সিংহ, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং নির্দল সদস্য সৈয়দ বদরুদ্দোজা।

প্রস্তাবক শুরুতেই বলেন "যাকে আমরা সকলে এই সভার অভিভাবক বলে গ্রহণ করেছি, যাঁর হাতে আমাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার ভার ন্যস্ত, তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা আমাদের কারও কাছে প্রীতিপদ নয়। কিন্তু অধ্যক্ষ যদি এমন কাজ করেন যার ফলে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির মূলে আঘাত এসে পড়ে। যদি এই আসনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে সে সম্বন্ধে অভিযোগ না করে উপায় থাকে না। ....দলীয় সামর্থ্যে স্পিকার নির্বাচিত হন সত্য, কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি এই ন্যায়দণ্ড ধারণ করেন সেই মুহূর্তে তাঁকে দলের ঊর্ধ্বে চলে যেতে হয়। তাঁকে হতে হয় নিরপেক্ষ, সমদর্শী

ও স্বতন্ত্র ; নিউট্রাল, ইন্ডিপেন্ডেন্টে অ্যান্ড ইম্পারসিয়াল।" মন্ত্রীদের সঙ্গে "হবনব" করার অভিযোগও তিনি আনেন।

সুধীর রায়চৌধুরীর অনাস্থা প্রস্তাবে এক সংশোধনী এনে কংগ্রেস নেতা বিজয় সিংহ নাহার অধ্যক্ষের প্রতি পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করেন। তাঁকে সমর্থন করেন বিমলচন্দ্র সিংহ ও হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। দুই সংশোধনী নিয়ে সভায় তুমুল আলোড়ন হয়। দুই পক্ষ থেকেই সংসদ বিশেষজ্ঞ এরস্কিন মে-র বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয় ; দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ার সংসদীয় নজির উপস্থাপিত হয়। উপাধ্যক্ষ নাহারের সংশোধনী বিধিসম্মত বলে রুলিং দেন। জ্যোতি বসু, সিদ্ধার্থ রায় অভিযোগ করেন উপাধ্যক্ষ আগে থেকেই তাঁর রুলিং লিখে নিয়ে এসেছেন। জ্যোতি বসু বলেন, আমার বড় আশ্চর্য লাগছে, তাই কমেন্ট না করে পারছি না যে, আপনি সমস্ত জিনিসটাই লিখে এনেছেন। আপনি কি করে জানলেন এই রকম আলোচনা হবে।" হেমন্ত বসু বলেন, ১৯৪৬ সাল থেকে তিনি সদস্য কিন্তু কখনও এরকম দেখেননি। উপাধ্যক্ষ অবশ্য তাঁর রুলিং পালটানোর কোনো কারণ দেখান না।[২৯]

আলোচনা হয় উচ্চমানের। স্পিকারের "সোশ্যাল অ্যালুফনেসের ট্রেডিশন" গড়ে তোলার ব্যাপারে সদস্যরা গুরুত্ব দেন। স্পিকার পদে নির্বাচিত হওয়ার পর রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ ত্যাগ করা উচিত বলেও সদস্যরা অভিমত প্রকাশ করেন। অধ্যক্ষ শংকরদাস ব্যানার্জি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার উপসংহারে বিধানসভাকে জানান তিনি অধ্যক্ষের পদে থাকলে কোম্পানির ডিরেক্টরের পদ ছেড়ে দেবেন। এই ঘোষণার পর সুধীর রায়চৌধুরী তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন। শংকরদাস ব্যানার্জি অবশ্য অধ্যক্ষের পদ ছেড়ে দেন কিছুদিন পরই। কয়েক মাস অধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকার পর বঙ্কিমচন্দ্র কর অধ্যক্ষ পদে আসীন হন (২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০) ও তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন কেশবচন্দ্র বসু।

উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ঔপনিবেশিক আমলে ইভান কটন, আজিজুল হক, জালালুদ্দিন হাশেমি, নৌশের আলি প্রমুখ অধ্যক্ষের পরিচালন দক্ষতা, রুলিং, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বাংলার বিধানসভাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। ভারতের অন্য প্রদেশের কাছে অনুকরণীয় ছিল বাংলার বিধানসভা। স্বাধীনতার পরও কয়েকবারই বাংলার বিধায়কদের অধ্যক্ষ পদকে গ্রেট ব্রিটেনের স্পিকারের সমমর্যাদা সম্পন্ন ও নিরপেক্ষ করার পক্ষে মত প্রকাশ করতে দেখা যায়। উল্লেখ্য রাজা বা শাসকদলের কর্তৃত্ব উপেক্ষা করার ঐতিহ্য গ্রেটব্রিটেনের স্পিকারদের দীর্ঘদিনের। ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে স্টুয়ার্ট রাজা প্রথম চার্লস পাঁচ জন এম. পি-কে গ্রেপ্তারের জন্য নিজে কমন্সসভায় উপস্থিত হন। সদস্যদের না পেয়ে রাজা অধ্যক্ষের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। হুমকিও দেন। অধ্যক্ষ লেনথাল বিনীতভাবে রাজাকে জানান "তিনি কোন সাহায্য করতে পারবেন

না। কারণ, তাঁর সত্তা কমন্সসভার সঙ্গে জড়িত। তাঁর নিজের কোনও চোখ নেই দেখার, কান নেই শোনার, জিহ্বা নেই কথা বলার। সভা যেভাবে তাঁকে নির্দেশ দেয় সেভাবেই তিনি চলেন।" ব্রিটেনে স্পিকার পদাধিকারী কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য পদ নেন না। কোনও ক্লাবেরও সদস্য তিনি থাকেন না। তাঁর সামাজিক জীবন অত্যন্ত সংকীর্ণ। তবে একবার স্পিকার হলে তিনি আজীবন স্পিকার থাকেন, অর্থাৎ অধ্যক্ষ পদ ছেড়ে দেওয়ার পরও তিনি মাহিনা, ভাতা, ইত্যাদি পান। অনেক স্পিকার "পিয়ার" হিসেবে মনোনীত হন।

বাংলার বিধানসভার অধ্যক্ষকে নিরপেক্ষ, দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে রাখার কথাবার্তা হয় কয়েকবারই কিন্তু তা আলোচনার স্তরেই থেকে যায়। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের (১৯৫৭) আগে জ্যোতি বসু জানান, অধ্যক্ষ শৈলকুমার মুখার্জির বিরুদ্ধে যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হয় সেজন্য তিনি পার্টির কাছে প্রস্তাব রাখতে পারেন যদি অধ্যক্ষ নিশ্চয়তা চান যে তিনি "ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে দাঁড়াবেন" এবং নির্বাচিত হওয়ার পর মিনিস্টার হবেন না।[৩০] শৈলবাবু এতে রাজি হন না, বিধানসভার নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন।

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরও কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভার অধ্যক্ষরা এখনও পুরোপুরি দলীয় প্রার্থী। সংসদ কাঠামোর যথাযথ কার্যকারিতার পক্ষে তা যে প্রতিবন্ধক সব রাজনৈতিক দলই তা স্বীকার করেন কিন্তু কোনও সমাধান সূত্রের নির্দেশ দিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখনও ব্যর্থ।

বাংলার বিধানসভায় উপাধ্যক্ষদের মধ্যেও অনেক কৃতি ছিলেন। জালালুদ্দিন হাশেমির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মেজর হাসান সুরাবর্দীও কিছুদিন উপাধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু উপাধ্যক্ষ হিসেবে বিশেষভাবে নাম করতে হয় প্রখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষক ড. আবদুল্লাহ-অল-মামুন সুরাবর্দীর। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি. এ. ও পরে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে আরবীতে প্রথম বিভাগে এম. এ. পাস করেন। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরার আগে ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, কনস্টান্টিনোপোল ও কায়রোতে অধ্যয়ন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান পি-এইচ.ডি.-তিনি। ১৯ বছর বয়সে হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে বই লিখে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। টলস্টয় এই বইয়ের প্রশংসা করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টেগোর ল' প্রফেসার'ও ছিলেন কয়েক বছর। রাজনৈতিক মতবাদের কারণে তাকে অধ্যাপনা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। আবদুল্লা সুরাবর্দী ছিলেন বহুভাষাবিদ ও পণ্ডিত হরিনাথ দে'র অন্তরঙ্গ বন্ধু। হরিনাথ দে'র জীবনীকার লিখেছেন "হরিনাথ দে'র মৃতদেহ চিতায় তোলা হলে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবদুল্লাহ সুরাবর্দীকে সান্ত্বনা দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে

পড়ে। তিনি তাঁর বন্ধুর চিতায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হন।" আবদুল্লাহ, হরিনাথ দে ও থিওডর ব্লথ ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু ; তিনজনই এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। এই তিন মুসলমান, হিন্দু ও খ্রীস্টান বন্ধু মিলে উপনিষদের এক নতুন সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।[৩১] আবদুল্লাহ সুরাবর্দী শিবশেখরের বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। তিনি জিন্নার ১৪ দফা দাবির বিরোধিতা করেন।

বিধানসভার কার্য পরিচালনায় তাঁদের ভূমিকা সম্বন্ধে উপাধ্যক্ষরা মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। অনেক সময়ই তাঁদের ক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ করতে দেখা যায়। স্বাধীন ভারতে বাংলার বিধানসভার প্রথম উপাধ্যক্ষ আশুতোষ মল্লিক ভারতীয় সংবিধানে উপাধ্যক্ষদের আরও অধিক ক্ষমতা দেওয়ার দাবি জানান।[৩২]

ষোড়শ অধ্যায়

বিধানসভায় বঙ্গসমাজের আলেখ্য

আইনসভাকে যথাযথভাবেই সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি বলা যায়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অবস্থা সম্বন্ধে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মনোভাব প্রতিফলিত হয় আইনসভায়। আধুনিক সংসদীয় কাঠামোয় আইনসভার কার্যবিন্যাস এমনভাবে করা হয় যাতে আইনসভা বিভিন্ন সামাজিক প্রবণতার যথার্থ প্রতিবিম্ব হয়ে উঠতে পারে। আদিপর্ব থেকেই বাংলার বিধানসভায় সমকালীন সমাজের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রবণতা ও ঘটনা প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। বলা যেতে পারে, স্বাধীনতা-পূর্ব পাঁচ দশকে বিধায়করা ছিলেন বঙ্গসমাজের চিত্রক, তাঁদের স্টুডিও ছিল বিধানসভা। অগ্রণী শিল্পী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফজলুল হক, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নলিনাক্ষ সান্যাল, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, অসিমুদ্দিন, আবুল হাশিম, আবদুল বারি, হেমপ্রভা মজুমদার, মণিকুন্তলা সেন, সুরাবর্দী, আজিজুল-হাশেমি-নৌশের, জ্যোতি বসু, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিধায়ক।

মূলত প্রশ্নোত্তর, প্রস্তাব, বিতর্ক, অর্ধঘণ্টাব্যাপী আলোচনা, বাৎসরিক বাজেট ও অন্যান্য সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজদর্পণ আইনসভায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ করতে হয় প্রশ্নোত্তর পর্বের। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতেন বিধায়করা। খেয়ানৌকার ভাড়া, পথ দুর্ঘটনা, হুগলীর ইমামবাড়া, কুইনাইনের স্বল্পতা, জিনিসপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্নীতি, জুয়াখেলা থেকে শুরু করে শাসন ও বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হতো বিধানসভায়। সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা দেখা যেত প্রশাসন বিভাগের কর্মচারী ও পুলিশের অত্যাচার নিয়ে। শাসকদের বিরক্তি উৎপাদন করে এবং বিধিনিষেধ সত্ত্বেও রাজনৈতিক বন্দীদের উপর নির্যাতন ও স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে বিধায়করা প্রশ্ন করেছেন। অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, এমনকি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধেও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বিধানসভায়। একসময় বিধানসভায় সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ সমস্যা নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিধায়কদের নানা প্রশ্ন করতে দেখা গিয়েছে। প্রাক্-স্বাধীনতা আমলে জননিরাপত্তা আইনে কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন মারফত প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে বিধানসভায়।

শ্রমিক ধর্মঘট, শ্রমিকদের উপর গুলিচালনা, কৃষক আন্দোলন এবং সাধারণভাবে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের দুর্বিষহ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন বিধানসভায় উত্থাপিত হয়েছে। প্রথমদিকে অসংখ্য উচ্চমানের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, অম্বিকাচরণ মজুমদার, গুরুপ্রসাদ সেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ বিধায়ক। এঁদের প্রশ্ন করার নৈপুণ্য ও কুশলতা সম্বন্ধে সপ্রশংস উল্লেখ লন্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে নীলরতন সরকার, ফজলুল হক, অখিলচন্দ্র দত্ত, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, এমদাদুল হক ও অন্যান্য সদস্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষতা দেখান। স্বরাজী আমলে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, জে এম দাশগুপ্ত, বিধানচন্দ্র রায়, আবদুল জব্বার পালোয়ান সর্বাধিক প্রশ্ন করেন। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নলিনাক্ষ সান্যাল, কিরণশঙ্কর রায়, আবদুল বারি, আবু হোসেন সরকার, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সদস্য নানা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে মন্ত্রীদের এক এক সময় কোণঠাসা করতে সক্ষম হন।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় স্থানীয় সমস্যা, খাদ্যসংকট, অনাহারে মৃত্যু, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, মূল্যবৃদ্ধি, কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের জন্য খরচ, বুলগানিন ক্রুশ্চেভের পশ্চিমবঙ্গ সফর, পথের পাঁচালী চলচ্চিত্র, ভূদান আন্দোলনের পাশাপাশি প্রশাসনিক ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক হালহকিকত, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ ইত্যাদি বিষয় প্রশ্ন উত্থাপনে প্রাধান্য পায়। বিরোধী বিধায়করা প্রশ্ন ও সম্পূরক প্রশ্নের মাধ্যমে মন্ত্রীদের জর্জরিত করতেন, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় পরিস্থিতির সামাল দিতেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর বিধানসভায় উত্থাপিত প্রশ্নের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ইংলন্ডের সংসদব্যবস্থা থেকেই প্রশ্নোত্তরের উৎপত্তি। এটাকে এক অনন্যসাধারণ ব্রিটিশ উদ্ভাবন বলে অভিহিত করা হয়।[১] ১৭৯১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি লর্ডসভায় প্রধানমন্ত্রী আর্ল অব সাদারল্যান্ডের উদ্দেশ্যে আর্ল কুপারের প্রশ্নই প্রথম নথিভুক্ত প্রশ্ন বলে গণ্য করা হয়। ভারতে আইনসভা প্রতিষ্ঠার প্রথম ৩০ বছর প্রশ্ন করার কোনও অধিকার সদস্যদের দেওয়া হয়নি। ১৮৮৪ সালে বড়লাট লর্ড ডাফরিনের কাছে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে এ বিষয়ে অনুযোগ করতে দেখা যায়। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠা অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস আইনসভার সদস্যদের প্রশ্ন করার অধিকার দাবি করে। পরবর্তী বছর কলকাতা অধিবেশনে এই দাবি আরও জোরালোভাবে পেশ করা হয়। এলাহাবাদ অধিবেশনে (১৮৮৮) সভাপতি জর্জ ইয়ুল প্রশ্ন করার অধিকারকে অপরিহার্য অধিকার বলে উল্লেখ করেন। ইংরেজ শাসকরাও ক্রমশ প্রশ্নোত্তরের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেন। কারণ, সরকারি নীতি সম্বন্ধে

ভ্রমাত্মক ধারণা সংশোধন বা দূরীকরণের কোনও গণমাধ্যম তখন প্রায় ছিল না বললেই চলে। ১৮৯২ সালের আইনে ভারতীয়দের আইনসভায় প্রশ্ন করার এবং উত্তর পাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। একই সঙ্গে বাজেট বিতর্কেও অংশ নেওয়ার সুযোগ পান আইনসভার ভারতীয় সদস্যরা। ভারতীয়রা এই সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে আনিচ্ছুক রাজপুরুষদের থেকে ঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা নেন।

ইদানীংকালে প্রশ্নোত্তর পর্ব কেন্দ্রীয় সংসদ ও রাজ্য বিধানসভা সমূহে সবচেয়ে উত্তেজক মুহূর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইনসভার প্রতিদিনের বৈঠকের প্রথম এক ঘণ্টা সদস্যদের উত্থাপিত প্রশ্ন ও সরকারের পক্ষ থেকে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট থাকে। উত্তরের জের ধরে সম্পূরক প্রশ্নও তুলতে পারেন সদস্যরা। প্রশ্নোত্তর পর্বে অনেক সময় সদস্যদের প্রশ্নবাণে সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। প্রশ্নের মাধ্যমে অতীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। লোকসভার এক প্রশ্নের সূত্র ধরেই শিল্পপতি হরিদাস মুন্দ্রার ব্যবসা-কেলেঙ্কারি প্রকাশ পায় এবং এর ফলে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারিকে পদত্যাগ করতে হয়। বেফাঁস উত্তরদানের ফলে একজন মন্ত্রীকে যেমন সংসদে অপদস্থ হতে হয়, তেমনি আবার মন্ত্রীর কুশলী জবাব সমগ্র কক্ষকে তাঁর সপক্ষে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। একজন পিছনের সারির সদস্যও গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে পরের দিন সংবাদ-শিরোনামে স্থান করে নিতে পারেন। প্রশ্ন উত্থাপনের বিষয়ে এখনো বিধায়কদের বেশ কিছু নিয়মাবলী ও শর্ত মেনে চলতে হয়। যেমন—প্রশ্নে সাধারণত ১৫০টির বেশি শব্দ থাকবে না, এতে কোনও যুক্তিতর্ক, অনুমান নির্ভর সিদ্ধান্ত, শ্লেষাত্মক উক্তি, দোষারোপ বা মানহানিকর বক্তব্য থাকবে না। কোনও নীতিগত প্রশ্নে বিশদ বিবরণ চেয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। ঔপনিবেশিক শাসনকালে আরও কঠিন শর্ত প্রশ্নের উপরে আরোপিত হতো। প্রথমদিকে সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপনের অনুমতিও দেওয়া হতো না, কিন্তু ভারতীয় সদস্যরা রাজপুরুষদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে এমন অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যার ফলে সরকারকে নাজেহাল হতে হয়েছে। ১৯০৯-এর পর প্রশ্ন সম্বন্ধে কড়াকড়ি অনেকটা শিথিল করা হয়। গভর্নররা নিজেরাই শাসন পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রীদের দেওয়া উত্তর পর্যালোচনা করে দেখতেন। গভর্নর আর্ল অব রেনাল্ডশে বিধানসভাকে জানান, ১৯২১-এ তিনি ১২৯৩টি প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা করার পর উত্তরদানের অনুমতি দিয়েছেন।[২] উল্লেখ্য, ১৯১৯-এর সংস্কার-পরবর্তী প্রথম বিধানসভার ১৬৪ দিন অধিবেশনে প্রায় সাড় তিন হাজার প্রশ্ন বিবেচিত হয়েছিল।

প্রশ্ন উত্থাপনে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলাকালীন সময় ছাড়া দুই দশকের বেশি সুরেন্দ্রনাথ বিধানসভার সদস্য ছিলেন। প্রশ্নকর্তা হিসেবে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। ১৮৯৩-১৯০২ এই দশ বছরে বিধানসভায় মোট প্রশ্নের শতকরা ৪১ ভাগই উত্থাপন করেন সুরেন্দ্রনাথ। প্রশ্ন উত্থাপনে এর পরই স্থান ছিল আনন্দমোহন বসু ও লালমোহন ঘোষের। বেশির ভাগ প্রশ্নই হতো সামাজিক সমস্যা নিয়ে, সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা নিয়ে। সুরেন্দ্রনাথের সমকালীন চিমনলাল শেতলবাদ, বালগঙ্গাধর তিলক, ফিরোজ শা মেহ্তা বোম্বাই বিধানসভায় এবং শঙ্করণ নায়ার, কল্যাণসুন্দরম আয়ার, রঙ্গিয়া নাইডু মাদ্রাজ বিধানসভায় প্রশ্ন উত্থাপক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন, কিন্তু এঁরা কেউ সুরেন্দ্রনাথের সমকক্ষ ছিলেন না। প্রশ্ন উত্থাপনে তথ্য সংগ্রহ ও সাজানো, নিয়ম মেনে সংক্ষেপে বিষয়বস্তু পরিবেশন ইত্যাদির জন্য সুরেন্দ্রনাথ প্রচুর পরিশ্রম করতেন। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের কাছে তিনি ছিলেন ভীতিস্বরূপ, চার্লস এলিয়ট সহ তৎকালীন প্রদেশপালরা এত বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ায় মাঝেমধ্যেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।

প্রশ্নোত্তর ছাড়া মুলতুবি প্রস্তাব (জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট কোনো বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে সভার কার্য মুলতুবি রাখার আবেদন) সংকল্প (মন্ত্রী ব্যতীত বেসরকারি সদস্য কর্তৃক নির্দিষ্ট বিষয়ে উত্থাপিত এবং ব্যালটের মাধ্যমে স্থিরীকৃত প্রস্তাব, জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ের উপর আলোচনার জন্য গৃহীত প্রস্তাব, স্বল্পকালীন আলোচনা, জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ইত্যাদি সংসদীয় হাতিয়ার বিধানসভাকে জনমুখী করতে এক বিশেষ ভূমিকা নেয়। সর্বোপরি বাজেট অধিবেশনে প্রত্যেক দপ্তরের অনুমিত আয় ও ব্যয়ের বিবরণকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক বিধানসভায় হয় তা থেকেও সমাজজীবনের সমস্যা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যায়। বিভিন্ন বিষয়ে বিধানসভায় জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন থেকে বাংলার তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রও পাওয়া যায়।

শাসকদের অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিগ্রহ ও নিষ্ঠুরতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন অতীত দিনের বাংলার বিধানসভায় উত্থাপিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও জাতীয় আন্দোলন যখন শাসকদের কাছে আর্জি পেশ এবং অনুরোধ উপরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই সময়ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, গুরুপ্রসাদ সেন, সৈয়দ ফজল ইমাম প্রমুখ বিধায়ক সাধারণ লোকের উপর বিদেশী শাসকদের অত্যাচার নিপীড়ন ও নিগ্রহ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। নমুনা হিসেবে কয়েকটি প্রশ্নের উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৪ মার্চ ১৮৯৬, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক প্রশ্ন থেকে জানা যায়, মেমারির কাছে বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উইন্ডসর এক গরুর গাড়ির চালককে নির্দয়ভাবে

প্রহার করেন। কারণ, তাঁর গাড়ির গতি কিছুটা শ্লথ করতে হয়েছিল গরুর গাড়ির জন্য। প্রহারের ফলে চালকের নাক ও মুখ দিয়ে প্রবল রক্তপাত হয়। দুর্ঘটনার বিবরণ দিয়ে বর্ধমানের অমরনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত একখানি পত্র "ইন্ডিয়ান মিরর" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে সুদূর মফস্বল এলাকার দরিদ্র মূক ভারতীয় প্রজাবর্গ কীভাবে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের দ্বারা অত্যাচারিত হয় তার বর্ণনা দেওয়া হয়। এই চিঠির ভিত্তিতে সুরেন্দ্রনাথ যে প্রশ্ন করেন তার জবাব দিতে গিয়ে সরকার পক্ষ থেকে মিঃ হেনরি কটন বলেন, এই ঘটনা সম্বন্ধে যতটুকু করার তা করা হয়েছে। উইন্ডসর ঘটনাটি স্মরণ করতে পারেননি বলে জানানো হয় এবং বলা হয় যতদূর তিনি মনে করতে পারছেন তাতে একজন গরুর গাড়ির চালক ইচ্ছাকৃতভাবে পথ অবরোধ করায় তিনি একবার মাত্র চাবুক মেরে নিজের পথ করে নেন। তবে রক্তপাত হয়েছে এমন কোনও ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বলে সরকারকে তিনি জানিয়েছেন।[৩]

সুরেন্দ্রনাথের অপর এক প্রশ্ন থেকে জানা যায় (৯.২.১৮৯৪ ও ২৯.২.১৮৯৪), অষ্টম অশ্বারোহী বাহিনীর সৈন্যরা মহেশতলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনসাধারণের উপর নানা ধরনের অত্যাচার ও নিগ্রহ চালায়, তাদের শাকসবজি ও অন্যান্য ফসল জোর করে কেটে নিয়ে যায়। চিরাচরিত পদ্ধতিতে সরকারি উত্তর হয়, "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, সে বিষয়ে সরকার হস্তক্ষেপ করতে চান না।"[৪]

জনৈক আলি হুসেন সরকারের বিপক্ষে এক মামলায় হিন্দুবাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে উঠলে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ল্যাং তাকে হুমকি দিয়ে বলেন, হিন্দুর পক্ষে সাক্ষী দেওয়ার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে। বিষয়টি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হলে (১.৩.৯৪) সুরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন করেন। সরকার পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয়, বিষয়টি এমন নয় যে সরকারকে নজর দিতে হবে।[৫] সুরেন্দ্রনাথের অন্য এক প্রশ্ন থেকে জানা যায় (২.১.১৮৯৭) ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের একজন গেটম্যানকে হত্যার দরুন এক ইউরোপীয় সাহেবের শাস্তি হয় মাত্র ৫০ টাকা জরিমানা।[৬]

ত্রিপুরার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বিটসন বেলের প্রচণ্ড আঘাতে একজন ভারতীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গুরুতর আহত হন, তাঁর হাড় ভেঙে যায়। সুরেন্দ্রনাথ বিধানসভায় ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ এ বিষয়ে এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। সরকার থেকে জানানো হয় বিটসন বেল ভারতীয় ডেপুটি ম্যজিস্ট্রেটকে ধাক্কা দিয়েছিলেন মাত্র এবং পড়ে গিয়ে তিনি সামান্য আঘাত পান। যেহেতু জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করেছেন সরকারের তাতে কিছু করণীয় নেই বলে উত্তর দেওয়া হয়।[৭]

অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষও যে ঐ আমলে প্রতি-আক্রমণের সাহস পেত তার নজির পাওয়া যায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রশ্নে। সিরাজগঞ্জের মহকুমা শাসক মিঃ ক্যারি অণু প্রামাণিক বলে একজন কৃষকের পাকা মাসকলাই

ক্ষেতের উপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যান। অণু তখন কোদাল নিয়ে সাহেবের দিকে তেড়ে আসে, কাছাকাছি লোকজন এগিয়ে এসে অণুকে বাধা দেয়, সাহেব রক্ষা পান। মিঃ ক্যারি নিজেই আবার অণুর বিচার করেন এবং অণুকে ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ড দেন। জেলা জজ অবশ্য এই আদেশ বাতিল করে দেন কারণ নিজ ফসল রক্ষার জন্য অণুর এই কাজ তাঁর কাছে গর্হিত মনে হয়নি। সুরেন্দ্রনাথের প্রশ্নের জবাবে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়, সরকার আশা করেন মহকুমা শাসক এই ঘটনা থেকে উপযুক্ত শিক্ষা নেবেন।[৮]

বেত্রাঘাত ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বিভিন্ন সময় অপবাধী, এমনকি নির্দোষ ব্যক্তি ও রাজনৈতিক কর্মীদের বেত্রাঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেন ভারতীয় সদস্যরা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় বেত্রাঘাত ছিল সামান্যতম শাস্তি। জেলের মধ্যে বেত্রাঘাতের ফলে অনেকে আহতও হয়েছেন। ফজলুল হককে কয়েকবারই রাজনৈতিক বন্দীদের বেত্রাঘাত করার বিষয়ে প্রশ্ন করতে দেখা যায়। গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার আবদুর রহিমকে (জেল দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত) এজন্য বিধানসভায় নাজেহাল হতে হয়। ওড়িশার দুই রাজকুমারকে বেত্রাঘাত করা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বিধানসভায় যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। রাধাচরণ পাল উত্থাপিত এক প্রশ্নের উত্তর থেকে জানা যায় ১৯০৫, ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে একমাত্র কলকাতা পুলিশ আদালতেই যথাক্রমে ৩৭৫, ৩২১ ও ৪০২ জনকে বেত্রাঘাতের আদেশ দেওয়া হয়।[৯] আনন্দমোহন বসুর এক প্রশ্ন থেকে জানা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই বেত্রাঘাতের আদেশ কার্যকর করার জন্য লোক পাওয়া যেত না। অন্তত সিরাজগঞ্জ ও আলিপুর থেকে বিচারকরা এই ধরনের অভিযোগ করেছেন বলে সরকার থেকে জানানো হয়। জাতীয় আন্দোলনের প্রসারলাভের ফলে বেত্রাঘাতের দণ্ডাজ্ঞা অনেকটা শিথিল হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষদিকে বেত্রাঘাত সম্বন্ধীয় প্রশ্নের আর বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কোনো কোনো সময় অবশ্য ভারতীয় সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লিস্টারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলে তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। আনন্দমোহন বসু এক প্রশ্ন মারফত মিঃ নর্মান জোন্স নামে জনৈক রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনেন। সরকার তাঁকে ছুটিতে যেতে বাধ্য করেন।

দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ আজ থেকে একশো বছর আগে কম ছিল বলা যায় না। পুলিশ বিভাগের আকছার দুর্নীতি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠেছে বিধানসভায়। বিচার বিভাগেও ব্যাপক দুর্নীতি ছিল। দুর্নীতি যে কত ব্যাপক ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়

সুরেন্দ্রনাথের এক প্রশ্ন থেকে। দেওঘরের এক মহকুমা শাসক মিঃ হার্ড সবকিছু ঘুষ নিতেন। এমনকি মুরগি, ডিম, ছাগল, ভেড়া পর্যন্ত। ব্যবহারের পর যেসব জিনিসপত্র অতিরিক্ত পড়ে থাকত, সেগুলি মহকুমা শাসকের আদালতের নাজির নিলামে বিক্রি করে দিত। "দেশের কথা"র লেখক স্বনামধন্য সখারাম গণেশ দেওস্কর (১৮৬৯-১৯১২) "হিতবাদী" পত্রিকায় মিঃ হার্ডের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রশ্ন ও সখারামের প্রবন্ধ ঐ সময় খুব আলোড়ন সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।[১০]

আইনশৃঙ্খলা ও পুলিশ বিষয়ে বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর, বিশেষ করে বাজেট আলোচনার সময় এই দুই বিষয়ের উল্লেখ ছিল বিধানসভার অন্যতম উত্তেজক "ইস্যু"। পুলিশ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আয়ারল্যান্ডের মডেল অনুসরণ করে ১৮৬৬ সালে কলকাতা ও শহরাঞ্চল পুলিশ-আইন প্রবর্তিত হয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও সংহত করার উদ্দেশ্যেই পুলিশবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। ১৮৯৫ সালে এই আইনের সংশোধনের এক প্রস্তাব সরকার পক্ষ থেকে বিধানসভায় আনা হয়। সংশোধনে ১৮৬৬ সালের আইনে পুলিশের যে ক্ষমতা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা পুলিশ বাহিনীকে দেওয়া হয়। পুলিশকে এই ধরনের যথেচ্ছ ক্ষমতা দেওয়ার বিরুদ্ধে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভারতীয় সদস্য প্রবল আপত্তি জানান। ভারতীয় সদস্যদের বিরোধিতার দরুন সরকার সংশোধন প্রস্তাবের অনেক কিছুই প্রত্যাহার করে নেন।[১১]

বিধানসভার প্রশ্নোত্তর ও বিতর্ক থেকে তৎকালীন সমাজের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্বন্ধেও সম্যক ধারণা করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলায় ডাকাতির ঘটনা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক প্রশ্ন থেকে (১৮৯৫ সালের ৬ জুলাই) জানা যায় নিম্নবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং ফরিদপুর ও খুলনা জেলায় ডাকাতির সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়। রেলপথে চুরির বিষয়েও বিধায়করা বিভিন্ন সময় প্রশ্ন করেন। নরেন্দ্রনাথ সেন এ বিষয়ে ১৮৯৯ সালের ১৫ এপ্রিল এক প্রশ্ন করলে সরকার যে উত্তর দেন তা থেকে জানা যায়, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের বুকিং অফিসের কেরানি ও কুলিদের যোগসাজশে পাঁচ হাজার টন বিশুদ্ধ ঘি চুরি হয়।[১২] ১৯২৯ সালে কিশোরীমোহন চৌধুরীর প্রশ্ন ও পুলিশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হেনরি হুইলারের উত্তর থেকে জানা যায়, চলন্ত ট্রেনে চুরির অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৪০টি পুলিশের নজরে এসেছে কিন্তু তদন্তে বিশেষ ফল হয়নি। দাঙ্গা, নারীনির্যাতন, ধর্ষণ, অনধিকার প্রবেশ ও দেহব্যবসা নিয়েও অনেক

প্রশ্ন উত্থাপিত হয় বিধানসভায়। সুরেন্দ্রনাথের এক প্রশ্ন থেকে জানা যায়, দাঙ্গা ও খুনখারাপির ঘটনা বেশি ঘটতো খুলনা জেলায়। অধিকাংশ দাঙ্গাই হতো জমি দখল ও ফসলের অধিকার নিয়ে। সরকারের পুলিশ বাহিনীও জমিদারদের মাইনে করা লেঠেলদের সমীহ করে চলত। ১৮৮৫ সালে একমাত্র খুলনা জেলাতেই ১৬০টি দাঙ্গা হয় বলে বিধানসভাকে জানানো হয়। নারী-নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাদি বিষয়েও প্রশ্ন উত্থাপিত হতে দেখা যায়। মৈমনসিং জেলা এই বিষয়ে ছিল কুখ্যাত। নসিপুরের রাজা রণজিত সিং-এর এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ রিজলে জানান, স্থানীয় পুলিশকে সাহায্য করার জন্য ঐ জেলায় এক বিশেষ পুলিশবাহিনী পাঠানো হয়েছে। 'ইন্ডিয়ান মিরর', 'হিতবাদী' প্রভৃতি সংবাদপত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সরকারি নিষ্ক্রিয়তার কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ঢাকা, মৈমনসিং, ফরিদপুর, খুলনা, হুগলী ও অন্যান্য জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আট-নয় বছরের বালিকাদের ভারতের অন্যত্র চালান দেওয়ার অবৈধ ব্যবসা প্রতিরোধে সরকারের অক্ষমতা নিয়ে বিধায়করা অভিযোগ করতেন। গুণ্ডা উপদ্রুত কলকাতার বড়বাজারে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে বলে বিধায়কদের প্রশ্ন করতে দেখা যায়। ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার থকে জানানো হয় ১৯১১ ও ১৯১২ সালে ২৩৯২ ও ২৩৬২টি ফৌজদারী মামলা কলকাতায় নথিভুক্ত করা হয়েছে। হত্যা, দাঙ্গা, নারী-নির্যাতন ও বে-আইনী কার্যকলাপের পিছনে পুলিশের প্রচ্ছন্ন সমর্থন আছে বলে বিধায়করা অভিযোগ করতেন। ২১ জুলাই, ১৯০০ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার থেকে জানানো হয়, বড়িশা গ্রামে দাঙ্গার সময় গ্রামীণ মানুষের সম্পত্তি লুটপাটের জন্য ১৪ জন পুলিশ কনস্টেবলকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়েও অনেক প্রশ্ন বিধানসভায় উত্থাপিত হয়। ১৯২৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপারে সদস্যরা হোসেন সুরাবর্দী ও মুসলিম নেতৃবৃন্দকে দায়ী করেন। মুসলমান বিধায়করাও হিন্দু নেতাদের দোষারোপ করেন।

১৯২১-১৯২২-এর বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে একের পর এক ভারতীয় সদস্য পুলিশ-বিভাগের বিভিন্ন খরচের উপর ছাঁটাই এনে সরকারকে বিব্রত করতে থাকেন। দুর্নীতি, নৈতিক অবনতি, স্বেচ্ছাচার ইত্যাদি নানা বিষয় এই প্রসঙ্গে উঠতে থাকে। কিশোরীমোহন চৌধুরী, তড়িৎভূষণ রায়, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রমুখ বিধায়ক বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করে পুলিশের সমালোচনা করেন। পুলিশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হেনরি হুইলার বলেন, সদস্যরা এই সুযোগে সব কিছু বলেছেন কিন্তু পুলিশ বাজেট কেন ছাঁটাই করা দরকার সে বিষয়ে কিছু বলেননি। প্রতি বছর বাজেট বিতর্কের সময় ভারপ্রাপ্ত সদস্য বা মন্ত্রীকে বিধানসভাকে দিয়ে পুলিশ বাজেট অনুমোদন করাতে হেনস্থা হতে হয়েছে। সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের নিগ্রহ, ছাত্রদের

উপর অত্যাচার, অপরাধীকে আশ্রয়দান ইত্যাদি বিভিন্ন অভিযোগ ভারতীয় সদস্যরা বিধানসভায় আনেন। হাওড়ার আনন্দপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার ও নিগ্রহের বিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথ বসু যে প্রশ্ন করেন তা থেকে জানা যায়, বিচারক পর্যন্ত কঠোর ভাষায় পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করেন এবং এই ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিপিনচন্দ্র পালকে অনবরত পুলিশি নজরে রাখা ও নিগ্রহ করার বিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রশ্ন উত্থাপন করলে বিধানসভায় আলোড়ন দেখা দেয়।

স্বাধীনতার পর পুলিশ বিভাগের বাজেট নিয়ে বিতর্কের সময় বিধানসভায় অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। তবে বিধায়কদের গঠনমূলক সমালোচনাও করতে দেখা যায়। ১৯৫৩-৫৪ সালে পুলিশখাতে খরচের আলোচনায় অংশ নিয়ে বিধায়ক হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বোম্বাই ও বাংলার মধ্যে তুলনা করে বলেন, বাংলার আয়তন (ঐ সময়) ৩০৭৭৫ বর্গমাইল, বোম্বাইয়ের ১১১৪৩৪ বর্গমাইল অর্থাৎ প্রায় চারগুণ, লোকসংখ্যা বাংলার ২৪৮ ০০ ০০০, বোম্বাইয়ের ৩৬০ ০০ ০০০ অর্থাৎ দেড়গুণ, বাংলার রাজস্ব ৩৮ কোটি টাকা, বোম্বাইয়ের ৬৮ কোটি টাকা। কিন্তু পুলিশখাতে বাংলার খরচ হয় মোট রাজস্বের ১৭ ভাগ, বোম্বাইয়ের ১৩.৫ ভাগ। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য পুলিশ বিভাগের খরচের কারণ ব্যাখ্যা করেন কিন্তু তা সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

তবে বাজেট আলোচনায় কোনও কোনও সময় যে ভাবাবেগ প্রাধান্য পেত তার পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে। ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট আলোচনায় তাঁর বক্তব্যের কিয়দংশ ঃ "মাননীয় সভাপাল মহাশয়, জীর্ণ-শীর্ণ, রুক্ষ মলিন, দীন-দুঃখী বাংলার বাজেট আলোচনার স্থান এটা নয়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মহামূল্য কার্পেট আচ্ছাদিত আরামপ্রদ সুখাসনে সজ্জিত হর্মের মধ্যে বাংলার বাজেট আলোচিত হতে পারে না। এই প্রকার আরাম ও বিলাসের মধ্যে মহাধনী ও ধনকুবের দেশেরই বাজেট আলোচিত হতে পারে। আজ বাংলার প্রকৃত বাজেট আলোচনা হচ্ছে ২৪ পরগনা, নদীয়া, হাওড়ায় দীন-দুঃখী দরিদ্রের ঘরে যারা ৭ দিনের মধ্যে কয় বেলা খেতে পারবে তার হিসেব করছে। আজ বাংলার বাজেট আলোচনা হচ্ছে। এদিকে হাড়োয়া সন্দেশখালিতে সেখানে ৭ দিনের একটুকুও খাবার সংগ্রহ করতে না পেরে একজন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে এবং শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে ধিক্কার ও অভিসম্পাত জানিয়ে যায় বর্তমান সরকারকে।"

স্বদেশী ও স্বাধীনতা আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও রাজবন্দী প্রসঙ্গ নিয়ে বিধানসভাকে প্রায়শঃই উত্তাল হতে দেখা যায়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সমগ্র ভারত, বিশেষ করে বাংলাদেশকে আলোড়িত করে। পরিষদীয় আলোচনা এবং

প্রশ্নোত্তরে বঙ্গভঙ্গ ও তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলী কয়েকবারই বিধানসভায় উল্লিখিত হয়। সরকার বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা বা প্রশ্নোত্তরে বহুবিধ বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য ভারতীয় সদস্যরা সরাসরি বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে প্রশ্ন না করে অনেকটা ঘুরিয়ে বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে তথ্য ও সরকারি নীতি জানতে চাইতেন। অম্বিকাচরণ মজুমদার (পরবর্তীকালে কংগ্রেস সভাপতি) মালদহে ছোটলাট প্রদত্ত এক ভাষণের জের ধবে ১৯শে আগস্ট, ১৯০৫ বিধানসভায় এক প্রশ্ন করেন। ঐ সভায় ছোটলাট ঘোষণা করেছিলেন, বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে তিনি বহু চিঠিপত্র পাচ্ছেন এবং একে তাড়াতাড়ি কার্যকর করার জন্য অনেকেই উৎসাহ দেখাচ্ছেন। উত্তরে সরকার থেকে জানানো হয়, "ছোটলাট উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম প্রকাশ করতে পারবেন না।" একই দিনে আরেকটি প্রশ্নে তিনি বঙ্গভঙ্গ সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রকাশ করতে সরকারকে অনুরোধ জানান এবং কোন্ সময় তা কার্যকর হবে তাও জানতে চান। উত্তর ছিল সংক্ষিপ্ত : (১) "বঙ্গভঙ্গ সংক্রান্ত কোনও কাগজপত্র প্রকাশ করার অধিকার এই সরকারের নেই, (২) বঙ্গভঙ্গ কোন্ সময় থেকে কার্যকর করা হবে তা সঠিকভাবে জানাতে সরকার অক্ষম।"

বিধায়ক যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, নলিনবিহারী সরকার বঙ্গভঙ্গ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইলে সরকার থেকে তা না-মঞ্জুর করে দেওয়া হয়। অম্বিকাচরণ মজুমদার ১৮ নভেম্বর, ১৯০৫ আটটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এক দীর্ঘ প্রশ্ন করে কুখ্যাত কার্লাইল সারকুলার প্রত্যাহার করে নেওয়ার অনুরোধ জানান। এই সারকুলারে স্কুলছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয় এবং শিক্ষক ও অধ্যাপকদের বিশেষ পুলিশ অফিসার হিসেবে নাম তালিকাভুক্ত করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রশ্নের উত্তরে সরকার থেকে জানানো হয়, সারকুলার প্রত্যাহার করে নেওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়।

ভারতীয় সদস্যরা সরকারি বাধার মুখেও বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবে বিধানসভার অভ্যন্তরে বিতর্ক, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে সোচ্চার প্রচার চালিয়ে যান। ১৯০৬-১৯০৭ সালের বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, যেভাবে তড়িঘড়ি করে সরকার বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা কার্যকর করেছেন তাতে এই সরকারের উপর ভারতবাসী আর কোনোভাবেই আস্থা রাখতে পারে না। অম্বিকাচরণ মজুমদার তাঁর বক্তৃতায় বলেন বঙ্গবিভাগের কথা উঠলেই সরকার চটে যান কিন্তু ডেনমার্ক রাজ্য ও রাজকুমারের আলোচনা ব্যতিরেকে হ্যামলেট নাটক যেমন আলোচনা করা যায় না, তেমনি বঙ্গভঙ্গের কথা উল্লেখ না করে বাজেট আলোচনা করা যায় না। বাজেট থেকে পরিসংখ্যান উদ্ধৃতি দিয়ে সদস্যরা দেখান কীভাবে বঙ্গভঙ্গ সমগ্র বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত করছে। এক আবেগপূর্ণ

বক্তৃতায় ভূপেন্দ্রনাথ বসু (পরবর্তীকালে কংগ্রেস সভাপতি) বলেন, সরকার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আলোচনা দমন করার জন্য পুলিশ ও গোর্খা সৈন্য নিয়োগ করেছেন, লাঠি ও সঙ্গীন দিয়ে আন্দোলন বানচাল করার চেষ্টা করছেন। অগণিত দেশপ্রেমিককে জেলে আটক রাখছেন। আন্দোলন স্তব্ধ হয়নি, এর অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে।

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কীভাবে শাসক সম্প্রদায়কে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায় উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও প্রস্তাবে। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৭। সুরেন্দ্রনাথ রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে জানানো হয়, বিপ্লবীরা তিরিশ জন ভারতীয় পুলিশের প্রাণহানির চেষ্টা করে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে কৃতকার্য হয়। ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন নিয়ে অনেক প্রশ্ন ও প্রস্তাব বিধানসভায় উত্থাপিত হয়। সদস্যদের পীড়াপীড়িতে সরকার আটক বন্দীদের বিশদ বিবরণ দিয়ে ৭৬ পৃষ্ঠাব্যাপী এক তালিকাও পেশ করেন।

অসহযোগ, আইন অমান্য ও ভারতছাড়ো আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বিধানসভায় উত্থাপিত হতে দেখা যায়। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেস বিধানসভা বর্জন করে, কিন্তু কংগ্রেস সদস্য নন এমন অনেক বিধায়ক অসহযোগ আন্দোলন দমনে সরকারি নীতির ব্যর্থতা বিধানসভায় তুলে ধরেন। সদস্যদের উত্থাপিত প্রশ্ন থেকেই বিধানসভায় সরকারকে স্বীকার করতে হয় একজন সহকারী পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর ও ৪৬ জন পুলিশ কনস্টেবল অসহযোগের সমর্থনে সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। প্রতি বিদ্যালয়ে চরকার ও সুতো কাটার ট্রেনিং বিষয়ে এক প্রশ্ন বিধানসভায় এই সময় উত্থাপিত হয়। সরকার থেকে জানানো হয় নিজ খরচায় স্কুলগুলি যদি তা করতে পারে তবে সরকারের আপত্তি নেই।[১৩] বিধানসভায় অপর এক প্রশ্ন থেকে জানা যায়, ১৯২১-এর জুন মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে নভেম্বর পর্যন্ত অসহযোগীরা ৪২৬৫টি সভা করেছে বলে সরকারের কাছে খবর আছে। কোনো কোনো সভায় হিংসাত্মক প্রচারও করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সুভাষচন্দ্র বসুর উপর পুলিশি অত্যাচার, ভগৎ সিং ও রাজগুরুর ফাঁসি, হিজলি জেলে পুলিশের গুলিচালনা, গান্ধী-আরউইন চুক্তি, গোল-টেবিল বৈঠক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা ও বিতর্ক হয়। ৪২-এর 'ভারত-ছাড়ো আন্দোলন নিয়ে বিধানসভায় অনেক সময়ই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ফজলুল হক-মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের পর বিধানসভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি ৪২-এর আন্দোলন দমনে সরকারের স্বৈরাচারী নীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পদচ্যুত হওয়ার পর ফজলুল হক বিধানসভায় অভিযোগ করেন, সমস্ত রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে গভর্নর হারবার্ট ৪২-এর আন্দোলন দমনে পুলিশকে যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রয়োগের

আদেশ দিয়েছিলেন। এইসব বিবৃতি, প্রশ্ন, বিতর্ক ইত্যাদি সেই সময় প্রবল রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

মদ ও মাদক দ্রব্য নিয়ে বিধানসভায় প্রায়ই শাসকদের সঙ্গে ভারতীয় সদস্যদের বাদানুবাদ হতো। সরকারি রাজস্বের এক মোটা অংশ তখন আদায় হতো আবগারি শুল্ক থেকে। ১৮৯৭ ছিল দুর্ভিক্ষের বছর কিন্তু ঐ বছরই সরকারি শুল্ক আদায় হয় সবচেয়ে বেশি। আফিমেরও বহুল প্রচলন ছিল ঐ সময়। ভারতীয় সদস্যরা গরিব মানুষের মদ্যপানে উৎসাহ যোগানোর জন্য সরকারের সমালোচনা করতেন। সরকারি জবাব হতো, মানুষের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বাড়ছে, অত্যধিক মদ্যপান তারই প্রকাশ। গুরুপ্রসাদ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, বালকৃষ্ণপ্রসাদ সহায়, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, অখিলচন্দ্র দত্ত বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করে সরকারী নীতির সমালোচনা করতেন। দারিদ্রপীড়িত মানুষ মদ্যপানের মধ্যে তাদের দুঃখদুর্দশা ভুলতে চায় বলে সদস্যরা অনুযোগ করতেন। আনন্দমোহন বসু সরকারেব প্রতি আবেদন জানান, জনগণের নৈতিক অবনতি ঘটিয়ে সরকার যেন রাজকোষ পূর্ণ না করেন। বিহারের কৃষ্ণপ্রসাদ সহায় অভিযোগ করেন, ছোটনাগপুরের আদিবাসী জনগণকে সরকার অত্যন্ত সফলভাবে মাদকপণ্যের পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত করে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতীয় সদস্যদের সমবেত বাধ্যদানের ফলে সরকার অনেকটা নতিস্বীকার করেন, মাদক দ্রব্যের প্রচলন খানিকটা রোধ করা সম্ভব হয়।

বাংলা, বিশেষ করে কলকাতায় শিশু মৃত্যুর অত্যধিক হার সম্বন্ধে সদস্যদের বিভিন্ন সময় বিধানসভায় উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায়। রাজা মহেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরীর উত্থাপিত এক প্রশ্ন থেকে জানা যায় কলকাতায় ঐ সময় শিশু মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৩১। অন্যত্র তা আরও বেশি। সরকার থেকে জানানো হয় শিশুমৃত্যু সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে সরকার বাংলা, হিন্দি ও ওড়িয়া ভাষায় প্রচারপত্রের ব্যাপক প্রচলনের চেষ্টা করেছেন কিন্তু জনসাধারণের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। প্রচারপত্রগুলো কেউ পড়েও দেখেনি বলে সরকার থেকে অনুযোগ করা হয়।

শিক্ষা ও শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাবলী পরিষদীয় কার্যবিবরণীতে চিরদিনই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। উচ্চশিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে, না প্রাথমিক শিক্ষা অগ্রাধিকার পাবে এ নিয়ে বিধানসভায় ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বিতর্ক হতে দেখা যায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজেট বক্তৃতা থেকে জানা যায়, ১৮৯৪-৯৫ সালে বাংলা সরকার শিক্ষাখাতে মাথাপিছু ব্যয় করতেন মাত্র ৭ পাই। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও অন্যান্য খ্যাতনামা ভারতীয় অধ্যাপক কম যোগ্যতাসম্পন্ন ইউরোপীয় অধ্যাপকের চেয়ে অনেক কম বেতন পান বলে ভারতীয় সদস্যরা অভিযোগ করেন। সহশিক্ষার যৌক্তিকতা নিয়েও বিধানসভায় আলোচনা হয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এক সময়

সহশিক্ষার প্রবল বিরোধী ছিলেন বলে বিধানসভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ আছে। প্রাক্-স্বাধীনতা আমলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বিশেষ করে সরকারি অনুদান পাওয়ার ব্যাপারে। পূর্ববাংলার বিধায়করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ আনতেন বিধানসভায়, অন্যদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থক সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেরাজ হাতে সরকারি অনুদান দেওয়া হচ্ছে বলে অনুযোগ করতেন।

সংস্কৃতি বিষয়ে উত্থাপিত প্রশ্ন নিয়ে বিধানসভার বাদানুবাদ চরম পর্যায়ে উঠতে দেখা যায়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কর্তৃক অভিনীত ৫৯টি নাটকের মুদ্রিত কপি, না থাকলে পাণ্ডুলিপি অন্তত চেয়ে পুলিশ কমিশনার সংঘের সম্পাদককে চিঠি পাঠান। নাটকগুলির মধ্যে ছিল নীলদর্পণ, গোরা, মহেশ, শুকসারি, মৃত্যু নাই, যুদ্ধ চাই না, মনজিল, ধরতি কি লাল, পদধ্বনি, ঢেউ, ছেঁড়া তার, নবান্ন, উলুখাগড়া, পথিক, চার অধ্যায় ইত্যাদি। মণিকুন্তলা সেন ১০ নভেম্বর, ১৯৫৩ এ-বিষয়ে বিধানসভায় এক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এ নিয়ে বিধানসভায় তুমুল কাণ্ড ঘটে, সদস্যরা জানতে চান, নীলদর্পণ, মহেশ, গোরা, চার অধ্যায় ইত্যাদির বিষয় কি পুলিশ কমিশনারের জানা নেই? ডাঃ রায় জানান মূল নাটকের কোনও কিছু পালটানো হয়েছে কি না সেটা দেখার জন্যই চিঠি দেওয়া হয়েছে। জ্যোতি বসু ও বিধান রায়ের মধ্যে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি চলে অনেকক্ষণ। জ্যোতি বসু বলেন, বিধান রায় হিটলারের মত কথা বলছেন। বিধান রায় উত্তর দেন তিনি স্টালিনের প্রশ্নের জবাবই দিচ্ছেন।

মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক অধিকারের বিষয় বিধানসভায় কয়েকবারই উত্থাপিত হতে দেখা যায়। ১৯৩৭ সালে মহিলারা প্রথম বিধানসভায় নির্বাচিত হন। পাঁচজন নির্বাচিত মহিলা বিধায়কদের মধ্যে ছিলেন বেগম ফারহাত বানু, হেমপ্রভা মজুমদার, মীরা দত্তগুপ্তা, হাসিনা মুরশেদ ও মিস বেল হার্ট (অ্যাংলো ইন্ডিয়ান)। হাসিনা মুরশেদ, মীরা দত্তগুপ্তা, মিস বেল হার্ট, হেমপ্রভা মজুমদার সকলেই ছিলেন কৃতী বিধায়ক। শেষোক্ত জন তাঁর ঋজু স্পষ্ট ভাষণের জন্য সুবিদিত ছিলেন। তাঁর বক্তব্য থেকে তৎকালীন বিধানসভার রাজনৈতিক বিন্যাস সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। যেমন ১৯৩৮-এর বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, "গত আট মাস যাবৎ এই কক্ষে খোদা ও ভগবানের মধ্যে যে টানাটানি চলছিল গড দূরে বসে তা বেশ উপভোগ করছিলেন।"[১৪] হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষে ইউরোপীয়দের অবস্থানই তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে জয়ী হন ছ'জন মহিলা। এঁরা হলেন আনওয়ারা খাতুন, হুসেন আরা বেগম, নেলী সেনগুপ্তা, বীণা দাস, আশালতা সেন ও মিসেস ই. এম. রিকেট। বাংলায় মহিলাদের ভোটাধিকার (নির্বাচিত হওয়ার নয়) দেওয়া হয় ১৯২৬ সালের নির্বাচন থেকে। বোম্বাই, মাদ্রাজ

ও বিহারে অবশ্য এর আগেই মহিলাদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। বাংলায় এ নিয়ে দীর্ঘদিন বিতর্ক চলে। ১৯২১ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিধায়ক এস. এম. বসু মহিলাদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি জানিয়ে এক প্রস্তাব বিধানসভায় আনেন। প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল বঙ্গীয় নির্বাচন বিধির ৭নং ধারার বিলুপ্তি ঘটিয়ে মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া। নীতিগতভাবে মহিলাদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি এবং এর বাস্তব রূপায়ণের জন্য কর্মপন্থা গ্রহণের সুপারিশ জানিয়ে বিধায়ক বসু সদস্যদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান, তাঁরা যেন যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এই প্রস্তাব বিবেচনা করেন। কারণ শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষেও এই প্রস্তাব তাৎপর্যপূর্ণ। দর্শক গ্যালারিতে এদিন মহিলাদের উপস্থিতি ছিল সর্বাধিক। কয়েকজন সদস্য বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করায় সভাপতি বিধায়কদের সাবধান করে দিয়ে বলেন, বক্তারা যেন গ্যালারির দিকে লক্ষ্য রেখে বক্তব্য না রাখেন।

এস. এম. বসু আদমসুমারির তথ্য পরিবেশন করে বিধানসভাকে জানান প্রতি একশো জন মহিলার মধ্যে মাত্র একজন শিক্ষিত। তিনটি যুক্তি তিনি দেন। প্রথমত ভারতবাসীর পক্ষে স্বরাজলাভ কখনো সম্ভব হবে না যদি মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। দ্বিতীয়ত, মহিলাদের ভোটাধিকার দিলে তাঁরা নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হবেন এবং শিক্ষিত হওয়ার দিকে মেয়েদের প্রবণতা বাড়বে, এতে সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ হবে। তৃতীয়ত, মাতৃত্ব ও মমতার গুণে মহিলারা যে-কোনও কঠিন কার্য সম্পাদনে সক্ষম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। মহিলাদের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি দেখানো হয় দীর্ঘ বক্তৃতায় বিধায়ক বসু তা খণ্ডন করেন। তিনি উল্লেখ করেন, মহিলারা নিজেদের উদ্যোগেই মন্টেগু-চেমসফোর্ড এবং ফ্র্যানচাইজ কমিটির কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন ; কলকাতা, বগুড়া, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পাবনা, দার্জিলিং, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি করেছেন, ভোটাধিকারের বিষয়ে সোচ্চার হয়েছেন। বেশ কিছু মুসলমান মহিলাও রক্ষণশীলতার আবরণ ভেঙে এগিয়ে এসেছেন বলে তিনি বিধানসভাকে জানান। পরিশেষে প্রস্তাবক আশা প্রকাশ করেন, দেশ ও সমগ্র জাতির কথা মনে রেখে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান সব সদস্যের সমর্থনে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পাস হবে।

এস. এম. বসুর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভোটাধিকার নিয়ে বিধানসভায় দীর্ঘ আলোচনা হয়। বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাব আসে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি যোগেশচন্দ্র ঘোষ গ্র্যাজুয়েট মহিলাদের মধ্যে ভোটাধিকার সীমিত রাখার প্রস্তাব আনেন। আনন্দচন্দ্র দত্ত (চট্টগ্রাম) মনে করেন, অন্তত ম্যাট্রিকুলেট না হলে মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া সঙ্গত নয়। এক আবেগময়ী বক্তৃতায় ইসলামের অনুশাসন উদ্ধৃত

করে ফজলুল হক বলেন, ইসলাম পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী, ডঃ আবদুল্লাহ মোমিন সুরাবর্দী, যতীন্দ্রমোহন মৈত্র ও অন্যান্য সদস্য সদস্যরা রিজিয়া, গুলবদন, নূরজাহান, মমতাজমহল, চাঁদবিবি, অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, রাণী শরৎসুন্দরী, মহারাণী স্বর্ণময়ী, এমনকি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে এস. এম. বসুর প্রস্তাব সমর্থন করেন। তবে যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁদের সংখ্যাই ছিল বিধানসভায় বেশি। বিরোধীদের বক্তব্য ছিল মোটামুটি এই রকম, (১) মহিলারা শিক্ষিত নন, কাজেই ভোটাধিকারের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন না, (২) পর্দাপ্রথা ভেঙে মুসলমান মহিলারা ভোট দিতে আসবে না, (৩) গৃহের শান্তি ব্যাহত হবে, (৪) সন্তানরা মায়ের সেবা ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হবে, (৫) "সহধর্মিণী কোনোমতেই সহভোটিনী হতে পারেন না।" (শিবশেখরেশ্বর রায়)।

প্রস্তাব ভোটে দিলে পর ৩৭-৫৬ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। যাঁরা বিপক্ষে ভোট দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শিবপ্রসাদ রায়, বিজয়প্রসাদ সিংহরায় এবং হাসান সুরাবর্দী প্রমুখ বিধায়ক। লক্ষণীয়, সুরাবর্দীরা প্রথমে প্রস্তাব সমর্থন করেও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসেন। ডঃ আবদুল্লাহ মোমিন সুরাবর্দী কিন্তু প্রস্তাবের পক্ষেই ভোট দেন। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলাদের ভোটাধিকার সুপারিশ করে ঐ গোষ্ঠীর নেতা মিঃ স্টার্ক বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পেশ করেন কিন্তু ভোটে এই প্রস্তাবও পরাজিত হয়।[১৫]

১৯২৩ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল আলোচনার সময় মহিলাদের ভোটাধিকারের বিষয় আবার বিধানসভার সামনে আসে। বিলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্পোরেশন নির্বাচনে মহিলাদের ভোট দেওয়ার সুপারিশ করেন। প্রাথমিক আলোচনার পর বিলটি সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো হয়। সিলেক্ট কমিটির সুপারিশে মহিলাদের ভোটাধিকার সমর্থন করা হয়। আলোচনার স্তরে দেখা যায় সমর্থক ও বিরোধীদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান এবং ভোটেও তা প্রতিফলিত হয়। যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রিষিন্দ্রনাথ সরকার, হেমচন্দ্র নস্কর, অমূল্যধন আড্ডি, হামিদউদ্দিন খাঁ প্রমুখ সদস্য। প্রস্তাবের পক্ষে ৩৩, বিপক্ষে ৩৩ ভোট পড়ে।[১৬] সভাপতি প্রস্তাবের পক্ষে নির্ণায়ক ভোট দেওয়ার পর প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বাংলার মহিলারা ভোটাধিকার পান। তবে ভোটাধিকার দেওয়া হলেও ভোটার হওয়ার জন্য যে সব শর্ত আরোপ করা হয় তার মধ্যে প্রধান ছিল সম্পত্তির অধিকারিণী হওয়া। এর ফলে মহিলাদের ভোটাধিকার নিতান্ত প্রহসনে পরিণত হয়। ১৯৩২ সালে ইন্ডিয়ান ফ্রেনচাইজ কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন তা থেকে জানা যায় ঐ সময় বাংলায় প্রতি ২৬ জন পুরুষ ভোটারে ছিলেন ১ জন মহিলা, মাদ্রাজে ১০ জনে ১ জন, বোম্বাইয়ে ১০ জনে ১ জন, বিহারে ৬২ জনে ১ জন এবং আসামে ১৪৪ জন পুরুষ ভোটারের মধ্যে ১ জন মহিলা।[১৭] ১৯৩৭-এর নির্বাচনে মহিলাদের ভোটাধিকার অনেকটা প্রসারিত

হয় এবং বিভাগপূর্ব বাংলায় নির্বাচিত মহিলা বিধায়কদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে দেখা যায়। হাসিনা মুরশেদ ছিলেন সংসদীয় সচিব, কংগ্রেস সদস্যা হেমপ্রভা মজুমদারকে সমীহ করে চলতেন সরকারি দল। মীরা দত্তগুপ্তা, বীণা দাস, নেলি সেনগুপ্তা, আশালতা সেন ও মিস বেলহার্ট বিধানসভার বিতর্ক, আলোচনা ইত্যাদিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন।

শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র বিধানসভায় যথাযথভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ১৯৩৭-এর আগে অবশ্য শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত কোনও সদস্য বিধানসভায় আসেননি। মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইনের ফলে ১৯২০ সালে পুনর্গঠিত বিধানসভায় শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী মনোনীত হন। শেষোক্ত জন দীর্ঘদিন বিধানসভার সদস্যও ছিলেন কিন্তু শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মামুলি কিছু প্রশ্ন উত্থাপন, প্রস্তাব পেশ করা ছাড়া বিধানসভায় তাঁকে কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় শ্রমিক ধর্মঘট, কর্মবিরতি, মজুরি ইত্যাদি নিয়ে বিধানসভায় এক প্রশ্ন উত্থাপন করে ধর্মঘট মীমাংসার ব্যাপারে সরকারের মনোভাব জানতে চান। সরকার থেকে জানানো হয়, দু'দিন ধর্মঘট চলার পর শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় কাজে যোগ দিয়েছেন। ১৯১৩ ও ১৯১৬ সালেও শ্রমিকদের ধর্মঘট নিয়ে বিধানসভায় বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে দেখা যায়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় পূর্ববঙ্গের কুলি ও রেলকর্মীদের ধর্মঘট নিয়ে বিধানসভায় তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ১৯২২ সালে ঝরিয়ায় অনুষ্ঠিত সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন নিয়েও বিধানসভায় আলোচনা হয়। উল্লেখ্য, ঝরিয়া অধিবেশনে স্বরাজের দাবি সমর্থন করা হয়, লন্ডনের ব্রিটিশ ব্যুরো অব দি রেড ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠায়। ঝরিয়া অধিবেশনকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী বিধানসভায় যে প্রস্তাব আনেন তাতে তিনি রাজনৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীকে যুক্ত করার নিন্দা করেন এবং লালজুজুর সন্ত্রাস সম্বন্ধে সরকারকে সাবধান করে দেন।[১৮] রায়চৌধুরীর অপর এক প্রশ্ন থেকে জানা যায়, ১৯২২-এর এপ্রিল থেকে ১৯২৩-এর মার্চ মাসের মধ্যে বাংলায় মোট ৮৬টি ধর্মঘট হয়। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য একটি শিল্পবোর্ড গঠনের প্রস্তাব করলে বিধানসভায় তা প্রত্যাখ্যাত হয়।[১৯] কিন্তু ১৯২০-২১ সালের আট মাসে বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে মালিকদের যে ৩৬ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয় তা কীভাবে পূরণ করা যায় তার জন্য বিধানসভা একটি কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। স্পষ্টত তা করা হয় মালিকশ্রেণীর স্বার্থে। সরকারি প্রেসে ১৯২৯ সালে শ্রমিকদের এক সার্বিক ধর্মঘট হয়। স্বরাজীরা এই ধর্মঘটের প্রসঙ্গ বিধানসভায় উত্থাপন করেন এবং যেভাবে সরকার শ্রমিকদের

ন্যায্য দাবি অস্বীকার করে দমননীতির আশ্রয় নিয়েছেন সে বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব আনেন। প্রায় সব সদস্যই তা সমর্থন করেন। তবে ইউরোপীয় সদস্যরা এর বিরুদ্ধে ভোট দেন।[২০] নাগপুর রেলওয়ে স্টেশনে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর জেলাশাসকের নির্দেশে গুলিবর্ষণ করা হলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্বরাজী সদস্যরা "শ্বেতাঙ্গ পুঁজিপতিদের" স্বার্থরক্ষার জন্য গুলিবর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। সরকারপক্ষ থেকে অবশ্য বলা হয়, পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে বাধ্য হয়ে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। বিশ ও তিরিশের দশকে সারা ভারত এবং বাংলায় যেভাবে শ্রমিক আন্দোলনের প্রসার ঘটেছিল বিধানসভায় তা তেমনভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়নি।

১৯৩৭ এর নির্বাচনের পর শিল্প ও শ্রমিকের সমস্যা নিয়ে বিধায়কদের খুব তৎপর হতে দেখা যায়। পাটশিল্প, কয়লা শিল্প সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন ও প্রস্তাব বিধায়করা উত্থাপন করেন। ১৯৩৭-এ শ্রমিককেন্দ্র থেকে বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি বিধানসভায় নির্বাচিত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আফতাব আলি, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জে. এন. গুপ্ত (রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়ন), আবদুল মোতালেব মালিক, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় (কমিউনিস্ট), লিটা মুণ্ডা সরদার (চা বাগান) এবং এম. এ. জামান। নীহারেন্দু দত্তমজুমদারও রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। শ্রম বাজেট মঞ্জুরি উপলক্ষে শ্রমিকদের কিছু দাবি মেনে নিতে এঁরা সরকারকে বাধ্য করেন। যুদ্ধের সময় উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারপক্ষ থেকে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শুরু হয় ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই, বিশেষ করে সূতাকল ও চটকল শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস পায়। কাশীপুর গানশেল ফ্যাক্টরি থেকে আট হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হন, ম্যাথমেটিকেল ইনস্ট্রুমেন্ট অফিসের কর্মীসংখ্যা ১০ হাজার থেকে ৮ হাজারে হ্রাস করা হয়। চা-বাগান শ্রমিকরা অবর্ণনীয় শোষণের শিকার হন। দার্জিলিং থেকে নির্বাচিত সদস্য ডাম্বের সিং গুরুং চা-বাগান শ্রমিকদের দুর্বিষহ জীবনযাত্রার চিত্র বিধানসভায় তুলে ধরেন। শ্রমবাজেট নিয়ে আলোচনায় প্রতি বছরই সরকারের সমালোচনায় বিধায়কদের মুখর হয়ে উঠতে দেখা যায়।

স্বাধীনতা-উত্তর বিধানসভায় শ্রমিক কৃষকের সমস্যা নিয়ে প্রতিটি অধিবেশনেই প্রশ্ন-প্রস্তাব-বিতর্ক ইত্যাদি উত্থাপিত হতে দেখা যায়। রণেন সেনের এক প্রশ্নের জবাবে শ্রমমন্ত্রী কালীপদ মুখার্জি জানান ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শিল্পে মোট ৬,০৪,১৯০ জন শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। এর মধ্যে চটকলগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক, আড়াই লাখের বেশি। ১৯৫২ সালে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬,২২,৮০৬ সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয় ব্যবসার মন্দা বাজার, র‍্যাশনালাইজেশন, "ন্যাচারাল ওয়েস্টেজ" বা বার্ধক্যজনিত অবসর ইত্যাদি।

মণিকুন্তলা সেনের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৫৩ সালে বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত নারীশ্রমিকদের সংখ্যা সম্বন্ধে তথ্য দেওয়া হয়।

	১৯৫০	১৯৫১	১৯৫২	১৯৫৩
রেলওয়ে ওয়ার্কশপ	৩৩৪	২৩১	৩৩৬	২৩৮
চালকল	৬৮৩৪	৬২৬০	৫৩৮৮	৭২৫৩
চা	৬৪৫৩	৬০১৫	৫৩৯৫	৫২০২
সূতাকল	১৩৬৯	১৫৬১	১৭৬২	১৬৩৪
চটকল	৩৫৯৬১	৩৩৭৬৬	৩১০১৭	২৬৪৭৬
কাগজকল	৩৯৬	৩৬৪	২৭০	২২৬
মেটাল রিফাইনিং	১৪৮১	১৫৮২	১৫৫৩	১২০৫
মেটাল ফাউন্ড্রি	২৫৩	২৭১	২৪০	২০৫
অন্যান্য শিল্প	৩৯০২	৪৩৫৯	৩৯১২	৫১২৫
মোট	৫৬৯৮৩	৫৪৪০৯	৪৯৮৭৩	৪৭৫৬৪

শ্রমিকের চেয়ে কৃষকের সমস্যা সম্বন্ধেই বিধানসভাকে বিশেষভাবে সোচ্চার হতে দেখা যায়। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে বেশ কিছু সদস্য নির্বাচিত হন যাঁদের সঙ্গে গ্রামবাংলার ও কৃষকসমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এঁরা নিজেদের "কৃষকের নিজের লোক" বলে দাবি করতেন। বিধানসভায় এরা অভিযোগ করতেন, কৃষক "শুধু চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়",[২১] মন্ত্রীদের সাবধান করে দিয়ে বলতেন, "কৃষি ও কৃষক যদি থাকে পদতলে, সে দেশ নিশ্চয়ই জেনো যাবে রসাতলে।" বড়লোক মন্ত্রীরা অত্যন্ত নিপুণভাবে দরিদ্র কৃষককে শিক্ষার ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন, এই অভিযোগ এনে এবং এর প্রতিবিধান দাবি করে বিধানসভায় সদস্যরা প্রস্তাব আনতেন। প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রচলনে সরকারের গড়িমসি বিষয়ে বিধায়ক সৈয়দ আহমদ বলেন, "বাংলার অজ্ঞ, মুর্খ, কৃষক জনসাধারণ লেখাপড়া শিক্ষা করে তাদের অধিকার আদায় করুক জমিদার, তালুকদার, মহাজন, এবং ধনিক বণিকের অত্যাচার হ'তে নিজেদের রক্ষা করুক এবং রাজদরবার দখল করে কৃষক সন্তানরা মন্ত্রীদের সঙ্গে শামিল হয়ে বসুক এটা বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী চায় না। সেজন্যই রাজা মহারাজাদের হাইস্কুল এবং কলেজে সরকার সাহায্য বিতরণ করে আর কৃষক-সন্তানদের লেখাপড়া শেখাবার কোনও বন্দোবস্ত এই মন্ত্রীমণ্ডলী করতে চায় না।"[২২] কৃষক আন্দোলন নিয়েও বিধানসভায় বিভিন্ন সময় আলোচনা হতে দেখা যায়। ক্যানেল কর নিয়ে বিতর্কের উল্লেখ আমরা পূর্বে করেছি। বর্ধমানের ক্যানেল অঞ্চলে একর প্রতি সাড়ে পাঁচ টাকা কর ধার্যের প্রতিবাদে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির যৌথ

উদ্যোগে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিধানসভায় এ বিষয়ে এক মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ১৯৩৮-এ এই আন্দোলন দমন করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের নির্দেশে গাড়োয়ালী আর গোরা সৈন্য পাঠানো হয়। বিধানসভায় প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, এম. এ. জামান, হেমপ্রভা মজুমদার, অদ্বৈতকুমার মাঝি প্রমুখ সদস্য সাধারণ প্রজা ও কৃষকের দুরবস্থা এবং কর প্রদানে অক্ষমতার কথা জানান। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় বলেন, "প্রজা গভর্নমেন্টের প্রথম বন্দুকের নিশানা হচ্ছে আজ দুঃখী কৃষক প্রজা।" হেমপ্রভা মজুমদার, অদ্বৈতকুমার মাঝি পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর অত্যাচার ও দমননীতির সমালোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত সরকার ২ টাকা ৯ আনায় কর নামিয়ে আনতে বাধ্য হন।[২৩]

তেভাগা আন্দোলন নিয়েও বিধানসভাকে সোচ্চার হতে দেখা যায়। উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ চাষীর প্রাপ্য, এই দাবিতে ১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বর্গাদার ও আধিয়ারদের যে অভ্যুত্থান ঘটে ব্যাপ্তি ও গভীরতায় কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা ছিল অনন্য। অপূর্ব আত্মত্যাগে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৬-৪৭-এর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষক ঐক্যবদ্ধভাবে জোতদার-জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। আহত সমিরুদ্দিনকে বাঁচাতে গিয়ে জোয়ান সাঁওতাল কৃষক শিবরাম পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেয়, মুসলমান ক্ষেতমজুর চিয়ার শাহীর পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশের আক্রমণ প্রতিহত করার সময় কৃষক-জননী যশোদা মৃত্যুবরণ করে। কৃষক চেতনার সংগ্রামী অভিব্যক্তির বর্ণনা দিয়ে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, "পূর্ববর্তী শত শত বৎসর ধরে যে কৃষক ছিল নির্বাক, মূক, একটি শ্লোগানের ধ্বনিতে আজ সে রূপান্তরিত। মুষ্টিবদ্ধ হাত কপালের দিকে তুলে কৃষক যখন তাঁর সঙ্গীকে 'ইনকিলাব কমরেড বলে সম্বোধন করে তখন এক অদ্ভুত ভীতিমিশ্রিত শিহরণ সৃষ্টি হয়।[২৪] বিধানসভায় কয়েকবারই জ্যোতি বসু এই আন্দোলন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, কংগ্রেস নেত্রী বীণা দাসও সরকারের সমালোচনা করেন। মুসলিম লীগ বিধায়ক আকবর আলি পুলিশি নির্যাতনের নিন্দা করে বিবৃতি দেন। অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা খগেন দাসগুপ্ত আন্দোলন দমনে সরকারি নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে অনুযোগ করেন। কমিউনিস্ট নেতা রূপনারায়ণ রায়কে নির্দয়ভাবে প্রহার করার জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিধায়করা দাবি জানান। মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বনের অভিযোগ আনেন।[২৫]

১২ মার্চ ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে জ্যোতি বসু অভিযোগ করেন, সরকারের পুলিশ আইনশৃংখলা লংঘন করছে, কৃষকদের বাড়ি ভাঙছে, মহিলাদের অসম্মান করছে, শিশুদের হত্যা করছে। তিনি বলেন, "আমি

নিশ্চিত, দিনাজপুরের সমিরুদ্দিন ও শিবরামের মতো যে সব কৃষক তেভাগার জন্য জীবন দিয়েছেন তাদের রক্ত ব্যর্থ হবে না। পুলিশ-বুলেটে বিদ্ধ হয়েও এইসব লোকদের বলতে শোনা গেছে 'জান দেব তবু ধান দেব না।"[২৬] এর ক'দিন পরে পুলিশ বাজেটের আলোচনায় জ্যোতি বসু আবার তেভাগা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, ৪০ জন কৃষক ইতিমধ্যে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন। তিনি জানতে চান, ক'জন জোতদার নিহত হয়েছে? মৈমনসিংহের জেলাশাসক বাস্তিনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ এনে তিনি তার অপসারণ দাবি করেন। অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে সুরাবর্দী বিধানসভাকে জানান, তেভাগা অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে তিনি অজস্র টেলিগ্রাম পাচ্ছেন যাতে জোতদারদের ধান ও সম্পত্তি লুণ্ঠনের উল্লেখ আছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় এক বিস্তৃত বিবৃতিতে সুরাবর্দী বলেন দিনাজপুর, মৈমনসিং, জলপাইগুড়ি জেলায় তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অরাজকতা চলছে, জোর করে জমি চাষ করা হচ্ছে। কৃষকরা নিজস্ব আদালত গঠন করেছে। বিশেষ করে ঠাকুরগাঁও মহকুমা ও হাজং অঞ্চলে কৃষকদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের উল্লেখ করে আরও কঠোর হস্তে আন্দোলন দমন করা হবে বলে তিনি হুমকি দেন।[২৭] কংগ্রেস নেত্রী বীণা দাস বিতর্কে অংশ নিয়ে বলেন, সুরাবর্দী সমস্ত শক্তি দিয়ে কৃষক আন্দোলন দমন করার হুমকি দিচ্ছেন অথচ পুলিশ ও বাস্তিনের মতো জেলাশাসক যে গুরুতর অন্যায় করে চলেছেন সে বিষয় তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকছেন। হাজং-এর জিজাতলা গ্রামে পুলিশের আক্রমণে একজন মহিলা ও তাঁর তিন বছরের শিশু নিহত হয়েছে বলে বীণা দাস অভিযোগ আনেন। জেলাশাসক বাস্তিনকে এর জন্য তিনি দায়ী করেন। বিতর্কের জবাবে সুরাবর্দী বিধানসভাকে জানান, পুলিশকে বাধ্য হয়েই গুলি চালাতে হয়েছে। বাস্তিনের অপসারণও তিনি বাতিল করে দেন।[২৮]

তেভাগা আন্দোলন বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিত হওয়ার ফলে মুসলিম লীগ সরকারও শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে ফ্লাউড কমিশনও তেভাগা দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু জমিদার ও জোতদারদের চাপে শেষ পর্যন্ত বিলটি ধামাচাপা পড়ে যায়। সুরাবর্দী জ্যোতি বসুকে জানান, তিনি জানতেন না যে তার দলে এত জোতদার রয়েছে।"[২৯]

বিল প্রকাশের ফলে তেভাগা আন্দোলনের সংগঠকদের মধ্যে বেশ খানিকটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। নেতৃত্বের মধ্যে আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব দেখা দেয় ; পুলিশি নির্যাতন ও দেশবিভাগের ফলে তেভাগা আন্দোলন ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

বিধানসভার কার্যবিবরণীতে সাধারণ মানুষের সমস্যা-জর্জরিত জীবনেও এক পূর্ণাঙ্গ চিত্রও পাওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফজলুল হক, অম্বিকাচরণ মজুমদার, সৈয়দ আহমেদ, অসিমুদ্দিন আহমদ, হেমপ্রভা মজুমদার, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, রাজীবুদ্দিন তরফদার প্রমুখ অসংখ্য বিধায়ক সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনের

সমস্যা বিধানসভায় তুলে ধরতেন। প্রথমদিকে ফজলুল হক ও সুরেন্দ্রনাথকেই এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা যায়। ১৯০০-১৯০১-এর বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, নির্দিষ্ট আয়ের মানুষরা অর্থনৈতিক চাপে প্রায় দেউলিয়া হতে বসেছে তার উপর কারো যদি একাধিক বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকে তাহলে একমাত্র ঈশ্বরই তাকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। সুরেন্দ্রনাথের দাবিতেই সরকার ৫ টাকা মাসিক বেতনের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ১ টাকা মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। সাধারণভাবে তখন ১ টাকায় ১২ সের চাল পাওয়া যেত। সরকার থেকে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করে বলা হয়, সরকার কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী যদি দেখা যায় ১ টাকায় ১২ সের চাল পাওয়া যাচ্ছে না তবেই মহার্ঘভাতা বাড়বে, অন্যথায় নয়।

অন্ন ও বস্ত্রের অভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা প্রায়ই সরকারের নজরে আনতেন বিধায়করা। বাখরগঞ্জের একটি গ্রামে একদিনে দু'জন ব্যক্তি অনাহারের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন বলে রাধাচরণ পাল বাহাদুর অভিযোগ করেন। শস্যভাণ্ডার ও হাট লুট এবং দাঙ্গা চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, রংপুর, যশোর, খুলনা ও চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে ৮৫৯ জন লোক ঐ সমস্ত হাঙ্গামায় জড়িত থাকার ফলে শাস্তি পান বলে দাবি করা হয়। বিধানসভায় সদস্যদের উত্থাপিত প্রস্তাব থেকে জানা যায়, এই অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের বছরগুলিতেও কলকাতা বন্দর থেকে প্রচুর চাল বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। বিধায়ক রাধাচরণ পাল তাঁর প্রস্তাবে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী কর্তৃক পরিবেশিত তথ্য উদ্ধৃত করে কলকাতা বন্দর থেকে চাল রপ্তানির হিসেব উল্লেখ করেন। বিধায়ক শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, অবাধ বাণিজ্য নীতি জনসাধারণকে এমন এক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে যে তাঁরা আর নির্বিকার চিত্তে বসে থাকতে পারছেন না। তিনি অভিযোগ করেন, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি যেমন মুষ্টিমেয় লোককে ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতি করে তুলেছে, তেমনি একই সঙ্গে বাংলার অধিকাংশ মানুষকে অনাহারের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তিনি ১৯০৬ এবং ১৯১৯-এর মূল্যস্তরের নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান বিধানসভায় পেশ করেন।[৩০]

	১৯০৬			১৯১৯		
প্রতি মণ	টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই
চাল	১	০	০	৯	০	০
ডাল	৪	৮	০	১২	৮	০
ময়দা	৫	৯	০	১২	০	০
ঘি	৪০	০	০	৯০	০	০
সরিষার তেল	১৫	০	০	৪০	০	০

তিনি আরও বলেন, "অলীক কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ স্বপ্নেও শায়েস্তা খাঁর আমলে ফিরে আসার কথা ভাবতে পারে না যখন টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত।" সরকারকে খাদ্যশস্য রপ্তানি বন্ধ করার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ী ও মুনাফাখোরদের কঠোর হস্তে দমন করার দাবি জানান তিনি।

সরকার পরিসংখ্যান তত্ত্বের জটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয় বলে মনে করেন এবং অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার না করলেও মূল্যবৃদ্ধি একটি বিশ্বব্যাপী ঘটনা— এই অজুহাতে কোনও প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণকে এড়িয়ে যান।[৩১] লক্ষণীয়, মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণে সরকারের অসম্মতির কথা বিধানসভাকে জানানো হয়। কয়েকজন ভারতীয় সদস্যের সমর্থনের ফলে সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকে এবং ভোটে মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা ও দারিদ্র্যের কথা সবচেয়ে বেশি উত্থাপন করতেন ফজলুল হক, অসিমুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ আহমদ ও মুসলিম বিধায়করা। মুসলিম লীগের আনোয়ারা খাতুন বিধানসভায় তাঁর বক্তৃতায় বলেন, সাধারণ মানুষ যখন চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে রয়েছেন, মুসলিম লীগ নেতারা তখন বিলাসবহুল জীবনযাপন করছেন। তিনি খলিফা ওমর, সুলতান নাসিরুদ্দিন প্রমুখের সহজ, সরল জীবনযাত্রা ও ইসলামের মহান আদর্শের কথা নেতাদের মনে করিয়ে দেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী গান্ধীবাদী নেত্রী আশালতা সেন সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন, এই মন্ত্রিসভা বাংলার হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আদিবাসীদের সমস্যা নিয়েও বিধানসভায় তৎপর ছিল। এই অবহেলিত জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার দাবি অনেকবারই করেছেন সদস্যরা। বাঁকুড়ার ছাতনা থেকে নির্বাচিত আদিবাসী বিধায়ক একাধিকবার আদিবাসী প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, "আদিবাসী সমস্যা জাতীয় সমস্যা। এরা যদি পিছিয়ে পড়ে থাকে তাহলে বাংলাদেশ কখনও শক্তিশালী হতে পারবে না। তারাই প্রথমে জঙ্গল থেকে বাঘ-ভালুক তাড়িয়ে ও জঙ্গল সাফ করে ফসলের জমি তৈরি করে। কিন্তু, কালক্রমে তারা সেই সমস্ত জমি থেকে বুদ্ধিমান লোকের চক্রান্তে ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেউ কেউ ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়, কেউ কেউ ভাগচাষ করে। কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও মদ্যপান ওদের অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে।" তিনি সহানুভূতির সঙ্গে আদিবাসী সমস্যা বিবেচনা করতে সকলের কাছে আবেদন জানান। গ্রামীণ নিঃস্ব মানুষের দুর্বিষহ জীবনের এক করুণ চিত্র আমরা পাই মালদহ থেকে নির্বাচিত আদিবাসী সদস্য বীর বিরশার বক্তব্যে। বিরশার বক্তৃতার পূর্ণ বয়ান :

"আমি গরিব মানুষ, এই এসেম্বলি হাউসে এসেছি গরিবদের পক্ষ থেকে, তাই তাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলব মনে করছি, কিন্তু কি বা

জানি যে বলব?

"আমি অতি সাধারণ মানুষ তাই সাধারণভাবে কথা বলছি, যেমন কাঁচা ছেলে না কাঁদলে খাবার পায় না, তেমনি চাষীরা লজ্জায় তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা প্রকাশ না করলে কিছু পায় না।

"আমরা ছেলেবেলা থেকে কষ্ট করে আসি কিন্তু সুখসুবিধা পাই না। আমরা গরিব মানুষ। খাবারের অভাবে সকালে উঠে পচাপুকুরে রক্তকমলের গেঁড়ো আর বনকচু আর বনআলুর সন্ধানে বার হই। আমরা এই খেয়ে কোনোরকমে জীবজন্তুর মতো বেঁচে আছি কিন্তু কেউ আমাদের দেখে না। আমাদের না আছে স্কুল, না আছে কবিরাজ। বিপদে আপদে কেউ আমাদের দেখে না, জিজ্ঞাসাও করে না।

"মালদহের এস ডি ও বা সার্কেল অফিসার যদি আমাদের ওখানে যান, আমাদের দেখতে পান না কারণ দিনের বেলায় কেউ বাড়ি থাকে না। কেউ যায় রক্তকমলের গেঁড়ো তুলতে, কেউ যায় বনকচু তুলতে। কারণ এই তো তাদের বেঁচে থাকার সম্বল। অফিসাররা ফিরে এসে রিপোর্ট দেন আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।

"এখন আমরা কাপড় চোপড় নুন তেল ইত্যাদির জন্য কত কষ্ট পাচ্ছি তার কথা কি আর বলব?

"মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানাচ্ছি যে আমাদের অনেকের বাড়িতে গরু বলদ আছে কিন্তু জমি নাই, চাষের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই আমরা নিরুপায় হয়ে ঐ বনকচু আর বনআলুর উপর নির্ভর করে আছি। আমাদের গরিবদের উপর যাতে আপনারা একটু নজর দেন তাই এই অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি আমাদের নিজের গভর্নমেন্ট আমাদের না দেখে তাহলে সে গভর্নমেন্ট থাকবে কেন? আজ এই বলে আমি শেষ করলাম।"[৩২]

গরিব চাষী ও সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বারবারই বিধানসভায় উত্থাপিত হয় কিন্তু প্রতিকার লাভে ব্যর্থ হয়। প্রধানত সরকারি দলের ঔদাসীন্য ও বিরোধিতার জন্য। সিউড়ি থেকে নির্বাচিত প্রজাসমাজতন্ত্রী সদস্য মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় ২ মার্চ ১৯৬০ রাজ্যপালিকার ভাষণের ওপর এক সংশোধনী এনে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে চাষীকে শোষণ করার বিষয় ভাষণে যুক্ত করার আবেদন জানিয়ে বলেন, "স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ দ্বাদশ বছর অতিক্রান্ত হইলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র চাষীগণের নিকট হইতে তাহাদের উৎপন্ন ফসল ক্রয় করিবার কালে ধান চাউলের মিল-মালিক ও আড়তদারগণ "ঢলতা"-র নামে আইনসম্মত ওজনের অতিরিক্ত পরিমাণ ধান্য আদায় করে এবং ব্যবসায়ীগণ "ঈশ্বরবৃত্তি"র নামে অর্থ আদায় ও সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই দুই প্রথার মাধ্যমে চাষী ও জনসাধারণ উৎপীড়িত হয় এবং উহা বন্ধ অথবা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন।" তিনি আরও বলেন,

"অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী ফজলুল হক যেমন জমিদারগণ কর্তৃক প্রজার নিকট "তহুরী" প্রভৃতি বাজে আদায় আইন অনুসারে দণ্ডনীয় করিয়া গিয়াছেন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে মিল-মালিক ও ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক "ঢলতা" অথবা "ঈশ্বরবৃত্তি" বন্ধ কিম্বা নিয়ন্ত্রণ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন।"

বিধানসভায় সংশোধনী গৃহীত হয় না। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন পি এস পি, কমিউনিস্ট ও অন্য বামপন্থী দল ; বিপক্ষে কংগ্রেস। ৭২-১৩১ ভোটে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।[৩৩]

সপ্তদশ অধ্যায়

উত্তর কথা

শতবর্ষ পরবর্তী বিধানসভা ঃ কংগ্রেস প্রাধান্যের অবসান বামপন্থীদের অগ্রগতি

শতবর্ষের পর বিধানসভার চার দশক অতিক্রান্ত হতে চলেছে। সদস্যসংখ্যা কিছুটা বেড়েছে, তবে বিধায়কদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি মোটামুটি অপরিবর্তিত আছে। লাঙল-ঠেলা চাষী, হাতুড়ি-পেটা শ্রমিক বিধায়কের সংখ্যা এখনও এক আঙুলে গোনার মধ্যেই সীমিত রয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণ পালটেছে, বিধানসভার গুরুত্ব বেড়েছে কিন্তু জনমানসে বিধানসভার উজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রান্তসীমায় এসে ঠেকছে।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হয় ন'টি, এর মধ্যে দু'টি মধ্যবর্তী নির্বাচন। তিনবার হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন থেকে অষ্টম সাধারণ নির্বাচনের পূর্ববর্তী দশ বছর (১৯৬৭-১৯৭৭) পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ছিল উত্তাল। এই পর্বে সরকার বদল হয় পাঁচ বার, অন্তত দু'বার সাংবিধানিক বিধি উপেক্ষা করে, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে। প্রথমবার ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার সুযোগ না দিয়ে ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা এবং দ্বিতীয়বার ১৯৭১ সালে বিধানসভায় মাত্র পাঁচ সদস্যের বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করায় নৈতিকতাহীন রাজনীতি চরম পর্যায়ে পৌঁছয়। এই পুরো এক দশক পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে চলছিল চরম অস্থিরতা। এই পর্বের রাজনৈতিক পর্যালোচনাকে সেজন্য সালতামামি না বলে কালতামামি বলাই সঙ্গত। পশ্চিমবঙ্গের এই দশ বছরের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ঃ এক, কংগ্রেস দলের একাধিপত্যের অবসান, দুই, কমিউনিস্ট দলের বিভাজনজনিত দলীয় ও বামপন্থী আন্দোলনের সমস্যা এবং তিন, অনুল্লেখ্য গণসমর্থন পেয়েও রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তির নির্ণায়ক ভূমিকা।

এই এক দশকে কংগ্রেস বিভক্ত হয় দু'বার। প্রথম বিভাজনে আত্মপ্রকাশ ঘটে বাংলা কংগ্রেসের, দ্বিতীয় নব ও আদি কংগ্রেস "আর" এবং কংগ্রেস "ও"-র। ১৯৭৭-এ আবার এক নতুন কংগ্রেসের স্বল্পকালীন অভ্যুদয় ঘটে জগজীবন রামের নেতৃত্বে, বাংলায় বিজয় সিংহ নাহারের সভাপতিত্বে। ১৯৬৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট দল বিভাজনের পর সি পি আই ও সি পি আই এম-এর মধ্যে তিক্ততা ক্রমশ শত্রুতার

রূপ নেয়। "দক্ষিণপন্থী" "সংশোধনবাদী" বলে সি পি আই আখ্যায়িত হয় সি পি আই এম-এর কাছে, আর "বাম বিচ্যুতি" ও "আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের শত্রু" হিসেবে সি পি এম পরিগণিত হয় সি পি আই-এর কাছে। কমিউনিস্ট দলের বিভাজন এইখানেই থেমে থাকে না। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি গ্রামে হিংসাত্মক কৃষক আন্দোলনের মধ্য থেকে জন্ম নেয় নকশাল আন্দোলন। জঙ্গল সাঁওতাল, চারু মজুমদার, কানু সান্যাল হয়ে ওঠেন কিংবদন্তী নায়ক। গেরিলা যুদ্ধ, কৃষি বিপ্লব, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা, চীনের চেয়ারম্যান ভারতের চেয়ারম্যান, আইনসভা শুয়োরের খোঁয়াড়, সশস্ত্র অভ্যুত্থান ইত্যাদি স্লোগান এবং কৃষক গেরিলা বাহিনী গঠন দিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয় তার পরিণতি ঘটে মূর্তিভাঙা, ব্যক্তিহত্যা ইত্যাদি দিয়ে। অনেক তাজা তরুণ আদর্শবাদী যুবক, আত্মত্যাগে উজ্জ্বল ছাত্র বুদ্ধিজীবী শ্রমিক কৃষকের এক অংশকে আবিষ্ট করে রাখে নকশাল আন্দোলন। শ্রেণী শত্রুর চেয়েও তিন কমিউনিস্ট দলের লোকেরা একে অন্যকে প্রধান শত্রু বলে গণ্য করতে থাকেন।

রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে অর্থনৈতিক সঙ্কট যুক্ত হয়ে সমাজজীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসে। বিদ্যুৎ ঘাটতি, শহরাঞ্চলে বেকারের সংখ্যাধিক্য, গ্রামে ভূমিহীন কৃষকের কর্মহীনতা, খাদ্য সংকট সবকিছু মিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও শিল্প অর্থনীতি, তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সত্ত্বেও সংকটের মধ্যেই রয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা দরকার, তৃতীয় বিধানসভার প্রায় শুরুতেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু কংগ্রেস পরিষদীয় দলকে আরও নিষ্প্রভ ও হীনবল করে দেয়। বিধান রায়ের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব এই দু'য়ের কাছেই নতুন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ছিলেন একান্তভাবে নিষ্প্রভ। কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি বেড়ে চলে, অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেনের হুগলী গোষ্ঠীর সঙ্গে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনার কংগ্রেস কর্মীদের উপদলীয় দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। বিভাজন সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের গণভিত্তি মোটামুটিভাবে অটুট থাকে। বিধানসভায় বিরোধীপক্ষের আধিপত্য সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলকে অনেকটা স্তিমিত করে রাখে। শক্তিশালী বিরোধী পক্ষের তোপের মুখে কংগ্রেস দলের অবস্থা সময় সময় কাহিলই মনে হয়। লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্য সংকটের জন্য প্রফুল্ল সেনের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। মূল্যমানের (খুচরো) সূচক ১৯৫০ সালে ১০০ ধরে দেখা যায় ১৯৬৬ সালে তা ১৮৯-এ পৌঁছেছে। সরকারী ধানচাল সংগ্রহের পরিকল্পনা এতো ত্রুটিপূর্ণ ছিল যে বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার এক-তৃতীয়াংশও সংগৃহীত হয় না। রেশনিং ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ে। কর্ডনিং প্রথার ফলে সংকট আরও বেড়ে যায়। কালোবাজারি, মুনাফাখোরেরা এর সুযোগ নেয়। খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল, পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের

সংঘর্ষ ঘটতে থাকে। পুলিশের গুলিতে বসিরহাটে নিহত হন কিশোর নুরুল ইসলাম, অন্যত্রও বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী। ১৯৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা ও কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুরা দাঙ্গার শিকার হন। দাঙ্গা দমনে প্রশাসনিক ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়।

ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় কংগ্রেস রাজনীতিতেও পরিবর্তন আসে। কংগ্রেসের কুশলী নেতা ও মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী কামরাজ নাদারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদত্যাগ করেন এবং দলীয় কাজের দায়িত্ব পান। পশ্চিমবঙ্গে সেচমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হন। কিন্তু কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের অবসান হয় না। জাল সদস্য, দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্মলেন্দু দে-র সঙ্গে সভাপতির বিরোধ শুরু হয়। অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা নির্মলেন্দু দে-কেই সমর্থন করেন। কুমার সিং হলে অনুষ্ঠিত সভায় বিরাট ভোটে অজয় মুখার্জির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়। সুশীল ধাড়া প্রমুখ কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে তিনি বাংলা কংগ্রেস গঠন করেন। কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনের ফলে বামপন্থীরা দুই শিবিরে বিভক্ত হন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেস ২৮০টি আসনেই প্রার্থী দেয়। কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হওয়ার ফলে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী মোর্চা গঠন সম্ভব হয় না, পূর্ববর্তী তিনটি নির্বাচনে যা হয়েছিল। সি পি আই এম-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট বা ইউ এল এফ ; সি পি আই বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লককে নিয়ে গঠন করে প্রগতিশীল সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট বা পি ইউ এল এফ। নির্বাচনে কংগ্রেস পায় ১২৭টি আসন, ইউ এল এফ ৬৮ ও পি ইউ এল এফ ৬৫। নির্বাচনের পর দুই ফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় হন মুখ্যমন্ত্রী। শিল্পবিরোধে শ্রমিকের "ঘেরাও"-এর অধিকারের স্বীকৃতি সংক্রান্ত ভুল সিদ্ধান্ত (পরে প্রত্যাহৃত) সত্ত্বেও উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন ইত্যাদি কিছু কর্মসূচী যুক্তফ্রন্ট সরকার নেয় এবং জনসমর্থনও পায়। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই খাদ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৯ জন সহকর্মী সহ পদত্যাগ করেন। রাজ্যপাল ধরমবীর মন্ত্রিসভা স্থিরীকৃত দিনে অজয় মুখোপাধ্যায়কে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার সুযোগ না দিয়ে ২১ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করেন। কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে প্রফুল্ল ঘোষ গঠিত মন্ত্রিসভাও তিন মাসের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারে না। ২৯ নভেম্বর বিধানসভার অধিবেশনে অধ্যক্ষ বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বিভাগ-পূর্ব বাংলার নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভাকে অবৈধ ঘোষণা করে নৌশের আলি যে রুলিং দেন তার নজির টেনে বলেন রাজ্যপাল কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রীর পদচ্যুতি অসাংবিধানিক ও অবৈধ। রুলিং-এ অধ্যক্ষ স্পষ্ট করে দেন, মন্ত্রিসভা সংখ্যালঘিষ্ঠ,

কি সংখ্যালঘিষ্ঠ নয়—এ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে পারে একমাত্র বিধানসভা, রাজ্যপাল বা অন্য কেউ নয়। ১৯৬৮-র ২০ ফেব্রুয়াবি ঘোষ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে, পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে হয় পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে এইভাবে বরখাস্ত করায় সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হন এবং তা প্রতিফলিত হয় পরবর্তী নির্বাচনে। নির্বাচনে ৭০ শতাংশ ভোট পড়ে। ১৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পায় ২১৪টি আসন (সমর্থিত নির্দল সহ), কংগ্রেস পায় ৫৫টি আসন। অজয় মুখোপাধ্যায় হন মুখ্যমন্ত্রী, জ্যোতি বসু উপমুখ্যমন্ত্রী। ভূমিসংস্কার কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিধানসভায় ভূমিসংস্কার সংশোধনী বিল পেশ করা হয়। ঘেরাও নীতি ইতিপূর্বেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়ন আইন সংশোধনী বিল বিধানসভায় পাস হওয়ার পর দু'শোর বেশি শ্রমবিরোধের মীমাংসা হয়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করার কথাও হয়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে মন্ত্রিসভার অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসে পড়ে। নিজ সরকারকে "বর্বর" আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় কলকাতার কার্জন পার্কে ৫ দিন অনশন সত্যাগ্রহ করেন। সি পি আই এম মন্ত্রিসভা ভাঙার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের অভিযোগ আনে। এ অভিযোগের যে ভিত্তি ছিল তা প্রকাশ পায় অনশন পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে বিজয় সিংহ নাহারের বক্তব্যে। নাহার লিখেছেন, "আমরাও সেখানে (কার্জন পার্কে) গিয়েছিলাম। অজয়দার সঙ্গে নিভৃতে কিছু আলোচনাও করেছিলাম। পরে একদিন ঠিক হলো তাঁর সঙ্গে প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের যোগাযোগ হওয়া দরকার। রাজনৈতিক নন এমন আমার এক বন্ধু ক্যামাক স্ট্রিটে থাকতেন। অজয়দাকে সেখানে বিকেল ৩টার সময় যেতে বললাম। আমি আর প্রফুল্লদা অনেক আগেই সেখানে পৌঁছেছিলাম। আমাদের গাড়ি সেখানে রাখিনি। যাতে পুলিশ বা অন্য কেউ বুঝতে না পারে। সেখানে কিছুক্ষণ আলোচনা হয়েছিল। পরে আবার বিশদ আলোচনার জন্য আর একদিন ঠিক করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীকে লুকিয়ে আনা আর পৌঁছনো খুবই শক্ত ব্যাপার। তবুও করতে হয়েছিল। একদিন রাত্রে অজয়দাকে নিয়ে বারাসাতে তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে আনা হবে। সেখানে প্রফুল্লদা সহ আমরা কয়েকজন থাকব, বিশদ আলোচনা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে পুলিশ পাহারা এবং জ্যোতি বসু পুলিশমন্ত্রী থাকায় খুবই কড়া পাহারা ছিল। আমরা ঠিক করলাম যে অজয়দা শাড়ি পরে তাঁর বাড়ির ঝিয়ের মত সেজে রাত দশটায় বেরুবেন। কাছেই আমার ছেলে রতনকে গাড়ি নিয়ে রাখা হয়েছিল। অজয়দা শাড়ি পরে বড় ঘোমটা দিয়ে খালি পায়ে নেমে বেরিয়ে এসেছিলেন। পুলিশ গার্ডরা ধরতেই পারেনি। সেই রাত্রে উনি বারাসাতে এলেন এবং আমাদের সব প্ল্যানিং হয়ে গেল। তিনি পদত্যাগ করে মন্ত্রিসভা ভেঙে দেবেন এবং পরে বামফ্রন্টের সঙ্গে কোনও রকম

যোগাযোগ রাখবেন না। অধিক রাত্রে এইভাবে তাঁকে পৌঁছে দেওয়া হলো। অবশ্য গাড়ি তাঁকে অনেক দূরে নামিয়ে দিয়েছিল। এ বিষয়ে পুলিশ গার্ডরা কিছুই জানতে পারেনি। আলোচনা অনুসারে অজয়দা মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন।"[১]

১৬ মার্চ, ১৯৭০ অজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন। আবার এক বছর চলে রাষ্ট্রপতি শাসন। রাষ্ট্রপতি শাসনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়। সন্ত্রাস, গুপ্তহত্যা বেড়েই চলে, বর্ষীয়ান ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসু খুন হন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ষষ্ঠ বিধানসভার (অন্তর্বর্তী) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। যুক্তফ্রন্ট তখন দুই শিবিরে বিভক্ত। সি পি আই এম সহ ছয় পার্টি জোট। সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি নিয়ে আট পার্টি জোট। নির্বাচনে কংগ্রেস পায় ১০৫, সংযুক্ত বামপন্থী জোট ১২৩, আট পার্টি জোট ২৫টি আসন। বাংলা কংগ্রেসের ফল হয় শোচনীয়, মাত্র ৫টি আসন পায় বাংলা কংগ্রেস। অজয় মুখোপাধ্যায় বরানগর কেন্দ্রে জ্যোতি বসুর নিকট ১১ হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। সি পি আই পায় ১৩টি আসন। নির্বাচনে এটাও প্রমাণিত হয় যে কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজনের পরে গণসমর্থন সি পি আই এমের দিকেই গেছে। কারণ, কংগ্রেসের সঙ্গে নৈকট্যের নীতি পশ্চিমবঙ্গের বাম-মনোভাবাপন্ন মানুষ মেনে নিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ সহ কয়েকটি দলকে নিয়ে কংগ্রেসই মন্ত্রিসভা গঠন করে। অজয় মুখোপাধ্যায়ই হন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বেশিদিন জোড়াতলি দিয়ে সরকার চালানো সম্ভব হয় না। তিন মাসের মধ্যেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিধানসভায় সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। এই অবস্থায় ২৯ জুন বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি শাসনের আওতায় আসে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মৌলনীতির বিরোধী বলে এর বিলুপ্তিরও দাবি করছেন রাজনীতিবিদ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞরা। রাজনৈতিক প্রয়োজনে দলীয় স্বার্থে এই ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে অনেকবার। ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা বাতিল করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার মধ্যে এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজয় সিংহ নাহারের দেওয়া বিবরণ থেকে জানা যায়, অজয় মুখোপাধ্যায় সরকারের প্রতি বিধানসভার আস্থা নেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তিনি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, বিধানসভা ভেঙে দেওয়া দরকার। "ইন্দিরাজীও রাজী হলেন। তাঁর সচিবকে ডাকলেন। নিয়মানুসারে কী করে ভাঙা যায় আলোচনা হলো। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে বিধানসভা ভাঙার জন্য একটি চিঠি দেবেন। তার খসড়া (মুসাবিদা) সেখানেই তৈরি হলো। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান সেদিন দিল্লিতেই ছিলেন। তাঁকে

টেলিফোনে জানানো হলো, আপনি আজই কলকাতা ফিরে যান। বিধানসভা বাতিল করার জন্য তাঁকে কী কী কাজ করতে হবে তাও সচিব মহোদয় জানিয়ে দিলেন।"[২] এইভাবেই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের নির্দেশে দলীয় স্বার্থে রাজ্যপাল পরিকল্পনা অনুযায়ী বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রচলন করলেন। তৃতীয় রাষ্ট্রপতি শাসনের সময়েই পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসের পরিধি আরও প্রসারিত হয়, কাশীপুরের গণহত্যায় ৪০ জন নিহত হন।

১৯৭২-এর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সপ্তম সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমূর্তি অনেকটা উজ্জ্বল হয়। "গরীবী হটাও" স্লোগানও বহু মানুষকে আকৃষ্ট করে। কংগ্রেস একাই পশ্চিমবঙ্গে পায় ২১৭টি আসন। কিন্তু সন্ত্রাস, দমন পীড়ন, দুর্নীতি ও নির্বাচনী কারচুপির অভিযোগ এনে সি পি আই এম এবং আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক সহ সব বামপন্থী দল (সি পি আই ছাড়া) "সাজানো আইনসভা" বয়কট করে। ১৯৭৫ সালে ২৬শে জুন মধ্যরাতে সারাদেশে অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা (৩৫২ ধারা) ঘোষণা করে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রায় স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের পর ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ২০০১ পর্যন্ত পরবর্তী ৫টি নির্বাচনে এই ধারা অব্যাহত আছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্মের পর্যালোচনা করে ভারতীয় ও বিদেশী লেখক ও গবেষকদের বেশ কিছু বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে, লেখাজোখা হয়েছে বিস্তর। প্রশংসা ও সমালোচনা দুই আছে ; সরকার ও বামফ্রন্টের কর্মসূচীর মূল্যায়নে "সংসদীয় সাম্যবাদের" অগ্রগতির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অতুল কোহলি দেখিয়েছেন, কীভাবে সাংবিধানিক পরিমণ্ডল এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে সি পি আই এম ও বামফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কার, ভূমিহীনদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষকে সংগঠিত করে রাজনৈতিক প্রভাব ও কর্তৃত্ব প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বিত্তবান ও সম্পত্তির অধিকারীদের নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, বিত্তহীন মানুষ বহুলাংশে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছে বলে কোহলি মনে করেন। এই প্রবণতার যথাযথ উপলব্ধি এবং তার রূপায়ণ পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের সাফল্যের উৎস, কোহলির এই বক্তব্য সম্বন্ধে মতানৈক্য থাকতেই পারে কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।[৩]

এই দুই দশকে বিধানসভার অধোগতি এবং সংসদীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত উদ্বেগ কিন্তু ক্রমশ বেড়েই চলছে। অস্বীকার করা যায় না, অষ্টম থেকে দ্বাদশ

বিধানসভা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও জনহিতকর আইন প্রণয়ন করেছে; বিধানসভাকে এড়িয়ে অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে খুব সীমিত ক্ষেত্রে। কেন্দ্রীয় সংসদের আদলে ১৯৯৩ সালে প্রবর্তিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিষয়ভিত্তিক কমিটি সংসদ কাঠামোর ক্ষেত্রে এক নতুন সংযোজন বলে বিশেষজ্ঞ মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। সরকার ও বিরোধী পক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত এইসব কমিটি যথাযথভাবে কার্যকর হলে বিধানসভার বৈধতা ও প্রাসঙ্গিকতা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে।[৪] তবে প্রতি অধিবেশনেই বিধানসভায় নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে চলছে যেমন পিস্তল (খেলনা) দেখিয়ে ত্রাস সঞ্চার, মহিলা সদস্য সম্বন্ধে অশালীন উক্তি, বোমাতঙ্ক, কারণে-অকারণে অধ্যক্ষের রুলিং নিয়ে আপত্তি, ওয়াক-আউট, রাজ্যপালের ভাষণে বাধাদান ইত্যাদি। সরকার পক্ষের সদস্যদের মধ্যেও সহনশীলতার অভাব লক্ষ করা যায়। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অনুপস্থিতি, কোরামের অভাবে অধিবেশন বন্ধ ইত্যাদিতে অধ্যক্ষকে অনেক সময়ই অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্বভাবতই সাধারণ মানুষ বিধানসভা সম্বন্ধে উদাসীন, বীতশ্রদ্ধ। বিধানসভা নিয়ে গণমাধ্যমের বক্রোক্তিরও বিরাম নেই। এক সময় সারা ভারত বাংলার আইনসভার দিকে তাকিয়ে থাকত ; প্রবলভাবে অনুকরণযোগ্য ছিল বাংলার আইনসভা। বহু সংসদীয় রীতিনীতির প্রচলন হয় বাংলায়, বাংলার অধ্যক্ষদের অনেক রুলিং এখনও সংসদ পরিচালনার নির্দেশিকা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বিধানসভার বর্তমান বেহাল অবস্থা মনে রেখে বলা যায়, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিধানসভার প্রাসঙ্গিকতা অনাদৃত থাকবে না যদি সরকার ও বিরোধী, উভয়পক্ষ স্বীকৃত সংসদীয় রীতিনীতি মেনে চলে। আইনসভার ভবিষ্যৎ কাঠামো নিয়েও চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। পঞ্চায়েত পর্যায়ে ক্ষমতার যথাযথ বিকেন্দ্রীকরণ হলে ত্রিস্তরীয় আইনসভার—কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানিক—প্রস্তাবও ইতিমধ্যে উত্থাপিত হয়েছে।

টীকা

কথাসার

১. ১৮৬১ সালের ভারত শাসন আইনে গভর্নরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, "শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সির বাংলা বিভাগের জন্য একটি আইন পরিষদ গঠনের।"

২. অমৃতবাজার পত্রিকা (৩০ ডিসেম্বর, ১৯২০) প্রকাশিত এক পত্রলেখকের চিঠি :

"The Lost Leader"

I am sending you, Mr. Editor, a copy of the poem, a no more appropriate greeting than which, I believe, could be addressed to the erstwhile leader of Bengal.

"Just for a handful of silver, he left us, just for a riband to stick in his coat, found the one gift of which fortunes bereft us."

৩. অশোক মিত্র, তিন কুড়ি দশ ১৯১৭-১৯৪০, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ৮২

৪. মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ২২২

প্রথম অধ্যায়

১. বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় সংবিধান বিশেষজ্ঞ গ্র্যানভিল অস্টিনের গবেষণালব্ধ পুস্তকের ঃ গ্র্যানভিল অস্টিন, ওয়ার্কিং এ ডেমোক্রেটিক কনস্টিটিউশন ঃ দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স ঃ নিউদিল্লি, ১৯৯৯, পৃঃ ৭৭১

২. কে পি জয়সওয়াল, হিন্দু পলিটি (কলকাতা, ১৯২৪), পৃঃ ৪০-৪৮

৩. "এই প্রকৃতিপুঞ্জ কাহারা? প্রকৃতির অভিধাগত অর্থ প্রজা। কিন্তু বাংলার তৎকালীন সমস্ত প্রজাবর্গ অর্থাৎ জনসাধারণ সম্মিলিত হইয়া গোপালকে রাজা নির্বাচন করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। কেহ কেহ মনে করেন, প্রকৃতি অর্থ রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কর্মচারী এবং গোপালকে রাজা নির্বাচন তাহারাই করিয়াছিলেন। এই মতও সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, সেই নৈরাজ্যের যুগে বাংলাদেশে পরস্পর বিবাদমান অনেকগুলি রাষ্ট্রের আধিপত্য, কোন্ রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কর্মচারীরা একত্র হইয়া এই নির্বাচন করিয়াছিলেন? একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের ব্যাপার হইলে হয়তো এইরূপ নির্বাচন সম্ভব হইতে পারিত। যেমন একবার কাশ্মীরে হইয়াছিল তৃতীয় শতকে জলৌকের ক্ষেত্রে। সমস্ত প্রজাবর্গের সম্মিলিত নির্বাচনও সেই নৈরাজ্যের যুগে সম্ভব ছিল না, তাহা হইলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামন্তনায়কদের সঙ্গে প্রজাবর্গের একটা প্রবল বিরোধের ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যাইত। বরং মনে হয়, এই সমস্ত সামন্ত- নায়কেরাই বহু বৎসর নৈরাজ্য ও মাৎস্যন্যায়ে উৎপীড়িত হইয়া শেষ পর্যন্ত সকলে একত্র হইয়া এই

নির্বাচন কার্যটি নিষ্পন্ন কবিযাছিলেন।" অধ্যাপক নীহাববঞ্জন বায, বাঙালীব ইতিহাস আদিপর্ব (কলিকাতা, ১৯৮০), পৃঃ ৫০০

৪ লর্ড ব্রাইস, দ্য আমেবিকান কমনওযেলথ, ভল্যুম ১ : (লন্ডন, ১৮৮৮), পৃঃ ১৯০-১৯৩

৫ এ বি লাওযেল, গভর্ণমেন্ট অ্যান্ড পার্টিস্ ইন কন্টিনেন্টাল ইউবোপ : (কেমব্রিজ, ১৮৯৬)

৬ ডেভিড ইস্টন, দ্য পোলিটিক্যাল সিস্টেম, এনকোযাবি ইনটু দ্য স্টেট অব পোলিটিক্যাল সাযেন্স, নিউ ইযর্ক, ১৯৫৩

৭ ডব্লিউ এইচ মবিস জোনস্, পার্লমেন্ট ইন ইন্ডিযা, (লন্ডন, ১৯৫৭)

—এল এম সিংভি, পার্লামেন্ট ইন ইন্ডিযান পোলিটিক্যাল সিস্টেম, কবেনবর্গ ও মুসেলফ সম্পাদিত লেজিসলেচাব ইন ডেভেলপমেন্ট পার্সপেকটিভ, (ডিউক ইউনিভার্সিটি, ১৯৭০), পৃঃ ১৭৯-২১৩

—এ আব মুখার্জি, পার্লামেন্টারি প্রোসিডিউব ইন্ ইন্ডিযা (কলকাতা, ১৯৬৭)

—আব কে ভবদ্বাজ : পার্লামেন্টাবি ডেমোক্রেসি অ্যান্ড লেজিসলেচাব, (দিল্লি, ১৯৮৩)

—এম এল কল অ্যান্ড এস এম শাকদেব, প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রোসিডিওব অব পার্লামেন্ট (নিউ দিল্লি, ২০০১)

৮ লাইব্রেবী অ্যান্ড বেফাবেন্স, বিসার্চ, ডক্যুমেন্টেশন অ্যান্ড ইনফবমেশন সার্ভিস, পার্লামেন্ট সেক্রেটাবিযেট : নিউদিল্লি

৯ রোজা লুক্সেমবুর্গ, সোশ্যাল ডেমোক্রেসি অ্যান্ড পার্লামেন্টাবিজম, ববার্ট লুকাব (সং) সিলেক্টেড পলিটিক্যাল বাইটিংস (নিউইযর্ক, ১৯৭৪), পৃঃ ১০৬-১১৬

১০ এবিক অলিন বাইট, ক্লাস ক্রাইসিস অ্যান্ড দ্য স্টেট (লন্ডন, ১৯৭৮), পৃঃ ১৮২-২০৭

১১ বালফ মিলিব্যান্ড, মার্কসিজম অ্যান্ড পলিটিক্স (অক্সফোর্ড, ১৯৭৭), পৃঃ ১৮০-১৯৫

১২ জোসেফ লাপালোমবাবা, পলিটিক্স উইদিন নেশনস্ (প্রেনিটিস হল, ১৯৭৪), পৃঃ ১১০ ১৫৭

১৩ ডি এ গাঁধোক, পার্লামেন্ট অব্ নার্ডক্য, দ্য জার্নেল অব পার্লামেন্টারি ইনফরমেশন, ভল্যুম ৩৭ নং ২, জুন ১৯৯২, নিউদিল্লী, পৃঃ ১৮০-১৮৫

১৪ হীবেন মুখার্জী, লোকসভা ইন ডিক্লাইন, দ্য স্টেটসম্যান, ৯ ৬ ১৯৮৬

১৫ লোকসভা ডিবেট, মার্চ ২১, ১৯৬৬

১৬ তদেব, নভেম্বব ১৮, ১৯৬৩

১৭ কে সি বাজোগি, পার্লামেন্ট অ্যাট ওযার্ক অ্যান এপ্রাইজেল, দ্য জার্নাল অব পার্লামেন্টাবি ইনফবমেশন, নিউদিল্লী, ভল্যুম ৩৭ নং ১, ১৯৯১ পৃঃ ৪০৩-৪০৫

১৮ ওযাদওযা ডি সি, প্রমালগেশন অব অর্ডিন্যান্স : এ ফ্রড অন দ্য কনস্টিটিউশন ১৯৮৩

১৯ ভারতেব সংবিধান পর্যালোচনাব জন্য সুপ্রীম কোর্টেব প্রাক্তন প্রধান বিচাবপতি এম এন বেঙ্কটচেলাইযাব সভাপতিত্বে ১১ সদস্যেব গঠিত কমিশন (ফেব্রুযাবি, ২০০০) কর্তৃক প্রচাবিত কনসালটেশন পেপারস (ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত)

২০. গ্রুন্ডগেসেটেজ বা "মৌল আইন" (জার্মান কনস্টিটিউশন) ইংরেজিতে অনূদিত ও ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. স্যর জর্জ ক্যাম্পবেল, মেমোয়রস্ অব মাই ইন্ডিয়ান কেরিয়ার. ভল্যুম ২ (লন্ডন, ১৮৯৩), পৃঃ ২০৮-২০৯

২. রজনী পাম দত্ত, ইন্ডিয়া টু ডে (কলকাতা, ১৯৭০), পৃঃ ৬০৩

৩. রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড (কলকাতা, ১৯৯০), পৃঃ ৩৪

৪. উইলিয়াম টেলর, ইন্ডিয়ান রিফর্ম—সাজেশন ফর দ্য কনসিডারেশন অব দ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট (লন্ডন, ১৮৭১), পৃঃ ৫

৫. ক্যাথলিন গফ, ইন্ডিয়ান পেজ্যান্টস্ আপরাইজিংস, এ আর দেশাই সম্পাদিত "পেজ্যান্টস্ স্ট্রাগলস্ ইন ইন্ডিয়া (১৯৭০) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, পৃঃ ৮৫-১২৬

৬. সি ই বাকল্যান্ড : বেঙ্গল আন্ডার দ্য লেফটেন্যান্ট গভর্নরস, ভল্যুম ১ ; (কলকাতা, ১৯০২), পৃঃ ১৯২

৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ; কলকাতা, ১৯৫৫, পৃঃ ২২৪-২২৫

৮. বিমানবিহারী মজুমদার, ইন্ডিয়ান পোলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড রিফর্ম অব লেজিসলেচার ১৮১৮-১৯১৭ (কলকাতা, ১৯৫৫), পৃঃ ৪০

৯. বিমানবিহারী মজুমদার, হিস্ট্রি অব পলিটিক্যাল থট ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ (কলকাতা, ১৯৩৪), পৃঃ ৪৪-৪৫

১০. বিমানবিহারী মজুমদার, ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড রিফর্ম অব লেজিসলেচার ১৮১৮-১৯১৭ (কলকাতা, ১৯৫৫), পৃঃ ৩২

১১. পি এন সিনহা রায় (সং) ক্রোনিকল অব দ্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ১৮৫১-১৯৫২ (কলকাতা, ১৯৬৫), পৃঃ ৯-১৯

১২. বি. বি. মজুমদার, তদেব, পৃঃ ৩৯৫

১৩. বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯৭৩), পৃঃ ৫৫১

১৪. এইচ এ. ডি ফিলিপস, ইন্ডিয়ান লেজিসলেশন অ্যান্ড লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, ক্যালকাটা রিভিউ, এপ্রিল, ১৮৮৯, পৃঃ ১৬, পুস্তিকাকারে মুদ্রণ (কলকাতা, ১৮৯০), পৃঃ ৪

১৫. পরবর্তীকালেও অনুরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন একাধিক ইংরেজ রাজপুরুষ। দ্রষ্টব্য, আর কারস্টেয়ার্স, দ্য লিটল ওয়ার্ল্ড অব অ্যান ইন্ডিয়ান ডিস্ট্রিক্ট অফিসার : লন্ডন, ১৯১২, পৃঃ ১৭২

১৬. বি. বি. মজুমদার, তদেব, পৃঃ ৩২০

১৭. মোহিনীমোহন রায়, ল অ্যান্ড লেজিসলেশন ইন ইন্ডিয়া (কলকাতা, ১৮৭০), পৃঃ ৮

১৮. প্রোসিডিংস অব দ্য কাউন্সিল অব দ্য লেফটেন্যান্ট গভর্নর অব বেঙ্গল ফর দ্য পারফস

অব মেকিং ল অ্যান্ড রেজুলেশানস ১৮৬২-১৮৬৪ (কলকাতা, ১৮৬৫) ভল্যুম ১, পৃঃ ১১২-১১৩, ৩৭৪

১৯. তদেব, পৃঃ ১৮৫-১৮৮

২০. তদেব, পৃঃ ১৯৬-২০১, ২৬১-২৭৮

২১. তদেব, ভল্যুম ২ পৃঃ ৯৪-৯৬

২২. তদেব, পৃঃ ১০৪-১০৭

২৩. তদেব, ভল্যুম ২৫, ১৮৯৩ পৃঃ ১৯৯

তৃতীয় অধ্যায়

১. ডব্লিউ এইচ মরিস জোনস্ : তদেব, পৃঃ ৪৫

২. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, এ নেশন ইন মেকিং (লন্ডন, ১৯২৫), পৃঃ ৫২-৫৫

৩. ভারত সচিবের কাছে লর্ড লিটনের গোপন চিঠি ; রজনী পাম দত্ত, তদেব, পৃঃ ৪৮৮

৪. তদেব, পৃঃ ৩১০

৫. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, তদেব, পৃঃ ৩৯

৬. তদেব, পৃঃ ৩৮৯

৭. ক্যালকাটা গেজেট, ১৮৯৩, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫২

৮. অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭) ঃ কলকাতা ১৩৯৭, পৃঃ ৬৯

৯. প্রশান্ত পাল, রবিজীবনী, পঞ্চম খণ্ড (কলকাতা, ১৩৯৭), পৃঃ ১৮৬

১০. অমলেশ ত্রিপাঠী, তদেব, পৃঃ ৫৮

১১. জে. এইচ ব্রুমফিল্ড, এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুর‍্যাল সোসাইটি (বোম্বাই, ১৯৬৮), পৃঃ ৩১

১২. পেপারস রিলেটিং টু দ্য কনস্টিটিউশন্যাল রিফর্ম ইন ইন্ডিয়া, ভল্যুম ১ (কলকাতা, ১৯০৮), পৃঃ ১-২১

১৩. তদেব, ভল্যুম ২, পৃঃ ৫৫০-৫৫৭

১৪. প্রোসিডিংস, ৪৪ ভল্যুম ১৯১২, পৃঃ ২৮০-২৮৮

১৫. তদেব, ভল্যুম ৪৫, ১৯১৩, পৃঃ ২-৪

১৬. তদেব, ভল্যুম ৪৫, ১৯১৩, পৃঃ ৫৭৬-৫৮১

১৭. বিপিনচন্দ্র পাল, নেশন্যালিটি অ্যান্ড এম্পায়ার, এ রানিং স্টাডি অব সাম কারেন্ট ইন্ডিয়ান প্রবলেমস (কলকাতা, ১৯১৬), পৃঃ ২২২-২২৩

১৮. তদেব, ভল্যুম ৫২, ১৯২০, পৃঃ ৯৪৮

১৯. ১২-১৬ ভোটে শেষ পর্যন্ত এই বিতর্কিত বিল পাশ হয়। যাত্রামোহন সেন, নিশিপুরের রাজা রণজিৎ সিং, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অপেকার প্রমুখ ছয়জন বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেন। প্রোসিডিংস ১৮৯৯, ভল্যুম ৩১, পৃঃ ১২২৮

২০. প্রোসিডিংস, ভল্যুম ৪৯, ১৯১৭, পৃঃ ৭২৩-৭৪২
২১. তদেব, ভল্যুম ৫২, ১৯২০, পৃঃ ৯৪৮
২২. তদেব, ভল্যুম ৫০, ১৯১৮, পৃঃ ২১৩-২১৮
২৩. তদেব, ভল্যুম ৫১, ১৯১৯, পৃঃ ২৫১-২৬২
২৪. ব্রুমফিল্ড, তদেব, পৃঃ ৯১-৯৪
২৫. প্রোসিডিংস, তদেব, ভল্যুম ৪৯, ১৯১৭, পৃঃ ১৫৮
২৬. তদেব, ভল্যুম ৪৮, ১৯১৬, পৃঃ ৪৩৫
২৭. ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ ১৪ মে ১৯১৫, ব্রুমফিল্ড উল্লেখিত, তদেব, পৃঃ ৮৩

চতুর্থ অধ্যায়

১. অমলেশ ত্রিপাঠী, তদেব, পৃঃ ৮৫
২. ব্রুমফিল্ড, তদেব, পৃঃ ১২৫-১২৭
৩. তদেব, পৃঃ ১২৮
৪. তদেব, পৃঃ ১৬০
৫. তদেব, পৃঃ ১২৮
৬. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তরী হতে তীর : কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৮৮
৭. প্রোসিডিংস ১৯২১, ভল্যুম ১, পৃঃ ৪-৮
৮. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, তদেব, পৃঃ ৩১৬
৯. প্রোসিডিংস ১৯২১, ভল্যুম ৫, পৃঃ ৫৩২-৫৩৩
১০. তদেব, ১৯২৩, ভল্যুম ১১, নং ২, পৃঃ ২৩৬
১১. তদেব, ১৯২৩ ভল্যুম ১১, নং ২, পৃঃ ১৮৩-২১৪
১২. তদেব, ১৯২৩ ভল্যুম ১১, নং ৪, পৃঃ ২১৫-২১৬
১৩. তদেব, ১৯২৩ ভল্যুম ১১, নং ৪, পৃঃ ২৩৭-২৪৩
১৪. তদেব, ১৯২২ ভল্যুম ৭, নং ৩, পৃঃ ২০৭-২৪৪
১৫. হানড্রেড ইয়ারস্ অব দ্য ইউনিভার্সিটি অব ক্যালকাটা (কলিকাতা, ১৯৫৭), পৃঃ ২৮৮-২৮৯
১৬. অজয় সি দত্ত, বেঙ্গল কাউন্সিল অ্যান্ড ইটস ওয়ার্ক (১৯২১-১৯২৩), ক্যালকাটা, ১৯২৩, পৃঃ ৪৫
১৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬১
১৮. প্রোসিডিংস, ১৯২২ ভল্যুম ৭, নং ১, পৃঃ ৫৪৪-৫৫৩
১৯. তদেব, ১৯২১ ভল্যুম ১, নং ৫, পৃঃ ২২৩
২০. পদ্মিনী সেনগুপ্ত, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত : দিল্লি, ১৯৬৮, পৃঃ ৪১-৪২
২১. তদেব, ১৯২১ ভল্যুম ৩, নং ১, পৃঃ ৩৮৩-৪২৭ এবং ১৯২১ ভল্যুম ৪, পৃঃ ৫৬০-৫৬৬

২২ তদেব, ১৯২১ ভল্যুম ৩, পৃঃ ৬৫৬-৬৩১
২৩ তদেব, ১৯২১ ভল্যুম ১, নং ১, পৃঃ ৬৬
২৪ তদেব, ১৯২১ ভল্যুম ১, নং ১, পৃঃ ১১৭ ১৪০
২৫ তদেব, ১৯২১ ভল্যুম ২, পৃঃ ৩ ৪৪
২৬ তদেব, ১৯২১ ভল্যুম ১, নং ৫, পৃঃ ১৯৬ ২০৬
২৭ তদেব, ১৯২২, ভল্যুম ৭, নং ১, পৃঃ ৪০৯-৪৮৭
২৮ অমৃতবাজাব পত্রিকা, ডিসেম্বব ৩০, ১৯২০
২৯ তদেব, এপ্রিল ১, ১৯২২
৩০ ব্রুমফিল্ড, তদেব, পৃঃ ১৯৮
৩১ প্রোসিডিংস, ১৯২২ ভল্যুম ৭, নং ১, পৃঃ ৪৭৩
৩২ তদেব, ১৯২১ ভল্যুম ৪, পৃঃ ২০৩
৩৩ নাযক, ডিসেম্বব ২৪, ১৯২০ ব্রুমফিল্ড উল্লেখিত, তদেব, পৃঃ ১৬৪
৩৪ সুবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, তদেব, পৃঃ ৩৬৮-৩৭৯
৩৫ ব্রুমফিল্ড, তদেব, পৃঃ ২০০ উল্লেখিত

পঞ্চম অধ্যায

১ বিচার্ড গর্ডন, নন-কোঅপাবেশন অ্যান্ড কাউন্সিল এনট্রি (১৯১৯ ২০), জন গ্যালাহাব, অ্যান্ড জনসন ও অনিল শীল (সং), লোক্যালিটি প্রভিন্স অ্যান্ড নেশন, ১৮৭০-১৯৪০ কেমব্রিজ, ১৯৭৩, পৃঃ ২১২৩-১৫৩
২ জওহবলালকে মতিলাল, অমলেশ ত্রিপাঠী উল্লেখিত, তদেব, পৃঃ ৯৫-৯৬
৩ এল এ গর্ডন, বেঙ্গল দ্য ন্যাশন্যালিস্ট মুভমেন্ট ১৮৭৬-১৯৪০ কলম্বিযা, ১৯৭৪, পৃঃ ১৭২
৪ জুডিথ ব্রাউন, গান্ধীজ বাইজ টু পাওযাব ইন ইন্ডিযান পলিটিক্স ১৯১৫-১৯২২, কেমব্রিজ, ১৯৭২, পৃঃ ২৭২
৫ বজতকান্ত বায়, সোশ্যাল কনফ্লিক্ট অ্যান্ড পলিটিক্যাল আনবেস্ট ইন বেঙ্গল ১৮৭৫ ১৯২৭, অক্সফোর্ড, ১৯৮৪, পৃঃ ২৪৬-২৪৭
৬ জে এইচ ব্রুমফিল্ড, তদেব, আইনসভা সম্বন্ধে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রলোকেব দুর্বলতা এবং আইনসভাকে কেন্দ্র কবে উচ্চাশা ব্রুমফিল্ডেব আলোচনায গুরুত্ব পেযেছে।
৭ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, দেশবন্ধু স্মৃতি, কলকাতা, ১৯২৬, পৃঃ ২৪০
৮ অমলেশ ত্রিপাঠী, তদেব, পৃঃ ১০১
৯ মান্দালয় জেল থেকে ৩ ৩,১৯২৬ তারিখে লিখিত সুভাষচন্দ্রেব পত্র, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, তদেব, পৃঃ ৫৫৪
১০ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, তদেব, পৃঃ ৩৩২
১১ তদেব, পৃঃ ৩৩১

১২. নায়ক ২৩ ও ২৭ জুলাই ১৯২২, বাংলার কথা ২২ ডিসেম্বর ১৯২২, ব্রুমফিল্ড উল্লেখিত, তদেব, পৃঃ ২৩১-২৩২
১৩. অমলেশ ত্রিপাঠী, তদেব, পৃঃ ১২১
১৪. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ভারত স্বাধীন হলো ঃ কলকাতা, ১৩৮৩, পৃঃ ২৯
১৫. তদেব, পৃঃ ৩৫
১৬. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, তদেব, পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯
১৭. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, ১৯৭০, পৃঃ ৪৯-৫০
১৮ দ্য স্টেটসম্যান, ডিসেম্বর ১, ১৯২৩
১৯. আর্ল অব লিটন, পণ্ডিতস্ অ্যান্ড এলিফেন্ট; লন্ডন, ১৯৪২, পৃঃ ৪৪
২০. জে এইচ ব্রুমফিল্ড, তদেব, পৃঃ ২৪৬-২৪৭
২১. বিজয় সিংহ নাহার, যা দেখেছি যা করেছি, কলকাতা, পৃঃ ৩০-৩১
২২. পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য
২৩ প্রোসিডিংস ১৯২৪, ভল্যুম ১৪, নং ১, পৃঃ ৩-৪
২৪. তদেব, ১৯২৪ ভল্যুম ১৪, নং ১, পৃঃ ৪৯-৫২, ৫৪-৯০
২৫. তদেব, ১৯২৪ ভল্যুম ১৪, নং ১, পৃঃ ১১৬-১১৭
২৬. তদেব, ১৯২৪ ভল্যুম ১৪, নং ২, পৃঃ ১৬
২৭. তদেব, ১৯২৪ ভল্যুম ১৪, নং ৫, পৃঃ ৬৯
২৮. তদেব, ১৯২৪ ভল্যুম ১৪, নং ৫, পৃঃ ১৫-১৮
২৯. লিটন, তদেব, পৃঃ ৪৯
৩০. প্রোসিডিংস, ১৯২৪, ভল্যুম ১৬, পৃঃ ৬৭
৩১. ঐ ভল্যুম ১৬, ১৯২৪, পৃঃ ৫৬
৩২. ঐ ভল্যুম ১৬, ১৯২৪, পৃঃ ৬৮-৬৯
৩৩. ঐ ভল্যুম ১৬, ১৯২৪, পৃঃ ৭১
৩৪. ঐ ভল্যুম ১৮, ১৯২৫, পৃঃ ৩-৮
৩৫. সুভাষচন্দ্র বসু, সমগ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ ৮১
৩৬. প্রোসিডিংস ভল্যুম ২৪, ১৯২৭, পৃঃ ২-৭
৩৭. ঐ ভল্যুম ২৪, ১৯২৭, পৃঃ ১৬-৫২
৩৮. ঐ ভল্যুম ২৬, ১৯২৭, পৃঃ ২৩১-২৬১
৩৯. ইন্ডিয়ান কোয়ার্টারলি রেজিস্টার, ভল্যুম ২ জুলাই-ডিসেম্বর ১৯২৭; গৌতম চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল ইলেকটোরেল পলিটিক্স অ্যান্ড ফ্রীডম স্ট্রাগল ১৮৬২-১৯৪৭, দিল্লি, ১৯৮৪, পৃঃ ৯৯
৪০. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, তদেব, পৃঃ ৩৬
৪১. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, তদেব, পৃঃ ৩৪৬
৪২. ঐ মান্দালয় থেকে ৩ মার্চ ১৯২৬ এ লিখিত চিঠি, পৃঃ ৫৫৩

৪৩. অমলেশ ত্রিপাঠী, তদেব, পৃঃ ১২৪
৪৪. আবুল মনসুর আহমদ, তদেব, পৃঃ ৫৪
৪৫. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, তদেব, পৃঃ ৩৬-৩৭
৪৬. প্রোসিডিংস ভল্যুম ১৪, নং ৪, ১৯২৪, পৃঃ ৫৫-১০৮
৪৭. আর্ল অব লিটন, তদেব, পৃঃ ৫২
৪৮. জে এইচ ব্রুমফিল্ড, তদেব, পৃঃ ২৭০-২৭২
৪৯. প্রোসিডিংস ভল্যুম ২০, নং ১, ১৯২৬, পৃঃ ১২৯-১৪৬
৫০. তদেব, ভল্যুম ২২, ১৯২৬, পৃঃ ৫৫-৮২
৫১. তদেব, ভল্যুম ২৯, ১৯২৭, পৃঃ ৬৫-১০৬
৫২. তদেব, ভল্যুম ৩০ নং ১, ১৯২৮, পৃঃ ৩৭-৭২, ২৫ নং ১, ১৯২৭, পৃঃ ৩১-৪৪
৫৩. তদেব, ১৯২৬ ভল্যুম ২০ নং ১ পৃঃ ৩০৬-৩৪১
৫৪. প্রোসিডিংস ভল্যুম ২০, ১৯২৬, পৃঃ ২৫-২৭
৫৫. চতুর্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. প্রোসিডিংস ১৯৩২ ভল্যুম ৩৯ নং ৩ পৃঃ ৪৪-৪৭, ১৯৩০, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ ৫১৫-৫১৭ ইত্যাদি
২. আবুল মনসুর আহমদ, তদেব, পৃঃ ১২৯
৩. সুভাষচন্দ্র বসু, তদেব, পৃঃ ৯৭-৯৮
৪. প্রোসিডিংস ১৯৩২, ভল্যুম ৩৯, নং ৩, পৃঃ ৪০-৪২
৫. তদেব, ১৯৩০, ভল্যুম ১৪, নং ৩, পৃঃ ৬৩২-৬৬২
৬. তদেব, ১৯৩০, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ ২০৬-২৩০
৭. তদেব, ১৯৩০, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ ২৮৭-২৮৮
৮. তদেব, ১৯৩০, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ ২৯৩-২৯৫
৯. তদেব, ১৯৩২, ভল্যুম ৩৮, নং ৩, পৃঃ ২২৫-২২৭
১০. তদেব, ১৯৩৫, ভল্যুম ৪৫, নং ১, পৃঃ ৪৪৬-৪৪৭
১১. তদেব, ১৯৩২, ভল্যুম ৪০, নং ১, পৃঃ ৮২-১০১
১২. তদেব, ১৯৩২, ভল্যুম ৪০, নং ১, পৃঃ ১১৭-১১৮
১৩. তদেব, ১৯৩৫, ভল্যুম ৪৬, নং ২, পৃঃ ৪৯২
১৪. তদেব, ১৯৩৫, ভল্যুম ৪৭, নং ১, পৃঃ ৬১
১৫. তদেব, ১৯৩২, ভল্যুম ৩৯, নং ১, পৃঃ ৪২-৬৯
১৬. তদেব, ১৯৩২, ভল্যুম ৩৯, নং ১, পৃঃ ২০৩-২৩৪
১৭. তদেব, ১৯৩০, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ ৪১৯-৪৪৪
১৮. তদেব, ১৯৩০, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ ৪৮৪-৫১৭, ৫৪৬-৫৬৯

১৯. তদেব, ১৯৩১, ভল্যুম ৩৬, নং ৩, পৃঃ ৫৬-৯৩
২০. তদেব, ১৯৩২, ভল্যুম ৪০, নং ১, পৃঃ ১৯৮-২৩৩
২১ তদেব, ১৯৩২, ভল্যুম ৪০, নং ১, পৃঃ ২৩৪-২৪১
২২. তদেব, ১৯৩১, ভল্যুম ৩৬, নং ১, পৃঃ ২৪৫-২৬৯
২৩. তদেব, ১৯৩১, ভল্যুম ৩৬, নং ৩, পৃঃ ৪৯৪-৫১১
২৪. তদেব, ১৯৩২, ভল্যুম ৩৮, নং ১, পৃঃ ২৩৩-২৩৯
২৫. তদেব, ১৯৩২, ভল্যুম ৩৯, নং ১, পৃঃ ৪২-১১২
২৬. তদেব, ১৯৩০, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ ৫৩৩
২৭. তদেব, ১৯৩০, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ ৬৪০-৬৪১
২৮. তদেব, ১৯৩২, ভল্যুম ৩৯, নং ৩, পৃঃ ৪৪-৪৫
২৯. তদেব, ১৯৩৫, ভল্যুম ৪৬, নং ২, পৃঃ ৫০১-৫০৬
৩০. তদেব, ১৯৩২, ভল্যুম ৩৮, নং ২, পৃঃ ১৩৫

সপ্তম অধ্যায়

১. অমলেশ ত্রিপাঠী, তদেব, পৃঃ ২১৭-২১৮
২. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, তদেব, পৃঃ ১৩৭-১৩৮
৩. আবুল মনসুর আহমদ, তদেব, পৃঃ ১১৩
৪. তদেব, পৃঃ ১২৫
৫. তদেব, পৃঃ ১২৬
৬. জে. এইচ ব্রুমফিল্ড, তদেব, পৃঃ ২৯২
৭. অমলেশ ত্রিপাঠী, তদেব, পৃঃ ২১৯-২৩৩
৮. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, তদেব, পৃঃ ২৬-২৭
৯. আবুল মনসুর আহমদ, তদেব, পৃঃ ১৩৯-১৪০
১০. অমলেশ ত্রিপাঠী, তদেব, পৃঃ ২৩৩-২৪
১১. আবুল মনসুর আহমদ, তদেব, পৃঃ ১২৮-১২৯
১২. শীলা সেন, মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল (১৯৩৭-১৯৪৭) ঃ নিউদিল্লি, ১৯৭৬, পৃঃ ৮২
১৩. প্রোসিডিংস, ১৯৩৮, ভল্যুম, ৫২, নং ৫, পৃঃ ১১২
১৪. আবুল মনসুর আহমদ, তদেব পৃঃ ১৬৬-১৬৭
১৫. প্রোসিডিংস ১৯৩৯, ভল্যুম ৫৪, নং ৩, পৃঃ ৩০৯-৩১০
১৬. প্রোসিডিংস ১৯৩৮, ভল্যুম ৫৩, নং ২, পৃঃ ৩-১২৪
১৭. তদেব, ১৯৪০, ভল্যুম ৫৭ নং ১, পৃঃ ২৪৯-২৫২
১৮. তদেব, ১৯৪০, ভল্যুম ৫৭, নং ১, পৃঃ ৪৫-৪৭, ৬৬-৯২, ২৪৯-২৫২, ২৫২-২৮৯
১৯. তদেব, ১৯৪০, ভল্যুম ৫৭, নং ৩, পৃঃ ১০২-২২৫

২০. তদেব, ১৯৩৯, ভল্যুম ৫৪, নং ১, পৃঃ ৯৯-১১৭

২১. তদেব, ১৯৩৮, ভল্যুম ৫২, নং ১, পৃঃ ৮৮-১১৪

২২. তদেব, ১৯৪০, ভল্যুম ৫৬, নং ১, পৃঃ ১০৭-১১৬

২৩. তদেব, ১৯৩৮, ভল্যুম ৫২, নং ৫, পৃঃ ৩৮-৪১

২৪. তদেব, ১৯৩৮, ভল্যুম ৫৩, নং ৪, পৃঃ ১১৬-১১৭

২৫. তদেব, ১৯৪১, ভল্যুম ৬১, নং ১, পৃঃ ১৬৪-১৬৫

২৬. তদেব, ১৯৪১, ভল্যুম ৬০, নং ৩, পৃঃ ১-৯

২৭. তদেব, ১৯৪০, ভল্যুম ৫৭, নং ৩, পৃঃ ১০২-১০৩

২৮. তদেব ১৯৩৯, ভল্যুম ৫৪, নং ৩, পৃঃ ৪৬৮

২৯. তদেব ১৯৩৯, ভল্যুম ৫৪, নং ১১, পৃঃ ৬৩

৩০. তদেব, ১৯৩৯, ভল্যুম ৫৪, নং ১২, পৃঃ ১৬৬-১৬৭

৩১. তদেব, ১৯৩৯, ভল্যুম ৫৪, নং ১১, পৃঃ ৬৪-৬৫

৩২. কালীপদ বিশ্বাস, যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায় ঃ কলকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ৩৫

৩৩. প্রোসিডিংস ১৯৩৮, ভল্যুম ৫৩, নং ১, পৃঃ ৭২

৩৪. তদেব, ১৯৩৯, ভল্যুম ৫৫, নং ৩, পৃঃ ১২৩-১৭০, ২১০-২৬২

অষ্টম অধ্যায়

১. প্রোসিডিংস ১৯৩৮, ভল্যুম ৫২, নং ১-৪, পৃঃ ১৩৮

২. কালীপদ বিশ্বাস, তদেব, পৃঃ ৩৩২-৩৩৩

৩. প্রোসিডিংস, ১৯৪২, ভল্যুম ৬২, নং ১, পৃঃ ২৩০-২৩২

৪. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৪, পৃঃ ২৫-৩৫

৫. তদেব, ১৯৪২, ভল্যুম ৬২, নং ১, পৃঃ ২৪৮

৬. তদেব, ১৯৪২, ভল্যুম ৬২, নং ২, পৃঃ ২২৩

৭. নীরদ সি চৌধুরী, দ্যাই হ্যান্ড গ্রেট এনার্ক, ইন্ডিয়া ১৯২১-১৯৫২, লন্ডন, ১৯৮৭ পৃঃ ৪৭৭-৪৮৭

৮. ম্যানসারগ এন (সং) ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ভল্যুম-৩, ডকুমেন্ট নং ৬৩৭, পৃঃ ৮৭৫ ৮৭৬

৯. প্রোসিডিংস ১৯৪২, ভল্যুম ৬২, নং ১, পৃঃ ৮৯

১০. তদেব, ১৯৪২, ভল্যুম ৬২, নং ১, পৃঃ ১৭৩-২২৫

১১. তদেব, ১৯৪২, ভল্যুম ৬২, নং ১, পৃঃ ২৫২-২৫৩

১২. হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ২২ জুন ১৯৪২, বিস্তৃত বিবরণ অমলেন্দু দে, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, কলকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ১৩৪-১৪৫

১৩. প্রোসিডিংস ১৯৪২, ভল্যুম ৬২, নং ২, পৃঃ ২২৪-২২৬

১৪. তদেব, ১৯৪২, ভল্যুম ৬২, নং ১, পৃঃ ১১৭

১৫. প্রোসিডিংস ১৯৪২, ভল্যুম ৬২, নং ১, পৃঃ ৩৫৩-৩৫৪

১৬. তদেব ১৯৪২, ভল্যুম ৬৩, নং ১, পৃঃ ১৩৯-১৪৩
১৭. তদেব, ১৯৪২, ভল্যুম ৬২, নং ২, পৃঃ ২৬৪-২৬৬
১৮. তদেব, ১৯৪২, ভল্যুম ৬২, নং ৪, পৃঃ ৬১-৬৬
১৯. তদেব, ১৯৪২, ভল্যুম ৬১, নং ১, পৃঃ ৩৪৬-৩৬০
২০. তদেব, ১৯৪২, ভল্যুম ৬২, নং ৩, পৃঃ ১৮৩-১৯৮
২১. তদেব, ১৯৪২, ভল্যুম ৬৩, নং ৩, পৃঃ ২২৫-২২৭
২২. তদেব, ১৯৪২, ভল্যুম ৬৫, পৃঃ ৩৯-৬৩
২৩. তদেব, ১৯৪২, ভল্যুম ৬৩, নং ২, পৃঃ ১৪৭
২৪. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৪, পৃঃ ২৫-৩৫
২৫. ম্যানসারগ (সং) তদেব, ভল্যুম ২, পৃঃ ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৪
২৬. প্রোসিডিংস, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৫, পৃঃ ৫৩
২৭. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৪, নং ১, পৃঃ ৩৯-৪৫
২৮. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৫, পৃঃ ৩৭-৩৯
২৯. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৫, পৃঃ ২৫-৩৫
৩০. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৫, পৃঃ ২৮
৩১. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৫, পৃঃ ৫৪-৫৫
৩২. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৪, নং ৩, পৃঃ ৪৭৭-৪৮১
৩৩. দ্য স্টেটসম্যান, এপ্রিল ২৫, ১৯৪৩
৩৪. আবুল মনসুর আহমদ, তদেব, পৃঃ ২৩১-২৩৩

নবম অধ্যায়

১. জহুর হোসেন, 'পাকিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন', শীলা সেন উল্লেখিত, তদেব, পৃঃ ১৭৬-১৭৭
২. আবুল হাশিম, আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ৪৬
৩. তদেব, পৃঃ ৭৮ (নিখিল চক্রবর্তী প্রখ্যাত সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার)
৪. প্রোসিডিংস, ১৯৪৫, ভল্যুম ৬৯, নং ১, পৃঃ ৬৫
৫. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৬, নং ২, পৃঃ ৩১৫-৩১৭
৬. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৬, নং ২, পৃঃ ৩১৭-৩১৮
৭. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৬, নং ২, পৃঃ ১২২-১২৩
৮. অমলেশ ত্রিপাঠী, তদেব, পৃঃ ৩৭৩
৯. আবুল হাশিম, তদেব, পৃঃ ৪৯
১০. প্রোসিডিংস, ভল্যুম ৬৫, পৃঃ ১৭০-১৭৩
১১. ম্যানসারগ ও অন্যান্য (সং) ট্রান্সফার অব পাওয়ার ৪র্থ খণ্ড, ডকুমেন্ট ১৫২
১২. প্রোসিডিংস, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৫, পৃঃ ৭১-৮৫

১৩. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৫, পৃঃ ২৮৬-২৮৯
১৪. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৬, নং ১, পৃঃ ১৯৬
১৫. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৬, নং ১, পৃঃ ১৯৭-১৯৮
১৬. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৬, নং ১, পৃঃ ৩১৫-৩১৭
১৭. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৬, নং ২, পৃঃ ৩৪৭
১৮. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৬, নং ২, পৃঃ ৩৫৬-৩৫৭
১৯. তদেব, ১৯৪৪, ভল্যুম ৬৭, নং ১-৩, পৃঃ ৯৬-৯৭
২০. তদেব ১৯৪৪, ভল্যুম ৬৭, নং ৫, পৃঃ ৫৮১
২১. তদেব, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৫, পৃঃ ৪১৫-৪১৮
২২. স্যার জন উডহেড, ফেমিন এনকোয়ারি কমিশন রিপোর্ট অন বেঙ্গল (কলিকাতা, ১৯৪৪)
২৩. তদেব, ১৯৪৪, ভল্যুম ৬৭, নং ৪-৬, পৃঃ ১৮২
২৪. তদেব, ১৯৪৪, ভল্যুম ৬৭, নং ৪-৬, পৃঃ ১৯৬-২০০
২৫. তদেব, ১৯৪৪, ভল্যুম ৬৭, নং ৪-৬, পৃঃ ৩৪৭-৩৪৮
২৬. তদেব, ১৯৪৫, ভল্যুম ৬৯, নং ২, পৃঃ ৫৬১
২৭. আবুল হাশিম, তদেব, পৃঃ ৯৯
২৮. অমলেশ ত্রিপাঠী, তদেব, পৃঃ ৪০০
২৯. প্রোসিডিংস ১৯৪৬, ভল্যুম ৭০, পৃঃ ৭-৯
৩০. তদেব, ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ১, পৃঃ ২১-২৩
৩১. তদেব, ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ১, পৃঃ ১৩৬-১৩৯
৩২. তদেব, ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ১, পৃঃ ৬০-৬১
৩৩. তদেব, ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ২, পৃঃ ৭-৯
৩৪. তদেব, ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ১, পৃঃ ১০৮-১১২
৩৫. প্রোসিডিংস, ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ১, পৃঃ ১৬৭-১৬৯
৩৬. তদেব, ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ১, পৃঃ ১৭০-১৭১
৩৭. তদেব, ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ২, পৃঃ ১৮৯
৩৮. তদেব, ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ২, পৃঃ ১৪০-১৪১
৩৯. তদেব, ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ২, পৃঃ ৯০-৯৯
৪০. তদেব, ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ১, পৃঃ ১০০-১০২
৪১. তদেব ১৯৪৬, ভল্যুম ৭,১ নং ২, পৃঃ ৮২
৪২. তদেব ১৯৪৭, ভল্যুম ৭২, নং ২, পৃঃ ২০৪-২০৬
৪৩. তদেব, ১৯৪৭, ভল্যুম ৭২, নং ২, পৃঃ ২৩৩-২৩৪
৪৪. তদেব, ১৯৪৭, ভল্যুম ৭২, নং ২, পৃঃ ২৩২
৪৫. তদেব, ১৯৪৭, ভল্যুম ৭২, নং ২, পৃঃ ২৪০-২৪৬
৪৬. অমলেশ ত্রিপাঠী, তদেব, পৃঃ ৪৪২

৪৭. হাশিম, তদেব, পৃঃ ১৫৭
৪৮. হাশিম, তদেব, পৃঃ ১০৫
৪৯. প্রোসিডিংস ১৯৪৬ ভল্যুম ৭১, নং ৩, পৃঃ ৯০-৯২
৫০. প্রোসিডিংস ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ৩, পৃঃ ১৫২-১৬৩
৫১. প্রোসিডিংস ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ৩, পৃঃ ১৪৬-১৪৯
৫২. প্রোসিডিংস ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ৩, পৃঃ ১৩৮-১৪৬
৫৩. প্রোসিডিংস ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ৩, পৃঃ ১২৫-১২৮
৫৪. প্রোসিডিংস ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ৩, পৃঃ ১২৭-১৩৪
৫৫. প্রোসিডিংস ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ৩, পৃঃ ১২৯-১৩০
৫৬. প্রোসিডিংস ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ৩, পৃঃ ১০৭-১০৯
৫৭. প্রোসিডিংস ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ৩, পৃঃ ১২২-১২৪
৫৮. প্রোসিডিংস ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ৩, পৃঃ ১২৫-১২৯
৫৯. প্রোসিডিংস ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ৩, পৃঃ ৩৩২-৩৩৪
৬০. প্রোসিডিংস ১৯৪৬, ভল্যুম ৭১, নং ৩, পৃঃ ৩৬৫-৩৭১
৬১. প্রোসিডিংস ১৯৪৭, ভল্যুম ৭২, নং ১, পৃঃ ৫৩
৬২. প্রোসিডিংস ১৯৪৭, ভল্যুম ৭২, নং ১, পৃঃ ৫২
৬৩. প্রোসিডিংস ১৯৪৭, ভল্যুম ৭২, নং ৩, পৃঃ ৪৮৮

দশম অধ্যায়

১. অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৩ এপ্রিল, ১৯৩৭
২. ম্যানসারগ ও অন্যান্য (সং) ট্রান্সফার অব পাওয়ার, লন্ডন, ১৯৮১, ভল্যুম ১০, পৃঃ ৯৪১
৩. আবুল হাশিম, তদেব, পৃঃ ১০০-১০১
৪. শীলা সেন, তদেব, পৃঃ ২০৬
৫. শরৎচন্দ্র বসু, কমমেমোরেটিভ ভল্যুম, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ৭২
৬. ভারত, ২মে ১৯৪৭, ভবানী সেন উল্লেখিত, নির্বাচিত রচনাবলী : কলকাতা, ১৯৭৭, পৃঃ ২৪৪
৭. অমলেশ ত্রিপাঠী, তদেব, পৃঃ ৪৬৮
৮. বদরুদ্দিন উমর, বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ৬৭
৯. উমর, তদেব, পৃঃ ৬৪-৬৫
১০. উমর, তদেব, পৃঃ ৭৫-৭৬
১১. শরৎচন্দ্র বসু, তদেব, পৃঃ ৭৩
১২. শরৎচন্দ্র বসু, তদেব, পৃঃ ৭০
১৩. উমর, তদেব, পৃঃ ৩৮-৪৫
১৪. আবুল হাশিম, তদেব, পৃঃ ১২২-১২৮

১৫. প্যারেলাল, মহাত্মা গান্ধী, দ্য লাস্ট ফেজ, ভল্যুম ২, আমেদাবাদ, ১৯৫৮, পৃঃ ১৮২-১৮৪
১৬. তদেব, পৃঃ ১৭৮-১৭৯
১৭. দুর্গাদাস (সং) সর্দার প্যাটেল করেসপনডেন্স, ভল্যুম ৪, পৃঃ ৩৯
১৮. শরৎচন্দ্র বসু, তদেব, পৃঃ ৮০
১৯. প্যারেলাল, তদেব, ১৭৬-১৭৮
২০. উমর, তদেব, পৃঃ ৮৯
২১. দুর্গাদাস, তদেব, ভল্যুম ৪, পৃঃ ৪৩-৪৬
২২. মর্নিং নিউজ ২০ মে ১৯৪৭, শীলা সেন উল্লেখিত, তদেব, পৃঃ ২৮২
২৩. আবুল হাশিম, তদেব, পৃঃ ১৪১
২৪. ভবানী সেন, তদেব, পৃঃ ২৬৮-২৬৯
২৫. ভবানী সেন, তদেব, পৃঃ ২৪২-২৬৭
২৬. সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ : বর্ধমান, ১৯৯১, পৃঃ ৪০১-৪০৩

একাদশ অধ্যায়

১. প্রোসিডিংস অব দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি ১৯৪৭, ভল্যুম ১, পৃঃ ৪
২. তদেব, ১৯৪৭, ভল্যুম ১, পৃঃ ২-৩
৩. তদেব, ১৯৪৮, ভল্যুম ৩, নং ১, পৃঃ ৬৬-৭৫
৪. তদেব, ১৯৪৮, ভল্যুম ৩, নং ১, পৃঃ ৮৮
৫. তদেব, ১৯৪৮, ভল্যুম ৩, নং ১, পৃঃ ৮২
৬. তদেব, ১৯৪৮, ভল্যুম ৩, নং ১, পৃঃ ৯২-৯৩
৭. তদেব, ১৯৪৮, ভল্যুম ৩, নং ১, পৃঃ ১৯৩
৮. তদেব, ১৯৪৮, ভল্যুম ৩, নং ১, পৃঃ ২৪২-২৫১
৯. তদেব, ১৯৪৮, ভল্যুম ১, পৃঃ ৪৮
১০. তদেব, ১৯৪৮, ভল্যুম ১, পৃঃ ৩৫৮
১১. তদেব, ১৯৪৮, ভল্যুম ৩, নং ২, পৃঃ ১৫৭
১২. তদেব, ১৯৫০, ভল্যুম ২, পৃঃ ২৭২
১৩. তদেব, ১৯৪৯, ভল্যুম ৫, নং ১, পৃঃ ৫-২৭
১৪. তদেব, ১৯৪৯, ভল্যুম ৫, নং ১, পৃঃ ৬৪-৬৬
১৫. তদেব, ১৯৪৯, ভল্যুম ৫, নং ১, পৃঃ ১০৯-১১০
১৬. তদেব, ১৯৪৯, ভল্যুম ৫, নং ২, পৃঃ ৮৬
১৭. তদেব, ১৯৫১, ভল্যুম ৩, নং ১, পৃঃ ২৩-২৫
১৮. তদেব, ১৯৪৮, ভল্যুম ১, নং ১, পৃঃ ১৫৭

১৯. তদেব, ১৯৪৮, ভল্যুম ২, নং ১, পৃঃ ১-৬০
২০. তদেব, ১৯৫০, ভল্যুম ১, নং ১, পৃঃ ১৯
২১. তদেব, ১৯৫০, ভল্যুম ১, নং ১, পৃঃ ২৯-৩২

দ্বাদশ অধ্যায়

১. প্রোসিডিংস, ১৯৫৫, ভল্যুম ১২, নং ২, পৃঃ ৪৩১-৪৩৩
২. তদেব, ১৯৫২, ভল্যুম ৬, নং ৩, পৃঃ ৭০৭-৭১৮
৩. তদেব, ১৯৫৪, ভল্যুম ৯, নং ৩, পৃঃ ৪২
৪. তদেব, ১৯৫৪, ভল্যুম ১০, নং ১, পৃঃ ১১৩৫
৫. তদেব, ১৯৫২, ভল্যুম ৬, নং ২, পৃঃ ৩০৪
৬. তদেব, ১৯৫৩, ভল্যুম ৭, নং ৩, পৃঃ ২৫৮-২৭১
৭. মার্কাস এফ ফ্রান্ড পোলিটিক্যাল ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্যাল ডিকে ইন বেঙ্গল (কলকাতা ১৯৭১), পৃঃ ৪৫-৬৪
মাইরণ ভীনার, চেঞ্জিং প্যাটার্ন অব পলিটিক্যাল লিডারশিপ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল : পলিটিক্যাল চেঞ্জ ইন সাউথ এশিয়া, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ১৭৭-২২৭
৮. তদেব, ১৯৫৫, ভল্যুম ১২, নং ৩, পৃঃ ২২৫
৯. সরোজ চক্রবর্তী, উইথ ডাঃ বি. সি. রায় অ্যান্ড আদার চিফ মিনিস্টারস্, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ১৯৫
১০. তদেব, ১৯৫৪, ভল্যুম ১০, নং ২, পৃঃ ৭৮৬-৭৮৮
১১. তদেব ১৯৫৫, ভল্যুম ১২, নং ৩, পৃঃ ২২১
১২. তদেব, ১৯৫৫, ভল্যুম ১৩, পৃঃ ২৭৮-২৮০
১৩. তদেব, ১৯৫৩, ভল্যুম ৭, নং ৩, পৃঃ ১০১৬-১০২৭
১৪. বিজয় সিংহ নায়ার, যা দেখেছি যা করেছি, কলকাতা, পৃঃ ১১৮
১৫. তদেব, ১৯৫৬, ভল্যুম ১৪, নং ১, পৃঃ ৫৪০-৫৪৩
১৬. জ্যোতি বসু, জনগণের সঙ্গে, কলকাতা, ১৯৯১, পৃঃ ৩২
১৭. তদেব, ১৯৫৬, ভল্যুম ১৫, নং ২, পৃঃ ১৬৭-২১০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১. সরোজ চক্রবর্তী উইথ বি. সি রায় অ্যান্ড আদার চিফ মিনিস্টার, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ১৯৫, ৩৪২
২. হু'জ হু ১৯৫৭, ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, কলকাতা, ১৯৫৭
৩. সিদ্ধেশ্বর মুখার্জী, বোলপুর দর্পণ ; মুলুক (বীরভূম), পৃঃ ১৬১-১৬৭
৪. প্রোসিডিংস, ১৯৫৮, ভল্যুম ১৯, নং ৩, পৃঃ ১৭২-২১৩
৫. তদেব, ১৯৫৮, ভল্যুম ২০, নং ৩, ভল্যুম ২১, পৃঃ ৫৮৯-৬২১
৬. তদেব, ১৯৫৯, ভল্যুম ২৩, পৃঃ ২৬৮

৭. তদেব, ১৯৫৮, ভল্যুম ২১, পৃঃ ২৬-২৭
৮. তদেব, ১৯৫৮, ভল্যুম ২১, পৃঃ ৪৭৫-৪৯৫
৯. তদেব, ১৯৬০, ভল্যুম ২৮, নং ২, পৃঃ ২৭-৫৮
১০. তদেব, ১৯৫৯, ভল্যুম ২৪, পৃঃ ২৩৯
১১. তদেব, পৃঃ ২৪১-২৪৬
১২. তদেব, পৃঃ ২৪৭-২৭৩
১৩. তদেব, পৃঃ ২৭৪-২৭৬
১৪. তদেব, পৃঃ ২৮০-২৮৪
১৫. তদেব, ১৯৫৯, ভল্যুম ২২, নং ২, পৃঃ ৩৭
১৬. তদেব, ১৯৫৯, ভল্যুম ২২, নং ১, পৃঃ ১৫৪-১৬৩
১৭. তদেব, ১৯৫৮, ভল্যুম ২১, পৃঃ ১০১-১০৪, ১৩৯-১৪১, ১৫৫-১৬৭
১৮. তদেব, ১৯৫৮, ভল্যুম ১৯, নং ২, পৃঃ ৪০৩-৪১০
১৯. ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট ৩৫ অব ১৯৭৫, পৃঃ ৩১৫-৩১৬
২০. তদেব, ১৯৫৭, ভল্যুম ১৭, নং ১, পৃঃ ৩৪
২১. পরিশিষ্ট ছ
২২. বিজয় সিংহ নাহার, যা দেখেছি যা করেছি, কলকাতা, পৃঃ ১২৫-১২৬
২৩. মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ২৭৮
২৪. তদেব, পৃঃ ২৮১-২৮২

চতুর্দশ অধ্যায়

১. প্রমথ চৌধুরী, রায়তের কথা, কলকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৮
২. তদেব, পৃঃ ১৪, প্রমথ চৌধুরীর রায়তের কথা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি আমাদের দেশে মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময় এই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি আর সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে।"
৩. সত্যব্রত দত্ত, বেঙ্গল লেজিসলেচার ১৮৬২-১৯২০, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ৯৩
৪. তদেব, পৃঃ ৯৩
৫. তদেব, পৃঃ ৯৪
৬. তদেব, পৃঃ ৯৪
৭. প্রোসিডিংস অব দ্য গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল, ১৮৮৫, ভল্যুম ১৫, পৃঃ ৬৯-৭০
৮. তদেব, পৃঃ ২৩৮
৯. প্রোসিড্ডিংস, ১৮৯৮, ভল্যুম ৩০, পৃঃ ৫
১০. সত্যব্রত দত্ত, তদেব, পৃঃ ৯৬
১১. প্রোসিডিংস, ১৯২৫, ভল্যুম ১৯, পৃঃ ৮২

১২. তদেব, ১৯২৫, ভল্যুম ১৯, পৃঃ ৮০
১৩. তদেব, ১৯২৫, ভল্যুম ১৯, পৃঃ ৯২
১৪. তদেব, ১৯২৫, ভল্যুম ১৯, পৃঃ ৮৩
১৫. তদেব, ১৯২৫, ভল্যুম ১৯, পৃঃ ৩৩১-৩৩২
১৬. আবুল মনসুর আহমদ, তদেব, পৃঃ ১৬৬
১৭. প্রোসিডিংস, ১৯২৮, ভল্যুম ৩০, নং ১, পৃঃ ৩৯৪
১৮. তদেব, ১৯২৮, ভল্যুম ৩০, নং ২, পৃঃ ২১-২২
১৯. তদেব, ১৯২৮, ভল্যুম ৩০, নং ২, পৃঃ ২৯-৩০
২০. তদেব, ১৯২৮, ভল্যুম ৩০, নং ২, পৃঃ ১৫৩-১৫৪
২১. তদেব, ১৯২৮, ভল্যুম ৩০, নং ২, পৃঃ ৫৬৩-৫৬৪
২২. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭, দ্য ল্যান্ড কোয়েশ্চন, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ৮৮-৯৫
২৩. আনন্দবাজার পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ১১, ১৯২৮
২৪. 'নীহার' (কাঁথি) সেপ্টেম্বর ১৮, ২৫, অক্টোবর ২, ১৯২৮ পার্থ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখিত, তদেব, পৃঃ ৯৭
২৫. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তদেব পৃঃ ৯৮-১০০
২৬. আবুল মনসুর আহমদ, তদেব পৃঃ ৬৩
২৭. মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ৯৫
২৮. মনসুর আহমদ, তদেব, পৃঃ ১৬৬
২৯. জয়া চ্যাটার্জি, বেঙ্গল ডিভাইডেড, কেমব্রিজ (১৯৯৫), পৃঃ ৮৭, ৯৬, ৯৯
৩০. বদরুদ্দিন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষক, কলকাতা (১৯৭৮), পৃঃ ১০১-১০২
৩১. জ্যোতি বসু, জনগণের সঙ্গে, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ৬১
৩২. ভবানী সেন, নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) ঃ কলকাতা, পৃঃ ১১১
৩৩. প্রোসিডিংস, ১৯৫৫, ভল্যুম ১৩, পৃঃ ২৯১
৩৪. তদেব, ১৯৫৫, ভল্যুম ১২, পৃঃ ৪৬৬
৩৫. তদেব, ১৯৫৩, ভল্যুম ৭, পৃঃ ১০৮৪
৩৬. তদেব, ১৯৫৫, ভল্যুম ১২, পৃঃ ৪৭৫-৪৭৬
৩৭. তদেব, ১৯৫৫, ভল্যুম ১২, নং ৩ পৃঃ ৫৯৯
৩৮. তদেব, ১৯৫৩, ভল্যুম ৮, পৃঃ ১২৪
৩৯. আবদুল্লাহ রসুল, কৃষকসভার ইতিহাস (কলকাতা, ১৩৭৬), পৃঃ ১৯০
৪০. সরোজ চক্রবর্তী, তদেব পৃঃ ২২৫
৪১. নির্মল মুখার্জী ও ডি. বন্দ্যোপাধ্যায়, নিউ হরাইজন ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত (কলকাতা, ১৯৯৩), পৃঃ ৪১

পঞ্চদশ অধ্যায়

১. প্রোসিডিংস, ১৯২৬, ভল্যুম ২০, নং ১, পৃঃ ২৩

২. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আত্মকথা, প্রিয়রঞ্জন সেন অনূদিত, নিউ দিল্লি, ১৯৬৯, পৃঃ ৮১-৮২ নিষ্ঠাবান মুসলমান সামসুল হুদা ছিলেন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মনোভাবের প্রতি সহনশীল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ সামসুল হুদার বাড়িতেই থাকতেন। বকরি-ঈদের দিন গোহত্যা হবে ভেবে কয়েকদিনের জন্য তিনি অন্যত্র চলে যান। বকরি-ঈদের পর ফিরে এলে সামসুল হুদা অনুযোগ করে বলেন, প্রসাদের তা করা উচিত হয়নি। হিন্দুদের কথা বিবেচনা করেই তিনি নিজের বাড়িতে গোরুর কোরবানি করেন না বলে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে জানান। প্রসাদ লিখেছেন "আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম, বুঝিতে পারিলাম তাঁহার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি।"

৩. প্রোসিডিংস, ১৯২১, ভল্যুম ১, নং ২, পৃঃ ১৪১

৪. তদেব, ১৯২৩, ভল্যুম ১১, নং ২, পৃঃ ৩২

৫. তদেব, ১৯২৪, ভল্যুম ১৬, পৃঃ ৫৭গ

৬. নায়ক, মার্চ ২৬, ১৯২৪, ব্রুমফিল্ড উল্লেখিত, তদেব, পৃঃ ২৪৮

৭. প্রোসিডিংস, ১৯২২, ভল্যুম ১০, পৃঃ ৮৩

৮. তদেব, ১৯২৪, ভল্যুম ১৪, নং ২, পৃঃ ৩৫-৩৬

৯. তদেব, ১৯২৪, ভল্যুম ১৬, পৃঃ ৬৭

১০. তদেব, ১৯২৪, ভল্যুম ১৪, নং ৫, পৃঃ ৪৮

১১. লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ডিবেট ১৯২৮, ভল্যুম ৪, পৃঃ ১৩৮৩-১৩৮৪

১২. প্রোসিডিংস ১৯২৫, ভল্যুম ১৮, পৃঃ ৩

১৩. তদেব, ১৯২৬, ভল্যুম ২০, নং ১, পৃঃ ৩০৬-৩৪১

১৪. তদেব, ১৯৩১, ভল্যুম ৩৬, নং ৩, পৃঃ ৪৯৯-৫১১

১৫. তদেব, ১৯৩১, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ ২৪৫-২৪৯

১৬. তদেব, ১৯৩৪, ভল্যুম ৪৩, নং ১, পৃঃ ৩৩-৩৪

১৭. পরিশিষ্ট ক

১৮. তদেব, ১৯৪২, ভল্যুম ৬২, নং ২, পৃঃ ৩১১-৩১৮

১৯. ডিসিশন অব স্পীকারস্ অব দ্য লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ১৯৩৭-১৯৪৩, কলকাতা, ভল্যুম ১, পৃঃ ১৬২-২১৮

২০. শীলা সেন, তদেব, পৃঃ ২৬৪-২৭০

২১. ডিসিশন, তদেব, পৃঃ ১৯৫-২১৮

২২. প্রোসিডিংস, ১৯৪৩, ভল্যুম ৬৪, পৃঃ ৬৬

২৩. তদেব, ১৯৪৫, ভল্যুম ৬৯, নং ২, পৃঃ ৫৬১-৫৬৬

২৪. তদেব, ১৯৪৬, ভল্যুম ৭০, পৃঃ ৮

২৫. প্রোসিডিংস অব দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ১৯৪৭, ভল্যুম ১, পৃঃ ৮৬

২৬. তদেব, ১৯৫৪, ভল্যুম ৯, নং ১ পৃঃ ৪৬
২৭. তদেব, ১৯৫৫, ভল্যুম ১৩, পৃঃ ২৫২
২৮. তদেব, ১৯৫৬, ভল্যুম ১৪, নং ১, পৃঃ ৫৪০-৫৪৪
২৯. তদেব, ১৯৫৯, ভল্যুম ২২, নং ৩, পৃঃ ২৫৭-৩১২
৩০. তদেব, ১৯৫৯, ভল্যুম ২২, নং ৩, পৃঃ ৩০০
৩১. সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনাথ দে, দিল্লী, ১৯৮৩, পৃঃ ৫৮-৫৯
৩২. প্রোসিডিংস, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৪৮, ভল্যুম ৩, নং ১, পৃঃ ১১১-১১৩

ষোড়শ অধ্যায়

১. হোরেথ পি, কোয়েশ্চন ইন দ্য হাউস, দ্য হিস্ট্রি অব এ ইউনিক ব্রিটিশ ইনস্টিটিউশন, লন্ডন, ১৯৫৬, পৃঃ ৩৪
চেস্টার ডি এন এবং বাউরিং এন, কোয়েশ্চন ইন পার্লামেন্ট ঃ অক্সফোর্ড, ১৯৬২, পৃঃ ১২
২ প্রোসিডিংস, ১৯২১, ভল্যুম ৫, পৃঃ ৭-১২
৩ তদেব, ১৮৯৬, ভল্যুম ২৮, পৃঃ ৪৩-৪৪
৪. তদেব, ১৮৯৪, ভল্যুম ২৬, পৃঃ ৯
৫ তদেব, ১৮৯৪, ভল্যুম ২৬, পৃঃ ১০১-১০২
৬. তদেব, ১৮৯৭, ভল্যুম ২৯, পৃঃ ২-৩
৭. তদেব, ১৮৯৫, ভল্যুম ২৭, পৃঃ ২৩
৮. তদেব, ১৮৯৫, ভল্যুম ২৭, পৃঃ ২৩০-২৪৮
৯. তদেব, ১৯০৮, ভল্যুম ৪০, পৃঃ ৬
১০. তদেব, ১৮৯৫, ভল্যুম ২৭, পৃঃ ৪৫৩
১০ক. তদেব, ১৮৯৯, ভল্যুম ৩৯, পৃঃ ৪৯
১১. তদেব, ১৮৯৫, ভল্যুম ২৭, পৃঃ ২৩০-২৪৮, ২৫১-২৫৪
১২. তদেব, ১৮৯৯, ভল্যুম ৩১, পৃঃ ৫৩-৫৪
১৩. তদেব, ১৯২২, ভল্যুম ৭, নং ৫, পৃঃ ৪২৯-৪৩০
১৪ তদেব, ১৯৩৮, ভল্যুম ৫, পৃঃ ৪০৮
১৫. তদেব, ১৯২১, ভল্যুম ৪, পৃঃ ৩১৩-৩৪৩, ৩৬৯-৪১২, ৪৪৮-৪৭৬
১৬. তদেব, ১৯২৩, ভল্যুম ১১, নং ২, পৃঃ ১৮৩-২১৬
১৭. রিপোর্ট অব দ্য ইন্ডিয়ান ফ্রেনচাইজ কমিটি, ১৯২৭, ভল্যুম ১, পৃঃ ৭৮-৮৫
১৮. প্রোসিডিংস, ১৯২২, ভল্যুম ৭, নং ২, পৃঃ ১০৭-১১১
১৯. তদেব, ১৯২১, ভল্যুম ৩, পৃঃ ৩২৬
২০. তদেব, ১৯২৯, ভল্যুম ৩,১ নং ১, পৃঃ ২৫১-২৬২
২১. তদেব, ১৯৪০, ভল্যুম ৫৫, পৃঃ ৩৯৯
২২. তদেব, ১৯৩৯, ভল্যুম ৫৪, নং ৩, পৃঃ ৩০৯-৩১১

২৩. তদেব, ১৯৩৯, ভল্যুম ৫৪, নং ১, পৃঃ ৯১-১১৭
২৪. দ্য স্টেটসম্যান, মার্চ ১৯, ১৯৪৭
২৫. প্রোসিডিংস, ১৯৪৭, ভল্যুম ৭২, নং ২, পৃঃ ২৩০-২৩৪
২৬. তদেব, ১৯৪৭, ভল্যুম ৭২, নং ২, পৃঃ ১৩২-১৩৩
২৭. তদেব, ১৯৪৭, ভল্যুম ৭২, নং ২, পৃঃ ২৩০-২৩৪
২৮. তদেব, ১৯৪৭, ভল্যুম ৭২, নং ২, পৃঃ ২৩০-২৩৪
২৯. জ্যোতি বসু, জনগণের সঙ্গে, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ৬১
৩০. প্রোসিডিংস, ১৯১৯, ভল্যুম ৫১, পৃঃ ১০৪০-১০৫১
৩১. তদেব, ১৯১৯, ভল্যুম ৫১, পৃঃ ১০৩৫-১০৩৯
৩২. তদেব, ১৯৪৭, ভল্যুম ৭২, নং ২, পৃঃ ৫৭৫
৩৩. তদেব, ১৯৬০, ভল্যুম ২৫, নং ১, পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬

সপ্তদশ অধ্যায়

১. বিজয় সিংহ নাহার, যা দেখেছি যা করেছি, কলকাতা, পৃঃ ১৩৩-১৩৪
২. তদেব, পৃঃ ১৪১-১৪২
৩. অতুল কোহলি, ওয়েস্ট বেঙ্গল ঃ পার্লামেন্টারি কমিউনিজম অ্যান্ড রিফর্ম ফ্রম এবাভ : দ্য স্টেট অ্যান্ড পভার্টি ইন ইন্ডিয়া লন্ডন, ১৯৮৭, পৃঃ ৯৫-১৪৩
৪. সত্যব্রত দত্ত : সাবজেক্ট কমিটি সিস্টেম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেমব্লি ; দ্য জার্নাল অব পার্লামেন্টারি ইনফরমেশন (নিউ দিল্লি), ভল্যুম ৪৩, নং ২, জুন ১৯৯৭

পরিশিষ্ট ক

বাংলার বিধানসভার সভাপতি (১৯২২-১৯৩৫) হেনরি ইভান কটন ছিলেন প্রখ্যাত সংসদবিদ, আইনজীবী ও শিল্পরসিক। শাসকরা যেসব বিধায়কদের ওপর নির্ভর করতে পারেন এবং যাদের তালিম দেওয়া দরকার প্রধানত তাদের বিষয়ে গভর্নর লিটনকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে কটনের স্বহস্তে লিখিত এই নোটস। উল্লেখ্য, তিন সুরাবর্দী—ডাঃ হাসান, হুসেন ও ডঃ আবদুল্লা মোমিন সুরাবর্দীর মধ্যে শেষোক্তজন ছিলেন সুপণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, স্বাধীনচেতা এবং শাসকবিরোধী। কিন্তু তাঁকেই কটন "সবচেয়ে কম আকর্ষণীয়" বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া, ফজলুল হক, আবুল কাশেম, ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শিবশেখরেশ্বর রায়, যতীন্দ্রনাথ বসু ও অন্য বিধায়ক সম্বন্ধেও কটনের মন্তব্য রয়েছে।

[উৎস : ব্রিটিশ লাইব্রেরির ব্যক্তিগত সংগ্রহ
MSS Eur F 160]

Confidential

Note for His Excellency the Governor

Your Excellency may remember that on the last occasion upon which you were good enough to converse with me on public affairs, you expressed a wish that I should submit notes of the impression made upon me by various members of the Council.

I will start, if I may, by saying that your excellency's speech to the Council on March, 16 has produced an excellent effect. Many members have spoken to me on the subject : and the speech delivered by Kumar Shiv Shekhareswar Roy at the morning session on March 17, afford a clear indication to me of the dissipation for the moment, at any rate, of the atmosphere of suspicion and distrust of Government in which the mind of a certain school of Bengali politician is steeped. The impression made upon member of the General Public is equally marked and equally satisfactory I have taken the opportunity to discuss the speech with my callers : and one and all are agreed that it has struck an entirely new note. If I may judge further from the tone of the debate now proceeding in the Council on the demands for grants, I should say that the signs are unmistakeable that members as a whole are convinced of the sincerity of your Excellency's utterance and are prepared to accept

CONFIDENTIAL

Note for His Excellency the Governor

Your Excellency may remember that on the last occasion upon which you were good enough to converse with me on public affairs, you expressed a wish that I should submit notes of the impression made upon me by various members of the Council

I will start if I may by saying that your Excellency's speech to the Council on March 16 has produced an excellent effect. Many members have spoken to me on the subject. and the speech delivered by Kumar Shib Shekhareswar Roy at the morning session on March 17 affords a clear indication to me of the dissipation - for the moment at any rate - of the atmosphere of suspicion and distrust of Government in which the ~~minds~~ mind of a certain school of Bengali politician is steeped. The impression made upon members of the general public is equally marked and equally satisfactory. I have taken the opportunity to discuss the speech with my

your assurances. The debate upon Ministers' Salaries has not yet taken place, and may exhibit a lapse from grace : Only if Minister will stand firm, they will carry the day.

I now turn to the member themselves and will first devote myself to the Mahomedan section. The three Suhrawardys are able and advanced in their views but they are ahead of their community and command no following either inside or outside the Council. Of the thtee, Dr. Hassan is the one whose character appeals to me most. He would make an efficient Executive Councillor—provided enough works were found for him to do but if made a Minister would be a general without an army. Young Huseyn Shaheed is the most brilliant of the trio : But his speeches are disfigured by unnecessary bitterness, and he is inclined to be conceited. I am encouraging him to accept my guidance, and are not without hope that be will respond. In any case he is too young and immature to be considered seriously. He would do well at this stage of his career to spend less time on politics and more on the practise of his profession as a barister in which I think he would achieve a success, if he applied himself to . Dr. Abdullah is the least attractive of the three. He is addicted to intrigue and plays openly for his own hand. The mass of the Mahomedans care nothing, as I have said for the Suhrawardys. They are of the type represented by the Minister for Agriculture and Industries. I exclude from my review the "comic" members who were returned by the extremist faction in order to bring ridicule on the Council and who are mere cypher taking no part in the debate and absorbed in the preparation and liquidation of their bills for travelling and residential allowances. The principal representatives of the class of Mahomedan which follows the Nawab and which comprises nearly the whole of the Mussalman members, are mofussil pleaders such as Khan Bahadur Wasimuddin Ahmed (Pubna) Khan Bahadur Emaduddin Ahmed (Rajshahye) and Maulavi Ekram-ul Huq (Moorshedabad). They play a prominent part in the local affairs of their districts as chairman and vice-chairman of district and local boards : and I look upon them as valuable additiorn to the Council. But they are not over burdened with grains, and their outlook is frankly communal. Where Mahomedan are in a minority, they demand special representation : but in localities where Mahomedans preponderate they practise openly the preferential treatment with they are never tired of charging the Hindus. They do not work on the Council

in combination with the Hindus and are inclined to form a bloc of their own. The recent concession of communal representation to Mahomedans in the Calcutta Municipal bill—however justifiable on the grounds of expediency has not tended to mend matters. The best of all these Mahomedan members of the Council is Syed Nasim Ali, a Pleader practising in the alipore courts whose aquaintance I would respectfully request your Excellency to cultivate. He is a lucid and forcible speaker, with a complete command of English, and a good voice (which he is disposed to use to excess) : and he possesses abilities of a high order. Moreover he has many progressive tendencies. I think he would endeavour to bring about some form of concordat with the Hindus, if entrusted with responsibility : and he is certainly assured of a following, for he is the principal lieutenant of the Nawab. A. K. Fazl-ul Huq is another man whose ability is undeniable. The difficulty about him is that he is like Reuben : unstable as water, he shall not excel.' He is extremely emotional and is apt to be carried away by the impulse of the moment. But office would, I think, steady him.

In this connexion I feel, I ought not to omit mention of two Mahomedan members of the assembly : Abul Kasem and Ashraff Osman Jamall. The former is a fine specimen of the old fashioned Bengali Musalman, but holds progressive views upon many subjects. As regards business capacity, there is no one among the Mahomedan whom I know to touch Ashraff Jamall whom your Excellency lately nominated to the assembly. He went up to Delhi with letters of introduction from me to Sir Frederick Whyte and Sir Malcolm Hailey, who have both been most favourably impressed with him and have written to me to that effect.

There are several Mahomedan baristers on the Bengal Council : Syed Erfan Ali and Razaur Rahman Khan occur to me under this head, but theirs are not outstanding personalities. The most brilliant of this class is outside the Council—Salahuddin Khuda Bakhsh, M.A. and I.C.L. of Oxford whose career I have watched for twenty five years. He is a consumate scholar : knows French and German perfectly, as well as oriental languages : and is an acknowledged authority on Islamic Law and history. His chief failing is that he has a sharp tongue : and the victims of it retaliate in the customary eastern fashion by muddying the wells of information with the stick

of misrepresentation.

I now proceed to discuss the Hindu members of the Council. The cleverest among the younger men is in my judgment D. C. Ghose, the brother of Mr. justice C. C. Ghose. He is well worth watching. I understand that he is already a member of the appeal Tribunal constituted under the Calcutta Improvement Trust : and I find him possessed of a sound sense of responsibilitiy. Good accounts of him reach me from all quarters and confirm my own opinion of him which is based on personal knowledge of him and his family which dates from 1893. Kumar Shiv Shekhareswar Roy is another with whose family the Tahirpur Raj I am well acquainted, and whose political career I am closely obsevring. Both he and Dhiren Ghose are constantly coming to me for advice : and I am pleased that they should do so. The Kumar has frankly told me that he has definitely adopted politics as a career and that he opposes Government because he finds that in that way he can best learn the ins and outs of political life. He is a close student of the rules of procedure and I have marked my appreciation of his ability by nominating him as a sessional Chairman to fill the vacancy caused by the death of Rai Radha Charan Pal Bahadur. He has occupied the chair several times while I have been absent temporarily to have a cup to tea : and he has acquitted himself with credit. During the debates on the Calcutta Municipal Bill, Dr. Haridhan Dutta, Rai Bahadur, did solid and valuable work. He is most thorough and conscientious and acquainted with every detail of Calcutta municipal administration. He I were colleagues on the corporation from 1900 to 1906, and he has fulfilled amply the promise he then showed. He has the merit of never speaking unless he understands his subject. He will be most useful under the new order of things inaquarated by the passing of the Calcutta Municipal Bill.

Jatindra Nath Basu, the nephew of Bhupendranath Basu, is a clever solicitor and speaks always to the point : but he is prone to regard question from the narrow standpoint of his own, which are the landlords, intersts.

Sudhangsu Mohan Bose and Ajay Chunder Dutt are not without ability. The former is the son of Ananda Mohan Bose, the latter of Romesh Chander Dutta, famous Bengalis of a byegone generation who were close personal friends of mine : and both suffer from the

fact that they are sons of eminent fathers. Ajay Dutta moreover is inclined to be over—sentimental, and to be led thereby into dangerous paths. The Santosh Raja does not trouble the Council with speeches : but I have known him from his boyhood and can testify to his ability.

Baboo Indu Bhusan Dutta has been to England, and so has Dr. Pramathanath Banerjea, a new member. Neither I fear has profited by his residence in the West. Dr. Banerjee who is Minto Professor of Economics in the university, is excessively sententiary and enunciates platitudes with an irritating vise and tall in his voice, which is reminiscent of the notes of the grain-fever bird. I have had occasion to rebuke him privately for anti-English utterances and for accentuating racial antagonism thereby. Both he and Indu Bhusan are pure Extremists, however much they may disguise the fact : but the latter is able occasionally to criticize constructively.

Bijoy Prasad Singh Roy, of the Chakdidhi family, is a charming young fellow of enjoying manners whom his father has commended to my care : and he is another of those who come to me for advice. He is not without ability and is also well worth watching.

The older members belong to a generation which is passing away. I need mention among them Sri Ashutosh Chaudhuri, an old friend & colleague of mine at the bar. He has unhappily grown morose and suspicious, and is constantly denouncing the council as a sham, when he is not able to secure acceptance for particular views of his own. He is of little or no use to me as senior sessional chairman : and I regret the move because he is really the only member of the Council with a knowledge of procedure. The present Deputy President is hopeless, from more points of view than one. He finds it difficult to understand that the Deputy President has no business to take part in controversial questions, and imagines that he is leading a party which as a matter of fact is a platform. I have corrected these delusious and instructed him to withdraw all the notices of reduction of grant which stand in his name : and he will take no part in the debate. These motions were so numerous that time did not permit of my scrutinizing them before they went on the paper. One of the Deputy Presidents motion was peculiarly objectionable as coming from him for it was directed towards a reduction of members salaries. Surendra Nath Roy is a rich man,

through no particular merit of his own but through speculation in land but that is no reason why he should suppose that every one else will give gratuitous public service. Nothing could be worse than the notion that office in Bengal is a monopoly of the rich man.

Surendranath Mallik the officiating chairman of the corporation, has thoroughly justified his selection for that important office. He has shown that a sharp critic can make an efficient administrator when the opportunity comes to him. Of the other members it is sufficient to say, as the abbéSiéyis said of himself during the Terror-ils out vécu. Some of them are terrible and nearly all persist in reading previously prepared speeches. There are notable exceptions but even European members are not free from the vice of the latter. Mr. Villies is a decided acquisition to the Council. He takes his duties seriously, and makes effective contributions to debate. Like Nasim Ali, he speaks extempore : or from notes. J. A. Jones of the Statesman should also prove an acquisition but he has been for too short a time on the Council to enable me to say more than that he exercises considerable influence over many of the Indian members.

I trust that the frankness with which these notes have been written will not be taken amiss and that they will be found legible. I have not entrusted them even to my confidential secretary for typing as I wish no one else your Excellency to see them.

March 18, 1923 H.E.A. Cotton

on the Council to enable me to say more than that he

~~[illegible]~~ exercises considerable influence over many of

the Indian members.

I trust that the frankness with which these notes

have been written will not be taken amiss, and that

they will be found legible. I have not entrusted them

even to my confidential secretary for typing, as I wish

no one but your Excellency to see them.

H. E. A. Cotton

March 18. 1923

পরিশিষ্ট খ

১৯২৩ সালের নির্বাচনের পর বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে স্বরাজী দলনেতা চিত্তরঞ্জন দাশকে গভর্নর লিটন হস্তান্তরিত বিষয়ের দায়িত্ব নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে অনুরোধ জানান। প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনার পর চিত্তরঞ্জন গভর্নরকে জানান, দলের সঙ্গে পরামর্শ না করে এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারবেন না। দলীয় সদস্যদের সভা শেষে চিত্তরঞ্জন গভর্নরকে যে চিঠি দেন, তাতে তাঁর রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও সংসদীয় মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

148, Russa Road South
Bhowanipur, the 16th December, 1923

Your Excellency,

I placed before our party the position as explained by your Excellency and they have just declined not to accept your Excellency's kind offer. The members of this party are pledged to do everything in their power by using the legal right granted under the Reforms Act to put an end to the system of dyarchy. This duty they cannot discharge if they accept office. The party is aware that it is possible to offer obstruction from within by accepting office, but they do not consider it honest to accept office, which is under the existing system, is your excellency's gift and then turn it into an instrument of obstruction. The awakened consciousness of the people of this country demands a change in the present system of government and until that is done or unless there is some change in the general administration indicating a change of heart, the people of the country cannot offer willing co-operation. Under the circumstances, I regret, I cannot undertake responsibility regarding the transferred departments. My party however wishes to place on record their appreciation of the spirit of constitutionalism which actuated you in making the offer which we feel bound not to accept.

H.E, Earl Lytton, C. R. Das
Governor of Bengal

পরিশিষ্ট গ

বাংলার প্রথম নির্বাচিত সভাপতি (স্পিকার) শিবশেখরেশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয় ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬। অনাস্থা প্রস্তাবের সপক্ষে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, বিধানচন্দ্র রায় ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ সদস্য বক্তব্য রাখেন। সভাপতির সপক্ষে স্যার স্টিফেন্সন্, স্যার আবদুর রহিম, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, প্রভাসচন্দ্র মিত্র ও একরামুল হকের বক্তৃতা হয় আত্মরক্ষামূলক। ভোটের জন্য বিধানসভার বিভাজন হয়। ৫৭-৭২ ভোটে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল-উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। প্রস্তাবের সপক্ষে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বক্তৃতা এবং প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সদস্যদের ভোট সংক্রান্ত 'প্রোসিডিংস্' (ভল্যুম ২০, নং ১, ২৪.২.২৬, পৃঃ ৩০৬-৩৪১) নিম্নে মুদ্রিত হলো ঃ

Motion under section 72C(4) of the Government of India Act
REMOVAL OF THE PRESIDENT

Mr. B. N. Sasmal : Sir, the motion which stands in my name is that the Hon'ble Kumar Shib Shekhareswar Ray, President, Bengal Legislative Council, be removed from his office under section 72C(4) of the Government of India Act, 1919, and I beg to move that the same be accepted by this House.

The incidents of Thursday last may be recapitulated as briefly as possible. Firstly, there is the fact that the Hon'ble the President at first disallowed the amendment of Sir Abd-ur-Rahim, only to revise his order a minute or two later. Secondly, there is the fact that the remark made by Maulvi Md. Nurul Huq Chaudhury had not reached the ears of the Hon'ble the President and he actually forced him to repeat his remark and then asked him to withdraw the same. Thirdly, there is the fact that the Hon'ble the President held that the conduct of Maulvi Md. Nurul Huq Chaudhury was "grossly disorderly", because he was guilty of uttering a single sentence, consisting of only 12 words, namely, "It was the arbitrary power of the President which was doing it". Fourthly, there is the fact that Dr. Kumud Sanker Ray was similarly found guilty of "grossly disorderly" conduct, for uttering a single word "shame" once or twice and at the time when he was actually suspended for the day, he was not inside the House at all. Fifthly, there is the fact that the leader of the Swarajya Party protested against the conduct of the

Hon'ble the President at this stage and he most certainly voiced the feelings of all the honest observers in this House when he suggested that the Hon'ble the President had gone too far and was wholly undignified.

I shall not relate the incidents which took place after the suspension of the leader of the Swarajya Party, for they most certainly took place in consequence there of and, human imperfections being what they really are, it is fortunate that other incidents of a graver character did not take place last Thursday afternoon.

Now, there can be no question that this House has the power—the constitutional right—to remove the President from his office. The only question is whether, under the circumstances of the present case, it should be done.

It is no use quoting English precedents here. In England the speaker has not the right to suspend any member on his own responsibility. If he does so, it is done with the authority and sanction of the House of Commons. The result has been that since 1777 till today there have been only two occasions, when a vote of censure was moved against the speaker there. In this unfortunate country of ours, the law is different, as almost everything else is different, and the consequent result is bound to be different too. Because the Hon'ble the President has been given the autocratic powers under the law of the land, therefore the remedy is bound to be drastic. Otherwise, it does not require much intelligence to foresee that suffering would be on one side only—possibly on the wrong side.

Judged from this view point, the question of finality of the President's rulings is of limited significance. In the eyes of law, only those rulings of the President are final, which are correct. His wrong rulings are to be corrected by the House. To my mind, the method of correcting his wrong rulings by proposing his removal is too cumbrous and serious and the direct method of applying the petty correctives on the spot is more effective and less consequential, at least so far as the honest mistakes of the honest speakers are concerned. Most of my English friends will perhaps disagree with me here, but that will be due to the fact that they have been great lovers of decorum for centuries together. I am sure, my continental friends will agree with me.

I must however, make it perfectly clear that we do not bear any

grudge or ill-will towards the Hon'ble Kumar Shib Shekhareswar Ray. We have also very nearly forgotten the fact that he got himself elected by the Government votes. We also decline to take notice of the remarks which the Hon'ble the President made outside this House to some of our colleagues, as to how he proposed to deal with the members when such an occasion arose. I shall indeed be too glad to be told that my information on this point is incorrect. He was one of us and he is our President now. We realise that by exposing him we are likely to court criticism from the enemy quarters. But how else, may I ask, can our grievances be remedied. How else can we make our President more dignified and less erring. As Mr. John Redmond said in 1902 when Mr. Mooney moved a vote of censure on the then speaker of the House of Commons, "such power as that vested in the Chair would be intolearable unless there existed in the House itself the power of reviewing, under proper condition, those decisions. If no such power existed, then the freedom of discussion would be a thing of the past".

Perhaps for all these reasons the Times of London once said that the speaker should have the following qualifications :

(1) Imperturbable good temper, tact, patience and urbanity ;
(2) a previous legal training, if possible ;
(3) absence of bitter partisanship in his previous career ;
(4) the possession of innate gentlemanly feeings which involuntarily command respect and deference ; and
(5) personal dignity in voice and manner.

To these indispensable requirements, a writer says, might be added the importance of a sense of humour in the holder of the office, for many a delicate situation has been saved, specially in recent times, by the speakers possessing this precious gift of nature.

I am afraid, our President lacks in many of these qualities. Not having been a lawyer himself, his rulings are sometimes wrong and he is tactless and undignified. He often forgets that he is a servant of this House and as such his sense of dignity cannot possibly be keener or higher than that of them who elected him. He is perhaps not aware of the "predominantly judicial character of his office", nor could he be well-acquainted with the so-called "melancholy events" with which the continental parliaments abound in these of rising and advancing democracy. And the incidents of Thursday last fully support

my contention.

Sir Abd-ur-Rahim had not given notice of his amendment seven days before the day fixed for the discussion of the resolution and the Hon'ble the President was right in disallowing it at the first instance. The power bestowed upon him under section 77(1) is an extraordinary power, giving him jurisdiction to allow any amendment to be moved without notice, but that jurisdiction was not to be arbitrarily exercised. There might have been members who would have attended the meeting, if they knew that Sir Abd-ur-Rahim was going to move his amendment on that date. I don't know if the Hon'ble the President had noticed the difference in language between Rule 37 and Rule 77 and after once deciding in favour of the objection raised by so many members of the House, he ought not to have taken upon himself the entire responsibility of allowing the amendment again.

In any case, there was reasonable ground to hold that he was exercising his jurisdiction arbitrarily and if Maulvi Md. Nurul Huq Chaudhury had said in whisper that it was so, the Hon'ble the President ought not to have taken notice of it. That Maulvi Md. Nurul Huq Chaudhury had said it in whispers is clear from the fact that the President had not heard him, at least distinctly, for then he would not have asked the Maulvi Saheb 3 or 4 times to repeat the remark. I distinctly remember that when the Hon'ble the President asked the Maulvi Saheb to repeat his remark on the first occasion, Maulvi Md. Nurul Huq Chaudhury did not reply to it at all. If the Hon'ble the President was dignified and tactful, he ought have stopped there. But he did not do so. He repeated his demand not twice but thrice most certainly and perhaps for a fourth time as well. This was the very height of indiscretion in his part, he ought to have known that the Maulvi Saheb was incapable of telling a lie. He actually goaded Maulvi Md. Nurul Huq Chaudhury to repeat his statement and he sentenced him with a day's suspension, announcing to the world that the Maulvi Saheb was guilty of "grossly disorderly conduct".

Who was in fact "grossly disorderly" may I ask? Did any member honestly feel in his conscience that the words of the Maulvi Sahib, 12 in number, were obstructing them in the discharge of their duties inside the Council? I am sure, none of us felt anything like

it, because most of us did not hear the remark, until the Hon'ble the President himself became angry and showed temper, his whole body trembling and shaking at the time. There have been speakers in the House of Commons, who have decleared that they did not hear the objectionable remarks on the ground that they were made from behind the Chair, or that they were not going to take notice of them, as they were not meant for them. Mr. Chaudhury's remark in whispers ought not to have been taken notice of by the Hon'ble the President, specially when he did not like to repeat it even after 3 or 4 demands from the Chair. But this is not all. The Maulvi Saheb was declared guilty of "grossly disorderly conduct' and suspended for the day, without any reference to the House as if the Hon'ble the President had come prepared to teach him and other little boys of this House a lesson in obedience on the very floor of this Hall. "Grossly disorderly" conduct indeed? He uttered only 12 words which did not reach your ears and therefore you forced him to repeat the same—only those 12 words—and then declare that he is guilty of grossly disorderly conduct : Indiscretion and tactlessness could not go any further.

Then, Dr. Ray shouted the word "shame" once or twice—Sir, you had yourself done so at the top of your voice and looking full at the face of Sir Evan Cotton, our late President, and you knew full well that he never suspended you or anybody else for the use of that word. If you had read the Parliamentary debates, you ought to have known that "it is a word which is of recent use and one which is becoming frequent" but for the use of which no member of Parliament had ever before been suspended. You not only suspended Dr. Ray but you did so under certain tragic circumstance. Dr. Ray had left the House immediately after the use of the word and yet you called upon him in his absence or perhaps within your knowledge, to withdraw the word. And because it was not withdrawn—it could not be withdrawn by Dr. Ray as he had left the House already—you were of opinion that his conduct was also "grossly disorderly" and you suspended him for the day and asked him to withdraw from the House immediately.

I have never been able to understand how, the Hon'ble the President could request Dr. Ray to withdraw his word while he was not in the House, perhaps with the President's knowledge, how

could Dr. Ray withdraw the word in his absence from the Hall, how could Dr. Ray's conduct become "grossly disorderly" when he could not be seen anywhere in our midst and how could he be asked by the Hon'ble the President to withdraw from the House, when he had already done so.

As I witnessed these incidents one after the other, sitting silently in the midst of this western block, the idea naturally came to my mind that our President was not only inherently incapable at times of becoming serious, but he was very much prone to exaggerate his own personal importance, as distinguished from the importance of his office. In my humble opinion, he forgot that the President of a representative institution like ours has no separate existence at all. If I were in his position I would have at once got up and said than by crying shame upon their President, the members were crying shame upon themselves and the matter would have ended then immediately. He wrongly thought that he was more dignified that his erstwhile colleagues and to my mind that is the main reason why we are in the midst of this difficulty.

After Dr. Ray's expulsion, the leader of the Swarajya Party very rightly protested against the conduct of the President and his description of the conduct was not at all wrong. In fact I thought the President would now realise the situation, which was his own creation, and settle matters amicably then and there. But he not only did not do so, he further suspended the leader of the most popular party in this House without realising the magnitude and gravity of the matter in anyway. No leader of any party had ever before been suspended anywhere in this world, on the contrary, when such incidents have cropped up, their assistance and advice have always been sought for by the Presidents. It was only in December last that Mr. Adamson was suspended by the House of Commons and Mr. Baldwin brought about an amicable settlement by declaring that it was not a case of premeditated infringement of the manner and customs of the House. "I am quite convinced", he said, "it arose from one of those temporary losses of control which occur to most people, and which most of us regret heartily as soon as the occasion has passed".

After all, the institution which the President represents can exist only by conventions of a tolerant character and no amount of law

or rule can possibly work it smoothly, without those conventions. And the person who has, for the time being, the greater power among the two, is the person who should be held responsible for the creation of such difficulties.

It appears this noble sentiment is not shared by all the parties concerned in this case. So much so, that some of us have been forced to realise that, even in a matter like this, we have got to vote according to party lines. It is a pity—a thousand pities—that this strength of party voting has stood in the way of amicable settlement in spite of our repeated serious efforts. The House should realise what would happen if a Swarajist were eleced President and if he suspended Sir Hugh Stephenson in the way the leader of the most numerous party has been suspended by the Hon'ble Kumar Shib Shekhareswar Ray.

We feel, however, that we can now vote for this motion with a clear conscience—we can not be accused of any premeditation at the commencement of this incident, nor can it be said that we were ever unwilling to settle the matter amicably. It is the intervention of a third party which has brought about this difficulty when practically everything was settled and the responsibility shall be their who are ruining the harmonious relations of this House.

With these words, I recommend this motion for the acceptance of the House.

আস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রদত্ত ভোট

AYES

Ahamad, Maulvi Asimuddin.
Ahmed, Maulvi Zannor.
Bagchi, Babu Romes Chandra.
Baksh, Maulvi Kader.
Banerjee, Dr. Pramathanath.
Banerjee, Babu Satya Kishore.
Banerjee, Mr. A.C.
Basu, Babu Sarat Chandra.
Biswas, Mr. Abdul Latif.
Bose, Babu Bejoy Krishna.
Chakravarti, Babu Jogindra Chandra.
Chakravorty, Babu Sudarsan.
Chatterjee, Babu Umes Chandra.
Chaudhuri, Maulvi Saiyed Abdur Rob.
Chaudhuri, Rai Harendranath.
Chaudhury, Maulvi Md. Nurul Huq.
Chunder, Mr. Nirmal Chandra.
Das, Dr. Mohini Mohan.
Das Gupta, Dr. J.M.
Datta, Babu Akhil Chandra.

Dey, Babu Boroda Prosad.
Gafur, Maulvi Abdul.
Ganguly, Babu Khagendra Nath.
Haldar, Mr. S. N.
Khan, Maulvi Abdur Reschild.
Khan, Maulvi Amanat.
Khan, Maulvi Mahi Uddin
Mahammad, Maulvi Basar.
Maity, Babu Mahendra Nath.
Mitra, Babu Jogendra Nath.
Mukerjee, Babu Tarahanath.
Nasker, Babu Hem Chandra.
Neogi, Babu Manmohon.
Quader, Maulvi Abdul.
Ray, Babu Abanish Chandra.
Ray Babu Surendra Nath.
Ray, Dr. Kumud Sankar.
Roy, Babu Manmatha Nath.
Roy, Babu Satcowripathi.
Roy Dr. Bidhan Chandra.
Roy, Mr. D. N.
Roy, Mr. Kiran Sankar.
Roy Chaudhuri, Babu Sallaja Nath.
Roy Choudhuri, Rai Bahadur Satyendra Nath.
Sarkar, Babu Hemanta Kumar.
Sarkar, Babu Naliniranjan.
Sasmal, Mr. B. N.
Sen, Mr. N. C.
Sen Gupta, Mr. J. M.
Hoque, Maulvi Sayedul.
Hossain, Mzulvi Wahed.
Huq. Mr. Mahbubul.
Joardar, Maulvi Aftab Hossain.
Khan, Babu Debendra Lal.
Suhrawardy, Mr. H. S.
Tarafdar, Maulvi Rajib Uddin.
Yasin, Maulvi Muhammad.

NOES

Addamas-Wiltiams, Mr. C.
Addy, Babu Amulya Dhone
Ahmed, Maulvi Tayebuddin.
Ahsanullah, Mollah
Ali, Maulvi Sayyed Sultan.
Ali, Mr. Altaf.
Banerjee, Rai Bahadur Abinash Chandra.
Barma, Rai Sahib Panchanan.
Basu, Babu Jatindra Nath.
Birley. Mr. L.
Campbell, Mr. K.
Chakravarti, Mr. Byomkes
Chaudhuri, the Hon'ble Nawab Bahadur
Aiyid Nawab Ali, Khan Bahadur.
Child, Mr. R.H.
Chowdhury, Maulvi Fazial Karim.
Chohon, Mr. D. J.
Coper, Mr. C.C.
Coreoran, Mr. B.J.
Crawford, Mr. T.C.
Das, Babu Charu Chandra.
Das, Rai Bahadur Amar Nath.
Daud, Mr. M.
De, Mr. K. C.
Donald, the Hon'ble Mr. J.
Doss, Rai Bahadur Pyari Lal.
Drummand, Mr. J.G.
Dutt, Mr. G. S.

Faroqui, Khan Bahadur K.G.M.
Forrester, Mr. J. Campbell.
Ghuznavi, Hadji Mr. A. K. Abu Ahmed Khan.
Goenka, Lal Bahadur Badridas.
Guha, Mr. P. N.
Haq, Khan Bahadur Kazi Zahirul.
Heard, Major General Richard.
Hopkyns, Mr. W. S.
Hossain, Hawab Musharruf, Khan Bahadur.
Huq. Maulvi A. K. Fazl-ul.
Huq, Maulvi Ekramul
James, Mr. F.E.
Jennaway, Mr. J.H.
Lal Mahammed, Haji.
Law, Raja Reshee Case.
Liddell, Mr. H.C.
Lindsay, Mr. J.H.
Masih, Mr. Syed M.
Mitter, Sir, Provash Chunder.
Moreno, Dr. H.W.E.
Morgan, Mr. Q.
Mukherji, Mr. S.C.
Nandy, Maharaj Kumar Sris Chandra.
Oaten, Mr. E.F.
Pahlowan, Maulvi Md. Abdul Jubbar.
Philip, Mr. J.Y.
Rahim,Sir Abd-ur.
Raikat, Mr. Prassanna Deb.
Ray, Babu Nagendra Narayan.
Ray, the Hon'ble Maharaja Kshaunish Chandra.
Ray Chaudhury, Mr. K.C.
Ray Chaudhuri, Raja Manmatha Nath.
Roy, Mr. S. N.
Roy, Mr. Tarit Bhusan
Roy, Raja Maniloll Singh
Sarkar, Maulvi Allah Bukhsh,
Simpson, Mr. J.W.A.
Skinner, Mr. S.A.
Snaith, Mr. J.F.
Stephenson, the Hon'ble Sir Hugh.
Suhrawardy, Dr. A.
Travers, Mr. W.L.
Wilson, Mr. R.B.
Woodhead, Mr. J.A

The Ayes being 57 and the Noes 72 the motion was lost.

পরিশিষ্ট ঘ

প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ বিধানসভায় এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি রাজবন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে ইংরেজ কর্মচারীদের বিরোধিতার উল্লেখ করেন। গভর্নর ও রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে তিনি আরও যে সব অভিযোগ আনেন তার মধ্যে প্রধান হলো ঃ (১) 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরে পাইকারী হারে জরিমানা ধার্য করার বিরুদ্ধে মন্ত্রিসভার প্রতিবাদ গভর্নর গ্রাহ্য করেননি, (২) অত্যাচারী সরকারি কর্মচারীদের বদলির ব্যাপারে মন্ত্রিসভার সুপারিশ গভর্নর নাকচ করে দেন, (৩) ভারত-ছাড়ো আন্দোলন মোকাবিলার ব্যাপারে ভারত সরকারের সারকুলার মন্ত্রিসভায় আলোচনার দাবি জানান মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক কিন্তু গভর্নর তা বাতিল করে দেন, (৪) 'ডিনায়েল পলিসি' সম্বন্ধে মন্ত্রিসভা যে 'নোট' তৈরি করেছিল গভর্নর তার কোনও গুরুত্ব দেননি। এই বিবৃতিতেই শ্যামাপ্রসাদ গভর্নর হারবার্ট সম্বন্ধে বলেন, ক্লাইভ স্ট্রিটের সওদাগরি অফিসের বড়বাবু হওয়ার যোগ্যতা তাঁর নেই। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতির সারাংশ প্রদত্ত হলো ঃ

(সূত্র ঃ প্রোসিডিংস, ভল্যুম ৬৪, ১২.২.১৯৪৩ পৃঃ ২৫-৩৫)

...my resignation has not been due to any want of confidence me either by the House or the party to which I belong nor it has been due to any difference of opinion either with the Chief Minister or any of my colleagues on any question of public importance.

"I felt compelled to resign first because I found that the continued policy of the British Government and the Government in this country was to ignore the claims of Indians to fuller political power, to hamper good government consistent with the full interest of the people and to weaken the forces of peoples' defence against enemy aggression".

"The letter which I wrote to the Governor, along with several other documents had been proscribed. It is clear that a Minister's accusation of autocratic misrule need not be replied with fact and figures but must be suppressed under arbitrary rules. What grandeur conception could the British authorities hold before us of responsible government in India".

"The reign of repression that we have witnessed in India since August last has been directed not only against a so-called subversive

movement but against every form of nationalist activities, calculated to mobilise the will-power of Indians to throw off a foreign rule they intensely dislike. As our British friends from a high moral attitude rebuke Hitler, so let us remind our masters that the history of all oppressed countries has for ever shown that greater is the repression by the oppressor, the more intense is the urge of the oppressed to unite and struggle for their rights.

For the first time in the history of the province representatives of large sections of Hindus, Muslims and other communities combined to work the provincial constitution under Fazl-ul-Huq. To me personally nothing would be of greater satisfaction than to see a combination of all the Indian elements in the legislature on the basis of a common programme, to fight for the rights of the people in this critical period of the history of Bengal."

"In any case, even the combination that we have formed under the leadership of Mr. A. K. Fazl-ul-Huq proved something too bitter to be swallowed by a section of permanent officials in this province and by no less a person than the head of provincial administration himself. British rule thrives in the eyes of the outer world on the constant strifes between Hindus and Muslims. and even a partial unity on the part of members belonging to these two great communities served as a nightmare to those bureaucrats who held in their hands the real power of administration."

"The Indian Ministers have very little real power which lies vested in the autocratic hands of the Governor. Section 52 clothes the Governor with special responsibilities who has at his back and call the services of a small coterie of unsympathetic and unimaginative civil servants, utterly oblivious of the real interests of the people of the province".

"Thus a man who by reason of his administrative and personal qualities may not even be competent to become a head cleark in Clive Street or who by reason of his capacity for carrying on intrigues or setting one against the other may at least adorn a modest chair in Elysium Row finds himself raised to the giddy height of Governorship of Indian Province."

"The advice tendered by Minister was invariably subject to revision in the light of counsel tendered by more trusted members of the service whose omnicompetence was almost of a divine character."

"Let me make this appeal to all sections of this House so that we may unite in our own struggle to uproot tyranny and oppression. We have often fought with each other and thereby not only weakend ourselves but have strengthened those reactionery forces whose very continuance depends on our differences. Today, in the crisis that threatens us, not as Hindus or Muslims but as Bengalees and Indians, let us demand the inaugusration of an administration which will recognise our just economic and political rights. A Hindu or a Muslim may differ on many things. But do they not equally detest slavery—and it is for ending the state of intolerable slavery that I am asking for your support and co-operation."

পরিশিষ্ট ঙ

প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন সরকারকে গদিচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর গভর্নর হারবার্টের চক্রান্তে পূর্বে টাইপ করা পদত্যাগপত্রে সই করতে ফজলুল হক বাধ্য হন। এই সংক্রান্ত চিঠিপত্র পেশ করে ৫ জুলাই ১৯৪৩ ফজলুল হক বিধানসভায় এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। লক্ষণীয়, ১৫ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে হারবার্ট ফজলুল হকের কাছ্ থেকে কৈফিয়ৎ চান ; প্রত্যুত্তরে ফজলুল জানান, কৈফিয়ৎ তো তিনি দেবেন-ই না, বরঞ্চ গভর্নরকে "মৃদু সতর্ক" করে দিয়ে জানান, ভবিষ্যতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পত্রালাপে গভর্নর যেন এই ধরনের অশোভন ভাষার ব্যবহার পরিহার করে চলেন।
(সূত্র ঃ প্রোসিডিংস, ভল্যুম ৬৫, ৫.৭.১৯৪৩ পৃঃ ৩৯-৬৩)

গভর্নর হারবার্টের পত্র ঃ

"Government House,
Calcutta,
The 15th February, 1943

My Dear Chief Minister,

I have received information which I have difficulty in crediting in view of your report on Midnapore at your last interview, that you have given today in the Legislature an undertaking for an enquiry into the conduct of officials in that district. You are well aware that this subject attracts my special responsibilities and you are also well aware of my views on the undesirability of enquiries in this matter. If my information is correct, I shall expect an explanation from you at your interview tomorrow morning of your conduct in failing to consult me before announcing what purports to be the decision of the Government.

Yours sincerely,
J. A. HERBERT

The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Huq."

ফজলুল হকের জবাব ঃ

114-A, New Park Street, Calcutta,
The 16th February, 1943

Dear Sir John,

In reply to your letter of the 15th February, 1943, I write to say that I owe you no exaplanation whatever in respect of my conduct

in failing to consult you before announcing what according to you is the decision of the Government ; but I certainly owe you a duty to administer a mild warning that indecorous language such as has been used in your letter under reply should, in future, be avoided in any correspondence between the Governor and his Chief Minister.

During my last interview I certainly did not convey any impression that the affairs of Midnapore did not call for an enquiry. That interview only lasted for 15 to 20 minutes, and reference to Midnapore in the course of the discussion did not take up more than 5 minutes. It was for the first time during the last 5 months that I had been to Midnapore and even that for only 6 hours. I could only visit 2 or 3 villages, which are alleged to have been scenes of some outrages on women. All that I told you was that there had been no regular enquiry and it was difficult to say whether there were no exaggerations or whether these allegations were true. It was obviously impossible for me to give you anything like a report about Middapore. As a matter of fact, I had been asking the Home Department officials to let me have the Government version about Midnapore. But they utterly failed to do so or at any rate, could not supply me with any report, except a scrappy note which was handed over to me by Mr. Porter in the Assembly House during the course of the debate yesterday. Even these notes do not, in the least, pretend to touch even the fringe of the various serious allegations that were made yesterday on the floor of the House. It is, therefore, incorrect to say that I had given you any report about Midnapore. I do not know what you mean by this remark but let me tell you that I know nothing about what has happened in Midnapore, nor was it possible for me to give you any information, nor did I actually give any report about the happenings in the district.

Permit me to tell you that the adjournment motion was tabled on Friday and the whole of the Home Department knew, and I am absolutely certain that you yourself knew, that serious allegations were going to be made about the happenings at Midnapore. In the course of the speech made by Dr. Syamaprosad Mookerjee on the opening day of the Session, he did not, mince matters about Midnapore and he gave sufficient indications of the kind of speeches that would be made on the floor of the House in the course of the

Debate. It is impossible for me to believe that you did not feel that there would be an insistent and almost irresistible demand for an enquiry from all sides of the House. If your feelings have been that no enquiry should be instituted, it was your clear duty to send for me and tell me that whatever the demand may be and from whatever side it may be, I was to have told the House that you were opposed to such an enquiry and therefore no enquiry can be promised by Government. Let me add also that since Saturday, we had been closetted together with higher officials of the Home Department who knew we were in favour of an enquiry. How can I believe after this that you knew nothing about a very certain demand that would be made for an enquiry? You neglected your duty in sending for me and, now you accuse me that in the House I gave an unauthoritative decision of Government. When I was in the House, I found that not only were the most serious charges brought by responsible members of the House, but that the demand for an enquiry was not opposed by a single member. Even the European Group kept silent and the Opposition were loudest in condemning us for not having made enquiries long before. In the circumstances, I felt, in consultation with my colleagues, that it was impossible to resist the demand for the enquiry that had been made.

I enclose herewith a copy of the concluding portion of my speech which I delivered yesterday on the floor of the House. Contrary to my usual practice, I read out from a manuscript the last portion of my speech. A perusal of the speech will convince you that what I said was that the Council of Ministers, as distinguished from Government, were agreed that it would be expedient to hold a committee of enquiry if only with a view to exculpating the public servants from the very grave charges such as had been levelled against them. You will thus see that the question whether or not the Council of Ministers should tender to you a particular advice does not come within the purview of your special responsibilities, even if it be conceded that the acceptance of such advice would involve the exercise of your special responsibilities. In these circumstances, I do not think that in so far as my statement in the Assembly is concerned any of your special responsibilities are attracted. If and when the Council of Ministers tenders to you advice contemplated in the penultimate sentence of my speech, it will then be for you

to consider whether in accepting this advice your special responsibilities are attracted.

It appears from your letter that you are not prepared to give your consent to the constitution of a committee of enquiry. If so, the only course left open to me is to make a statement in the House in which I shall endeavour to explain that my statement made yesterday should not be taken as a commitment on the part of the Government to a committee of enquiry, and that I propose to read out to the House your letter under reply so as to explain my position. I shall not however do so without giving you previous notice. My colleagues and I are responsible to the Legislature and the Legislature has a right to expect a sufficient explanation as to why a committee of enquiry cannot be constituted. The only explanation which I can offer is the letter I have received from you.

I was due for an interview with you this morning at 10. I have already verbally, indicated to your Private Secretary that it will not be possible for me to go and see you, because I consider that unless sufficient amends are made for the language used in your letter under reply, no useful purpose would be served by an interview which would admittedly have been carried out in a spirit of anger.

Yours sincerely,
A. K. Fazlul Huq

His Excellency Sir John Herbert, G. C. I. E.,
Governor of Bengal.

পরিশিষ্ট চ

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট নারকীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর বিধানসভায় প্রায় প্রতিটি অধিবেশনই দাঙ্গা নিয়ে বিতর্ক, মুলতুবি প্রস্তাব এবং পরিশেষে সুরাবর্দী-মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আসে। ১৯ সেপ্টেম্বর অনাস্থা উত্থাপন করেন কংগ্রেস দলের সহকারী নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বিধানসভার কার্যবিবরণীর প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা জুড়ে এই অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সদস্যদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা আছে। কমিউনিস্ট সদস্য জ্যোতি বসু, কংগ্রেস নেত্রী বীণা দাশ এবং সদ্য মুসলিম লীগে যোগ দেওয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের বিবৃতি নিম্নে দেওয়া হলো।

(সূত্র ঃ প্রোসিডিংস, ভল্যুম ৭১, নং ৩, ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬, পৃঃ ১২৫-১২৮, ১২৯-১৩০, ১৪৬-১৪৯)

MR. JYOTI BASU : Mr. Deputy Speaker, Sir, I feel I must participate in this debate as a representative of a working class constituency composed of both Hindus and Muslims and let us pay a tribute to the working class of Calcutta and its suburbs for keeping comparatively aloof from the carnage that has disgraced our city and blackened most horribly our political life.

I shall not attempt to depict the savagery, cowardice and inhumanity to which thousands of people descended but I would ask all members of this House and my countrymen outside in all seriousness not to forget for a moment that whatever we say or do must be with a view to salvage, at once and with all the good will, political insight and the spirit and strength of our people, their doubtless determination to fight imperialist trickery and win the freedom for which both Hindus and Muslims ache in every limb. In Bengal for life and liberty the only way out is a coalition ministry with our backs turned on the Europeans with a progressive programme. The method of a achieving it is not through votes by sitting round a table. Let us put first things first, and before we billory the Ministry—which has an enormous amount of acts of omission and commission to account for—let us see the prime mover in the dastardly game against us, let us with all our indignation realise that it is British Imperialism our enemy No. 1 which keeps us down, keeps us divided and maddens our people and now proudly maintains in Calcutta a miserable desert peace that might break any moment.

Every time previously we have had a communal riot we have rightly condemned Imperialism as its main instigator and seen in our people only hopeless, pathetic pawns in imperialist hands. There is no reason to think differently now. I accuse with all the patriotic force I can command to main criminals who sit complacently whether in Whitehall or New Delhi or Calcutta's Government House and pull strings and make our leading political parties walk into their trap. What a neat game the Cabinet Ministers played for the last six months, mouthing honeyed phrases, luring the Congress once and League another time. They announced proposal which are capable of varied interpretations. Finally they instead of leaving our country with their army gives an award which gives neither freedom, nor democracy nor self-determination but is calculated to perpetuate our conflict and poison the minds of one section of our people against another and which finally led to the cataclysm that happened in Calcutta. Coupled with all this I ask, Sir, what were the secret plans discussed at the Governors conference presided over by the Viceroy after which the Sind Governor disallowed the declaration of holiday on the 16th August and the Bengal Governor did the contrary in Calcutta, the seat of British business. How was it that Government had literally abdicated in Calcutta for two days and who saw to it that the police abstained from their ordinary duty and helped in loot and arson? We have known how the police break up strikes. We have seen how they acted on Rashid Ali Day to disperse our revolutionary youth; that is how they act in suppressing people's upsurge. We have experience how in 1942 the police let loose their terroristic rule without reference to the Ministry. But this was an occasion when the people fell apart and they realised their rule would be strengthened. Hence it will not avail these autocrats to take shelter behind constitutional procedure. Would they have done the same thing if Englishmen were waylaid or their property looted or military trucks burnt ? This is what is palpable and meets the eye, but one case, only guess the diabolic method of the C.I.D. in working up the riot because presumably they knew of the preparations that were afoot. Therefore I assert, Mr. Deputy Speaker, this malevolent neutrality of the Governor and the Police Commissioner was deliberately planned.

Mr. Suhrawardy and his Ministers are attempting to say that their

business is only to give orders and it is the Police Commissioner's to carry it out. But Mr. Suhrawardy knows, saw it with his own eyes, felt it on the wind screen of his car on the noon of the 16th August that the crowds were getting out of control. It was his business to see that the Police Commissioner under him carry out his duty. But there is nothing to show the Prime Minister acting in a determined way. Is he thinking of suspending the Police Commissioner or other Deputy Commissioners who failed to do their duty? He lacks courage because he knows his own failure is the miserable failure of his Government. But the Muslim League Minister is not separate from the Muslim League Party and the latter must bear responsibility for its acts of omission and commission. In spite of every thing I maintain that imperialist policy could never have landed us in catastrophe but for the part played by the League and the Congress falling victims to the evil conspiracy.

Thus I shall cite in brief the responsibility of the League first :

(1) The "Azad" on 15th August editorially explained the significance of the 16th August as the day when the battle for Pakisthan begins.

(2) The All-India League Council characterised both the British and Congress as enemies.

(3) Maulana Akram Khan and Mr. Osman reminded the Muslims that in the sacred month of Ramzan jihad against the kafirs had been undertaken.

(4) The knight-errant Mr. Nazimuddin repeatedly emphasised that Muslims were not pledged to non-violence.

(5) The brave Mr. Suhrawardy declared that he would declare Bengal independent and defy the authority of the centre if the British Government made a unilateral settlement with the Congress.

(6) The All-India League Council's Direct Action was meant to force the Congress to accept the Cabinet Mission's statement of May 16th which gives freedom to none and also to accept compulsory grouping without the vote of the people.

(At this stage the member reached his time-limit.)

Sir, may I have a few more minutes?

MR. DEPUTY SPEAKER : I don't think I shall be justified in

giving you more time.

MR. JYOTI BASU : Sir, Mr. Speaker told me that he would alow me 10 minutes. Would you kindly give me two minutes more?

MR. DEPUTY SPEAKER : No, One minute.

MR. JYOTI BASU : Want two minutes more.

Is it to be wondered, Sir, that a section of the Muslims took their leaders seriously and made practical preparations for the Direct Action and were led to a fratricidal strife by which the British forged fresh chains for us and only British life and property became safe and Hindus and Muslims looked at one another with fear and distrust. On the other hand the Congress instead of organising an all-out offensive against British Imperialiam has accepted the British plan knowing that the British army is not leaving, the princes will have a dominant voice and that ultimate power remains with the British. Thus the Congress face the Opposition of the Muslim League within the British scheme and has to prepare politically and psychologically against it. That is why the Muslim league Direct Action is taken as a threat to the Congress and a successful hartal is looked upon with disfavour. So passions are roused in Desapriya Park âgainst the day on the 15th August.

Even now with all our experience, we say that British troops cannot give us peace ; curfew order, section 144 and suppression of civil liberties will not bring back brotherly trust and fellow feeling. Appeals to the Viceroy to get rid of this Ministry will not help and neither will the attempt to overthrow it solve our problems. Because "what next" the people will ask. It is of no use the League making excuses that without coalition at the Centre no coalition in Bengal is possible. It must realise what our people have been reduced to under a one-party Ministry. It is only in a spirit of patriotism that the political parties can together save Bengal by working for a Coalition Ministry, a Ministry which will deal with the Europeans and follow as I have stated a programme of progressive legislation, living wages, protection of unions, abolition of landlordism, fair minimum price of jute, adequate food and cloth for all, complete civil liberties and release of remaining political prisoners.

We shall therefore not vote for any side in this debate arising out of resolution of no-confidence. It will only fan the flames of a war.

Our appeal goes to our common people—Hindus and Muslims—to mobilise their forces, so that they may not be involved again and again in mutal slaugater leading to the smashing of our trade unions, ending our fight for more wages and better conditions of life and strengthening the Europeans civil rule. In the spirit of Rashid Ali Day, R.I.N. rating mutiny, I.N.A. trials movement and General Strike of July 29th; the people, the united people will force the leaders to work together and common humanity will march on to peace and freedom. It is time for them to say, "never, never again shall we raise our hands against our brothers; never never again shall we tolerate those who speak in terms of Hindus and Muslims and make a fight".

MISS BINA DAS : মাননীয় স্পিকার মহোদয়, বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে প্রস্তাবকে সমর্থন করবার জন্য আমি দাঁড়িয়েছি। এর প্রয়োজন হবে বলে ভাবতে পারিনি। গত ১৬ই আগস্ট থেকে পাঁচদিন কলকাতায় যা ঘটে গিয়েছে, যা একান্ত অবিশ্বাস্য, নিজের চোখকে বিশ্বাস করা যায় না এমনি সব ঘটনা স্বচক্ষে দেখার পর একবারও মনে করতে পারিনি-আবার ঠিক এইভাবে আমরা মিলবো, এইভাবে এই মন্ত্রীমণ্ডলীরই সামনে দাঁড়িয়ে এমনি করে কথার মালা গেঁথে আমাদের নিদারুণ অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দাহকে ভাষা দিতে যাব। পনেরো আনা হেরে যাবার সম্ভাবনা সামনে রেখে অনাস্থা প্রস্তাবের সাহায্যে মন্ত্রীমণ্ডলীকে অপসারিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে হবে। বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য নাহলে এর চেয়ে অনেক অনেক শতাংশেরও কম অপরাধে কত দেশে কত রাজশক্তি ধুলায় লুটিয়ে গিয়েছে। বাংলার গণশক্তি আজও সুপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত, নাহলে শুধু এই কলকাতা শহরের জনতার শক্তি ছিল হিন্দু-মুসলমান, নরনারী নির্বিশেষে শুধু এই কলকাতার জনগণই পারতো এই মন্ত্রীমণ্ডলীকে বিনা ক্লেশে গদী থেকে টেনে নামিয়ে দিয়ে বাংলার প্রতিনিধিমূলক শাসনের নামে যে উন্মাদ শাসন চলছে তাকে বন্ধ করে দিতে। কিন্তু যা হওয়া উচিত ছিল, তা হল না। দেখা গেল বাংলা দেশে সবই সম্ভব হয়। এখানে প্রতিষ্ঠিত popular Government-এর চোখের সামনে যেমন অনায়াসে হাজার হাজার নিরপরাধ লোককে পাঁচদিন ধরে লাঠি পিটিয়ে ছোরা ঘুঁচিয়ে মেরে ফেলা যায়, সর্বস্বান্ত করে দেওয়া যায়, তেমনি আবার সেই গভর্নমেন্টকেই কায়েম করে রাখবার জন্য বাংলার জনগণের প্রতিনিধি দলই পরম ব্যগ্র থাকে। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে এখনি কাগজের বা মুখের অনাস্থা প্রস্তাবের মূল্য কতটুকু সে বিষয়ে সন্দেহ হয় সকলেরই। শুধু চুপ করে থাকা অসম্ভব। তাতে অপরাধ করবো তাদের কাছে, যারা আমায় এখানে পাঠিয়েছে। যেসব মায়েদের চোখের সামনে তাদের বুকের শিশুদের আছড়ে মেরে ফেলেছে, যে স্ত্রীদের দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে স্বামীকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয়েছে,

যেসব নারীরা নারীত্বের চরম অপমানের গ্লানি কোন অজ্ঞাতস্থানের অন্ধ দায়ে আজও বহন করে চলেছে, যাদের উদ্ধারের কোনও ব্যবস্থা আজ অবধি করা হয় নাই, তাদেরই প্রতিনিধি হয়ে আর কিছু যদি নাও পারি অন্তত এই আইনসভার মধ্য দিয়ে আমার সাক্ষী রেখে দিয়ে যাব এই মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে দুর্বলের শরণাগতের রক্ষা যাঁরা করেনি অসংখ্য নরনারীর সর্বনাশের কারণ যাঁরা হয়েছেন।

এখানে একটা কথা আমি বলে রাখতে চাই। এই অভিযোগ আজ যখন আমি করছি, তখন কোন দলের ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে করছি না আমি যে একজন কংগ্রেস কর্মী সে পরিচয়ও আমার কাছে বড় হয়ে উঠছে না। মানুষের চরম নির্যাতন নিজের চোখে দেখেছি বলেই আজকের মন্ত্রীমণ্ডলীকে প্রশ্ন করছি কেন তাঁরা এতগুলি সবচেয়ে অসহায়, সবচেয়ে নিরপরাধ মানুষকে এমন করে হত্যা করতে দিলেন? কেন এই কলকাতা শহরে ফোর্ট উইলিয়ম পুলিশ, মিলিটারী বেষ্টিত কলকাতায় যেখানে সামান্য দু' একটা মিলিটারী লরী পুড়লে সমস্ত কলকাতা পুলিশ মিলিটারীতে ছেঁকে ধরে রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেয়, সেই কলকাতায় পাঁচ পাঁচটি দিন ধরে গুণ্ডার হামলা চললো, অথচ কোথাও কোনও রকম পুলিশের প্রতিরোধ দেখা গেল না। কেন প্রধানমন্ত্রী ৭২ ঘণ্টা ধরে থাকা সত্ত্বেও বহু টেলিফোনে বহু জায়গা থেকে, এমন কি বহু নারী প্রতিষ্ঠান থেকেও বারে বারে চাওয়া সত্ত্বেও কোথাও কোনও সাহায্যই পাওয়া যায়নি? পুলিশের পক্ষে তখনকার অবস্থা থামানো সাধ্য ছিল না, এটা মিথ্যে কথা। কারণ একথা সকলে জানেন যে সে কদিন বিশেষ করে প্রথম দুদিন বহু জায়গায় গিয়েছে পুলিশের সামনেই দোকান ভেঙে ফেলছে, মানুষকে মেরে ফেলছে, সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে হাসছে কোথাও লুটের মধ্যে নিজেরা যোগ দিচ্ছে এবং এমনও বহু জায়গা ছিল যেখানে ২/৩ মাইলের মধ্যে বড় রাস্তার উপরও একজন লাল পাগড়ী বা একটিও armed car দেখা যায়নি। আমার এই কথায় যাথার্থ্যের সাক্ষ্য দেবেন এখানে প্রত্যেকেই, যারা তখন কলকাতায় ছিলেন এবং আমি জানি একজনও এখানে নেই যিনি এর প্রতিবাদ করতে পারেন। এ সত্ত্বেও আজ প্রায় এক মাস হয়ে গেল, পুলিশের এই আচরণের কোনও explanation জনসাধারণকে দেওয়া প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজন বোধ করেননি। মন্ত্রীমণ্ডলীকে সমর্থন করতে গিয়ে কেউ কেউ প্রচার করছেন—সে সময় পুলিশের বিদেশীয় কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রীর কথা না শোনাতেই সে রকম ব্যাপার হতে পেরেছে। কিন্তু সেখানে আমাদের প্রশ্ন সে কথা যদি সত্য হয় তবে প্রধানমন্ত্রী কেন তৎক্ষণাৎ সে কথা প্রকাশ করে দিলেন না? তাঁর আদশে অমান্য যারা করে, কেন তাদের পদচ্যুত করার বন্দোবস্ত তিনি করলেন না? আর সেও যদি তিনি না পেরে থাকেন, তাঁর শক্তিতে না কুলিয়ে থাকে—তাহলে কি শুধু ঐ একটি মাত্র কারণই যথেষ্ট ছিল না তাঁর পদত্যাগ করার? বাংলার

"প্রধানমন্ত্রী" নামে যিনি পরিচিত—পুলিশ বিভাগের ভার তাঁর হাতে থাকবে, অথচ প্রকাণ্ড crisis-এর সময় পুলিশের উপর কোনও কর্তৃত্ব তাঁর খাটবে না, এমন অপমানজনক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকার অপমান তাঁর গায়ে না লাগলেও সারা বাংলার গায়ে লাগে। Provincial Autonomy limitations আমরা জানি, বহুবার তার প্রমাণও পেয়েছি। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মহাশয় যদি আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন যে সেই চরম দুর্যোগের সময় পুলিশ কর্তৃপক্ষ তার কথা শোনেনি বলেই তিনি পাঁচ দিন ধরে সেই মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা থামাতে কোনও চেষ্টা—বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করতে পারেন নি, তাহলে তাকে আমরা বলবো, সমগ্র বাংলার হয়েই বলবো, এই বাংলাদেশকে অন্তত Provincial Autonomy এই হীন পরিহাস থেকে তিনি বাঁচান, মন্ত্রিত্ব তিনি ছেড়ে দিন। মরতেই যদি হয়—সোজাসুজি বিজাতীয় পক্ষের হাতেই আমরা মরব, সামনে আমাদেরই প্রতিনিধিকে এমন করে শিখণ্ডীর মত দাড়িয়ে থাকতে দেব না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাছে পুলিশের বিরুদ্ধে এ ধরনের—অর্থাৎ তাঁর কোন আদেশ না শোনার মত গুরুতর অভিযোগ আমরা আজ অবধি শুনিনি। কাজেই এর পরে জনসাধারণের একটি মাত্র সিদ্ধান্ত করার পথ খোলা থাকে, সে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করেই সে দিন সমস্ত পুলিশকে কলকাতার বুক থেকে অপসারিত করে কলকাতা শহরকে গুণ্ডাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং এরপরেও প্রধানমন্ত্রীর পদে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত রাখা মানে আবার সে অবিস্মরণীয় পাঁচটি দিনের পুনরাবৃত্তির পথ খোলা রাখা। অবশ্য এক হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর বা মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে বলবার বা দাবী করবার আজ আমাদের কিছুই নেই। পরম সঙ্কটের মুখে যাঁরা কলকাতার একান্ত বিপন্ন একান্ত শরণাপন্ন নরনারীর আর্তনাদে কান দেননি, তাঁরা আজও আমাদের এই অভিযোগকে অনায়াসেই হেসে উড়িয়ে দিতে পারবেন। আমার শুধু এই সভার অপর পক্ষের সভ্যদের একবার আজকের এই সুযোগে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—এত অন্যায়ের পরও এই মন্ত্রীমণ্ডলীকে কায়েম রাখতে কিসের জন্য তারা ইচ্ছুক? কংগ্রেসের সঙ্গে, হিন্দুর সঙ্গে রাজনৈতিক কলহ সাম্প্রদায়িক কলহ যত তীব্রই তাঁদের হোক, বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর যে আচরণ তাঁরা নিজের চোখে দেখেছেন, সে আচরণের মূল্য শুধু হিন্দুই দেয়নি দিয়েছে অসংখ্য দরিদ্র অসহায় মুসলমান। তাই মন্ত্রীমণ্ডলীর এই মার্জনাহীন কর্তব্যচ্যুতির পাপকে এভাবে বিনা প্রতিবাদে সমর্থন করে যাবার তাদের কোন্ যুক্তি থাকতে পারে? ইতিহাসদুর্লভ যে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল কলকাতায় কারণ তার যাই হোক, রাজনৈতিক কলহ যত তীব্র ভাবেই তার পিছনে থাকুক না কেন, সে প্রশ্ন আজ নয়। আমাদের শুধু প্রশ্ন কলকাতার সবচেয়ে গরীব অসহায় নিরপরাধ মানুষগুলোকে যে এমন করে কাতারে কাতারে একান্ত অসহায়ভাবে একান্ত নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলা হল অথচ তাদের বাঁচাবার জন্য গভর্নমেন্ট একটি

আঙুলও যে তুলল না—নিষ্পাপ শিশুর রক্তে কলকাতা লাল হয়ে গেল—উপদ্রুত নারীর করুণ আর্তনাদে সারা কলকাতার আকাশ বাতাসকে বিদীর্ণ করে তুললো, অথচ তাদের দেখার জন্য চারদিন ধরে কোনও বন্দোবস্ত গভর্নমেন্ট করতে পারল না, সেই গভর্নমেন্টকেই জনগণের প্রতিনিধি হয়ে তাঁরা যে এভাবে বিনা প্রতিবাদে সমর্থন করে যাবেন—বিশ্বের কাছে কি এর জবাবদিহি? দেশের ইতিহাসের পাতায় কি নির্লজ্জ দুরপনেয় কলঙ্কের কালি তাঁরা লেপে দিচ্ছেন।

আমি আর কথা বাড়াতে চাই না। শুধু বসবার আগে বাংলার সমগ্র নারীর হয়ে বাংলার এই অক্ষম কাপুরুষ মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে আমার পূর্ণ অনাস্থা জ্ঞাপন করে বাংলার এই প্রতিনিধি সভার কাছে অসংখ্য নির্যাতিত নারীর উপর সংঘটিত দানবীয় অত্যাচারের বিচার দাবী করছি।

MR. A. K. FAZLUL HUQ : Mr. Speaker, it has been my lot during my parliamentary career—longer parhaps than that of any other Indian now living—to be faced with awkward political situations but I confess that I have never felt so embarrassed as I do at the present moment in rising to say a few words on the motions before the House. Sir, for more than three years and a half I have been closely associated with the Opposition. Today I am in the thick of the great phalanx on which the Ministers rely for support and even for self preservation. But this is only the objective aspect of the question. There are other things, Sir, far more important and far more embarrassing.

Sir, during the dark days or nights of the Great Killing I watched events from the point of view of a member of the Opposition. The news that came to me trickling down from various sources was unfavourable to the Ministers in power. I was very deeply impresed with the fact that during the whole of these disturbances the machinery of Government had completely broken down in this city. Sir, I pondered deeply over the situation, and if I have risen to say a few words on these motions I wish to tell my comrades in this Assembly what I feel very strongly and which I think ought to be raised before the people of Bengal, if Bengal is to be saved at all from utter extermination. There have been Hindu Muslim quarrels in the past all over India. In many of these quarrels when cases had been started I had the privilege of defending the Muslim accused almost all over the country. But Sir, I have never in the whole course of my life seen anything like the purely fiendish fury with which

both Hindus and Muslims have murdered not merely men or women but even small children. I do not know to satisfy what impulse, human or devilish, which seems to have possessed the Bengalees for those fateful days and nights that countrymen indulged.

Sir, so far as the Ministers are concered, I am going to obey the party mandate and I will cast my votes against the motions before the House. But that is only because I feel constitutionally that we cannot, when a motion like this is tabled, leave the Ministers of our choice to the mercies of the Opposition. But if that is so as regards the Ministers the guardians of law and order who control the police force in Calcutta claim no protection from us.

Sir, I will not take much time of the House, but I will refer to instances which have been an eye opener to me. I have felt that greatest disturbances did not rise in a moment out of the moon but the result of a well planned action may be on one side or may be on both sides. I do not know, God alone knows. The future alone will disclose what is the truth.

I am not here concerned with the details of this nauseating event. I do not wish to discuss how these disturbances began, who was responsible, but I certainly want the House to consider why is it that the trouble was allowed to grow to gigantic proportions till within 24 hours the entire situation was out of control. Now, Sir, I have not been an eye witness of everything that occurred but one who has suffered most. I am not a young man with a heart but, Sir, I am supposed to have something like that sort of grit which can face unpleasant situation, but this time my nerves completely broke down. We could not sleep, batch after batch of ruffians knocked at our doors and every moment seemed to be our last. It seemed, Sir, that not only had British rule ended but that some modern Nadir Shah had come to Calcutta and had given up the city to rapine, plunder and pillage. But each time I tried to get into touch with police officers I was told that I was to contact the Control Room. I do not know, Sir, who was controlling the Control Room, but whenever I wanted some kind of help the reply came that my complaint has been noted and will be attended to in proper time. Then, Sir I sometimes tried to get into touch with high officials of Government House. I was told that none but Government servants were allowed the telephone to get into touch with the household of

His Excellency Governor. Police officers would not listen, the control office would not control, the Government House wouldnot listen. Sir, in these circumstances the great killing went on and it is undisputed that this thing would never have happened if the police and the military had taken strong measures on Friday, the 16th, when the trouble began. It would have been nipped in the bud that very day, and therefore the conclusion is inevitable that although the police may not be responsible for the origin of disturbances, they are directly responsible for the great loss of human life and if an impartial enquiry is held and these police officers can be spotted my opinion is that they deserve to be hanged, drawn and quartered publicly on charges of murder and abetment of murder.

Sir, I was deeply distressed on seeing what was happening in the Assembly House this afternoon. These tumultuous scenes were not befitting a solemn occasion like this, Already, Sir, we have blackened our face before the whole civilised world and have demonstrated to satisfaction that the Hindus and the Muslims cannot live together. It would be a tragedy if a debate of such importance cannot be carried on in an atmosphere free from passion and prejudice and calm judgment should not be allowed to get the better of any racial, communal or other considerations.

As regards these motions I think, Sir, they have been somewhat inopportune and if I may be permitted to say so somewhat ill-advised. As has been pointed out already by some of the speakers we are going to have a Commission to sit and investigate into all the matters connected with the disturbances. We are discussing here practically many of the important issues which are *sub judice before that Tribunal.*

Secondly, Sir, I feel that while we are discussing these affairs in this House issues of far greater moment and importance are hanging in the balance in the talks that are going on in Delhi. While we are shouting here, the fate of India is going to be decided not by resolutions here and there but in White Hall and in Delhi. It would have been better if we had waited and seen what would be the upshot and the result of the talks which are now going on between the Viceroy and the party leaders. I am optimistic in this respect. I feel, Sir, that all will end well. If there is a Coalition Government at the Centre there is no reason why there should not be a Coalition

Government in all the Provinces. (Cries of "hear, hear" from the Government Party Benches.) Sir, I have been a great believer in Coalition Government. In March, 1943, only a week before I resigned, I wrote two letters to Sir John Herbert and I told him that Bengal was faced with a critical situation and if Bengal was to be saved, there should be in office not a Cabinet of one Party or other but a Cabinet represented by all the parties in the country. I also said that if for any reason I am a hindrance to the formation of that Cabinet, I am not only prepared to resign but to guarantee that I will not ask for any seat in that Cabinet. To that opinion, Sir, I adhere, I will work ceaselessly now that I am a member of the only representative political organisation of the Muslim for the formation of Coalition Governments. I want to see peace established in the country. I am not for war ; I am for peace. I will do my best to restore friendly relation between the various communities. I have not jointed the Muslim League for self advertisement or self aggrandisement. The Muslim League cup board is now empty. They can offer me nothing. The most opportune moment to join the Muslim League would have been before the election. I might have had an easy entry into this house followed by an honoured place in the Cabinet. I have now come at a time when the future of the Muslim League is enveloped in darkness. The whole Muslim League army, If I may call it so, are waiting for a clarion call and if the bugle is sounded, we shall be marching to a terrible doom. I have not come here for personal gain. When the news came that I have joined the Muslim League some of the newspapers said that it was a somersault. Some said I have lost the confidence of my erstwhile colleagues. I have done nothing of the kind. My colleagues, new and old, may rest assured that I will do nothing to betray not merely the interests of the Muslims but the interests of any community, least of all I hope I will do nothing which will hinder the march of India towards freedom and liberty. I shall hope for peace. I wish for peace and I shall strive for peace. If I cannot establish peaceful relations between the communities, even with the help of the organisation to which I belong, even with the tremendous influence which that organisation wields in the Muslim community in India, if I fail, it is my resolve to retire entirely from politics. I will take no part in bickering. I will not forget those happy days when I used to work

with the members of the Opposition. I am looking forward to happy days of close contact, and co-ordination with the members of the Muslim League. It is my desire so to conduct the meeting and discussions in my party that all attempts to bring peace between the parties may prevail. After all even these disturbances have shown that Indians especially Bengalees, are not so bad as a mere contemplation of that holocaust may lead one to think. There have been golden deeds which do honour to any race or any nation or tribe of any part of the world. There is an example of Judge M. N. Banerjee, one of the advocates of our Court, who gave up his life in order to save a Muslim youth. There is the story of a Muslim woman in whose house Hindus had taken refuge. The mob came and knocked at her door and asked her to open the door. She refused, She stood at the door and bared the entrance of these ruffians, something like Catherine Douglas of Scottish history. These ruffians broke open the door and trampled upon her body. That took sometime, meanwhile the Hindu refugees escaped. While men and women exist who will suffer and thus die, hope for our future cannot be lost. Let us remember that in the presence in India of so many races, tribe and religion, there is something of the divine, that there is a divine purpose behind every thing. Let our endeavour be for the achievement of a more prosperous country and a much happier people.

পরিশিষ্ট ছ

ঘড়ির কাঁটা বন্ধ রেখে নির্ধারিত সময়ের পরও বিধানসভার অধিবেশন ৪ জুন, ১৯৫৭ পরিচালনার প্রতিবাদ করেন বঙ্কিম মুখার্জি এবং এই প্রসঙ্গে ফরাসী সংসদের উল্লেখ করেন। লেখকের নিকট ফরাসী জাতীয় সভার মহাসচিবের চিঠি থেকে জানা যায় সভার কার্যপরিচালন সংক্রান্ত নিয়ম মেনেই সংসদের অধিবেশন প্রলম্বিত করা হয়, ঘড়ির কাঁটা বন্ধ করে নয়।

অনূদিত চিঠি :

ASSEMBLEE´ NATIONALE
Secre´tariat Ge´ne´ral
SG 292

RE´PUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE´-E´GALIT´-FRATERNITE´
PARIS, le, ler Octobre 1981

Mr. Professor,

In reply to your letter dated 24th September, 1981, I request you to find herewith a copy of the letter I have sent you on the 18th September, 1981

With warm regards,
Yours truly
Divisional Chief
Michel Couderc

Mr Satyabrata Dutta
Calcutta (India)

Mr. Professor,

In your letter dated 4th July, 1981, you have informed the President of the National Assembly of your research on the legislative procedure, particularly the practice followed in 1946, which is, the imaginary stopping of the clock and the calendar.

As the budgetary rule requires that the finance bill must be passed before the 1st January of the year concerned, debates pertaining to budget, when they had to go on beyond the midnight of 31st December is extended continuing the last session of the previous year.

The report of the debates published officially gives us the information.

—that the second session of 31st December, 1945, which began at 15 hrs was closed on 1st January, 1945 at 20 hrs 25.

—that the second session of 31st December, 1947, which began at 21 hrs was closed on 2nd January, 1948 at 16 hrs 20

—and the 3rd session of 31st December, 1948 which began at 21 hrs 30 was closed on 3rd January at 2 hrs 25.

Therefore, it was not a question of stopping the clocks—since the official publication very clearly indicated the real time and day of the closing of the session as a prolongation of the last session of the year.

With best wishes,

Yours truly,
Divisional Chief
Michel Couderc

MR. SATYABRATA DUTTA
Calcutta (India)

গ্রন্থপঞ্জি

এক শতকের বিধানসভা কেন্দ্রিক বাংলার রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক প্রবণতার পর্যালোচনা গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয়। আইনসভা আলোচনায় মূলত নির্ভর করতে হয়েছে বিধানসভা গ্রন্থাগার, মহাকরণ গ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত (খুব ভালভাবে নয়) সরকারি দলিল দস্তাবেজ, রিপোর্ট ও আইনসভার কার্যবিবরণীর উপর।

প্রাচ্য ও ইন্ডিয়া অফিস সংগ্রহশালার "ইউরোপীয় ম্যানাসক্রিপ্ট" এখন সুরক্ষিত রয়েছে লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে। বলা হয়, ভারত ও দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপির সবচেয়ে সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা ব্রিটিশ লাইব্রেরী। লর্ড ক্লাইভ থেকে শুরু করে ভারতের গভর্নর জেনারেল, বাংলার গভর্নর ও সিভিলিয়ান সহ অনেকের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, টাইপ কিম্বা হাতে লেখা 'নোটস', ডায়েরি ইত্যাদি রয়েছে ব্রিটিশ লাইব্রেরীর হেপাজতে। প্রাক-স্বাধীনতা আমলের বাংলার রাজনীতি এবং বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা সম্বন্ধে অজানা তথ্য পাওয়া যায় এইসব পাণ্ডুলিপিতে। বাংলার বিধানসভার ইংরেজ সভাপতি (১৯২২-১৯২৫) হেনরি কটনের নিজ হাতে লেখা একটি দীর্ঘ 'নোটস' যুক্ত রয়েছে পরিশিষ্টে। অমুদ্রিত কয়েকটি হস্তলিখনের উল্লেখ আছে গ্রন্থপঞ্জিতে।

ঔপনিবেশিক বাংলার আইনসভার বিবর্তন নির্ভরশীল ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রণীত বিধি ও ভারত সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন সংস্কার আইনের উপর। স্বাধীনতা-পরবর্তী কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য আইনসভার ভূমিকা আলোচনার সঙ্গে ভারতীয় সংবিধান ও তৎসংক্রান্ত সংশোধনাবলীও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। স্বভাবতই সংবিধান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আইনসভা আলোচনায় অপরিহার্য। গ্রন্থপঞ্জিতে সেজন্যই সংবিধান বিষয়ে কয়েকখানি প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

ভারতে আইনসভা আলোচনা এখনও অঙ্কুরাবস্থায়, বিদেশে কিন্তু সংসদ গবেষণা বেশ উন্নত স্তরে। দেশী-বিদেশী খ্যাতনামা লেখকদের আইনসভা সংক্রান্ত গ্রন্থের তালিকা রয়েছে গ্রন্থপঞ্জিতে। বিধানসভা ও বাংলার রাজনীতি আলোচনায় সহায়ক হবে মনে করে রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থেরও উল্লেখ করা হলো।

ক. সরকারি দলিল, রিপোর্ট, আইনসভার কার্য-বিবরণী ইত্যাদি

Proceedings of the Legislative Council of the Governor General of India (1855-1920)
Debates of the Legislative Assembly (1921-1947)
Lok Sabha Debates (1953-1980)

Proceedings of the Council of the Governor of Fort St. George (1892-1940)
Proceedings of the Council of the Governor of Bombay (1862, 1870-1878, 1872-1896, 1918-1919, 1921-1929, 1931-1943)
Proceedings of the Council of the Lieutenant Governor of Bengal Governor's Council/Legislative Assembly/ West Bengal Legislative Assembly (1862-1974, 1976-1980, 1983-1988, 1990-1996)
Administration of Bengal under Sir Andrew Fraser : 1903-1908 : Calcutta, 1908
Administration of Bengal during the Governorship of Carmichael, Calcutta, 1918
Administration of Bengal under the Earl of Ronaldshay : 1917-1922 : Calcutta, 1922
F. G. Wigley, The Bengal Local Council Manual : Calcutta, 1906
Dawes Swinton, The Bengal Local Statutory Rules and Orders, 1903 : 2 vols : Calcutta, 1909
Collection of Papers relating to the Bengal Tenancy Bill Nos. I and II : Calcutta, 1884
Census of Bengal 1881 by S. A. Bourdillion : Calcutta, 1883
Census of India 1931 and 1941, Bengal and Calcutta Part.
Government Circulars and orders in force in Bengal : Calcutta, 1902
Hand-book for the use of Members of the Legislative Council, Eastern Bengal and Assam : Shillong, 1906 :
Memorandum on the Results of Indian Administration during the past fifty years of British Rule in India : Calcutta, 1911
L.S.S. O'Malley, History of Bengal, Bihar and Orissa under British Rule : Calcutta, 1925
L.S.S. O'Malley and Sydney Steward, Memorandum on the conditions of the people of Bengal and Bihar and Orissa from the year 1902-1903 to 1911-1912 : Darjeeling, 1912
Papers relating to the constitutional reform in India, vol. I, II, III : Calcutta, 1908
Report on the Conditions of the Lower classes of population in Bengal : Calcutta, 1888
Report of the Commission appointed to enquire into the Famine in Bengal and Orissa : Calcutta, 1886
Report of the Indigo Commission with Minute of Evidence : Calcutta, 1860

Report on the Administration of Bihar and Orissa, 1913-1914 : Patna, 1915

Report on the Working of the Reformed constitution in Bengal, 1921-1927 : Calcutta, 1928

Report of the Land Revenue Commission in Bengal, vol. I : Calcutta, 1940

Report of the Reforms Office, Bengal 1932-1937 compiled by R. N. Gilchrist : Calcutta, 1938

Report on the Indian Staturory Commission, vol. I, and II : London, 1930

Report on the General Election of 1923 in Bengal by S. N. Roy : Calcutta, 1925

Report on the General Election of 1926 in Bengal by O. M. Martin : Calcutta, 1927

Report on the Native Press in Bengal, 1907-1915 : Calcutta, 1916

খ. ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে রক্ষিত ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের প্রাসঙ্গিক কয়েকটি ফাইল

MSS Eur D 1194 : Type script extract from Diary of Cyril Geoige Grassby of Indian Police Service regarding agrarian unrest in Bengal : 1927-1939

MSS Eur D 601 : Papers of Lawrence John Lumley, 2nd Marques of Zetland, Governor of Bengal : 1917-1922

MSS Eur D 700 : Letters of Sir William Grey, Lieutenant Governor of Bengal : 1867-1871

MSS Eur C 349 : Paper of George Campbell, Lieutenant Governor of Bengal : 1871-1874

MSS Eur E 341 : Papers of Sir Dawson Tyson, Private Secretary to the Governor of Bengal : 1930-1935

MSS Eur D 1172 : Papers of Michael John Carritt, (I.C.S. 1930-1939), Communist underground worker containing notes on Communist Party organisation in India in 1936-1937

MSS Eur D 714 : Collection of Michael Carritt and other permanent Under Secretaries of the Government of Bengal

MSS Eur E 268 : Collection of papers of Sir Harry Evan Auguste Cotton, President of the Bengal Legislative Assembly (1922-1925) containing materials for a projected book on the painting of Thomas and William Daniel.

MSS Eur F 160 : Lytton collections containing Cotton's notes about members of the Bengal Legislative Assembly. Also contain letters of Bhupendranath Basu to Lytton. Cotton's notes about Surendra Nath Banerjee.

MSS Eur C 235 : Unpublished biography of Charles Tegart of the Indian Police Service in 2 volumes

MSS E 743 : Notes by Col. Claude Hugh Marley Toye taken at interrogation centre (Singapore) of one N.G. Swami about the latter's wartime activities in Germany and with the Indian National Army.

MSS Eur D 714 : Permanent under Secretaries Collection on political, constitutional, military, financial and economic matters

Photocopy

MSS Eur 397 (Photo) :

MSS Eur (photo) 398 : Photocopies of letters sent to Major-General M. Z. Kiani, Commander, Indian National Army, from Subhas Chandra Bose concerning the situation at the front line on the Burma Border compiled by G. D. Anderson

1 OR Neg 15538-69 : File regarding Dr. Shyamaprasad Mookerjee

R 207 : Suhrawardy (Huseyn Shaheed)

গ. সংবিধান ও নির্বাচন ব্যবস্থা

Austin, G. The Indian Constitution Cornerstone of a Nation : Bombay, 1966

——,Working a Democratic Constitution The Indian Experience : Oxford, 1999

Banerjee, A. C. Indian Constitutional Documents 3 vols. : Calcutta, 1974

Basu, Durga Das, Introduction to the Constitution of India : New Delhi, 1994

——, Shorter Constituion of India, New Delhi, 1988

Baxi, Upendra, The Crisis in the Indian Legal System : New Delhi, 1983

Chandrachud, The Basics of Indian Constitution : Its search for Social Justice and the Role of Judges : New Delhi, 1989

Dhavan, Rajeeb and Jacob, Alice (eds) Indian Constitution : Trends and Issues : Bombay, 1998

Gajendragadkar, P. B. The Constitution of India : Its philosophy and Basic postulates : Nairobi 1970

Hidayatullah, M. (ed) Constitutional Law of India : New Delhi, 1989

Ilbert, C. and Meston, The New Constitution of India : London, 1923

Jain, C.K. (ed) Constitution of India Precept and Practice : New Delhi, 1992

Kashyap, Subhas C. (ed) : Reforming the Constitution : New Delhi, 1992

Khanna, H.R. : Constitution and Socio-Economic Changes : New Delhi, 1979

Lok Sabha Secretariat : Constituent Assembly Debates : New Delhi 1989

Noorani, A. G. The Presidential System : The Indian Debate : New Delhi, 1989

Namboodiripad, E.M.S., Republican Constitution in the Struggle for Socialism : Trivandrum, 1976

Palkhivala, N.A. Our Constitution, Defaced and Defiled : New Delhi, 1975

——, We, the Nation (New Delhi, 1984)

Rau, B. N. : Indian Constitution in the Making : Calcutta, 1960

Report of the Committee on Electroal Reforms (Dinesh Goswami Committee) : New Delhi, 1990

Committee on State Funding of Elections (Indrajit Gupta Committee) : New Delhi, 1998

Law Commission of India, Report on Reform of the Electoral Laws : New Delhi, 1999

Sarkaria, R. S. : Commission on Centre State Relations : Delhi, 1988

Tarakunde Committee Report on Electoral Reforms : New Delhi, 1995

Election Commission of India, Proposals of the Election Commission for Electoral Reforms : New Delhi, 1992

Maddex, R.L. : Constitution of the World : London, 1996

Mitra, Subrata K. Democracy and Social Change in India : a cross-sectional analysis of the national electorate : New Delhi, 1999

Butler, David ; Lahiri, Ashoke and Roy, Pranoy, India Decides : Elections 1952-1991 : New Delhi, 1991

ঘ. আইনসভা ঃ বিদেশ ও ভারত

Bagehot, W. : The English Constitution : London, 1880
Blondel J. : Comparative Legislature : New Jersy, 1973
Bryce, J. : Modern Commonwealth, 2 vols : London, 1921
——, Modern Democracies : Calcutta, 1962, Indian Edition
Crick, Bernard : The Reform of Parliament : London, 1964
Chester, D. N. and Bowring, N. : Question in Parliament : London, 1962
Finer, Herman (1986) : Theory and Practice of Modern Government : New York, 1949
Howrath, P. : Questions in the House, History of a unique British Institution : London, 1956
Inter-Parliamentary Union, Parliaments of the World, 1993
Jennings, Ivor : Parliament : Cambridge, 1957
Jewell, M.E. and Patterson S.C. : The Legislative Process in the United States : New York, 1953
Korenberg and Muself (eds) Legislature in Development Perspective : Duke University, 1970
Laski, Harold J. : Parliamentary Government in Britain : London, 1938
Locke, John : Second Treatise on Civil Government : 1690
Luce, R. Legislative Assemblies : Massachusets, 1924
Montesquieu, The Spirit of Laws : 1748
May, Erskine, Treatise on the Laws, privileges, Proceedings and usages of Parliament : London, 1979
Morrison, Herbert : Government and Parliament : London, 1964
Miliband, Ralph : Capitalist Democracy in Britain : Oxford, 1982
Norton, Philips : Legislatures and Legislators : London, 1998
Palombara, I. L. : Politics within Nations : New York, 1974
Strong, C.P. : Modern Political Constitution : London, 1966
Wahlke I. C. and Eulau H, Legislative Behaviours : New York, 1959
Wheare, K. C. : Legislatures : London, 1963
——, Federal Government : Oxford, 1953
Bharadwaj, R. K. Parliamentary Democracy and Legislature : New Delhi, 1983
Dutta, Satyabrata, Bengal Legislature 1862-1920 (Calcutta, 1980)

Gopalan, A. K. and Mukherjee, H. Communists in Parliament : New Delhi, 1957)
Jain, R. B. : Comparative Legislative Behaviour : Research Exploration in Indian perspective (New Delhi, 1974)
Jones Morris, W. W. : Parliament in India (London, 1957)
Kaul, M. L. and Shakder,S.L. : Practice and Procedure of Parliament (New Delhi, 2001)
Kashyap, Subhash C. History of Parliamentary Democracy : Delhi, 1991
——, Parliament as Multifunctional Institution : New Delhi, 1987
Philips, H. A. D. . Indian Legislation and Legislative Councils (Calcutta, 1890)
Roy, Mohini Mohon : Law and Legislation in India (Calcutta, 1870)
Rothnaswarry, M : Legislation—Principle and practice (Delhi, 1974)
Lok Sabha Secretariat : Parliaments of Commonwealth : New Delhi, 1989
——, Question Hour in Lok Sabha (New Delhi, 1988)
——, President Rule in the States and Union Territories, : New Delhi, 1991
Mukherjee, A. R. Parliamentary Practice in India (Calcutta 1967)
Mukherjee, Hiren, India and Parliament (New Delhi, 1962)
Portrait of Parliament (Reflection and Recollection) New Delhi, 1978
Pylee, M. N. Constitutional Government in India, (Bombay, 1965)
Sinha Roy, B. P. Parliamentary Government in India (Calcutta, 1943)

ঙ. রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয় ঃ ভারত ও বাংলা

Azad, Maulana Abul Kalam, India Wins Freedom : Calcutta, 1960
Banerjee, Surendranath, A Nation in Making, Being the reminisences of fifty years of public life : London, 1925
Bandyopadhyaya,Gitasree, Constraints in Bengal politics 1921-1941 Gandhian Leadership : Calcutta, 1984
Baxi, Upendra and Bhiku Parekh, Crisis and Change in Contemporary India : New Delhi, 1995
Betelle, Andre, Society and Politics in India : Essays in comparative perspective : Oxford, 1993
Birla, G. D. In the Shadow of Mahatma—a personal Memoir : Calcutta, 1953

Bose, Sarat Chandra, I warned my Countrymen, being a collected works 1945-56 : Calcutta, 1984

Bradley-Birt, F.B. Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century : Calcutta, 1910

Brass, Paul R. The Politics of India since Independence : New Delhi, 1992

Broomfield, J. H. Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth Century Bengal : Bombay, 1968

Brown, Judith, Gandhi's Rise to Power in Indian Politics : Cambridge, 1972

Buckland, C.E., Bengal under the Lieutenant Governors, 2 vols. : Calcutta, 1920

Carritt, Michael, A Mole on the Crown : Calcutta, 1986

Campbell, G, Memoirs of My Indian Career 2 vols. : London, 1893

Campbell Johnson, Alan, Mission with Mountbatten : London, 1951

Chatterjee, Joya, Bengal Divided Hindu Communalism and Partition : New Delhi, 1995

Chatterjee, Partha, A possible India : Delhi, 1997

——, Bengal 1920-1947 The Land Question, (Calcutta, 1984)

Chattopadhyay, Gautam, Bengal Electoral Politics & Freedom Struggle : New Delhi, 1984

Chaudhuri, Nirad C. Thy Hand Great Anarch India 1921-1952 (London, 1989)

Carstairs, Robert, The Little World of an Indian District Officer : London, 1912

Dre'ze Jean and Amartya Sen, Economic Development and Social Opportunity : Delhi, 1996

Engineer, Asgar Ali, Essays in Contemporary Politics Identity, Religion and Secularisn : Delhi, 1999

Frankel, Francine R, et al, Tranforming India : Social and Political dynamics of democracy : New Delhi, 2000

Gandhi, Rajmohan, Understanding thc Muslim Mind : Penguin, 1990

Ikramullah, Shaista Suhrawardy Begum, Huseyn Shaheed Sutrawardy A Biography (Karachı, 1'993)

Ispahani, M.A.H. Quaid-e-Azam as I Knew Him : Karachi, 1967

Jalal, Ayesha, The Sole Spokesman Jinnah The Muslim League and Demand for Pakistan : Cambridge, 1985

Kabir Humayun, Muslim Politics in Bengal 1906-1942 : Calcutta, 1943

Khaliquzzaman Chaudhury, Pathway to Pakistan : Lahore, 1961

Kohli, Atul, Democracy and Discontent : Indias Growing Crisis of Governability : Cambridge, 1990

Kothari, Rajani, Politics in India : New Delhi, 1970

Lytton, Earl, Pundits and Elephants : London, 1942

Land Question : Reprinted from the Times of India : Bombay, 1871

Markovitz, C. Indian Business and Nationalist Politics 1931-1939 : Cambridge, 1985

Menon, V. P. The Transfer of Power in India : Calcutta, 1957

Montagu, Edwin, An Indian Diary : London, 1930

Mansergh, N. and Lumby EWR. The Transfer of Power (12 volumes) : London, 1970-1983

Moon, Penderell, (ed), Wavell, The Viceroy's Journal : London, 1973

Majumdar, Ambica Charan, The Indian National Evolution : Madras, 1915

Majumder, R. C. Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century (Calcutta, 1960)

Mitra, Digambar, Epidemic Fever in Bengal : Calcutta, 1873

Nehru, Jawaharlal, Letters to the Chief Ministers (Parthasarathi, G. (ed) (New Delhi, 1989)

Sarkar, S. Bengal Renaissance and other Essays : New Delhi, 1970

Sarkar, Sumit. Modern India 1885-1947 : Delhi, 1983

Sarkar, N. N. Bengal under Communal Award and Poona Pact : Calcutta, 1983

Sen, Shila. Muslim Politics in Bengal 1937-1947 (New Delhi, 1976)

Setalvad, C. H. Recollections and Reflections : Bombay, 1946

Sitaramayya, P. History of the Indian National Congress (1885-1935) 2 vols. (Bombay, 1935)

Taylor, William, Indian Reforms Suggestions for the Consideration of the British Parliament : London, 1871

অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭ (কলকাতা, ১৩৯৭)

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৪৭-১৯৯৭) (কলকাতা, ১৯৯৯)

অবনী লাহিড়ী, তিরিশ চল্লিশের বাংলা, (কলকাতা, ১৯৯৯)
আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (ঢাকা, ১৯৭০)
আবুল হাশিম, আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি (কলকাতা, ১৯৮৮)
কালীপদ বিশ্বাস, যুক্ত বাংলাব শেষ অধ্যায় (কলকাতা, ১৯৬৬)
জ্যোতি বসু, জনগণের সঙ্গে (কলকাতা, ১৯৮৬)
——, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা, ১৯৯১)
বিজয় সিংহ নাহাব, যা দেখেছি যা করেছি (কলকাতা, ১৯৯০)
বদরুদ্দিন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙলা দেশের কৃষক (কলকাতা, ১৯৮২)
মণিকুন্তলা সেন, সেদিনেব কথা (কলকাতা, ১৯৮২)
বাজেন্দ্রপ্রসাদ, আত্মকথা (প্রিয়রঞ্জন সেন অনূদিত) (নিউ দিল্লি, ১৯৬৯)
শান্তিপ্রিয় বসু, বাংলার চাষী (কলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)
শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মকথা
সুভাষচন্দ্র বসু, সমগ্র রচনাবলী ১-৪ খণ্ড (কলকাতা, ১৯৮৩)
হিতেশরঞ্জন সান্যাল, স্বরাজের পথে (কলকাতা, ১৯৯৪)
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায, তরী হতে তীব (কলকাতা, ১৯৭৪)

নির্ঘণ্ট